হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত
অ্যাডভেঞ্চার
সমগ্র

অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র

২

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭৩

আমার

লেখকবন্ধু

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

ও

পাঠকবন্ধু

শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জিকে

ভূমিকা

'অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র'র পর এবার 'অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র-২'। আগের বইটির মতো এই বইতেও স্থান পেয়েছে পাঁচটি অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস। ইতিপূর্বে উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন শারদ পত্রিকায়। বরফদেশের ছায়া মানুষ (আনন্দমেলা), কোস্টরিকার রক্তচোষা, (শুকতারা) বিছে মানুষের দাঁড়া (মায়াকানন)। চাদের বাজনা ও শেরউড বনের শিঙা (মাসপাতা ব্যাসপাতা)।

প্রথম তিনটি উপন্যাসের নায়ক সুদীপ্ত আর হেরম্যান। ক্রিপ্টিড, অর্থাৎ রূপকথা-লোককথা বা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীর সন্ধানে তারা ঘুরে বেড়ায় কখনও তুষার ধবল পর্বতে, কখনও, আফ্রিকার জঙ্গলে, জনহীন মরুভূমিতে এমনকী সমুদ্রর গভীরেও। নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে তারা ছুটে চলে অজানার হাতছানিতে। এ বইয়ে সংকলিত প্রথম তিনটি উপন্যাসের পটভূমি কিরীট শোভিত দুর্গম হিমালয়ের পর্বতমালা, কোস্টারিকার মেঘ অরণ্য আর নিষ্প্রাণ কুখ্যাত রাব-আলি-খালি মরুভূমি। যেখানে সুদীপ্ত-হেরম্যানের অ্যাডভেঞ্চার কখনও হিমালয়ের রহস্যময় প্রাণী ইয়েতি, রক্তচোষা চুপাকাবরা বা দানব কাঁকড়া বিছে ইউরেপুটেরাসের সন্ধানে। প্রসঙ্গত বলি যে এ বইয়ের প্রথম উপন্যাস। 'বরফ দেশের ছায়া মানুষ'-এ কিন্তু প্রথম পরিচয় হয়েছিল সুদীপ্ত আর হেরম্যানের। বিচিত্র পৃথিবীর অচেনা অজানা পটভূমিতে রচিত সুদীপ্ত-হেরম্যানের এই উপন্যাসগুলি তাদের অন্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির মতো পাঠকদের ভালো লাগবে আশা করি।

এ বইয়ের শেষ দুটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইতিহাস গবেষক প্রফেসর জুয়ান ও দীপাঞ্জন। তাদের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল সন্দেশ পত্রিকার পাতায়। সুদীপ্ত-হেরম্যান যেমন ক্রিপ্টিডের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় তেমনই জুয়ান আর দীপাঞ্জন পৃথিবীর নানা চেনা-অচেনা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় প্রাচীন ইতিহাসের খোঁজে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি অভিযান চালিয়েছে তারা। তাদের সে অভিযান কখনও লাটিন আমেরিকার প্রাচীন অ্যাজটেক মন্দিরে, আবার কখনও রোমের প্রাচীন যুদ্ধ ভূমি কলোসিয়ামে। এ বইতে অন্তর্ভুক্ত হল তাদেরও দুটি অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস 'চাদের বাজনা' ও 'শেরউড বনের শিঙা'। যার প্রথমটির পটভূমি আফ্রিকার যুদ্ধবিধ্বস্ত ছোট্ট দেশ 'চাদ'। যেখানে দেখা মেলে সভ্যতার কলঙ্ক 'চাইল্ড আর্মি'দের। শৈশব কেড়ে নিয়ে শিশুদেরও সেনা বানানো হয়। মানুষ খুন করতে শেখান হয় যেখানে। সম্ভবত 'চাইল্ড আর্মি' বা 'শিশু সৈন্য' নিয়ে বাংলায় লেখা এটাই প্রথম কিশোর উপন্যাস। এ বইয়ের শেষ উপন্যাসের পটভূমি

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শেরউড বনাঞ্চল। যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে লোককথার রবিনহুডের নাম। দুই বিচিত্র পটভূমিতে লেখা জুয়ান-দীপাঞ্জনের গা-ছমছমে এই অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস দুটিও সকল বয়সি পাঠকরা পড়ে আনন্দলাভ করবেন বলেই মনে হয়।

'সুদীপ্ত-হেরম্যান' সিরিজের লেখাগুলো লেখার সময় বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন লোপামুদ্রা বাগ। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই 'দে'জ পাবলিশিং'কে 'অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র-২' প্রকাশের জন্য।

পরিশেষে বলি পাঠক-পাঠিকারা যদি প্রথম বইটির মতো এ বইটিকেও সাদরে গ্রহণ করেন তবে ভবিষ্যতে লেখক-প্রকাশক এগিয়ে যাবেন 'অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র-৩' প্রকাশ করার জন্য।

৭ ডিসেম্বর, ২০১৬

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

সূচি

বরফ দেশের ছায়ামানুষ

তাঁবুর বাইরে এসে মুগ্ধ হয়ে গেল সুদীপ্ত। দু'দিন পর মেঘ কেটেছে সকালের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই নীল আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সার-সার তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গ। ওদের মধ্যে কয়েকটা শৃঙ্গ অবশ্য চেনা সুদীপ্তর। নন্দাঘাট, ত্রিশূল নন্দাদেবী। তবে বেশিরভাগটাই অজানা। এই নেপাল-হিমালয়ে এমন অনেক শৃঙ্গ আছে, যেখানে এখনও মানুষের পদচিহ্ন আঁকা হয়নি। উচ্চতায় হয়তো তাদের মধ্যে অনেকেই তেমন বিখ্যাত নয়, কিন্তু দুর্গমতায় অনেক সময় তারা মাউন্ট এভারেস্টকেও পিছনে ফেলে দেয়। সুদীপ্ত আর একজন পোর্টারকে এই বেসক্যাম্পে রেখে গতকালই সুদীপ্তর পর্বতারোহী বন্ধুরা যাত্রা করেছে তেমনই এক আপাতঅখ্যাত কিন্তু দুর্গম 'শিবের জটা' পর্বতশৃঙ্গ সামিট করতে।

এই বেসক্যাম্প অঞ্চলটা সমতল হলেও প্রচণ্ড ঠান্ডা। চারপাশের পাহাড়গুলো থেকে ভেসে আসা ঠান্ডা বাতাস সুদীপ্তর ফার ও চামড়ায় ঢাকা ওভারকোট আর তার ভিতরের জ্যাকেট ভেদ করে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এসব জায়গায় আকাশ যত মেঘ মুক্ত হয়, বাতাস আর ঠান্ডার প্রকোপ তত বাড়ে। এদিনটাও তেমনই।

কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার পর সুদীপ্তর মনে হল, তাঁবুর ভিতর থাকাই ভালো ছিল। সুদীপ্তর তাঁবু বলতে যা বোঝায়, তা হল চারদিকে পাথরের টুকরো সাজিয়ে ফুটচারেক উঁচু দেওয়াল, আর তার মাথায় প্যারাশুট কাপড়ের ছাউনি। তার ভিতর গুটিসুটি মেরে দু'জন লোক থাকতে পারে। ভিতরে শোওয়া-বসা যায়, তবে দাঁড়ানো যায় না। এখানে সব তাঁবুগুলোরই এরকম অস্থায়ী ছাউনি, শুধু একটা মাত্র ছাদওয়ালা বাড়ি আছে। কাঠের ছাদওয়ালা পাথরের বাড়ি। সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে নেপাল সরকারের বনবিভাগের একটা দল। তারা নাকি তুষারচিতার খোঁজে যাচ্ছে।

সুদীপ্তকে এই বেসক্যাম্পে অন্তত দিন দশ-বারো থাকতে হবে তার বন্ধুরা এক্সপিডিশন শেষ করে না ফেরা পর্যন্ত। সারাদিন তো আর তাঁবুর মধ্যে বসে থাকা যায় না, হাত-পায়ে খিল ধরে যাচ্ছে। তাই বাইরে বেরিয়েছে সুদীপ্ত। চারপাশে তাকাতে-তাকাতে সুদীপ্ত হঠাৎ কিছু দূরে পাহাড়ের ঢালে বাড়ির মতো আরও একটা কাঠামো দেখতে পেল। পাইন গাছের ঘন বন ও জায়গাটাকে বেশ কিছুটা আড়াল করে রেখেছে। সুদীপ্তর পাশেই দাঁড়িয়েছিল এখন এখানে তার একমাত্র সঙ্গী পোর্টার তাশি। মাঝবয়সি লোক। কিন্তু প্রচুর পরিশ্রম করতে পারে আর বেশ ভালো ইংরেজি বলতে পারো। বহুবার এ তল্লাটে এসেছে সে এক্সপিডিটর বা অভিযাত্রী দলের সঙ্গে। সুদীপ্ত তাকে জিজ্ঞেস করল, "পাইন বনের

ওপাশে ওটা কী দেখা যাচ্ছে?'

তাশি বলল, "ওটা একটা মনাস্ট্রি। বৌদ্ধ গুম্ফা। এক্সপিডিশনে যাওয়ার আগে অনেকে ওখানে পুজো দিতে যায়। ওখানে পুজো দিলে পাহাড়ের দানোরা আর কিছু করতে পারে না। আপনি চাইলে ওখানে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।"

"পাহাড়ের দানো মানে?"

তাশি তার কানের লতিতে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, "দানো মানে, ওই যারা ওই সব পাহাড়ের মাথায় থাকে। যারা হঠাৎ তুষার ঝড় নামিয়ে আনে, পায়ের নীচের বরফ ফাটিয়ে মানুষকে নীচে টেনে নেয়, রোপ ক্লাইম্বিং-এর সময় দড়ির হুক খুলে দেয়, পাহাড়ের মাথায় তাঁবুতে শুয়ে গভীর রাতে যাদের ডাক শোনা যায়।"

সুদীপ্ত বুঝতে পারল, তাশি কী বলতে চাইছে। এই সব পোর্টার-শেরপারা নানা ভূত-প্রেত, অপদেবতায় বিশ্বাস করে। সে তাদের কথাই বোঝাতে চাইছে। সুদীপ্তর এসবে তেমন বিশ্বাস নেই, কিন্তু মনাস্ট্রিটা দেখার লোভে সে তাশিকে বলল, "চলো, তা হলে ওখানে ঘুরেই আসা যাক।"

তাশি যেন বেশ খুশিই হল সেখানে যাওয়ার কথা শুনে। এক ছুটে সে পিছনের তাঁবুতে ঢুকে তার নিজের ব্যাগ হাতড়ে এক গোছা ধূপকাঠি নিয়ে এসে সুদীপ্তকে বলল, "চলুন সাহেব।"

কনকনে ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে পাইন বনের দিকে রওনা হল তারা। জায়গাটা সুদীপ্তর যত কাছে মনে হয়েছিল, ঠিক তত কাছে নয়। পাহাড় ভেঙে, বরফগলা জল পেরিয়ে সেই পাইন বনের কাছে পৌঁছতেই আধ ঘণ্টা সময় লেগে গেল।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপর দিকে উঠে গিয়েছে বনটা। পায়ের নীচে শতাব্দীর পর-শতাব্দী ধরে জমা হওয়া পচা পাতার স্তূপ। আর মাথার উপর গাছের ডালের গায়ে আটকে থাকা বরফকুচি থেকে টুপটাপ ঝরে পড়া জল, বনটা পার হতে গিয়ে প্রায় ভিজে গেল সুদীপ্তরা। বনের বাইরে বেরিয়ে আসতেই অবশ্য মনাস্ট্রি চত্বরে পৌঁছে গেল তারা।

মনাস্ট্রিটা বেশ প্রাচীন। পাথরের দেওয়াল, মাথায় পাথরের টুকরো বসানো ঢালু ছাদ। তবে অনাদর-অবহেলায় জীর্ণ হয়ে গিয়েছে গুম্ফাটি। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসা হিমেল বাতাস মনাস্ট্রি চত্বর প্লাবিত করে নেমে যাচ্ছে আরও নীচের দিকে। মনাস্ট্রির প্রবেশ তোরণের মাথায় খোদিত আছে ভীষণদর্শন এক অপদেবতার মূর্তি। তাশি জানাল, এ মঠ নাকি নিয়াগমাপা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের। এ মঠে নাকি তন্ত্রসাধনা করা হয়।

তোরণ অতিক্রম করে প্রায় অন্ধকার প্রার্থনাকক্ষে প্রবেশ করল তারা দু'জন। ঘরের শেষ প্রান্তে উঁচু বেদির উপর রয়েছে পাথরের তৈরি বেশ বড় পদ্মাসনে ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তি। তার পাদমূলে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেখানে। তাশির সঙ্গে সুদীপ্ত হাজির হল মূর্তিবেদির সামনে। বেদিটা প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু। তার নীচে ধূপের ছাই জমে-জমে যেন একটা ছোট পাহাড় তৈরি হয়েছে।

যুগ-যুগ ধরে কত অভিযাত্রীরা যে অভিযানের সফলতা কামনায় এখানে ধূপ জ্বালিয়েছেন কে জানে? তাঁদের মধ্যে অনেকে হয়তো দেবতার আশীর্বাদে দুর্গম পর্বতমালার মাথায় নিজেদের পদচিহ্ন এঁকে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরেছেন। আবার কেউ হয়তো ফিরতে পারেননি। অজানা, অচেনা দুষারাবৃত কোন পর্বতকন্দরে বরফের পুরু চাদরের নীচে যুগ-যুগ ধরে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকবেন তাঁরা। ধূপের স্তূপের দিকে তাকিয়ে সুদীপ্তর মনে হল এ কথাগুলো।

তাশি ধূপ জ্বালিয়ে ক'টা ধূপ সুদীপ্তকে দিয়ে বাকিগুলো নিজের হাতে বসিয়ে দিল সেই ছাইয়ের স্তূপে। তার দেখাদেখি সুদীপ্তও একটু ঝুঁকে কাজটা করে সোজা হয়ে বেদির সামনে দাঁড়াতেই হঠাৎই একটা জিনিসে চোখ আটকে গেল তার। সুদীপ্তর চোখের সমান্তরালে পদ্মাসনে বসা বৃদ্ধমূর্তির কোলে রাখা আছে একটা বিশালাকৃতির খুলি। তার মাথায় কাপড়চাপা দেওয়া থাকলেও তার গঠন দেখে সে যে মানুষ বা তার সমগোত্রীয় কোনো প্রাণীর খুলি, তা বুঝতে অসুবিধে হল না সুদীপ্তর। ঘিয়ের প্রদীপের ম্লান আলোয় সেই করোটিটা তার শূন্য অক্ষিকোটর নিয়ে দাঁত বের করে যেন হাসছে সুদীপ্তর উদ্দেশে।

"ও কার খুলি কোলে নিয়ে বসে আছেন বৃদ্ধদেবতা?" সুদীপ্ত তাশিকে প্রশ্নটা করতেই সে শ্রদ্ধাভরে সেই খুলিটার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে একটু ভয়ার্ত ভাবে বলল, ওটা হল তাদের রাজার মাথা। যারা পাহাড়ে বরফের নীচে টেনে নেয় মানুষকে, যারা পাথরের খাঁজ থেকে আইস-এক্স খুলে ফেলে, দড়ি কেটে দুর্ঘটনা ঘটায়, যাদের সাধারণত চোখে দেখা যায় না, তুষারপ্রান্তরে তাঁবুর বাইরে অন্ধকারে যাদের চিৎকার শোনা যায় . . . ভূতের রাজার মাথা!

ব্যাপারটা বিশ্বাস না করলেও খুলিটা কৌতূহলের উদ্রেক ঘটাল সুদীপ্তর মনে। অনেকটা মানুষের মাথার মতো দেখতে, কিন্তু মানুষের মাথার খুলিতে দাঁত অত বড় হয় না! তা হলে কীসের খুলি ওটা? সুদীপ্ত খুলিটার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল ব্যাপারটা।

তাশি সুদীপ্তর উদ্দেশে বলল, "আপনি খুব ভাগ্যবান বলে মাথাটা দেখতে পেলেন। প্রতি পাঁচ বছরে ধর্মীয় উৎসবের জন্য মাথাটা উপর থেকে এই মঠে ক'দিনের জন্য আনা হয়, তারপর আবার এ জিনিস উপরে রেখে আসা হয়। আমি এর আগে এই মাথাটা একবারই মাত্র দেখেছি।"

"উপরে মানে?"

তাশি জবাব দিল, "উপরে মানে, নন্দাদেবী ক্লাইম্ব রুটে এখান থেকে আরও পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় 'মিগু গুম্ফা' নামের এক গুম্ফা আছে। আমি সেখানে যাইনি, শুধু নাম শুনেছি। নন্দাদেবীর মাঝপথে এক গ্লেসিয়ার ব্রিজ পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। যারা নন্দাদেবী পিক এক্সপিডিশনে যায়, তারা সেদিকে না গিয়ে উপর দিকে উঠে যায়। আমি ব্রিজটা দূর থেকে দেখেছি। সেই মিগু গুম্ফাতেই মাথাটা রাখা থাকে।"

সুদীপ্ত বলল, "বুঝলাম। কিন্তু মাথাটা আসলে কি প্রাণীর, সেটা এখনও স্পষ্ট হল না। এরকম জিনিস এর আগে আমি কখনও দেখিনি।"

তাশি কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই খুব কাছ থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর, "আমি কিন্তু ওরকম আরও একটা মাথা দেখেছি। সেটা রাখা আছে এই নেপাল হিমালয়েরই খুমজাং মনাস্ট্রিতে।"

সুদীপ্ত মৃদু চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল, কিছু দূরে দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একজন দীর্ঘকাল লোক। অন্ধকার দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে বলে তাকে এতক্ষণ খেয়াল করেনি সুদীপ্তরা।

লোকটা এবার কাছে এগিয়ে এসে সুদীপ্তকে বলল, "আমাকে চিনতে পারছেন?"

লোকটা একজন ইউরোপিয়ান। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর সুদীপ্ত চিনতে পারল লোকটাকে। এখানে আসার পথে কাঠমান্ডুতে এক হোটেলে একদিনের জন্য থাকতে হয়েছিল সুদীপ্তদের টিমটাকে। তখনই হোটেলের লবিতে এ লোকটার সঙ্গে সুদীপ্তর সৌজন্যমূলক পরিচয় হয়েছিল। সুদীপ্তরা কোন পিক এক্সপিডিশনে যাচ্ছে, সে জানতে চেয়েছিল। জার্মানি থেকে এসেছে লোকটা। প্রাণীতত্ত্ববিদ। খুব সামান্যই কথাবার্তা হয়েছিল তার সঙ্গে। কী যেন নাম বলেছিল?

লোকটা এর পর নিজেই করমর্দনের জন্য সুদীপ্তর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমি হেরম্যান। কাঠমাণ্ডুর 'হোটেল স্বয়ম্ভূ'তে . . ."

সুদীপ্তও হেসে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি চিনতে পেরেছি।"

হেরম্যান বললেন, "আমিও দু'দিন আগে এখানে এসেছি। কাল দেখলাম আপনার টিমের সবাই এক্সপিডিশনে বেরিয়ে গেলেন, আপনি গেলেন না?"

সুদীপ্ত জবাব দিল, "না, আমি যাইনি।"

"কেন? শরীর খারাপ হল? নাকি পারমিটের সমস্যা?"

সুদীপ্ত বলল, "না, ও দুটোর কোনোটাই নয়। আসলে রক ক্লাইম্বিংয়ের বেসিক কোর্সটা আমার করা থাকলেও আমি সে অর্থে ঠিক ক্লাইম্বার নই। আমার বন্ধুরা যে এক্সপিডিশনে যাচ্ছে, সে এক্সপিডিশনে একমাত্র দক্ষ পর্বতারোহীরাই অংশ নিতে পারে। আমি ওদের সঙ্গে এ পর্যন্ত এসেছি বেড়ানোর নেশায়। এ পর্যন্ত হিমালয়ের যতটুকু সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়, তার জন্য।"

"আপনি কি ক্লাইম্বার?"

হেরম্যান হেসে জবাব দিলেন, "এভারেস্ট বা নন্দাদেবী-ত্রিশূল ক্লাইম্ব করার মতো তেমন দক্ষ নই, তবে আল্পসের দু'-একটা ছোট পিক ক্লাইম্ব করেছি।"

"এখানে কি তা হলে আপনি আমার মতো ভ্রমণের নেশায় এসেছেন?"

মৃদু চুপ করে থেকে হেরম্যান জবাব দিলেন, "এ ব্যাপারে আপনি 'হ্যাঁ' বা 'না' দু'টোই ধরে নিতে পারেন।"

সুদীপ্ত এর পর আগের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলল, "খুমজাং গুম্ফায় এরকম আর একটা মাথার ব্যাপারে আপনি কী যেন বলছিলেন?"

হেরম্যান বললেন, "আপনার এ জায়গা দেখা হয়ে গেলে আমরা বাইরে বেরিয়ে কথা বলতে পারি। ধূপের ধোঁয়ায় আমার অ্যালার্জি আছে। বেশিক্ষণ থাকলে হাঁচি হয়।"

সুদীপ্ত একবার সেই খুলিটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, চলুন বাইরে যাই।"

মনাস্ট্রির অন্ধকার কক্ষ ছেড়ে বাইরে বেরোতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়িয়ে হেরম্যান কারও উদ্দেশে কী যেন বললেন।

সুদীপ্ত দেখল বেদির কোণ ঘেঁষে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন একজন লামা আর একজন লম্বা লোক। সেই লম্বা লোকটা জবাব দিল, "এই তো একটু আগে। যাত্রা শুরু আগে একটু খোঁজখবর নিতে এলাম এই মঠে।"

তার সঙ্গে আর কোনো কথা না বলে বাইরে বেরতে-বেরতে হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, "ওঁর নাম বীরবাহাদুর। ফরেস্ট রেঞ্জার। আমি ওঁদের ওখানেই আছি।"

বাইরে পা রাখলেন তাঁরা। নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে তুষারশুভ্র, কিরীটশোভিত হিমালয়। তা দেখে সুদীপ্ত বলে উঠল, "ভয়ঙ্কর সুন্দর!"

হেরম্যান বললেন, "হিমালয় শুধু ভয়ঙ্কর সুন্দরই নয়, রহস্যময়ও বটে। ওর বরফাবৃত নির্জন প্রান্তরে, অন্ধকার পর্বতকন্দর-পাতালগুহায় কত যে গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে! অনেকে ওই রহস্যর টানেই হিমালয় অভিযানে যায়।"

সুদীপ্ত বলল, "আপনি নিশ্চয়ই ওই বেসক্যাম্পের ওখানে যাবেন চলুন, যেতে-যেতে কথা বলি।"

সম্মতি প্রকাশ করে পাইন বনে প্রবেশ করলেন হেরম্যান।

হেরম্যান হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, খুমজাং মনাস্ট্রিতে আমি ঠিক ওরকম একটা খুলি দেখেছি। শুনেছি, হিমালয়ের প্যাংবোচে মনাস্ট্রিতেও ওরকম আরও একটা মাথা রাখা আছে। খুলিটা কাপড়চাপা অবস্থায় আছে বলে আপনি হয়তো বুঝতে পারেননি যে, ওর মাথায় রোমশ চামড়ার আবরণ আছে।"

সুদীপ্ত বলল, "কিন্তু খুলিটা আসলে কোন প্রাণীর?"

চলতে-চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন হেরম্যান। তারপর বেশ রহস্যময় ভাবে বললেন, "পাহাড়ি লোকরা তো বলে এ হল সেই প্রাণীর খুলি, পর্বত অভিযানে গিয়ে কেউ-কেউ যার পায়ের ছাপ দেখে ফেলেন।"

হেরম্যানের কথার ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে সুদীপ্ত চমকে উঠে বলল, "অ্যাবোমিনেবল স্নোম্যান? ইয়েতি?"

তিনি আবার হাঁটতে-হাঁটতে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, মনাস্ট্রির লোকজন সেরকমই দাবি করে। তবে এ নিয়ে বিভিন্নরকম মত আছে।"

"কীরকম?"

হেরম্যান বললেন, 'আপনি হয়তো জানেন যে, ওই প্রাণীর খোঁজে বহুবার হিমালয়

অভিযান হয়েছে। এমনকী, হিলারি, তেনজিং-এর মতো প্রণম্য এভারেস্ট জয়ীরাও তার কয়েকটিতে অংশ নেন। ইয়েতির সন্ধানে সবচেয়ে বড় অভিযান হয় 'ডেলি মেল' নামক এক খবরের কাগজের অর্থানুকূল্যে ১৯৫৪ সালে। এভারেস্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে যে অভিযান চালানো হয় জন জ্যাকসনের নেতৃত্বে। তার সহকারী ছিলেন বাঙালি প্রাণীবিদ বিশ্বময় বিশ্বাস। সে অভিযানের রিপোর্ট বের হয় ওই বছরই। তাতে বলা হয়, প্যাংবোচে মনাস্ট্রিতে ওরকম এক খুলি সন্ধান পান তাঁরা। সেটার থেকে কয়েকটা লোম বা চুল সংগ্রহ করেন তাঁরা। সেই চুল পরীক্ষা করেন পৃথিবীবিখ্যাত শরীরসংস্থানবিদ প্রোফেসর ফ্রেডরিক উড জেন্স। কিন্তু বিভিন্ন প্রাণীর চুলের সঙ্গে সে নমুনা মিলিয়েও ওটা ঠিক কী প্রাণীর লোম, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি তিনি। আধুনিক পৃথিবীর জীববিজ্ঞানীরাও পরিচিত কোনো জীবের সঙ্গে সে প্রাণীর মিল পাননি। এবার আসি আমি খুমজাং মনাস্ট্রির খুলিটার কথায়, যেটা আমি দেখেছি। ১৯৬০ সালে হিলারি ইয়েতির সন্ধানে অভিযানে গিয়ে ওই খুমজাং গুম্ফায় যান। সেখানে সেসময় ওরকম একাধিক খুলি রাখা ছিল। তারই একটা জোগাড় করে তিনি বিখ্যাত কয়েকজন জীববিজ্ঞানীর কাছে পাঠিয়েছিলেন গবেষণার জন্য। কয়েকজন জীববিজ্ঞানী বলেন, এটা নাকি মেরো নামে এক ধরনের হরিণের হাড় ও চামড়া দিয়ে তৈরি করা লোক ঠকানোর জিনিস। কিন্তু ম্যায়রা শ্যাকলের মতো বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ওই তত্ত্ব নাকচ করে দিয়ে বলেন, ওটা কখনওই মেরোর হতে পারে না। কারণ, ওই চুলগুলো বাঁদরের চুলের মতো, আর ওই চামড়া-হাড়ে এমন কিছু পরজীবী পোকা পাওয়া গিয়েছে, যা মেরোর চামড়ায় কোনো অবস্থাতেই থাকতে পারে না," একটানা কথাগুলো বলে থামলেন ভদ্রলোক।

সুদীপ্ত বেশ চমৎকৃত হয়ে বলল, "আপনি তো এ ব্যাপারে অনেক খবর রাখেন দেখছি!"

হেরম্যান মুচকি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে। আপনি যে অ্যাবোমিনেব্‌ল স্নোম্যান কথাটা বললেন, এই শব্দবন্ধের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল জানেন?"

"অ্যাবোমিনেব্‌ল স্নোম্যান বা ঘৃণ্য তুষারমানব কথাটা জানা থাকলেও কথাটার উৎস জানা নেই," মাথা নাড়ল সুদীপ্ত।

হেরম্যান বললেন, "ব্যাপারটা তা হলে বলি। ১৯২১ সালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল চার্লস হাওয়ার্ড বেরির নেতৃত্বে 'এভারেস্ট রিকনয়সেন্স' বলে এক অভিযান হয়। ওই অভিযানে ২১ হাজার ফুট উচ্চতায় 'লাকপা-লা' গিরিবর্ত্মে দোপেয়ে মানুষের নগ্ন পদচিহ্নর মতো বড় পদচিহ্ন দেখতে পান চার্লস। সেই ছাপগুলো এঁকেবেঁকে হারিয়ে গিয়েছিল গিরিবর্ত্মের এক অগম্য প্রান্তে। ওই ছাপটা সম্বন্ধে চার্লসের সঙ্গী শেরপারা জানায়, ওটা হল তাদের ভাষায় 'মেটোহ্ কাংগমি' অর্থাৎ বুনো মানুষের পায়ের ছাপ। ওই অভিযান শেষে ফিরে আসার পর শেরপাদের একটা ইন্টারভিউ নেন কলকাতার এক বিখ্যাত ইংরেজি কাগজের সাংবাদিক কিম। তিনি শেরপাদের বলা 'মেটোহ্' শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে না পেরে তাঁর কলামে শব্দটার অর্থ করেন অ্যাবোমিনেব্‌ল

স্নোম্যান, নোংরা বা ঘৃণ্য তুষারমানব। খবরের কাগজের দৌলতে শব্দটা পরিচিতি লাভ করে।"

সুদীপ্ত হেরম্যানের বক্তব্য যত শুনছে, ততই যেন আগ্রহ বাড়ছে তাঁর প্রতি। লোকটার বেশ পড়াশোনা আছে। বাচনভঙ্গিও বেশ সুন্দর। সে জানতে চাইল, "আপনার কী ধারণা? হিমালয়ের গভীরে ইয়েতি বা ও ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব কি আছে?"

হেরম্যান সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ অথচ বেশ দৃঢ় ভাবেই যেন বললেন, "হ্যাঁ, আমার ধারণা, আছে। এত লোক এত ভাবে মিথ্যা বলতে পারে না।"

জবাব দিয়ে হেরম্যান আর কোনো কথা বললেন না। গম্ভীর ভাবে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

সুদীপ্তরা একসময় ফিরে এলেন তার ডেরার কাছে। সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, "একটু চা খেয়ে যান?"

লোকটা সুদীপ্তর প্রস্তাবে বেশ খুশি হয়ে বলল, "হ্যাঁ, একটু চা পেলে মন্দ হয় না। আমি আস্তানা গেড়েছি ওই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের দলটা যেখানে আছে। এ পাহাড়ি অঞ্চলে জঙ্গল না থাকলেও বন্যপ্রাণী রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নাকি ওরাই করে।"

তাশি তাঁবু থেকে স্পিরিট, স্টোভ আর সরঞ্জাম বের করে কিছু দূরে চা করতে বসল। আর সুদীপ্তরা বসল তাঁবুর সামনে একটা পাথরের উপর। বসার পর সুদীপ্ত একটু ইতস্তত করে বলল, "আপনার এখানে আসার কারণটা আমার এখনও জানা হয়নি। আপত্তি না থাকলে বলবেন?"

হেরম্যান বললেন, "আমি একজন ক্রিপ্টোজুলজিস্ট। "আপনি ক্রিপ্টোজুলজিস্ট কাদের বলে জানেন?"

সুদীপ্ত বলল, "না শুনিনি। তবে শব্দটা শুনে বুঝতে পারছি, সম্ভবত তাঁরা প্রাণীবিষয়ক কোনো কিছুর চর্চা করেন।"

হেরম্যান মুচকি হেসে বললে, 'হ্যাঁ, প্রাণীবিষয়ক চর্চা তো বটেই। তবে একটু অন্য ধরনের। ব্যাপারটা তবে একটু খোলসা করি। বিজ্ঞানী হুভেলম্যান হলেন এই শব্দের জনক। ক্রিপ্টোজুলজি শব্দের অর্থ হল 'ধাঁধা জীববিদ্যা'। এই পৃথিবীতে আমাদের পরিচিত প্রাণীকুলের বাইরেও বিভিন্ন লোককথা-উপকথায় এমন অনেক প্রাণীর কথা শোনা যায়, যাদের মানুষ কল্পলোকের প্রাণী বলে ভাবে। অথবা এমন কোনো প্রাণী যারা লক্ষ-কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে বলে আধুনিক পৃথিবীর ধারণা। এসব প্রাণীকে বলে ক্রিপটিড, আর যাঁরা তাদের নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের বলা হয় ক্রিপ্টোজুলজিস্ট।"

"চর্চা মানে?"

"চর্চা মানে অনুসন্ধান। তাঁরা খুঁজে বেড়ান ওই সব গল্পকথার প্রাণীদের। ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের কথা শুনলে একসময় নাক সিঁটকাতেন ঘরে বসে পুঁথিপড়া পণ্ডিত বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বিশ্বাসই করতেন না ক্রিপটিডদের অস্তিত্ব। ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের তাঁরা শঠ-ধাপ্পাবাজ-প্রবঞ্চক বলতেন। রূপকথার প্রাণী বা কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া

প্রাণীর বাস্তবে অস্তিত্ব থাকতে পারে নাকি? হ্যাঁ, পারে এবং তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা। পুঁথি পড়ে নয়, সামান্য লোককথা বা জনশ্রুতিকে সম্বল করে নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে তাঁরা প্রমাণ করেছেন ক্রিপটিডদের।"

"কীরকম?"

"দু"-একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। যেমন ইন্দোনেশিয়ার সুন্দা দ্বীপমালার ধীবররা বলতেন যে, সে দেশের কোনো-কোনো দ্বীপে নাকি এখনও জীবন্ত ড্রাগনের দেখা মেলে। প্রচলিত বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত জীবনবিজ্ঞানীরা তখন এ ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করতেন। কিন্তু ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা বারবার বলতেন, ও প্রাণীর অস্তিত্ব আছে। নিরক্ষর ধীবর বলে তাঁদের কথা অবিশ্বাস করা উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সত্যি খোঁজ পাওয়া গেল কোমোডো ড্রাগনকে। আবার ধরুন, সমুদ্র অভিযানে যাওয়া অনেক মানুষ এক দানবীয় স্কুইডের কথা বলতেন, যারা ছোটখাটো নৌকো তাঁর শুঁড়ে পেঁচিয়ে ডুবিয়ে দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা মানতেন না ব্যাপারটা। কিন্তু ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের উদ্যোগে জাপানের ন্যাশনাল সায়েন্স মিউজিয়াম সমুদ্রের গভীরে অভিযান চালিয়ে তুলে আনলেন জায়েন্ট স্কুইডের মুভিফোটো। অথবা ৪৯ কোটি বছর আগের জীবাশ্মে দেখা সেই সিলিকান্থ মাছ। পুঁথি পড়া বিজ্ঞানীদের যাবতীয় ভাবনায় জল ঢেলে ১৯৩৮ সালে ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা প্রমাণ করলেন, সে মাছ আছে। কোমোরোস দ্বীপের ধীবররা ও মাছকে 'গামবোসা' বলেন। তার খসখসে চামড়া দিয়ে তাঁরা দীর্ঘদিন শিরীষ কাগজের কাজ চালিয়ে আসছেন, অথচ সভ্য পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা জানতেনই না ব্যাপারটা। বুঝুন তাঁদের কাণ্ডটা! তাসমানিয়ার ডিমপাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণী প্লাটিপাস, সমুদ্রের দানব হাঙর মেগামাউথ শার্ক ও ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেস দ্বীপের ডোয়ার্ফম্যান, এ সবই কিন্তু একসময় ক্রিপটিড বা রূপকথার প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত হত। কিন্তু এই প্রতিটা ক্ষেত্রেই শেষ হাসি হেসেছেন ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, পৃথিবীতে এসব প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বা একদিন ছিল।"

সুদীপ্ত হেরম্যানের কথা অবাক হয়ে শুনতে-শুনতে প্রশ্ন করল, "ওরকম কী-কী ক্রিপটিডের সন্ধান এখনও চলছে?"

হেরম্যান জবাব দিলেন, "পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এখনও নানা প্রাণী উপস্থিতির কথা শোনা যায়, যাদের সভ্য পৃথিবী চোখে দ্যাখেনি। কিন্তু দৈবাৎ কোনো-কোনো মানুষ তাদের চোখে দেখেছেন বা তাদের উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছেন। এই সবে ক্রিপটিডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ইন্দোনেশিয়ার জঙ্গলের উড়ুক্কু ডাইনোসর 'আ-হুল', স্কটল্যান্ড লেক নেসির লম্বা গলার জলদানব, আমেরিকার বিগফুট, মালয়ের রাবার বনের লোমগুলো বানর-মানুষ, মাদাগাস্কারের মানুষখেকো গাছ আর . . .

তাশি চা করে আনল। ছেদ পড়ল হেরম্যানের বক্তব্যে। কথা থামিয়ে তৃপ্তি সহকারে চায়ের মগে চুমুক দিতে লাগলেন তিনি। সুদীপ্তও চায়ে চুমুক দিয়ে এই সুযোগে ভালো করে দেখতে লাগল হেরম্যানকে। হেরম্যান মাঝবয়সি, শরীরের গঠন বেশ শক্তপোক্ত। দড়ির মতো হাতের চামড়ার গায়ে জেগে থাকা শিরা-উপশিরাগুলো যেন তাঁর কাঠিন্যর,

পরিশ্রমের সাক্ষ্য দিচ্ছে। মাথায় সোনালি চুল, নীল চোখ গায়ের রং একসময় খুব সাদাই ছিল। কিন্তু রোদে পুড়ে সেই রং এখন তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে।

চা শেষ করে হেরম্যান সুদীপ্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম?"

সুদীপ্ত বলল, "ওই ক্রিপটিডদের কথা। আচ্ছা, ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা তাঁদের কাজের বিনিময়ে কী পান?"

হেরম্যান হেসে বললেন, "আপনি অর্থানুকূল্য বা খ্যাতির কথা বলছেন? ওসব কিছুই তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের কপালে ব্যঙ্গবিদ্রুপই জোটে। ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা কাজটা পুরস্কার বা খ্যাতির জন্য করেন না, করেন নতুনকে জানার নেশায়, আত্মতৃপ্তির জন্য। নিজেদের সর্বস্ব পণ করে তাঁরা ঘুরে বেড়ান ক্রিপটিডের খোঁজে। এই যেমন আমি, নিজেদের দেশে ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা বেচে দিয়ে পৃথিবীর এ মাথা, ও মাথায় পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই ক্রিপটিডের খোঁজে।"

তাঁর এই শেষ কথাগুলো শুনে বিস্মিত সুদীপ্ত বলে উঠল, "আপনিও তা হলে ক্রিপ্টোজুলজিস্ট?"

মৃদু হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন হেরম্যান।

সুদীপ্ত এর পর প্রশ্ন করল, "আপনি কি তা হলে এখানে কোনো ক্রিপটিড খুঁজতে এসেছেন? কী সেটা?"

প্রশ্নটা শুনে হেরম্যান বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দূরের তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গের দিকে। তারপর বেশ শান্ত গলায় জবাব দিলেন, "হ্যাঁ। আমি এখানে খুঁজতে এসেছি পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় প্রাণী, ক্রিপটিড জগতের মহানায়ক ইয়েতিকে। যার প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্র ধরে আমাদের এত কথা হল।"

"ইয়েতি! তার মানে গুম্ফায় যে খুলিটা রাখা আছে, সেটাকে আপনি সত্যি বলে মনে করেন?"

"ওটা সত্যি কিনা আমি বলতে পারছি না, তবে যে গুম্ফায় ওই খুলিটা আসলে রাখা থাকে, সেই মিগু গুম্ফাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটা রহস্যময় খবর কিন্তু লোকমুখে প্রচারিত আছে। আচ্ছা, আপনি 'মিগু' শব্দের অর্থ জানেন?"

সুদীপ্ত জবাব দিল, "না, জানি না।"

তিনি বললেন, "তিব্বতি ভাষায় মিগু শব্দের অর্থ হল বরফের বুনো মানুষ অর্থাৎ ইয়েতি।"

এই বলে একটু থেমে তিনি এরপর বললেন, "এখানকার গুম্ফা থেকে ওই খুলিটা আগামী কাল মিগু গুম্ফায় নিয়ে যাওয়া হবে বলে শুনলাম। আমিও কাল রওনা হব মিগু গুম্ফার উদ্দেশে। আমি ওই গুম্ফাটা একবার দেখতে চাই। ওখানকার মঠাধ্যক্ষ নাকি একজন দৃষ্টিহীন ভদ্রলোক। দেখি, ওখানে পৌঁছে যদি ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোনো তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ওই সরকারি দলটা কালই রওনা হচ্ছে তুষার চিতার খোঁজে। দলটার নেতা রেঞ্জার বীরবাহাদুর ছেত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আমি ওদের পিছনে যাব। মিগু গুম্ফা এখান থেকে দু'দিনের পথ।"

"আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে নেবেন?" সুদীপ্ত হালকা চালেই প্রশ্নটা করেছিল হেরম্যানকে। কিন্তু কথাটা সত্যি ধরে নিয়ে প্রবল আগ্রহের সঙ্গে তিনি বললেন, "আপনি সত্যিই যেতে চান আমার সঙ্গে। আমিও একজন সঙ্গী খুঁজছিলাম। এই মুহূর্তে আমার কাছে এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব হতে পারে না! আমি অবশ্যই আপনাকে সঙ্গে নেব। চিন্তার কিছু নেই, আট-দশ দিনের মধ্যেই ফিরে আসব। আর যাবতীয় খরচ আমিই বহন করব।"

সুদীপ্ত এবার একটু থতমত খেয়ে গেল। সুদীপ্তর বন্ধুরা এক্সপিডিশন থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার হাতে হেরম্যানের সঙ্গে ঘুরে আসার সময় আছে ঠিকই, এ কথাও ঠিক যে, এই হেরম্যান বলে লোকটা আর তাঁর অভিযানের ব্যাপারটা তাকে প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু এরকম স্বল্পপরিচিত লোকের সঙ্গে বেরনো কি ঠিক হবে? যদি পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা হয়? লোকটার যদি তাকে সঙ্গে নেওয়ার পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য কাজ করে? যদি কোনো বিপদ . . .

ধন্দে পড়ে পাশ কাটানোর জন্য সুদীপ্ত বলল, "আপনার সঙ্গে যেতে পারলে ভালো হত ঠিকই, কিন্তু আমি তো ভালো মাউন্টেনিয়ার নই। আমাকে নিয়ে যদি আপনার বিপদ ঘটে।"

হেরম্যান বললেন, "আমরা যেখানে যাব, সেখানে পৌঁছনোর জন্য দক্ষ মাউন্টেনিয়ার হওয়ার প্রয়োজন নেই। মাউন্টেনিয়ারিং-এর প্রাথমিক জ্ঞান থাকলেই চলবে। সেটা তো আপনার আছেই। তবে হ্যাঁ, ঝুঁকি বা বিপদের ব্যাপারটা তো যে-কোনো অভিযানেই . . .," হেরম্যান তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না, হঠাৎ সুদীপ্তর কানে মুহূর্তের জন্য প্রচণ্ড একটা শব্দ ধরা দিল। আর তার পরমুহূর্তেই হেরম্যান উঠে দাঁড়িয়ে এক হ্যাঁচকা টানে সুদীপ্তকে একপাশে সরিয়ে দিলেন। পরমুহূর্তেই বেশ বড় একটা পাথরের খণ্ড সুদীপ্তর গা ঘেঁষে বেরিয়ে একটু এগিয়ে আটকে গেল কিছু দূরে। একটু ধাতস্থ হয়ে সুদীপ্ত বুঝল ব্যাপারটা। সুদীপ্তরা যেখানে বসে ছিল, ঠিক তার পিছনেই কিছুটা উপর দিকে এক জায়গায় বেশ কিছু বড়-বড় পাথরের চাঁই রাখা আছে। সম্ভবত তাঁবুর দড়ি বাঁধার জন্য ওই পাথরগুলো জড়ো করা হয়েছিল। তারই একটা কোনো ভাবে খসে পড়েছে উপর থেকে। হেরম্যানের সতর্ক চোখ না থাকলে সুদীপ্তর বিপদ অনিবার্য ছিল। সুদীপ্ত বিস্মিত ভাবে পাথরটার দিকে তাকিয়ে রইল। অত বড় পাথর যদি সত্যিই তার গায়ে পড়ত, কী অবস্থা হত তার!

হেরম্যান এবার সুদীপ্তর কাঁধে হাত রেখে মৃদু হেসে বললেন, "দেখলেন তো, বিপদ যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো মুহূর্তেই নেমে আসতে পারে, আবার মানুষ বিপদ কাটিয়েও ওঠে। ঠিক যেমন আপনার বিপদ কেটে গেল, কাজেই বিপদ নিয়ে বেশি ভাবলে চলে না। সাহস আর ইচ্ছেশক্তি থাকলে বিপদ কেটে যায়।"

হেরম্যানের কথা শুনে সুদীপ্ত কয়েক মুহূর্ত তাঁর চোখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকার পর বলল, "আমি কাল আপনার সঙ্গে নিজ গুম্ফায় রওনা দিচ্ছি। আমরা সে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব।"

যেদিকে চোখ যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। মাঝে কোথাও কোথাও হঠাৎ হয়তো চোখে পড়ছে, একখণ্ড পাইন অথবা জঙ্গল। বরফের সাদা চাদরের মাঝে ওই বনগুলোকে মনে হচ্ছে সবুজ রঙের কল্কা। মাথার উপর মেঘমুক্ত নীল আকাশের চাঁদোয়া, তবে আকাশে কোনো পাখি নেই, এত উপরে তারা আসে না। গিরিশিরা ধরে এগোচ্ছে সুদীপ্তরা। তাদের কিছুটা আগে এগোচ্ছে তুষারচিতার খোঁজে চলা সেই দলটা। তাঁদের পায়ের ছাপ আঁকা হয়ে থাকছে বরফের বুকে। তার উপর দিয়েই এগোচ্ছেন সুদীপ্ত আর হেরম্যান। যাত্রাপথের দু' ধারে অতলান্ত খাদ। মেঘের দল সুদীপ্তদের পায়ের নীচে ওই খাদগুলোর উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত লাগছে দেখতে, মাঝে-মাঝে একখণ্ড ধূসর ছোপের মতো নীচের বেসক্যাম্পটাও চোখে পড়ছে। হেরম্যানের হাতে একটা দুরবিন। মাঝে-মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে তিনি সেটা দিয়ে চারপাশ দেখছেড়। একসময় হঠাৎ তিনি মাটির দিকে সুদীপ্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "ওই দেখুন ওই ছাপগুলো।"

মাউন্টেনিয়ারদের পায়ের ছাপের পাশেই আঁকা হয়ে আছে বেশ কিছু খালি পায়ের ছাপ। পায়ের বুড়ো আঙুলগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, [illegible] ছাপগুলো ইয়েতির মতো বিশালাকার প্রাণীর পায়ের ছাপ নয়, মানুষেরই পায়ের ছাপ। সুদীপ্ত বিস্মিত ভাবে বলল, "মাউন্টেনিয়ারদের মধ্যে কেউ খালি পায়ে হাঁটছেন নাকি? অদ্ভুত ব্যাপার তো!"

হেরম্যান বললেন, "না, মাউন্টেনিয়ার নয়, তাঁদেরও আগে যাচ্ছেন ওঁরা। খুলিটাকে ওঁরা মিগু গুম্ফায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দু'জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। গতকালই তাঁরা বেসক্যাম্পে নেমেছিলেন, আজই আবার ফিরে যাচ্ছেন। আমি ওঁদের দেখতে পাচ্ছি মাঝে-মাঝে।"

এ কথা বলে তিনি যাত্রাপথের অগ্রবর্তী অংশে আঙুল তুলে দেখিয়ে দূরবিনটা সুদীপ্তকে ধরিয়ে দিলেন। সুদীপ্ত দুরবিন চোখে লাগিয়ে একটু এপাশ-ওপাশ দেখতেই হঠাৎ দেখতে পেল তুষারাবৃত পাহাড়ের ঢালে দুটো লাল বিন্দু। লাল পোশাকপরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দু'জনকে এত দূর থেকে বিন্দুর মতোই লাগছে। সম্ভবত পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠছেন তাঁরা।

হেরম্যান মন্তব্য করলেন, "এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নাকি অনেক অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে। এই ঠান্ডায় খালি পায়ে বরফের উপর দিয়ে হাঁটা তারই একটা নিদর্শন। আমি শুনেছি, কোনে-কোনো বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাকি যোগবলে নিজের দেহে টেম্পারেচার জেনারেট করতে পারেন। এ ব্যাপারটাকে বলে 'তিউমা'। শীত কাবু করতে পারে না তাঁদের।"

সুদীপ্ত বলল, "আমিও ওরকম বেশ কিছু গল্প শুনেছি ওঁদের সম্পর্কে। কোনো একটা বইয়ে যেন পড়েছিলাম যে, হিমালয়ের তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নাকি পদ্মাসনে ধ্যানস্থ

অবস্থায় শূন্যমার্গে বিচরণ করতে পারেন। কেউ-কেউ আবার নাকি মঠের অন্ধকার কুঠুরিতে বসেই তাঁর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার মাধ্যমে বলে দিতে পারেন পাহাড়ের কোথায় কী ঘটনা ঘটছে। আচ্ছা, আমরা যে মিগু মঠে যাচ্ছি, সেখানেও কি এরকম কোনো অবিশ্বাস্য ব্যাপার দর্শন করার সম্ভাবনা আছে?”

হেরম্যান বললেন, “সেটা ওখানে না পৌঁছনো পর্যন্ত ঠিক বলা যাবে না। তবে ও জায়গাটা সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি, তাতে ওই মঠটাকে বেশ রহস্যময় বলেই মনে হয়েছে। তুষারাবৃত এক জনহীন প্রান্তরে একলা দাঁড়িয়ে আছে কয়েকশো প্রাচীন ওই গুম্ফা। তিন-চারজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ওখানে থাকেন। বেশ কয়েকটা তুষারচিতা নাকি রয়েছে ওই মঠে। মঠের লোকেরা নাকি কুকুরের মতো তাদের পোষ মানিয়েছে। শুধু ওই খুলির ব্যাপারটাই নয়, সাম্প্রতিক কালের দু'টো ঘটনা ওই মঠ সম্পর্কে আমাকে বিশেষভাবে আগ্রহী করে তুলেছে।”

“কী ব্যাপার?”

“প্রথম ঘটনাটা মাসছয়েক আগের। একটা জার্মান দল এখানে এসেছিল নন্দাদেবীর কাছে একটা মাঝারি পিক এক্সপিডিশনে। তার মধ্যে দু'-তিনজন শিক্ষানবিশও ছিল। এ পথে যাওয়ার সময় তাদেরই একজন রোপ ছিঁড়ে পড়ে যায় খাদে। ফ্রেডরিক তার নাম, বাচ্চা ছেলে। পড়ে গেলেও ভাগ্য ছিল তার। ছেলেটার পিঠের ব্যাগটার একটা অংশ খাদের গায়ে একটা বুনো গাছের ডালে আটকে যায়। উপর থেকে তার সঙ্গীরা তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। পড়ার সময় ফ্রেডরিক অজ্ঞান হয়ে যায়। উপর থেকে হাঁকডাক করে তার সন্ধান না মেলায় অন্যরা অভিযান স্থগিত বেসক্যাম্পের দিকে ফিরতে শুরু করে। ফ্রেডরিক পড়ার মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান ফিরেই সে দেখতে পায়, সে গাছের ডালে ঝুলছে। ফ্রেডরিক তখন বাঁচার জন্য চিৎকার শুরু করে, কিন্তু ততক্ষণে তার সঙ্গীরা বেসক্যাম্পের দিকে রওনা হয়েছে। ফ্রেডরিক যেখানে ঝুলছিল, তার হাতখানেক তফাতেই একটা পাথরের তাক আর তার উপরেই একটা গুহামুখ। ফ্রেডরিক যদি তাকটার কাছে পৌঁছতে পারে, তবে বেঁচে যায়। কিন্তু ওই ঝুলন্ত অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ তাকটার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় সে। ক্লান্তি আর অবসাদে এর পর হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেকে ভাগ্যের উপর সঁপে দিয়ে ওভাবেই ঝুলতে থাকে সে। এদিকে তখন পাহাড়ে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। কতক্ষণ ফ্রেডরিক ওভাবে ঝুলছিল খেয়াল ছিল না তার। ভবিতব্য বুঝতে পেরে তার চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল। একসময় হঠাৎ তার মনে হয়, তাকে ধরে কে যেন ঝাঁকাচ্ছে। চোখ খুলতেই সে দেখতে পায়, সে তাকে পৌঁছে গিয়েছে। কীভাবে সে পৌঁছল? আর তখনই সে খেয়াল করে, কে যেন পিছন থেকে ধরে রেখেছে তার কোমরটা। মানুষের অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দও যেন তার কানে আসে। তা হলে কি কোনো উদ্ধারকারী দল এসেছে তাকে বাঁচাতে? তার সঙ্গীরা? সে তার উদ্ধারকারীকে দেখার জন্য পিছনে তাকাতেই দেখতে পায় এক অদ্ভুত দৃশ্য। একটা বিরাট বড় রোমশ হাত তাকের গায়ের গহ্বর থেকে বেরিয়ে ধরে রেখেছে তার কোমরটা! চাঁদের আলোয় সে স্পষ্ট দেখতে পায় সেই হাত। অজানা

আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে ফ্রেডরিক। হাতটাও সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় গহ্বরের ভিতর। ফ্রেডরিক আবারও সংজ্ঞা হারায় এর পর। তার যখন জ্ঞান ফেরে, তখন সে মিগু গুম্ফায়। সে এই ব্যাপারটা মঠের লোকদের জানালে তাঁরা বলেন যে, সে ওসব ভুল দেখেছে। মঠের লোকেরাই নাকি তাকে ঝুলন্ত গাছ থেকে উদ্ধার করেছেন। পরদিন মঠের লোকেরাই তাকে বেসক্যাম্পে নামিয়ে দিয়ে যান। তবে সেখান থেকে ফেরার সময় ফ্রেডরিক বলে ছেলেটা নিজের অজান্তেই একটা জিনিস সঙ্গে করে এনেছিল। তা হল তার কোমরবন্ধ আর পোশাকের খাঁজে আটকে থাকা কয়েকটা ধূসর লোম। ওই লোমগুলোর ডি এন এ অ্যানালিসিস বলছে, লোমগুলো বানর জাতীয় কোনো প্রাণীর, তবে তা পরিচিত কোনো প্রজাতির নয়।"

একটা গিরিশিরার শেষ মাথায় পৌঁছে গিয়েছে সুদীপ্তরা। পিছল বরফে পা রেখে এবার নীচে নামতে হবে কিছুটা। সে জায়গাটা সাবধানে অতিক্রম করার পর তিনি আবার শুরু করলেন, "এবার দ্বিতীয় ঘটনাটা বলি। সেটাকে প্রায় সাম্প্রতিকই বলা যায়। মাত্র মাস দুই আগের। নেপালের একটা ইংরেজি দৈনিকে সে খবর প্রকাশিত হয়। আমি ইন্টারনেট সংস্করণে খবরটা দেখেছি। আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে, মাঝে-মাঝে হিমালয়ে সাফাই অভিযান হয়, অর্থাৎ এক্সপিডিশনে গিয়ে পর্বতারোহীরা যা ফেলে আসেন, বিশেষত খাবারের টিন, প্যাকেট বা পর্বতারোহণের কোনো জিনিস, বেশ কিছু সংস্থা সেসব পরিষ্কার করে।"

সুদীপ্ত বলল, "হ্যাঁ জানি।"

হেরম্যান বললেন, "ত্রিশূলের থার্ড পিকে ওরকমই একটা এন জি ও সংস্থার কয়েকজনকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল নেপালের এক বেসরকারি উড়ান সংস্থার হেলিকপ্টার। এন জি ও-র লোকগুলোকে নামিয়ে দিয়ে একাই কাঠমাণ্ডুতে ফেরার পথ ধরেন কপ্টারচালক ক্যাপ্টেন রাই। সময়টা দুপুরবেলা। কিন্তু তুষারপাত শুরু হয় সেই সময়। কিছুটা নিচ দিয়েই উড়ছিলেন রাই। ওই মিগু গুম্ফার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় নীচে তাকিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পান তিনি। মঠ চত্বরে তুষারপাতের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা তুষারচিতা আর অদ্ভুত ধরনের এক দোপেয়ে জীব। আকৃতিতে সেটা মানুষের চেয়ে অনেক বড় বলেই রাইয়ের অনুমান। প্রাণীটাকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে কৌতূহলবশত তিনি কপ্টারটাকে আরও কিছুটা নীচে নামাবার চেষ্টা করেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণীটা তুষারপাতের মধ্যে বেশ কয়েকটা লম্বা লাফে বরফের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ওই মঠের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যায়। এ ঘটনা দেখে বেসক্যাম্পে ফেরার পর ভদ্রলোক গোটা ব্যাপারটা তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করেন। কিন্তু তাঁরা ব্যাপারটাকে গুরুত্ব তো দেনই-নি, বরং তাঁর দৃষ্টিশক্তির ও মানসিক সমস্যা আছে বলে তাঁকে চাকরি করে বরখাস্ত করেছেড়। রাই বলে ওই ভদ্রলোক প্রথম জীবনে মাউন্টেনিয়ার ছিলেন। কাজ হারিয়ে তিনি এখন পুরনো অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বনদফতরের এক বিশেষ কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি ওই অতিমানব প্রাণীটাকে স্পষ্ট দেখেছেন!"

সুদীপ্ত বিস্মিত ভাবে বলল, "এত খবর আপনি সংগ্রহ করলেন কীভাবে? আর ওই

রাই বলে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ই বা হল কোথায়?"

হেরম্যান হেসে বললেন, "এসব খবর সংগ্রহ করার জন্য ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের ভাড়া করা এজেন্ট থাকে। তাঁরা বিভিন্ন স্থানীয় সংবাদ সংস্থার থেকে খবর সংগ্রহ করে আমাদের দেন। আর ফ্লাইট ক্যাপ্টেন রাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এখানে এসে। ওই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের টিমটার সঙ্গেই উনি আছেন। লোকটি নাকি শিকারিও। তবে আমার আসল পরিচয় কিন্তু আমি কাউকে বলিনি। আমি রাইকে বলেছি, আমি হিমালয়ের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা, ধর্মদর্শন সম্বন্ধে আগ্রহী। ও নিয়ে একটা বই লেখার জন্য এখানে এসেছি। বীরবাহাদুরও একই কথা জানেন।

সুদীপ্ত বলল, "মিগু মঠেও কি আপনি ওই পরিচয় দেবেন? আর আমার পরিচয় কী হবে? যদি ধরা পড়ে যান?"

হেরম্যান বললেন, "হ্যাঁ, ওই পরিচয়ই দেব। নইলে হয়তো মঠে আমরা ঢুকতেই পারব না। আমার মঠে ঢোকার ক্ষেত্রে অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই। আমি এসেছি সত্য অনুসন্ধানে। তেমন মনে হলে সত্যিটা নিজেই প্রকাশ করব। আমি কিছুটা পড়াশোনা করে এসেছি ওদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে। আপনার পরিচয়, আমার ভারতীয় বন্ধু। শুধু আমার আসল পরিচয় কারও কাছে ফাঁস না করলেই হল।"

সুদীপ্ত জানতে চাইল, "আপনি যখন রাইকে ওসব কথা জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি কিছু সন্দেহ করেননি?"

হেরম্যান জবাব দিলেন, "সম্ভবত করেননি। ওঁর খবরটা কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ধরনের খবর সব মানুষকেই আকৃষ্ট করে। আমি ওঁকে বলেছি, খবরটা অদ্ভুত বলেই আমি ওঁর কাছ থেকে নিছক কৌতূহলবশতই তার সত্যতা যাচাই করলাম। তা ছাড়া ক্রিপ্টোজুলজি বা ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষ পরিচিত নয়, কাজেই সন্দেহ না হওয়ারই কথা।"

বিকেল হয়ে এসেছে। পাহাড়ের চুড়োগুলোতে ধীরে-ধীরে শুরু হয়েছে রঙের খেলা। লাল, গোপাপি, বেগুনি, নীল রঙে কোনো অদৃশ্য জাদুকর যেন রাঙিয়ে দিচ্ছে পাহাড়ের মাথাগুলোকে। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, "আমরা যে অভিযানে যাচ্ছি, তা কতটা সফল হবে আমরা জানি না। কিন্তু প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার সৌভাগ্য খুব অল্প মানুষের জীবনেই ঘটে! এটাও কম প্রাপ্তি নয়।"

সেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকগুলো আধ মাইল দূরে একটা পাহাড়ি তাকের কাছে গিয়ে থেমে গিয়েছেন। হেরম্যান তা দেখে বললেন, "ওঁরা বোধ হয় আজকের মতো তাঁদের যাত্রার ইতি ঘটালেন। আমরাও ওখানে গিয়েই থামব।"

সে জায়গায় পৌঁছতে আরও প্রায় এক ঘণ্টা মতো সময় লাগল সুদীপ্তদের। ততক্ষণে আগের দলটা তাদের তাঁবু-টাবু খাটিয়ে ফেলেছে। তাদের পাশেই নিজেদের তাঁবু ফেলার পর হেরম্যান বললেন, "চলুন, একবার রাই আর ওই বীরবাহাদুর ছেত্রীর সঙ্গে কথা বলে আসি।"

প্যারাশুট কাপড়ের তাঁবুটার টানাগুলোয় ভারী পাথর চাপা দেওয়ার পর সুদীপ্তরা এগোল এই জনমানবহীন পার্বত্য অঞ্চলে তাদের প্রতিবেশীদের তাঁবুর দিকে।

চারটে তাঁবু। একযা কমলা রঙের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বনবিভাগের লোগো আঁকা জ্যাকেট পরা দু'জন নেপালি ভদ্রলোক। সুদীপ্তরা সেই তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই দু'জন লোক হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন হেরম্যানকে। তিনি সুদীপ্তর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দু'জনের মধ্যে একজন দীর্ঘকায়, নেপালিদের মধ্যে সাধারণত ওরকম লম্বা চেহারা দেখা যায় না, তিনি রেঞ্জার বীরবাহাদুর। অন্যজন হলেন রাই। তাঁরা দু'জনেই প্রৌঢ় লোক। তবে চেহারার গড়ন বেশ শক্তপোক্ত।

সুদীপ্তর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় পর্ব মেটার পর হেরম্যান বীরবাহাদুরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কাল কতটা এগোবেন?"

বীরবাহাদুর বললেন, "দেখুন, এই মুহূর্তে আমরা প্রায় বারো হাজার ফিট উচ্চতায় অবস্থান করছি। স্নো লেপার্ড সাধারণত এই সময় বারো থেকে চোদ্দো হাজার ফিট উচ্চতায় থাকে। আমি ঠিক করেছি, আরও হাজার দুই ফিট উপরে উঠব আগামী কাল। তারপর অনুসন্ধান চালাব। আপনি কতটা এগোবেন?"

হেরম্যান জবাব দিলেন, "কাল আমিও ওরকমই উঠব। ওখানে একটা প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ আছে, সেটা দেখতে যাব।"

রাই শুনে জানতে চাইলেন, "আপনারা কি মিগু গুম্ফায় যাওয়ার কথা ভাবছেন? তা হলে আমার একটা কথা জানানোর আছে?"

হেরম্যান বললেন, "হ্যাঁ, ওখানেই। কী কথা জানানোর আছে?"

রাই বললেন, "ওই মঠের যিনি প্রধান লামা, যে লোকটা চিতা পোষে, লোকটা একদম মিথ্যেবাদী। আমার চাকরি যাওয়ার পিছনে ওর একটা ভূমিকা আছে।"

"কীরকম?"

হেরম্যানের প্রশ্নের জবাবে রাই বললেন, "আমি যখন আমার অফিসে গিয়ে সেই বিরাট বড় দোপেয়ে প্রাণীটা দেখার কথা রিপোর্ট করি। তখন আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে, দু'জনকে পাঠানো হয়েছিল ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে।

"কিন্তু ওই মঠের প্রধান লামা তাঁদের জানিয়ে দেন, সেরকম কোনো প্রাণী মঠে কেন, এই হিমালয়ের কোথাও নেই। তিনি বহু বছর এ তল্লাটে আছেন, ওরকম কোনো প্রাণী এ অঞ্চল থেকে থাকলে তিনি নাকি অবশ্যই তাকে দেখতে পেতেন। আমি নাকি ব্যাপারটা ভুল দেখেছি, অথবা আমার চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। সে কারণেই তো আমার চাকরিটা আরও গেল। ব্যাটা মিথ্যেবাদী! আমি স্পষ্ট দেখলাম কাটারের শব্দ শুনে তুষারপাতের মধ্যে প্রাণীটা তোরণ দিয়ে গুম্ফার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।"

হেরম্যান জিজ্ঞেস করলেন, "প্রাণীটা কী রঙের?"

তিনি জবাব দিলেন, "আমার যত দূর মনে হয় ধূসর রঙের। যে কারণে সাদা বরফের মধ্যেও আমি প্রাণীটাকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম।"

বীরবাহাদুর এবার হঠাৎ বললেন, "কিছু মনে কোরো না রাই, এমনও তো হতে

পারে, ওই প্রাণীটা ফারের ওভারকোট পরা কোনো লম্বাচওড়া মানুষ? তুষার ঝড় থেকে বাঁচতে দৌড়ে মঠের ভিতর ঢুকছিল?"

তাঁর কথা শোনামাত্রই ক্যাপ্টেন রাই বেশ উত্তেজিত ভাবে বললেন, "হ্যাঁ, সেরকম কোনো ব্যাপার হতেই পারত, কিন্তু তুমি কি কোনো মানুষকে সাধারণ ভাবে কুড়ি ফুট লাফাতে দেখেছ? লং জাম্পারদের মতো ছুটে এসে লাফ নয়। না ছুটেই খুব যেন স্বাভাবিক ভাবে মাত্র কয়েকটা লাফে অন্তত একশো ফুট জায়গা পার হয়ে ভিতরে ঢুকল প্রাণীটা। তোমরা যা খুশি ভাবতে পার ঘটনাটা নিয়ে কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।"

বীরবাহাদুর এর পর এ প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে সুদীপ্তকে উদ্দেশে বললেন, "চলুন বাইরে না দাঁড়িয়ে তাঁবুর ভিতরে বসে কথা বলি। দেখছেন বিকাল হতে না-হতেই আবার কেমন ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে!"

ক্যাপ্টেন রাই অভিজ্ঞ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে হয়, অন্ধকার নামলে তুষারপাত শুরু হবে। এটা তারই আভাস। হ্যাঁ, চলুন তাঁবুতে বসা যাক।"

তাঁবুর ভিতর ঢুকে সিন্থেটিক ম্যাটের উপর গুটিসুটি মেরে বসলেন সকলে। তাঁবুর একটা অংশ দখল করে রেখেছে ক্যামেরার ব্যাগ, ?? ব্যাগ, রুকস্যাক ইত্যাদি জিনিসপত্র। বীরবাহাদুর একটা ব্যাটারি চালিত আলো জ্বালালেন। সেই আলোতে তাঁবুর কোণে রাখা একটি রাইফেলও দেখতে পেল সুদীপ্ত। সে বীরবাহাদুরকে জিজ্ঞেস করল "শুনলাম, আপনারা তুষারচিতার খোঁজে যাচ্ছেন? বাঘশুমারির মতো তুষারচিতা শুমারির কোনো ব্যাপার? নাকি তাদের সংরক্ষণের ব্যাপারে?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সুদীপ্তদের অবাক করে বীরবাহাদুর জবাব দিলেন, "সে দু'টোর কোনোটাই নয়। একটা স্নো লেপার্ডকে মারতে যাচ্ছি।"

"মারতে যাচ্ছেন! কেন?"

"কারণ, প্রাণীটা গত চার মাসে ছ'জনকে আক্রমণ করেছে। নন্দাদেবী এক্সপিডিশনে যাওয়ার পথে একজন স্ক্যান্ডেনেভিয়ান পর্বতারোহী ও একজন শেরপার মৃত্যু হয়েছে ওর আক্রমণে। চারজন লোক ঘায়েলও হয়েছে। প্রত্যেকে অবশ্য আলাদা-আলাদা দলের সদস্য। সরকার প্রাণীটাকে বিপজ্জনক ঘোষণা করেছেন, আর তাই . . ."

তাঁর কথা শেষ করার আগেই হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, "প্রাণীদের নিয়ে আমারও কিছুই পড়াশোনা আছে। স্নো লেপার্ড মানুষখেকো হয় বলে শুনিনি তো?"

বীরবাহাদুর বললেন, "প্রাণীটা সে অর্থে মানুষখেকো কিনা জানি না, তবে মানুষকে আক্রমণ করছে এটা সত্যি। এক শেরপার কাঁধের কিছুটা মাংস সে খেয়েছিল, বাকিদের খায়নি বা খাওয়ার সুযোগ পায়নি। স্নো লেপার্ড আকারে বাঘের চেয়ে ছোট, ধূর্ততায় চিতার মতনও নয়। তাদের খাদ্যতালিকায় সাধারণত থাকে পাহাড়ি ভেড়া, কস্তুরী হরিণ, খরগোশ, ফেজেন্ট এসব। বরং তাদের বুদ্ধি কিছুটা কম থাকায় শিকারিরা ভেড়ার টোপ ফেলে ওদের সহজেই শিকার করে। বাঘ, সিংহ, চিতার চামড়ার চেয়েও ওদের চামড়া অনেক বেশি মূল্যবান। সাধারণত মানুষকে এড়িয়ে চলে ওরা। তবে প্রাণীজগতে অনেক সময় ব্যতিক্রম ঘটে। ও প্রাণীটা হয়তো তারই একটা নমুনা।"

এরপর একটু থেমে বীরবাহাদুর বললেন, "জানেন, একসময় বহু বছর আগে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ছেলেবেলায় আমি শিকার খেলতে আসতাম এ তল্লাটে। এটা ছিল আমাদের হান্টিং গ্রাউন্ড। আমার এখনও মনে আছে, আমার ঠাকুরদা একবার একজোড়া তুষারচিতা শিকার করেছিলেন এখানে। পরে অবশ্য চাকরির সূত্রে অনেকবার এসেছি এ জায়গায়।"

সুদীপ্ত একটু বিস্মিত ভাবে বলল, "আপনারা এখানে শিকার করতেন?"

বীরবাহাদুর মৃদুহেসে বললেন, "হ্যাঁ, আমার পরিবারের লোকজন এখানে শিকার করতে আসতেন। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন ছোট ভূস্বামী বা জমিদার। নেপালের রানা অর্থাৎ রাজার খুব অনুগত ছিলেন তাঁরা। আমার এক পূর্বপুরুষ দুর্গাবাহাদুর কোনো এক যুদ্ধে রানাকে খুব সাহায্য করেন। তার পুরস্কারস্বরূপ তিনটি জিনিস তাঁকে দান করেন। তার মধ্যে ছিল একটা হিরে, একটা পুঁথি ও এ অঞ্চলে শিকার করার একটা অনুমতিপত্র। হিরেটা পরবর্তীকালে অভাবে পড়ে বেচে দেওয়া হয়। অনুমতিপত্রটা এখনও আছে।"

"আর পুঁথিটা? কীসের পুঁথি ওটা?" জানতে চাইলেন হেরম্যান।

বীরবাহাদুর বললেন, "একটা তিব্বতি পুঁথি। আর ওটা পড়েই তো কেমন যেন হয়ে যান তিনি। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন তিনি।"

চারজনের মধ্যে এর পর আলোচনা শুরু হল সারাদিনের যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা নিয়ে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর একসময় হেরম্যান বললেন, "বাইরে অন্ধকার নেমেছে। এবার আমাদের তাঁবুতে যাই। আপনাদের, আমাদের সকলেরই এবার বিশ্রামের প্রয়োজন।"

তাঁবু থেকে বেরতে যাচ্ছিল তারা। ঠিক সেই সময় হঠাৎ স্লিপিং ব্যাগের উপর রাখা চামড়ায় বাঁধানো দু'যো বই দেখে সে দু'টো বই হাতে তুলে নিল সুদীপ্ত। দু'টো বই-ই ইংরেজিতে লেখা। তার একটার নাম 'স্নো লেপার্ডস অফ হিমালয়াস' আর অন্যটার নাম 'ক্রায়োজেনিক্স'। জেমস ডেওয়ার-এর লেখা। দ্বিতীয় এই বইটা বেশ পুরনো। 'ক্রায়োজেনিক্স' অর্থাৎ 'অতি শৈত্যবিদ্যা' বা 'হিমবিজ্ঞান'।

বীরবাহাদুর বললেন, "এ বইটা আমার পারিবারিক লাইব্রেরির। অনেক পুরনো বই আছে আমাদের চিতওয়ানের হাভেলিতে। আমারও নানা বিষয়ে পড়াশোনার শখ আছে। তিব্বতি ভাষাটাও আমি পড়তে পারি। জানেন, আমাদের চিতওয়ানের বাড়িতে একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটরিও আছে। দুর্গাবাহাদুর একসময় বানিয়েছিলেন সেটা। বিজ্ঞানের ব্যাপারেও আমার বেশ কিছুটা ঝোঁক আছে।"

বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর সুদীপ্তরা যখন বাইরে পা রাখল, তখন ঝিরিঝিরি তুষারপাত শুরু হয়েছে।

ভোরবেলা সুদীপ্তরা যখন তাঁবু ছেড়ে বেরল, তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মিহি তুষারের চাদরে মুড়ে আছে চারপাশ। বীরবাহাদুররা আগেই উঠে পড়ে তাঁবু গোটানোর তোড়জোড় করছেন। সুদীপ্তদের বাইরে বেরতে দেখে তিনি একবার এসে জেনে নিলেন, কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা? তারপর বললেন, "চলুন, একসঙ্গেই আমরা রওনা হব।"

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁবু গুটিয়ে তাঁদের সঙ্গেই রওনা হল সুদীপ্তরা। পথ ক্রমশ উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। পথ মানে বরফের ঢাল, তার উপর তুষারের আস্তরণ। বীরবাহাদুর-রাইদের সঙ্গে চলায় একটা সুবিধে হচ্ছে সুদীপ্তদের। বীরবাহাদুরদের লোকেরা আগে রাস্তা পরখ করে নিচ্ছে। শেরপারা দেখে নিচ্ছে তাদের যাত্রাপথে বরফের নীচে কোথাও কোনো ফাটল আছে কিনা, কখড়ওবা প্রয়োজনে বরফ পাথরের খাঁজে লোহার গজাল বা আই-এক্স পুঁতে রোপ টাঙানোর ব্যবস্থা করছে। সুদীপ্তদের অগ্রবর্তী লোকগুলোর পদচিহ্ন আঁকা হয়ে যাচ্ছে নরম তুষারে। তার উপর পা ফেলে সুদীপ্তরা এগোচ্ছে। সুদীপ্ত হেরম্যানকে জিজ্ঞেস করল, "মিগু গুম্ফায় যাঁরা সেই মাথাটা নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের পায়ের ছাপ আর চোখে পড়েছে?"

হেরম্যান জবাব দিলেন, "না, পড়েনি। তাঁদের আমি শেষবার দেখেছিলাম আমাদের যাত্রাপথের পশ্চিমের একটা ঢালে। হয়তো অন্য কোনো পথে মিগু গুম্ফায় যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের হয়তো কোনো সংক্ষিপ্ত পথ জানা আছে। তাই এ পথে তাঁদের পায়ের ছাপ নেই।"

এর পর হেরম্যান বললেন, "তুষারে এই আমাদের পায়ের ছাপ যেমন আঁকা হয়ে থাকছে, তেমনই আঁকা কিছু ছাপ কিন্তু এই তুষার রাজ্যে অন্য কোনো দোপেয়ে জীবের উপস্থিতি সম্পর্কে মানুষের মনে ধারণা জাগিয়েছে।"

"সেটা কীরকম?"

হেরম্যান চলতে-চলতে বললেন, "চার্লস হাওয়ার্ড বেরির লাকপা লা গিরিসংকটে সুবিশাল পায়ের ছাপ দেখার কথা তো আপনাকে বলেইছি। আরও কয়েকটা ছাপ দেখার ঘটনা বলি। রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ফোটোগ্রাফার টোমবাজি ১৯২৫ সালে প্রথম তুষারমানব দেখেছেন বলে দাবি করেন। ১৫ হাজার ফিট উচ্চতায় জেমু হিমবাহের কাছে মাত্র তিনশো গজ উপর থেকে প্রাণীটাকে দ্যাখেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। একটা রডোড্রেনড্রন গাছের মাথা ধরে দাঁড়িয়েছিল সেই দোপেয়ে জীবটা। হতে পারে, পুরো ব্যাপারটাই টোমবাজির দৃষ্টিবিভ্রম। কিন্তু ঘণ্টা দুই পর নীচে নেমে যখন তিনি সে জায়গায়

পৌঁছোন, তখন সে জায়গায় তিনি মানুষের পায়ের মতো বেশ কিছু ছাপ দেখতে পান। তবে সেই ছাপগুলো ছিল প্রায় ১৫ ইঞ্চি লম্বা! এমনই ঘটনা আবার প্রত্যক্ষ করেন ১৯৫১ সালে এরিক শিপটন তাঁর এভারেস্ট অভিযানে। ছ'হাজার মিটার উচ্চতায় তিনি অগস্ট মাসের শেষ দিকে দেখতে পান ওরকম বিশাল পদচিহ্ন। তার পাশে একটা আইস-এক্স রেখে ফোটো তো তোলেন শিপটন। জানি না পৃথিবীবিখ্যাত ফোটোটো আপনি দেখেছেন কিনা? এর ঠিক দু'বছর পর ১৯৫৩ সালে ঐতিহাসিক এভারেস্ট অভিযানে তেনজিং নোরগেও ওই ছাপ দেখেছিলেন বলে দাবি করেন। আমি আপনাকে যেসব অভিযানের কথা বললাম তার একটাও কিন্তু গল্পের প্রয়োজনে তৈরি নয়। ছাপগুলো কীসের, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ঘটনা ও চরিত্ররা কিন্তু সত্যি।"

সুদীপ্ত বলল, "ওই ছাপগুলো সম্পর্কে অন্য মতামতগুলো কী?"

হেরম্যান জবাবে বললেন, "অনেকে বলেন, ওই ছাপগুলো তুষারনেকড়ে বা ওই ধরনের কোনো প্রাণীর ছাপ। তুষার গলে জলে ওইরকম আকার ধারণ করেছে। কিন্তু এ তত্ত্বটা অনেক ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, এমন অনেক জায়গায় পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছে, যেখানে অত উঁচুতে তুষারনেকড়ে উঠতে পারে না। বেশ কিছু খাড়া দেওয়ালের গায়েও ওই ছাপ দেখা গিয়েছে। যেখানে মানুষ বা বানর জাতীয় প্রাণীরাই হাত ব্যবহার করে উপরে উঠতে পারে। তা ছাড়া শিপটনের ফোটোগুলো যদি আপনি দ্যাখেন, তা হলে বুঝতে পারবেন ছাপগুলো অবিকল মানুষের পায়ের ছাপের মতো দেখতে।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে চলল তারা। চলার পথে কখনও তুষারমোড়া নিঃসঙ্গ প্রান্তর, কখনও বা পথ আটকে দাঁড়ানো তুষার পাথরের দেওয়াল, কখনও বা পিচ্ছিল বরফের প্রাকৃতিক সেতু। তার দু'পাশে অতলান্ত খাদের হাতছানি। সামান্য পা ফসকালে মৃত্যু অবধারিত। সেসব অতিক্রম করে ঘণ্টাপাঁচেক চলার পর এক জায়গায় বিশ্রামের জন্য থামল সকলে। বীরবাহাদুর আর তার সঙ্গের লোকেরা স্পিরিট স্টোভ জ্বেলে নুড্‌লস সেদ্ধ করতে লেগে গেল বীরবাহাদুরের আমন্ত্রণে সুদীপ্ত আর হেরম্যান তাঁদের কাছে গিয়ে বসার পর বীরবাহাদুর বললেন, "আমরা প্রায় আরও হাজার দুই ফুট উপরে উঠে এসেছি। ওই যে মাথার উপর দূরে ওই পাথরের তাক দেখছেন, ওটা আরও হাজার ফুট হবে। ঘণ্টাচারেক উঠতে হবে ওখানে পৌঁছতে। জায়গাটায় গিয়ে আমরা তাঁবু ফেলব। আর আপনারা যাবেন মঠের দিকে। ওখান থেকে একটা বরফসেতু পেরিয়ে উপরে উঠলেই দেখতে পাবেন গুম্ফাটা।"

হেরম্যান জানতে চাইলেন, "আপনি ওখানে গিয়েছেন কখনও?"

বীরবাহাদুর জবাব দিলেন, "না যাইনি কখনও, তবে অনেকবার দূর থেকে দেখেছি। আমার ঠাকুরদা যখন এখানে শিকার করতে আসতেন, তখন একবার করে ওই গুম্ফায় গিয়ে মঠাধ্যক্ষের আশীর্বাদ নিতেন। তবে তিনি একলাই যেতেন ওখানে।"

সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, "আপনারা যে চিতাটাকে খুঁজছেন, তাকে পাবেন কীভাবে?"

বীরবাহাদুর বললেন, "এ ব্যাপারে আমি এই রাইয়ের উপরই ভরসা রাখছি। ওর

কিন্তু অনেক গুণ। একাধারে বৈমানিক, মাউন্টেনিয়ার, আবার দক্ষ শিকারিও। বাঘটা তার পিছনের ডান পায়ের পাতা ঠিক মতো ফেলতে পারে না। ছাপ দেখেই ওকে শনাক্ত করতে হবে। তারপর রাইয়ের কাজ।"

হেরম্যান বললেন, "শুনেছি মিগু গুম্ফায় নাকি বেশ কিছু পোষা তুষারচিতা আছে। ব্যাপারটা কি সত্যি?"

বীরবাহাদুর বললেন, "হ্যাঁ, আমিও তেমনই শুনেছি। তবে তুষারচিতা কিন্তু সাধারণ ভাবে পোষ মানে না। ব্যাপারটা গল্পও হতে পারে।"

রাই এবার বললেন, "না, ব্যাপারটা সত্যি। এমনও হতে পারে যে, গুম্ফার চিতাগুলোর কোনো একটাই এ কাণ্ড ঘটাচ্ছে। প্রয়োজন বুঝলে মাঠে ঢুকে ওটাকে সাবাড় করব। দেখি ওঁরা কীভাবে আটকান আমাকে।"

তাঁর কথা শুনে সুদীপ্ত বুঝতেই পারল, ওই মিগু গুম্ফার লোকেদের উপর সত্যিই বেশ চটে আছেন ক্যাপ্টেন রাই।

ধূমায়িত পাত্রে সেদ্ধ নুড্‌লস দিয়ে গেল। রাই দূরের সেই পাহাড়ের তাকটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "তাকটার মাথার উপরটা বেশ অস্পষ্ট লাগছে। অর্থাৎ ওখানে তুষারপাত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়া সেরে আবার যাত্রা শুরু করল সকলে। যত উপরে উঠছে সুদীপ্তরা, বাতাস তত হালকা হচ্ছে। এক-এক সময় বেশ কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে। তার মধ্যেই ক্রমশ উপরে উঠছেন সকলে। মাঝে-মাঝে দু'টো গিরিখাতের মাঝখান থেকে শিসের মতো তীব্র শব্দে ধেয়ে আসছে হিমেল বাতাস। হাড় পর্যন্ত কাঁপন ধরছে সে বাতাসে। কখনও বা মেঘের দল এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে তাদের। তবুও চলার বিরাম নেই তাদের। তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গগুলোর আড়ালে লুকোচুরি খেলতে-খেলতে সূর্যও এগিয়ে চলল তাদের সঙ্গে। সুদীপ্তরা যখন সেই তাকের কাছে পৌঁছল, তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে।

ঝিরিঝিরি তুষারপাত শুরু হচ্ছে। ক্যাপ্টেন রাই ঠিকই বলেছিলেন, তুষারপাতের জন্যই নিচ থেকে এ জায়গাটাকে ধোঁয়া-ধোঁয়া মনে হচ্ছিল।

তাকে দাঁড়িয়ে বীরবাহাদুর বললেন, "আমরা এ জায়গাতেই তাঁবু ফেলে অনুসন্ধান চালাব। একই জায়গায় আছি যখন, তখন নিশ্চয়ই আমাদের দেখা হবে। আর প্রয়োজনে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যও আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি?"

হেরম্যান বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমিও ঠিক এই কথা আপনাদের বলতে যাচ্ছিলাম।"

রাই আবার সুদীপ্তদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, "যেখানে যাচ্ছেন সে জায়গা কিন্তু ভালো না। ওই মঠাধ্যক্ষ লোকটা সুবিধের নয়। চোখ কান খোলা রাখবেন, আর প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।"

সুদীপ্তরা এর পর দেখতে পেলেন, বরফ ঢাকা সেই প্রাকৃতিক সেতুটা দু'টো পাহাড়ের ঢালের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে সেটা। রাই বললেন, "সেতু পেরিয়ে ওপাশের

পাহাড়ের ঢালের পিছনের তাকেই মিগু গুম্ফ।"

তাদের থেকে বিদায় নিয়ে সুদীপ্তরা এগোল সেতুর দিকে। বরফপিচ্ছিল সর্পিল সেতু। তার উপর আবার তুষারপাত ক্রমশ বাড়ছে। তিনশো ফুট লম্বা হবে সেতুটা, চওড়া মাত্র হাতচারেক। দু'পাশে অতলান্ত খাদ, দৈবাৎ কেউ পা ফসকালে জীবিত-মৃত কোনো অবস্থাতেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কাউকে। লম্বা একটা নাইলনের দড়ির দু'টো প্রান্ত ভালো করে নিজেদের কোমরে বাঁধার পর সেতুতে উঠল তারা। তুষারপাত ক্রমশ বাড়ছে, তার উপর বাতাসের প্রবল ঝাপট। প্রথমে হেরম্যান। তার হাতদশেক তফাতে সুদীপ্ত। তুষারপাতের দাপটে সামনেটা প্রায় ঝাপসা। ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগোতে লাগল তাঁরা। সুদীপ্তর এক-এক সময় মনে হতে লাগল, যেন অনন্তকাল ধরে এই সেতু পার হচ্ছে তারা। তবে শেষ পর্যন্ত সেতু পার হয়ে ওপাশে তারা পৌঁছে গেল। কিন্তু তুষারপাত আরও এমন বেড়ে গেল যে, বেশ কিছুক্ষণ তাদের একটা পাথরের ফাটলে ঢুকে অপেক্ষা করতে হল।

তারপর তুষারস্নাত পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে-উঠতে উলটো পিঠে যাওয়ার পথ ধরলেন। একসময় গন্তব্যে পৌঁছে গেল তারা। সুদীপ্ত দেখতে পেল, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেশ বড় একটা প্রাচীন গুম্ফা। তুষারপাত হঠাৎই যেন কোনো অলৌকিক কারণে থেমে গিয়েছে। পাহাড়ের আড়াল থেকে শেষ বিকেলের আলো এসে পড়েছে তুষারচাদর বিছানো মঠের ঢালু ছাদে, সামনের ছোট্ট প্রাঙ্গণে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ এক ধর্মস্তম্ভ বা চোর্তেন। বরফস্নাত প্রাঙ্গণে কোনো লোকজন নেই। সুদীপ্তরা যে পথে উঠে এসেছে, সে পথ ছাড়া মঠে যাওয়ার অন্য কোনো রাস্তা নেই। দু'দিকে গভীর খাদ আর অন্য একটা দিকে পাথরের একটা দেওয়াল যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে মিগু গুম্ফাকে। সেই দেওয়ালের গায়ে দূর থেকে একটা গুহামুখও নজরে পড়ল সুদীপ্তদের। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, "চোখ-কান একটু খোলা রাখবেন।"

তারপর তিনি সুদীপ্তকে নিয়ে বরফস্নাত প্রাঙ্গন পেরিয়ে এগোলেন মঠের প্রবেশ-তোরণের দিকে।

তারা দু'জন মঠের প্রধান তোরণের সামনে এসে দাঁড়াল। তোরণের মাথায় খোদিত আছে ভীষণদর্শন তিব্বতি অপদেবতাদের কয়েকটা মুখ। তবে বয়সের ভারে জীর্ণ তারা। মুখগুলোর কিছু অংশ খসে পড়েছে। কাঠ আর পাথরের তৈরি দেওয়ালের গা একসময় মনে হয় চিত্রশোভিত ছিল। সেসব ছবি এখন অস্পষ্ট। হেরম্যান চাপা স্বরে একবার বললেন, "এ মঠ মনে হয় তিন-চারশো বছর পুরনো হবে।"

তারপর তিনি ঘা দিলেন দরজায়।

বেশ কয়েকবার দরজায় ঘা দেওয়ার পর ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা, তারপর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে ভারী দরজাটা খুলে গেল। দরজা খুলে দাঁড়ালেন মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘকায় অতিবৃদ্ধ এক লামা। কিছুটা ন্যুব্জ হলেও তাঁর উচ্চতা সাড়ে ছ'ফুটের বেশি হবে। এত লম্বা মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর কত বয়স তা অনুমান করা মুশকিল। অসংখ্য বলিরেখাময় মুখ, ভ্রূহীন, রোমহীন

অক্ষিপল্লব। লাল রঙের পরিধেয় তিব্বতি বস্ত্রের বাইরে বেরিয়ে থাকা হাতগুলোয় যেন হাড়ের উপর শুধু চামড়া কাগজের মতো লেগে আছে। তিনি বেশ শান্ত স্বরে ইংরেজিতে বললেন, "আপনারা কারা?"

হেরম্যান পরিকল্পনামাফিক নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, "আপনি কি এ মঠের প্রধান লামা?"

তিনি আবারও বেশ মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আমিই মঠাধ্যক্ষ লামা ডং রিম্পুচি।"

হেরম্যান বললেন, "আমাদের পরিচয় তো আপনাকে দিলাম। আমার সঙ্গে পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট এসব আছে। চাইলে আপনি সেসব দেখতে পারেন। আমি বহু দূর থেকে এই দুর্গম জায়গায় এসেছি আপনার মঠের সাহচর্যে ক'দিন থেকে আপনাদের জীবনযাত্রা-ধর্ম-দর্শনকে জানব বলে। যদি আপনি এই মঠে আমাদের দু'জনকে থাকার জন্য অনুমতি দেন, তবে আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। আমি জানতে চাই এই দুর্গম জায়গায় কীভাবে ভগবান বুদ্ধর উপাসনা করেন আপনারা?"

হেরম্যান লামা ডং রিম্পুচিকে কাগজপত্র দেখার কথা বললেও সুদীপ্ত খেয়াল করল, তাঁর কোটরগত মণি দু'টো কেমন যেন স্থির নিষ্প্রভ, দৃষ্টিহীন। হেরম্যান অবশ্য সুদীপ্তকে আগেই বলেছিলেন এ ব্যাপারটা। লামা ডং রিম্পুচি দৃষ্টিহীন মানুষ।

হেরম্যানের কথা শুনে ডং রিম্পুচির ঠোঁটের কোণে যেন অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। লামা বললেন, "কাগজের লেখা দেখে মানুষের পরিচয় জানা গেলেও তার মনের কথা কি জানা যায়? কী হবে পরিচয়পত্র দেখে? কিন্তু যে কারণেই আপনারা আসুন না কেন, আসতে বড় দেরি করে ফেলেছেন। আর ক'টা দিন মাত্র, তারপরই এই মঠ ত্যাগ করে আমরা চলে যাচ্ছি।"

হেরম্যান বললেন, "তা হলে? আমরা কি এ মঠে থাকার অনুমতি পাব না?"

হেরম্যানের কথা শুনে লামা রিম্পুচি কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে কী যেন ভাবলেন, তারপর সুদীপ্তদের সেখানেই দাঁড়াতে বলে মঠের ভিতর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পাহাড় থেকে ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। সেই বাতাসে উড়ছে মঠের একধারে কয়েকটা খুঁটির গায়ে লাগানো বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ছিন্ন পতাকাগুলো। ওদের বলে লুংদার। তিব্বতি ভাষায় মন্ত্র লেখা ধর্মীয় পতাকা। এ পতাকা সব বৌদ্ধমঠেই দেখা যায়। এই ঠান্ডা বাতাস অন্ধকার নামার পূর্বাভাস। হেরম্যান চত্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভিতরে আশ্রয় না পেলে আজ রাতটা আমাদের বাইরে এই ঠান্ডার মধ্যেই কাটাতে হবে। এখন আর ফেরা যাবে না। উনি কি ভিতরে কাউকে ডাকতে গেলেন?"

বাইরে দাঁড়িয়ে রইল সুদীপ্তরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার অবশ্য তাঁর পায়ের শব্দ শোনা গেল। মঠের অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা আলো এগিয়ে আসছে। একটা প্রদীপ নিয়ে আবার ফিরে এলেন লামা ডং রিম্পুচি। তারপর সুদীপ্তদের উদ্দেশে বললেন, "মিগু গুম্ফায় মঠাধ্যক্ষ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে। আপনারা ভিতরে আসুন।"

হেরম্যান সুদীপ্তর সঙ্গে মৃদু দৃষ্টি বিনিময়ে করার পর লামাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুদীপ্তকে নিয়ে পা রাখলেন মঠের ভিতর। ভিতরে প্রবেশ করতেই সুদীপ্তর নাকে এসে

লাগল একটা অদ্ভুত গন্ধ। অনেক পুরনো বাড়িতে যেরকম গন্ধ থাকে, ঠিক সেরকম গন্ধ। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে সুদীপ্তদের নিয়ে একটা বারান্দা ধরে এগোলেন মঠের ভিতর থেকে। আলো-আঁধারি খেলা করছে মঠের ভিতর। তারই মধ্যে কোথাও দেওয়ালের গা থেকে উঁকি দিচ্ছে। অদ্ভুতদর্শন ভয়াল ধর্মীয় মূর্তি, কোথাও বা চিকচিক করে উঠছে মাথার উপর থেকে ঝুলন্ত সোনালি সুতোয় বোনা ধর্মীয় চাদর থাংকা। বারান্দার দু'পাশে সারিবদ্ধ অন্ধকার সব ঘর। এক অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে সারা মঠ জুড়ে। তাঁদের তিনজনের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

এগিয়ে চলেছেন লামা। কোনো লোকজন না দেখতে পেয়ে সুদীপ্ত কৌতূহলবশত লামা রিম্পুচিকে জিজ্ঞেস করল, "এত বড় মঠে অন্য কোনো লোকজন নেই? আপনি একাই থাকেন?"

তিনি অদ্ভুত একটা জবাব দিলেন, "একাও বলতে পারেন, আবার তা না-ও বলতে পারেন।"

বারান্দার শেষ মাথায় একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে লামা তাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন দোতলার একটা ঘরে। ঘরটা পরিচ্ছন্ন। কাঠের দেওয়াল, কাঠের মেঝে। ঘরের এক কোণে শোয়ার জায়গাও আছে। কুলুঙ্গিতে রাখা আছে একটা বুদ্ধমূর্তি। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামনের চত্বর আর পাহাড় শ্রেণি। তার আড়ালে সূর্য তখন মুখ লুকিয়েছে। অন্ধকার নামছে পাহাড়ের বুকে।

ঘরে ঢুকে লামা সুদীপ্তদের বললেন, "এই আপনাদের থাকার জায়গা। জানি, এখানে থাকতে আপনাদের কষ্ট হবে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধর অতিথিদের জন্য এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা করার সুযোগ আমার নেই। আমাকে ক্ষমা করবেন!" বেশ নম্র ভাবে কথাগুলো বললেন তিনি।

হেরম্যান সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "না-না, এখানে থাকতে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। আপনি যে আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করলেন তার জন্যই আমরা কৃতজ্ঞ।"

প্রদীপের আলোয় হাসির আভাস দেখা দিল বৃদ্ধের বলিরেখাময় মুখে। তিনি বললেন, "ভগবান বুদ্ধ আপনাদের আশীর্বাদ করুন। অনেকটা পথ আপনারা এসেছেন, আজকের মতো বিশ্রাম নিন। কাল মঠটা ঘুরে দেখবেন। আজ আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না এর পর। আমি এখন নীচে প্রার্থনাকক্ষে বসব। কাল সব কথা হবে।"

এই বলে তিনি তাঁর হাতের বড় প্রদীপটা বুদ্ধমূর্তিতে নামিয়ে রেখে ঘর ছেড়ে ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

তিনি চলে যাওয়ার পর জানলা-দরজা বন্ধ করে দিলেন হেরম্যান। সুদীপ্তর পাশে বসে তিনি বললেন, "এমনিতে লোকটাকে খারাপ বলে মনে হল না। তবে তিনি এ মঠে একা থাকেন কিনা, সে ব্যাপারটা কিন্তু স্পষ্ট করলেন না।"

সুদীপ্ত বলল, "লোকটা দৃষ্টিহীন, কিন্তু কী অবলীলায় তিনি হেঁটেচলে বেড়াচ্ছেন মঠের ভিতর। ওঁর চোখের দিকে না তাকালে বোঝাই যাবে না উনি দৃষ্টিহীন।"

হেরম্যান বললেন, "উনি দীর্ঘদিন এ মঠে আছেন। মঠের সব কিছু ওঁর নখদর্পণে।

তা ছাড়া দৃষ্টিহীন মানুষদের অন্য ইন্দ্রিয়গুলো প্রখর হয়, তাই উনি এমন সাবলীল ভাবে চলাফেরা করতে পারেন।"

একথা বলার পর হেরম্যান বললেন, "থাক, এসব ব্যাপারে এখন আর কোনো আলোচনা নয়। আজ সারাদিন অনেক ধকল গিয়েছে। এখন আমরা শুয়ে পড়ব। কাল ভোরে উঠে যা পরিকল্পনা করার, তা করব। তবে একটা ব্যাপার, চোখ-কান কিন্তু সবসময় খোলা রাখবেন।"

ঘরের এক কোণে কাঠের তৈরি খাটের মতো একটা জায়গা আছে। সত্যিই বড্ড ধকল গিয়েছে আজ। সামান্য কিছু খাবার খেয়ে রিম্পুচির রেখে যাওয়া চর্বির প্রদীপটা নিভিয়ে ঘরের কোণে সে জায়গায় নিজেদের জিনিসপত্র বিছিয়ে শুয়ে পড়ল দু'জন। সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম নেমে এল সুদীপ্তর চোখে।

মাঝরাতে আবার হেরম্যানের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল সুদীপ্তর। উঠে বসতেই হেরম্যান চাপাস্বরে বললেন, "জানলা দিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে! ব্যাপারটা আপনাকে দেখানোর জন্য ঘুম ভাঙালাম।"

হেরম্যানের কথা শুনে তাঁর পিছন-পিছন সুদীপ্ত গিয়ে দাঁড়াল জানলায়। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত বাইরের পৃথিবী। বরফের উপর চাঁদের আলো পড়ে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন কেউ গলিত রুপো ছড়িয়ে দিয়েছে মঠের সামনের চত্বরে, আর ওই পাহাড়গুলোর গায়ে। ঝিরিঝিরি তুষারপাতও হচ্ছে। আর তার মধ্যেই মন্দির চত্বরে চোর্তেন স্তম্ভের ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে আছেন মঠাধ্যক্ষ লামা ডং রিম্পুচি। তাঁকে ঘিরে রয়েছে বেশ কয়েকটা বড় প্রাণী। কেউ বসে আছে তাঁর পায়ের কাছে, কেউ তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, কেউ বা তাঁর গায়ে ওঠার চেষ্টা করছে বা তাঁকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। ডং রিম্পুচি মাঝে-মাঝে গায়ে হাত দিয়ে আদর করছেন প্রাণীগুলোকে। প্রাণীগুলো সাদা রঙের, গায়ে বেশ বড়-বড় কালো ছোপ, মাঝে-মাঝে তারা লেজ ঝাপটাচ্ছে বরফের উপর। তাদের সবুজ চোখগুলো জ্বলছে!

"ওগুলো কী প্রাণী?"

"তুষারচিতা! এ ব্যাপারটা তা হলে সত্যি!" জবাব দিলেন হেরম্যান।

সুদীপ্ত বলল, "প্রাণীগুলো তো যে-কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে ওঁকে। এই হিংস্র প্রাণীগুলোকে উনি বশ মানালেন কীভাবে?

হেরম্যান বললেন, "অনেকে বলেন, ওই লামাদের অনেক রকম অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা থাকে। উনি হয়তো সেই ক্ষমতাবলেই বশ মানিয়েছেন ওদের। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, এ পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার থাকে যা সাধারণ মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও আসলে তা সত্যি। হয়তো আমরা যাকে খুঁজতে এসেছি, সেও আসলে লুকিয়ে আছে এই বরফ প্রান্তরের কোথাও। তুষারমানব সত্যিই আছে।"

সুদীপ্তরা দেখতে লাগল লামা আর প্রাণীগুলোকে। বেশ কিছুক্ষণ পর লামা যেন প্রাণীগুলোকে কী বললেন। তা শুনে প্রাণীগুলো দল বেঁধে ধীরে-ধীরে চত্বর ছেড়ে খাদের

দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। লামা রিম্পুচি হাঁটতে শুরু করলেন চত্বরের ডান দিকের সেই দেওয়ালটার দিকে। তারপর যেন তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ভোরবেলা জানলা খুলতেই একরাশ উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল সুদীপ্তদের ঘরে। তুষার-ছাওয়া চত্বরের মাঝে চোর্তেনটা দাঁড়িয়ে আছে। ওরই নীচে চাঁদের আলোয় তুষারচিতাদের সঙ্গে গতকাল রাতে খেলছিলেন লামা ডং রিম্পুচি। দিনের আলোয় সে দৃশ্যটা এখন নিছকই কল্পনা বলে মনে হচ্ছে। বাইরে তাকিয়ে হেরম্যান বললেন, "বাঃ, বেশ সুন্দর পরিবেশ! মঠের ভিতরটা দেখার পর একবার বাইরেও যাব। চারপাশটাও একবার দেখতে হবে। বীরবাহাদুররাও তো বরফসেতুর ওপাশেই আছেন। তাঁদের সঙ্গেও একবার দেখা করা যেতে পারে।"

হেরম্যানের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সিঁড়িতে অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন রিম্পুচি। দিনের আলোয় সুদীপ্তরা প্রথম দেখতে পেলেন তাঁকে। রাতে তাঁরা হয়তো সেভাবে খেয়াল করেননি। কিন্তু দিনের আলোয় লামার মুখটা কেমন যেন ফোলাফোলা মনে হল তাঁদের। যেন তাঁর শীর্ণ দেহের সব রক্ত এসে জমা হয়েছে মুখে। তবে তাঁর চোখের মণি দু'টো একদম স্থির। কোনো জ্যোতি নেই তাঁর সে দু'টো চোখে। কিন্তু এই অতিবৃদ্ধ লামার বয়স কত হবে, তা ঠিক অনুমান করতে পারলেন না সুদীপ্তরা। তাঁর ভ্রূর কোনো অস্তিত্বই নেই। কোনো-কোনো লামা নাকি দু'-তিনশো বছরও বাঁচেন বলে শোনা যায়। লামা স্মিত হেসে সুপ্রভাত জানিয়ে সুদীপ্তদের বললেন, "আশা করি আপনাদের ঘুম ভালো হয়েছে? আপনারা তৈরি থাকলে আমি আপনাদের মঠটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারি।"

হেরম্যানও প্রতি-সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমরা তৈরি।"

মঠাধ্যক্ষ তাঁদের ইশারায় অনুসরণ করতে বললেন। সুদীপ্তরা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামার পর লামা রিম্পুচি তাদের প্রথম যে ঘরে নিয়ে এলেন, সেটা একটা লাইব্রেরি। বিরাট বড় ঘরটায় কাঠের র‍্যাকে থরে-থরে কাপড়ে মোড়া প্রাচীন পুঁথি সাজানো আছে। বেশ কিছু বইও সেখানে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেগুলো বেশ পুরনো। প্রাচীন একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে আলো-আঁধারি মাখা ঘরের ভিতর।

লামা রিম্পুচি বললেন, "আপনারা যে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন সম্বন্ধে জানতে এসেছেন, তার সবই লেখা আছে এই সব পুঁথির মধ্যে। তাই প্রার্থনা কক্ষে যাওয়ার আগে আপনাদের এ ঘরে নিয়ে এলাম। তবে এত পুঁথি আপনারা এখানে বসে নেড়েচেড়ে দেখতে পারবে না। কারণ, এ মঠ ছেড়ে ক'দিনের মধ্যে চলে যেতে হবে। আমরা মঠ ছেড়ে যাওয়ার পর এই সব পুঁথি নীচের গুম্ফায় নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। সেখানে অবশ্য সময়

নিয়ে পুঁথিগুলো আপনারা দেখতে পারেন।"

হেরম্যান জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় চলে যাচ্ছেন আপনারা?"

"আবার উপরে। হিমালয়ের আরও গভীরে, আরও দুর্গম কোনো স্থানে", জবাব দিলেন ডং রিম্পুচি।

"সেখানে যাচ্ছেন কেন? সেখানেও কি কোনো মঠ আছে?" জানতে চাইল সুদীপ্ত।

লামা বললেন, "না, সেখানে কোনো মঠ নেই। থাকার জায়গা বলতে সেখানে পাহাড়ের কোনো গুহা বা উন্মুক্ত বরফাচ্ছাদিত কোনো প্রাঙ্গণ। সেখানে গিয়ে আরও কৃচ্ছ্রসাধন করে ভগবান বুদ্ধর আরও কাছে পৌঁছতে পারব। সাধনার বিভিন্ন স্তর আছে। একসময় আমি নীচের মঠে ছিলাম, তারপর এখানে উঠে এলাম আরও কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য। এখানের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার চলে যাব আরও উপরে। সাধনার আরও উচ্চমার্গে, বলা যেতে পারে অন্তিম মার্গে। পৌঁছনোর জন্য।"

"ঠিক কবে এ মঠ ত্যাগ করছেন?" জানতে চাইলেন হেরম্যান।

ডং রিম্পুচি বললেন, "খুব বেশি হলে তিন-চার দিন, তেমন হলে কালও চলে যেতে পারি। পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে কয়েকটা ব্যাপারের উপর।"

কী ব্যাপার সেটা ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করতে পারল না সুদীপ্ত বা হেরম্যান। প্রশ্ন একান্তই ব্যক্তিগত হয়ে যেত।

লামা নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। লাইব্রেরি ঘরটা একটু ভালো করে দেখার জন্য কাঠের র‍্যাকগুলোর আশপাশে ঘুরতে শুরু করলেন সুদীপ্তরা। একটা র‍্যাকে কিছু ইংরেজি বইও রাখা আছে। পুরু ধুলোর স্তর জমেছে বইগুলোর উপর। পুঁথিগুলো সব তিব্বতি ভাষায় লেখা, সুদীপ্ত তা পড়তে পারবে না, কিন্তু ইংরেজি বইগুলো পড়া যেতে পারে। তাই সে ধুলো ঝেড়ে বইগুলো দেখতে লাগল। 'লাইফ অব মিলারাপা', "ওয়ার্কস অফ পদ্মসম্ভব' বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগীপুরুষদের জীবন-কাজ এসবের উপর লেখা বইগুলো। তারই মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বই হাতে পেয়ে বেশ অবাক হয়ে গেল সুদীপ্ত। বইটার নাম 'ক্রায়োনিক্স-ক্রায়োজেনিক্স।' এখানে এ বিষয় সংক্রান্ত বই! বীরবাহাদুরের কাছেও এ বিষয়ে একটা বই দেখেছেন তাঁরা। সুদীপ্তর ক্রায়োজেনিক্স শব্দটা জানা থাকলেও ক্রায়োনিক্স শব্দের অর্থ জানা নেই। যে বইটা হেরম্যানকে দেখিয়ে বলল, "ক্রায়োনিক্স শব্দের মানে জানেন?"

হেরম্যান বললেন, "শব্দটা আগে শোনা, তবে মানেটা এই মুহূর্তে ঠিক মনে আসছে না।" এই বলে তিনি বইটা হাতে নিয়ে দেখতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় লামা রিম্পুচি বললেন, "চলুন, এবার আপনাদের প্রেয়ার হলটা দেখাই। এ ঘর তো খোলাই রইল, পরে নয় আবার এ ঘরে আসবেন। আমাকে আবার উপাসনায় বসতে হবে।"

তাঁর কথা শুনে বইটা তাকে রেখে দিয়ে সুদীপ্তরা তাঁকে অনুসরণ করল। কয়েকটা ঘর পেরিয়ে সুদীপ্তরা এসে ঢুকল প্রেয়ার হলে। ঘরটা অন্ধকার। একটা জানলা খুলে দিতেই আলোকিত হয়ে উঠল ঘর। ঘরটা বিশাল। মাথার উপর হাতে-টানা পাখার মতো ঝুলছে কারুকাজ করা বিরাট থাংকা। সারা দেওয়াল জুড়ে নানা অলংকরণ, ছবি। সেখানে

ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ভগবান বুদ্ধর জীবনকথা, জাতক কাহিনি। সুদীপ্তদের সামনেই দেওয়ালের গা ঘেঁষে কাঠের স্ট্যান্ডের উপর রাখা আছে নানা বাদ্যযন্ত্র। বিরাট বড় শিঙা, ডুগডুগি, আর একটা জয়ঢাক। ঢাক বাজানোর জন্য যে জিনিসটা তার উপর রাখা আছে, সেটা যে মানুষের উরুর হাড়, তা দেখেই বুঝতে পারল সুদীপ্তরা। আর ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে কাঠের তৈরি অপদেবতাদের নানা মুখ। তাদের কেউ ভয়ংকর দাঁত বের করে আছে, কারও বা লকলকে জিভ, ভাঁটার মতো চোখ, কেউ বা নরমুণ্ড-শোভিত। দেওয়ালের গা থেকে তারা যেন সব তাকিয়ে দেখছে সুদীপ্তদের। কেমন যেন একটা অদ্ভুত রহস্যময় পরিবেশ বিরাজ করছে সারা ঘর জুড়ে। বাইরের আলোও সেই রহস্যময়তা কাটাতে পারছে না।

ঘরের শেষ প্রান্তে একটা বেদিতে অধিষ্ঠান করছেন ভগবান গৌতম। আর বেদির ঠিক নীচেই রাখা কাঠের তৈরি বিরাট কফিনের মতো একটা লম্বা বাক্স। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে তাঁর সামনে। বুদ্ধমূর্তিটা অন্য ধরনের, কঙ্কালসার ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি। তাঁর কারোটি, পঞ্জরাস্থি, হাত-পায়ের হাড় সবই প্রকট ভাবে দৃশ্যমান। আর পাথরের তৈরি অস্থিচর্মসার কোলে রাখা আছে নীচের গুম্ফায় দেখা সেই বিরাট খুলিটা, আর লাল শালুতে মোড়া একটা প্রাচীন পুঁথি। আগেরবার দেখার সময় তত আলো ছিল না, কিন্তু এবার বেশি আলোয় দেখে সুদীপ্ত বুঝতে পারল, খুলি দু'টো যে প্রাণীরই হোক না কেন, এখনও সে প্রাণীর চামড়ার কিছু অংশ খুলির মাথায় লেগে আছে। কালচে রোমশ চামড়া।

খুলি দু'টোকে আলোয় ভালো করে দেখার পর সুযোগ বুঝে হেরম্যান লামা ডং রিম্পুচিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, ওই বিরাট বড় খুলিটা কোন প্রাণীর?"

রহস্যময় হাসির রেখা ফুটে উঠল লামা রিম্পুচির ঠোঁটের কোণে। সুদীপ্তদের চমকে দিয়ে তিনি বললেন, "ওই খুলিগুলোর আকর্ষণেই তো আপনারা পাহাড়-পর্বত-বরফপ্রান্ত পেরিয়ে এ মঠে এসেছেন, তাই না? ওটা বরফদেশের রাজার মাথা।" লামা কি থট রিডিং জানেন? নাকি মনের ভাব পড়তে পারেন? হেরম্যান ব্যাপারটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই ভাব দেখাবার চেষ্টা করে বললেন, "নীচের মঠে খুলিটা দেখে এ সম্বন্ধে আমার জানার ইচ্ছে হয়েছে ঠিকই। কারণ, আপনাদের প্রত্যেকটা ব্যাপারেই আমার জানার আগ্রহ আছে। আলাদা ভাবে তেমন কিছু নয়।"

হেরম্যানের কথাশুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ডং রিম্পুচি গম্ভীর ভাবে বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ভগবান বুদ্ধ সহস্রবার সহস্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে হাতির মতো বিরাট প্রাণী রূপেও তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসেন। ওগুলো যার খুলি সে রূপেও তিনি এসেছিলেন পৃথিবীতে। আমরা তন্ত্রসাধনায় তাঁর সে রূপেরই উপাসনা করি। তাঁর সহস্র রূপের মধ্যে ক'টা রূপই আর সাধারণ মানুষ জানে! এসব তন্ত্রসাধনার গূঢ় বিষয়।"

সুদীপ্ত এবার জিজ্ঞেস করল, "সেটা কোন প্রাণীর রূপ?"

লামা শান্ত স্বরে বললেন, "এসব গোপন তত্ত্ব আমার পক্ষে আপনাদের বলা সম্ভব নয়। আমাকে মাপ করবেন।"

সুদীপ্তকে বেশ আকৃষ্ট করেছে বেদির সামনে রাখা বিরাট সিন্দুকটা। কী আছে ওর মধ্যে? ঘরের চারপাশে ঘুরতে-ঘুরতে বারবার আড়চোখে সে তাকাতে লাগল সিন্দুকটার দিকে। কিছু সময় পর ডং রিম্পুচি বললেন, "এবার সময় হয়ে গিয়েছে। আমি এখন প্রার্থনায় বসব। ইচ্ছে করলে আপনারা নিজেরাই মঠের অন্য জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে পারেন।"

হেরম্যান একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "বাইরে আবহাওয়াটা আজ বেশ চমৎকার। আমরা বরং এখন বাইরে থেকে ঘুরে আসি।"

লামা বললেন, "হ্যাঁ, ঘুরে আসতে পারেন। তবে যেখানেই যান, অন্ধকার নামার আগে মঠে ফিরবেন। আর একটা ব্যাপারে আপনাদের সতর্ক করে দিই। ইদানীং এখানে একটা তুষারচিতা মানুষকে আক্রমণ করছে। পাহাড়ের গায়ে কোনো গুহা দেখলে সেখানে ঢুকতে যাবেন না, বিশেষত মঠের কাছে দেওয়ালের গায়ে যে গুহাটা আছে। প্রাণীটা ওখানে আত্মগোপন করে থাকতে পারে।"

লামা ডং রিম্পুচি আর কোনো কথা বললেন না। মূর্তিবেদির নীচে পাতা আসনে বসে, তার পাশে রাখা একটা জপযন্ত্র তুলে নিয়ে ঘরঘর শব্দে সেটা ঘোরাতে-ঘোরাতে দুর্বোধ্য ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলেন।

সুদীপ্তরা মঠের বাইরে বেরিয়ে এল। সত্যি, বাইরের পৃথিবীটা আজ বড় চমৎকার। নির্মেঘ আকাশ। ধোঁয়াশা বা কুয়াশার চিহ্ন নেই কোথাও। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে পর্বতশৃঙ্গগুলো। ওই তো নন্দাদেবী, ওই তো ত্রিশূলের তিনটে শৃঙ্গ! ওই তো ভৃগুপন্থ, বান্দরপুচ্ছ! আর সকলের উপর ওই যে দূরে স্বদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মাউন্ট এভারেস্ট। যেদিকেই তাকানো যায়, সেদিকেই দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় আর পাহাড়!

সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, "আপনি বাইরে এলেন কেন? শুধু প্রকৃতির শোভা দেখতে, নাকি অন্য কোনো কারণে?'

হেরম্যান বললেন, "মঠের ভিতরটা আমরা কিছুটা দেখলাম, এবার দিনের আলোয় বাইরে চারপাশটা একবার ভালো করে দেখে নিই। যদি কোথাও কোনো পায়ের ছাপ-টাপ বা ওই ধরনের কোনো সূত্র মেলে? তা ছাড়া যদি বীরবাহাদুরের দলটার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ওরা তো রাতটা বাইরেই কাটাল। যদি কোনো খবর পাওয়া যায়!"

মঠের চারপাশে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরল তারা। তিন দিকে অবশ্য গভীর খাদ। মঠের তাকের মতো চত্বরটা হঠাৎই যেন তিন দিকে গিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। খাদের দেওয়ালগুলো ঢালু নয়, একদম খাড়া নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। সেসব দিক দিয়ে নিচ থেকে উপরে ওঠার সুযোগ নেই। চোর্তেনটার সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন তাঁরা, যেখানে গত রাতে লামা তুষারচিতাগুলোকে আদর করছিলেন। তাদের পায়ের ছাপ এখন আর অবশ্য সে জায়গায় নেই। গত রাতের তুষারপাত ঢেকে দিয়েছে সব। চত্বরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা গুহামুখের দিকে সুদীপ্ত তাকাল। তার ভিতর জমাটবাঁধা অন্ধকার।

মঠচত্বর ছেড়ে সুদীপ্তরা এর পর এগোল যে পথে তারা এসেছিল, সে পথে।

যেতে-যেতে সুদীপ্ত বলল, "আপনার কী মনে হয়, লামা রিম্পুচি এত বড় গুম্ফায় একাই থাকেন? আর কাউকে তো দেখলাম না!"

হেরম্যান বললেন, "কথা বলার সময় লামা কিন্তু 'আমি' না বলে বেশ কয়েকবার 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করলেন! এর অর্থ তিনি একলা মঠে থাকেন না। হয় মঠের অন্য কেউ বা অন্যরা সাময়িক ভাবে বাইরে আছেন, অথবা মঠেই কোথাও . . .।"

তিনি কথা শেষ করার আগেই সুদীপ্ত বলল, "প্রার্থনাকক্ষের ভিতর অদ্ভুত সিন্দুকটা খেয়াল করেছেন? ওর মধ্যে লামার মতো লম্বা লোকও অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। এমনকী, তার চেয়ে বড় কোনো প্রাণীও। আচ্ছা লামা 'আমরা' বলতে সেই প্রাণীকেও বোঝাননি তো?"

হেরম্যান সুদীপ্তর কথার জবাবে বললেন, "এ ব্যাপারটা অসম্ভব না-ও হতে পারে। দেখলেন তো ওই খুলিটার ব্যাপারে লামা বললেন যে, তাঁদের বিশ্বাস ভগবান বুদ্ধ তাঁর সহস্র জীবরূপে জন্মের মধ্যে ওই বিশেষ প্রাণীরূপেও জন্মেছিলেন। অর্থাৎ খুলিটা যে প্রাণীর, তার অস্তিত্ব এক সময় পৃথিবীতে ছিল বা আছে। প্রাণীটা অলীক নয়। আর প্রাণীটার নামও বললেন না তিনি। প্রাণীটা যদি পরিচিত কোনো প্রাণী হয়, তবে তার ব্যাপারে এত গোপনীয়তা কেন?"

পরিষ্কার আকাশ, তুষারপাত বা বাতাসও বেশি নেই। বরফে উতরাই বেয়ে নামার সময় সতর্ক থাকতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পরিশ্রম বেশি হচ্ছে না। চলতে-চলতে হেরম্যান বললেন, "ইয়েতি বা এধরনের প্রাণীর কথা কিন্তু নানা ভাবে নানা দেশে শোনা যায়। যেমন, আমেরিকার ইয়েতি বা 'বিগ ফুট'। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার পর্বতসঙ্কুল অরণ্যে রাস্তা তৈরির সময় বহু মানুষ সেই দানবাকৃতি রোমশ মানুষকে দেখেছেন বলে দাবি করেন। একজন বুলডোজার চালক 'জেরাল্ড ক্রু' প্লাস্টার সব প্যারিসে প্রাণীটার পায়ের ছাপও তোলেন। ছাপটা ছিল ১৮ ইঞ্চি লম্বা। কাগজে তার ফোটো ছাপা হলে আমেরিকা জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। একই রকম মানুষের মতো রোমশ প্রাণী চিনের আর মালয়ের রবার বনে দেখা গিয়েছে বলে শোনা যায়। মায়ানমারের জঙ্গলেও এ ধরনের প্রাণীর গল্প অনেক শোনা যায়।"

কথা বলতে-বলতে নীচে নামার পর হঠাৎ সুদীপ্তরা দেখতে পেল বীরবাহাদুর, রাই আর জনাকয়েক লোককে। সেই তুষারসেতুটা পেরিয়ে তাঁরা এপারে চলে এসেছেন। রাই আর বীরবাহাদুর, দু'জনের কাঁধেই রাইফেল। সম্ভবত সেই চিতার খোঁজেই বেরিয়েছেন তাঁরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢালের নীচে দেখা হয়ে গেল দুই দলের। কুশল বিনিময়ের পর হেরম্যান বললেন, "আপনারা এপারে চলে এলেন।"

বীরবাহাদুর বললেন, "কাল রাতে সেতু পেরিয়ে আমাদের তাঁবুর কাছে চলে গিয়েছিল প্রাণীটা। ওদিকে বরফসেতুতে ওঠার সময় একজন পোর্টার তাকে দেখেছে। প্রাণীটা নাকি খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। সেতুর উপরে কয়েক জায়গায় তার পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। তিন ঠ্যাঙের ছাপ। সেতু পেরিয়ে এদিকে এসেছে প্রাণীটা। কিন্তু গত রাত্রে তারপর এপারে এত তুষারপাত হয়েছে যে, পায়ের ছাপ হারিয়ে গিয়েছে।"

মিস্টার রাই সুদীপ্তদের জিজ্ঞেস করলেন, "একটা রাত তো কাটালেন ওই মঠে। কোনো অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল কি? কোনো প্রাণীর দেখা পেলেন?"

হেরম্যান একটু ইতস্তত করে জবাব দিলেন, "না তেমন কিছু নয়, তবে . . ."

"তবে কী?" তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন রাই।

হেরম্যান বললেন, "কাল রাতে মঠচত্বরে একপাল তুষারচিতা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন লামা।"

বীরবাহাদুর বিস্মিতভাবে বললেন, "ব্যাপারটা তা হলে সত্যি!"

রাই বললেন, "আর সেই বিরাট রোমশ প্রাণীটার ব্যাপারও সত্যি। আমি তাকে স্পষ্ট দেখেছিলাম। আসলে ওই শয়তান লামাটা সব জানে। আমার অনুমান ওই চিতাটাও মঠেই আছে। ওই খোঁড়া চিতাটার খোঁজ না পেলে মঠের সব ক'টা চিতাকেই সাবাড় করব।"

বীরবাহাদুর তাঁর কথা শুনে মৃদু ধমকে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমরা এখন সরকারি কাজে এখানে এসেছি। ছেলেবেলার মতো এটা আর এখন হান্টিং গ্রাউন্ড নয়। ওই বিশেষ প্রাণী ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীকে মারার অনুমতি আমাদের নেই। তোমার দেখা ব্যাপারটা সত্যি ধরে নিয়েই বলি, হয়তো মঠাধ্যক্ষের কথায় তোমার ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখো। চলো, এবার প্রাণীটার খোঁজ করা যাক।"

চিতাটার পায়ের ছাপ খুঁজতে শুরু করলেন রাই-বীরবাহাদুররা। সুদীপ্তরাও যোগ দিল তাঁদের সঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর কয়েকটা পায়ের ছাপের সন্ধান পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সে ছাপ সেই বিশেষ প্রাণীটার নয়। প্রায় দুপুর হয়ে গেল। বীরবাহাদুর একসময় বললেন, "এবার থামা যাক। ভালো করে পরিকল্পনা করে খোঁজা শুরু করতে হবে। আশপাশের পাহাড়ের খাঁজগুলোও দেখতে হবে।"

তাঁর কথা শুনে রাই বীরবাহাদুরকে বললেন, "তুমি বরং অন্যদের দিয়ে তাঁবুতে ফিরে যাও, আমি ওই যে ওই পাহাড়ের ঢালটা একবার দেখে আসি। এখন আমার ফেরার ইচ্ছে নেই।"

সুদীপ্তদেরও ফিরতে হবে। বীরবাহাদুর-রাইদের সঙ্গে মঠের উলটো দিকে চলে এসেছেন তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরবাহাদুর তাঁর লোকজন নিয়ে তাঁবুর দিকে রওনা দিলেন।

"পরদিন আবার দেখা হবে," বলে সুদীপ্তরাও মিগু গুম্ফায় ফেরার পথ ধরলেন।

ফেরার পথে মঠের রাস্তায় একটু সংক্ষেপে পৌঁছনোর জন্য অন্য একটা পথ ধরলেন সুদীপ্তরা। রাস্তাটা চলার পক্ষে একটু সুবিধেজনকও বটে। তুষারের ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে উঁকি দিচ্ছে পাথর। পা হড়কে যাওয়ার ভয় নেই। সে পথে চলতে শুরু করে সুদীপ্ত কথা প্রসঙ্গে বলল, "রাই বলে লোকটা কিন্তু লামা রিম্পুচির উপর সত্যি খুব খাপ্পা। সুযোগ পেলেই তাঁকে গালাগালি করছেন।"

হেরম্যান বললেন, "তবে মিস্টার রাই কিন্তু সবসময় বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছেন যে, ওই অদ্ভুত প্রাণীটাকে তিনি দেখেছিলেন। ফিরে গিয়ে যথাসম্ভব ভালো ভাবে মঠটা

আমাদের দেখতে হবে। আর একটা কথা, বাইরের দিকেও নজর রাখা দরকার। পালা করে রাত জেগে জানলা দিয়ে বাইরেটা খেয়াল করব দু'জন। চত্বরে বা মঠে ওঠার পথ তো একটাই। কেউ মঠের বাইরে গেলে সেটা আমাদের নজর এড়াবে না।"

কথা বলতে-বলতে চলতে-চলতে হঠাৎ একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন হেরম্যান। মাটির দিকে তাকিয়ে তাঁর ভ্রূ কুঁচকে গেল। এক জায়গায় নরম তুষারের উপর জেগে আছে স্পষ্ট কয়েকটা পায়ের ছাপ। কোনো অতিমানবের পায়ের ছাপ নয়। বরফে হাঁটার জন্য স্পাইকওলা যে ধরনের জুতো পরা হয়, সে ধরনের ছাপ। আপাশে আরও বেশ কিছু ওই ধরনের ছাপও চোখে পড়ল। হেরম্যান মাটিতে ঝুঁকে পড়ে ছাপগুলো পরীক্ষা করে বললেন, "একজন নয়, দু'-তিনজন লোকের পায়ের ছাপ। পাথরে পা ফেলতে গিয়ে মাঝে-মাঝে তুষারে পা পড়ে ছাপগুলো তৈরি হয়েছে। উপর থেকে নীচে নেমেছে ছাপগুলো। সম্ভবত আমরা যেদিক থেকে এখন এলাম, সেদিকেই কোথাও গিয়েছে লোকগুলো।"

সুদীপ্ত বলল, "কিন্তু ছাপগুলো কাদের? আমরা দু'দল ছাড়া তৃতীয় কোনো দল কি আছে এখানে? হয়তো অন্য কোনো অভিযাত্রী দলের সদস্য? নাকি আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে মিস্টার রাইরা এদিকেও এসেছিলেন?"

হেরম্যান বললেন, "সেটা কাল জিজ্ঞেস করব ওঁদের। কিন্তু এটা তাদের পায়ের ছাপ নয়তো, লামা 'আমরা' বলতে যাদের বোঝাচ্ছেন?"

সুদীপ্তরা এর পর আবার চলতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল মঠে।

দরজা ঠেলে মঠের ভিতর পা রাখল সুদীপ্তরা। বাইরের আলো ঝলমল, মুক্ত বাতাসের পৃথিবীর বদলে আবার মঠের ভিতরেই সেই আধো-অন্ধকার রহস্যময়তা। ভারী বাতাসে প্রাচীন জিনিসপত্রের গন্ধ, ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে অদৃশ্য কারা যেন তাকিয়ে দেখছে সুদীপ্তদের।

প্রেয়াররুমের ভিতর থেকে জপযন্ত্রের ঘরঘর শব্দ আর অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ কানে আসছে। সুদীপ্ত উঁকি দিয়ে দেখল, মঠাধ্যক্ষ একই জায়গায় বসে আছেন। মঠের না দেখা ঘরগুলো দেখতে শুরু করল তারা। অধিকাংশ ঘরই ফাঁকা। ধুলো জমতে-জমতে দেওয়ালচিত্রগুলো সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, মাথার উপর ঝুলন্ত থাংকাগুলো পোকায় কেটে খসে পড়ছে। মঠটা এত উঁচুতে অবস্থিত না হলে নির্ঘাত বাদুড়ের আড্ডা হত এ ঘরগুলো! কয়েকটা ঘরে অবশ্য কিছু পাথরের তৈরি দুর্লভ মূর্তি আছে। বুদ্ধমূর্তি, তান্ত্রিক বৌদ্ধদের নানা অপদেবতার মূর্তি। শেষ একটা ঘর অন্যরকমের। স্টাফ করা

বেশ কিছু প্রাণীর দেহ রাখা আছে। পাহাড়ি ভল্লুক, তুষারচিতা, ভেড়া, হরিণ থেকে শুরু করে বেশ কযেক ধরনের পাখিও আছে সেখানে। তবে অবহেলায় জিনিসগুলো নষ্ট হতে বসেছে। ধুলো আর পোকা চামড়াগুলোকে নষ্ট করছে। সুদীপ্ত বলল, "প্রাণীগুলোকে মঠে স্টাফ করা হয়েছিল কেন? এ জায়গা তো মিউজিয়াম নয়?"

হেরম্যান বললেন, "এগুলো হয়তো একসময় স্টাফ করা হয়েছিল মঠে আগত মানুষদের সঙ্গে এই তুষাররাজ্যের প্রাণীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। আবার এমনও হতে পারে যে, তান্ত্রিক বৌদ্ধদের তন্ত্রসাধনার উপকরণ এই দেহগুলো। ঠিক যেমন ওই খুলিটা ব্যবহার করা হচ্ছে।

সুদীপ্তদের একসময় উপর-নীচের ঘরগুলো দেখা হয়ে গেল। সুদীপ্তর হঠাৎ মনে হল, লাইব্রেরি থেকে কয়েকটা বই নিজেদের ঘরে নিয়ে গেলে সময় কাটানো যাবে। বিশেষত তার মনে পড়ে গেল ক্রায়োনিক্স-ক্রায়োজেনিক্স বইটার কথা। ক্রায়োনিক্স শব্দের অর্থ জানে না সুদীপ্ত। বইটা নেওয়ার জন্য লাইব্রেরিতে ঢুকল দু'জনে। কিন্তু বইটা যেখানে নামিয়ে রেখে গিয়েছিল, সেখানে অন্য বইগুলো আছে, কিন্তু সে জায়গা বা আশপাশে কোথাও নেই সেই বইটা। বেশ একটু অবাকই হল সুদীপ্ত। বইটা গেল কোথায়? অগত্যা পদ্মসম্ভবের বইটা নিয়ে উপরে উঠে এল তারা।

হেরম্যান বললেন, "এখন খেয়ে ঘুমিয়ে নিতে হবে নইলে রাত জাগা যাবে না।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই বইটা নিয়ে হেরম্যানের পাশে শুয়ে পড়ল সে। বইটা পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল সুদীপ্ত। হেরম্যানের ডাকে ঘুম ভেঙে যখন সে উঠে বসল, তখন বাইরে অন্ধকার নেমে গিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, আর তারপরই ঘরে প্রবেশ করলেন লামা রিম্পুচি। তাঁর মুখের সেই অস্বাভাবিক রক্তজমাট ভাবটা এখন আর নেই। লোলচর্মের মুখমণ্ডল এখন ফ্যাকাসে। তাঁর হাতে ঘিয়ের প্রদীপ। সারাদিন উপাসনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে সুদীপ্তদের সঙ্গে কথা বলার সময় দিতে না পারায় প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিলেন তিনি। তারপর বললেন, "বাইরে কেমন ঘুরলেন?"

হেরম্যান বললেন, "সেই তুষারচিতাটাকে মারার জন্য শিকারিদের একটা দল এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হয়েছে এ পথে আসার সময়। ওঁদের সঙ্গেই কিছুটা সময় কাটালাম। চিতার পায়ের ছাপ খুঁজছিলেন ওঁরা।"

লামা বললেন, "ওঁরা যে এসেছেন, আমি জানি। তা রাই আমার সম্পর্কে কী বলল?"

সুদীপ্তরা একটু চমকে উঠে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

মঠাধ্যক্ষর ঠোঁটের কোণে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "থাক, আর বলতে হবে না, ও আপনাদের কী বলেছে আমি জানি। আমার সম্পর্কে সে ভালো কিছু বলেনি।"

অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা পালটানোর জন্য সুদীপ্ত বলল, "আচ্ছা, ওই তুষারচিতাটা মানুষকে আক্রমণ করছে কেন, বলুন তো?"

লামার উত্তরে এবার বেশ অবাক হয়ে গেলেন সুদীপ্তরা। তিনি বললেন, "তার কারণটা

রাই-ই ভালো জানে।”

এর পর একটু থেমে লামা বললেন, “আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। যদি এ মঠের কোনো ব্যাপার আপনাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়, তবে ব্যাপারটা নিজেদের মনের মধ্যেই রাখবেন। বাইরে কোথাও, ওই যারা এখানে এসেছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। এ মঠে আপনাদের আশ্রয়দানের বিনিময়ে মঠের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনাদের কাছ থেকে আশা করতে পারি?”

হেরম্যান বললেন, “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারেন। আপনি নিশ্চিত থাকুন। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?”

লামা রিম্পুচি বললেন, “ওই যেমন গতকাল রাতে এ ঘরের জানলা দিয়ে দেখলেন যে, আমি তুষারচিতাগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে আছি, সেরকম কোনো ব্যাপার।”

কথাটা শুনেই চমকে উঠে সুদীপ্ত আর হেরম্যান লামার চোখের দিকে তাকাল। তাঁর চোখের মণি দু'টো স্থির, নিষ্প্রাণ। লামা তো দৃষ্টিহীন, তা হলে তিনি সুদীপ্তদের জানলা দিয়ে দেখার ব্যাপারটা বুঝলেন কীভাবে? সুদীপ্ত পদ্মসম্ভবের বইটায় পড়ছিল যে, তান্ত্রিক-বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে নাকি অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন হন। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ নাকি আকাশে উড়ে বেড়াতে পারেন, কেউ ধ্যানস্থ অবস্থায় শূন্যে বিচরণ করতে পারেন, কেউ আবার নাকি বহু বছর ধরে মঠের নির্জন অন্ধকার উপাসনাকক্ষ থেকে বাইরে বেরোননি। কিন্তু সেই কক্ষে বসেই তিনি বলে দিতে পারেন, পাহাড়ে কোথায় কী ঘটে চলেছে। মঠাধ্যক্ষ লামা ডং রিম্পুচি কি তেমনই অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ?

লামা এর পর শুধু বললেন, “বাইরে অন্ধকার নেমে গিয়েছে। এ জায়গা আপনাদের অপরিচিত। বাইরে বেরলে কিন্তু বিপদ হতে পারে।” কথাগুলো বলে তিনি ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর ছায়াটা সিঁড়ির আড়ালে মিলিয়ে যাওয়ার পর হেরম্যান মন্তব্য করলেন, “অবিশ্বাস্য!”

সুদীপ্ত বলল, “আমরা যে এ মঠে আরও কোনো অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হতে পারি, লামার কথায় তার ইঙ্গিত আছে।”

হেরম্যান বললেন, “আমারও তাই মনে হয়। আর একটা ব্যাপার হল, উনি বললেন, চিতাটা কেন মানুষকে আক্রমণ করছে তা মিস্টার রাই ভালো জানেন! এ কথার অর্থ কী?”

সময় এগোতে লাগল, রাত গভীর হল এক সময়। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, “আপনি এখন শুয়ে পড়ুন। অর্ধেক রাত আমি জাগি, শেষ রাতটা আপনি জাগবেন।”

এ কথা বলে হেরম্যান জানলার কাছে গিয়ে পাল্লাটা একটু ফাঁক করে সেখানে দাঁড়ালেন। সুদীপ্ত বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে রইল, কিন্তু তারও ঘুম আসছে না। এক সময় সেও উঠে গিয়ে হেরম্যানের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে আকাশে বেশ বড় চাঁদ উঠেছে। তবে মেঘের আনাগোনাও আছে। মাঝে-মাঝে খণ্ড-খণ্ড মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদটাকে। কিছুক্ষণের জন্য বরফাচ্ছাদিত চত্বরটা ঢেকে যাচ্ছে নিছক কালো অন্ধকারে।

তখন মাঝরাত। সুদীপ্তরা প্রথম দেখতে পেল লামা ডংকে। তিনি ধীর পায়ে মঠ থেকে বেরিয়ে চত্বরের মাঝখানে চোর্তেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছু সময় কেটে গেল। সুদীপ্তর মনে হল, লামা যেন কোনো কিছুর প্রতীক্ষা করছেন। হঠাৎ একখণ্ড মেঘ এসে চাঁদটাকে ঢেকে দিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। কিন্তু মেঘ সরে যেতেই সুদীপ্তরা দেখতে পেল সেই অদ্ভুত পরিচিত দৃশ্য। একপাল তুষারচিন্তা মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন লামা রিম্পুচি। প্রাণীগুলো এতক্ষণ ছিল কোথায়? চোর্তেন স্তম্ভের আড়ালে?

প্রাণীগুলো খেলতে শুরু করল লামার সঙ্গে। সুদীপ্তরা দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য। একসময় হেরম্যান চাপা স্বরে বললেন, "ওই যে ওই দিকে দেখুন!"

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সুদীপ্ত দেখল উপরে ওঠার রাস্তা বেয়ে কখন যেন চত্বরে উঠে এসেছে একজন লোক। তার কাঁধে রাইফেল। যদিও এত দূর থেকে তার মুখ বোঝা যাচ্ছে না। সেই ভৌতিক অবয়বটা যেন থমকে দাঁড়িয়ে মঠের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর সে সম্ভবত খেয়াল করল চোর্তেনের সামনে লামা আর তুষারচিতাগুলোর উপস্থিতি। কাঁধের রাইফেল খুলে নিয়ে লোকটা এগোল চোর্তেনের দিকে। বাতাস মনে হয় তার উপস্থিতি জানিয়ে দিল প্রাণীগুলোকে। সঙ্গে-সঙ্গে আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়াল তারা। লামার হাবভাবে মনে হল, তিনিও যেন লোকটার উপস্থিতি টের পেলেন। লোকটা এবার থমকে দাঁড়িয়ে লামার উদ্দেশে কী যেন বলল। লামা সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণীগুলোকে সম্ভবত অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। চিতাগুলো দল বেঁধে অদৃশ্য হয়ে গেল চত্বরের অন্য প্রান্তে। লোকটা এবার লামার কাছে এসে একটু ঝুঁকে সম্ভবত তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। কয়েকটা কথা হল তাঁদের মধ্যে। তারপর লোকটা যে পথে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে গেল। লামা রিম্পুচিও ফিরে এসে মঠে ঢুকলেন। একটু পর থেকেই নীচের প্রার্থনাকক্ষ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসতে লাগল। জপযন্ত্র ঘোরানোর ঘরঘর ঝুনঝুন শব্দ। নিস্তব্ধ মঠে ওই সামান্য শব্দও ধরা দিতে লাগল সুদীপ্তদের কানে।

লোকটা কে হতে পারে? এত রাতে সে কোথা থেকে কেন লামার সঙ্গে দেখা করতে এল? ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না সুদীপ্তরা। হেরম্যান একসময় বললেন, "এসব ব্যাপার যাই হোক, একটা দিন কিন্তু কেটে গেল, যার সন্ধানে এসেছি, তার কিন্তু কোনো খোঁজ মিলল না। এখনও অন্ধকারেই আমরা আছি।"

বেশ চিন্তান্বিত দেখাল হেরম্যানকে।

সুদীপ্তরা তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত বাইরের পৃথিবী। সুদীপ্তর হঠাৎ নজর পড়ল চত্বরের শেষ প্রান্তে সেই দেওয়ালের গায়ের গুহামুখের দিকে। সে বলল, "লামা আমাদের ওই গুহায় ঢুকতে বারণ করলেন, অথচ কাল নিজেই ওই গুহায় ঢুকলেন। ওই গুহায় কোনো রহস্য লুকিয়ে নেই তো?"

হেরম্যান বললেন, "ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি। কিন্তু মুশকিল হল, লামার নির্দেশ অমান্য করে আমরা ওখানে ঢুকছি। তা তিনি বুঝতে পারলে এই মঠ থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারেন। তবে তেমন হলে ওখানে আমরা ঢুকব। কে বলতে

পারে ওই গুহাতেই হয়তো আছে সেই প্রাণী। গুহাটির উপর আমাদের নজর রাখতে হবে।”

হেরম্যান আরও কী কথা যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পাহাড় কাঁপিয়ে বাইরে কোথায় যেন একটা শব্দ হল, ‘গুম!’

তারপর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে সে শব্দ এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, ‘গুম, গুম, গুম, গুম . . .’

সুদীপ্ত বলল, “ও কীসের শব্দ? কোথাও পাথর ধসে পড়ল নাকি?”

হেরম্যান বললেন, “না, এটা সম্ভবত রাইফেলের শব্দ।”

“রাইফেলের শব্দ?”

হেরম্যান জবাব দিলেন, “তাই মনে হচ্ছে। এমন হতে পারে, চিতাটাকে দেখতে পেয়ে গুলি চালিয়েছেন মিস্টার রাই বা অন্য কেউ।”

সুদীপ্তদের এর পর কানে এল নীচে মঠের দরজা খোলার আওয়াজ। তারা দেখল, সম্ভবত শব্দটা শুনেই আবার বাইরে বেরলেন লামা ডং। কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন চত্বরে। তারপর বেশ দ্রুত হেঁটে চত্বরের শেষ প্রান্তে দেওয়ালের কাছে গিয়ে সেই গুহার ভিতর হারিয়ে গেলেন।

হেরম্যান মন্তব্য করলেন, “একটু আগে আমরা যেকথা বলছিলাম, হয়তো সেটাই ঠিক। মনে হচ্ছে সত্যিই কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে ওই গুহার মধ্যে।”

সুদীপ্তরা দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেই গুহার দিকে। লামা কিন্তু আর বাইরে বেরলেন না। হেরম্যান একসময় বললেন, “রাত শেষ হয়ে আসছে। চলুন, এবার শুয়ে পড়া যাক। কাল ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ করা যাবে।”

সুদীপ্তরা শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হেরম্যান বললেন, “আরে, আবার সেই শব্দটা শুরু হয়েছে না?”

সুদীপ্তও এবার যেন মনে হল, নীচ থেকে জপযন্ত্র ঘোরানোর ক্ষীণ স্পষ্ট শব্দ কানে আসছে! এটা কি তাদের মনের ভুল? লামা রিম্পুচি কি তবে ফিরে এলেন? কই সুদীপ্তরা তাঁকে ফিরে আসতে দেখল না তো?

সত্য উদ্ঘাটনের জন্য সুদীপ্তকে ঘরে বসিয়ে রেখে হেরম্যান ঘর ছেড়ে সন্তর্পণে নীচে নেমে গেলেন। আবার ফিরেও এলেন কিছু সময়ের মধ্যে। তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময়ের স্পষ্ট ছাপ। তিনি বললেন, “লামা রিম্পুচি মঠে ফিরে এসে প্রার্থনায় বসেছেন।”

শেষ রাতে জানলা বন্ধ করে সুদীপ্তরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠতে একটু দেরিই হয়ে গেল তাদের। প্রায় আটটা বাজল। হেরম্যান বললেন, "তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। বীরবাহাদুরদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। দেখি, যদি ওঁরা কাল রাতের ব্যাপারে কোনো আলোকপাত করতে পারেন। তবে বাইরে বেরোবার আগে মঠাধ্যক্ষ ডংয়ের সঙ্গেও একবার দেখা করে যাব।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দু'জন তৈরি হয় নীচে নেমে প্রার্থনাকক্ষের সামনে হাজির হল। লামা খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুদীপ্তরা ঘরে পা রাখতেই চমকে উঠে পিছন ফিরলেন। তাঁর মুখ-চোখ আজ যেন অস্বাভাবিক ফোলা-ফোলা লাগছে। সুদীপ্তরা কাছে যেতে একটু আশ্বস্ত হওয়ার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, "ও আপনারা! রাত জাগার ফলে ঘুম ভাঙতে দেরি হল বুঝি?"

সুদীপ্তরা অবাক হয়ে গেল তাঁর কথা শুনে। এই দৈবদৃষ্টিসম্পন্ন লামার কাছে ব্যাপারটা আর গোপন করে লাভ নেই বুঝতে পেরে হেরম্যান জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।"

জবাব দিলে একটু ইতস্তত করে তিনি বললেন, "আচ্ছা, কাল রাতে কী ঘটেছিল, বলুন তো? ওরকম প্রচণ্ড শব্দ! তারপর দেখলাম আপনি ওই গুহাটার দিকে ছুটে গেলেন?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বৃদ্ধ বললেন, "গুলি চলেছিল। আপনারা তো নিশ্চয়ই ওই দলটার কাছে যাচ্ছেন। রাই বলে লোকটাকে বলে দেবেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ অঞ্চল ছেড়ে ও যেন চলে যায়। নইলে সে আর ফিরবে না।"

"ফিরবে না মানে?" সুদীপ্ত তাকাল লামা রিম্পুচির মুখের দিকে। তাঁর চোয়াল যেন কঠিন হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই সুদীপ্ত একটা ব্যাপার খেয়াল করল, লামার নাকের নীচে রক্তবিন্দু টলটল করছে! সঙ্গে-সঙ্গে সুদীপ্ত বলল, "আপনার নাকে কী হল? চোট লাগল নাকি?"

সঙ্গে-সঙ্গে লামা হাতের চেটোর উলটো পিঠ দিয়ে নাকের রক্ত মুছে নিয়ে বললেন, "ও কিছু না, তবে আমি যে কথা বললাম, সেটা অবশ্যই জানিয়ে দেবেন মাইকে।" লামা এর পর আর কোনো কথা না বলে বুদ্ধমূর্তির সামনে চলে গেলেন।

মঠ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে হেরম্যান বললেন, "মিস্টার রাই যেমন লামা রিম্পুচির উপর খেপে আছেন, তিনিও তেমনই ওর উপর খাপ্পা। আমার ধারণা, এর পিছনে অন্য কোনো ব্যাপার আছে।"

সুদীপ্ত বলল, "একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করেছেন, ভোরবেলা ওঁকে যখনই দেখি,

তখনই ওঁর মুখ কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম ফোলা মনে হয়। যেন সব রক্ত মুখে গিয়ে জমেছে! পরে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় মুখমণ্ডল। আজ আবার নাকে রক্ত দেখলাম। এটা কি দীর্ঘক্ষণ ধরে এক জায়গায় বসে সাধনা করার ফল?"

হেরম্যান বললেন, "ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি। ব্যাপারটা আমারও বোধগম্য হচ্ছে না।"

হেরম্যান এরপর বললেন, "আমাদের হাতে হয়তো আর মাত্র আজ আর কালকের দিনটা আছে। যেভাবেই হোক, এ দু'টো দিন আমাদের কাজে লাগাতে হবে। মঠে ফিরে আবার আমরা ঘরগুলো ভালো করে দেখব।"

সুদীপ্ত হঠাৎ বলল, "একটা ব্যাপারে আমার একটু খটকা লাগছে। কাল ক্রায়োনিক্স-ক্রায়োজেনিক্স বইটা লাইব্রেরিতে রেখে এলাম। সেটা হঠাৎ উবে গেল কী করে? কোনো বিশেষ কারণে লামা সেটা সরিয়ে ফেলেননি তো? আবার বীরবাহাদুরের কাছেও একই বিষয়ের উপর বই। এটা কি কাকতালীয় ব্যাপার? ক্রয়োজেনিক্সের ব্যাপারে আপনার কিছু পড়াশোনা আছে?"

হেরম্যান বললেন, 'সাধারণ কিছু তথ্য জানা আছে। এই যেমন ক্রায়োজেনিক্স বা 'হিমবিজ্ঞান' হল পদার্থবিজ্ঞানের এক শাখা। গ্রিক শব্দ থেকে এই শব্দের সৃষ্টি। যার মানে হল 'জমে যাওয়া শীতে তৈরি'। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে মারাত্মক শীতল তাপমাত্রা তৈরি হয়। ন্যূনতম তাপমাত্রা হল ১৮০° সেন্টিগ্রেড। এ কাজে মূলত তরল নাইট্রোজেন ও হিলিয়াম ব্যবহার করা হয়। এ দু'টি তরল মারাত্মক ঠান্ডা। তরল নাইট্রোজেনে যদি একটা আঙুরকে চুবিয়ে রাখা যায়, তবে সেটা এত কঠিন হয়ে যাবে যে, একটা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে সেটা টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। ক্রায়োজেনিক্স ব্যাপারটা বর্তমানে পদার্থবিদ্যার সীমানা অতিক্রম করে কৃষিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। অতিনিম্ন তাপমাত্রায় শাকসবজি, ফলমূল, রক্ত-মজ্জা ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ব্যস, এব্যাপারে আমার জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই। তবে তোমার ওই ক্রায়োনিক্স শব্দটা আমি পড়েছিলাম, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না।"

সুদীপ্তরা কথা বলতে-বলতে নীচে নেমে পৌঁছে গেল বরফসেতুর কাছে। দূর থেকেই দেখতে পেল, এপারে সেতুর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন বীরবাহাদুর, রাই, আরও জনাপাঁচেক লোক। তার মধ্যে তিনজন লোক সম্পূর্ণ অচেনা। সুদীপ্তরা তাদের কাছে গিয়ে বুঝতে পারল, সেই অচেনা লোকগুলো কোনো পাহাড়ি উপজাতির লোক হবে। তাদের চেহারা অনেকটা তিব্বতিদের মতো। ছোটখাটো কিন্তু শক্তপোক্ত গড়ন, পায়ে হাইহিল কাঁটা লাগানো জুতো, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা ঘরে বানানো ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট। একজনের কাঁধে একটা গাদা বন্দুকও আছে।

তাদের কাছে পৌঁছে লোকগুলোকে দেখিয়ে হেরম্যান বললেন, "এরা?"

রাই দাঁত বের করে হেসে বললেন, "ওরা ওই পাহাড়ের ওপাশের উপত্যকায় থাকে। একবার ওখানে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করতে হয়েছিল, সে সময় ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ওরা এখানে পাহাড়ি ছাগল শিকার করতে আসে। কাল রাতে গুলির শব্দ পেয়ে

ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে বেরোয়। আমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল।”

সুদীপ্তর মনে পড়ে গেল গত কাল মঠে ফেরার পথে দেখা সেই পায়ের ছাপগুলোর কথা। সে ছাপগুলো তা হলে এই লোকগুলোরও হতে পারে।

হেরম্যান বললেন, “কিন্তু কাল গুলিটা চালাল কে?”

বীরবাহাদুর বললেন, “কাল রাতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। রাত তখন প্রায় তিনটে হবে। আমরা সবাই ঘুমোচ্ছিলাম। ছেত্রী নামের এই ফরেস্ট গার্ড শুধু তাঁবুর বাইরে পাহারায় ছিল। বরফ সেতুর উপর হঠাৎ সে দেখতে পায় চিতাবাঘটাকে। প্রাণীটা এদিক থেকে সেতু পেরিয়ে আমাদের তাঁবুর দিকে যাচ্ছিল। বাঘটা ওর রাইফেলের পাল্লার মধ্যে আসতেই গুলি চালায় ও। প্রাণীটা গুলি খেয়ে সেতুর উপর থেকে প্রায় একশো ফুট নীচে একটা তাকে পড়ে যায়। আমরা সবাই গুলির শব্দ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। কিন্তু এত রাতে নীচে নামা সম্ভব ছিল না। সকালবেলা আমরা নীচে নামলাম, কিন্তু সেই প্রাণীর দেহটা সেখানে নেই!”

সুদীপ্ত বলল, “প্রাণীটা গুলি খেয়ে ঠিক তাকে পড়েছিল তো?”

বীরবাহাদুরের পাশে দাঁড়ানো ছেত্রী নামের মাঝবয়সি ফরেস্ট গার্ড বলে উঠল, “হ্যাঁ, সাহেব, প্রাণীটা ঠিক নীচে পড়েছিল। রক্তের চিহ্নও সেখানেও আছে। সাহেবরা নীচে নেমে দেখেছেন।”

হেরম্যান বললেন, “এমন হতে পারে প্রাণীটার চোট তেমন কিছু মারাত্মক ছিল না। পড়ে যাওয়ার পর চোট সামলে উঠে প্রাণীটা পালিয়েছে।”

মিস্টার রাই এবার বললেন, “হ্যাঁ, ব্যাপারটা তেমন হতেই পারে, কিন্তু সম্ভবত তা নয়। কারণ . . .” একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল রাইয়ের মুখে?

“কী কারণ?” একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন সুদীপ্ত-হেরম্যান।

বীরবাহাদুর সম্ভবত কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রাই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “ব্যাপারটা ওঁদের মুখে না বলে চোখে দেখানোই ভালো। আবার সেতুর নীঁচে নামব আমরা।”

কৌতূহল নিয়ে তাঁদের পিছন-পিছন সেতুতে উঠল সুদীপ্তরা। সেতুর মাঝামাঝি জায়গা থেকে আরও কিছুটা এগিয়ে এক জায়গায় থামল সকালে। কিছুটা তফাতে একটা খাড়া পাথরের দেওয়াল থেকে আন্দাজ একশো ফুট নীচে একটা তাক বেরিয়ে আছে। রোপ টাঙানো হল সেতুতে পিট্টু অর্থাৎ লোহার পেরেক পুঁতে। দু'জন শেরপা প্রথমে দড়ি ধরে সেই তাকে নামল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেতু থেকে তাকে পৌঁছনোর জন্য তৈরি হয়ে গেল একটা ঝুলন্ত রাস্তা। পিঠে হুক আটকে বীরবাহাদুর, রাই, সুদীপ্ত, হেরম্যানকে একে-একে সেই তাকে নামিয়ে দিল শেরপারা। সকলে নীচে নামার পর রাই কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, “প্রাণীটা যে নীচে পড়েছিল, তার প্রমাণ ওই যে বরফে জমাট বাঁধা রক্ত। আর তার পাশে ওই যে . . .”

“ওই যে কী?”

ভালো করে সে জায়গায় তাকাতেই চমকে উঠল সুদীপ্তরা। রক্তের দাগের পাশেই

বরফের উপর আঁকা হয়ে আছে বেশ বড় কয়েকটা পায়ের ছাপ! সুদীপ্ত আর হেরম্যান তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল সেই ছাপগুলোর উপর। ছাপগুলো একটু পরীক্ষা করার পর সেগুলো যে ধোঁকা নয়, তা বুঝতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল হেরম্যানের মুখ। পকেট থেকে তিনি একটা মাপার ফিতে বের করলেন। সুদীপ্ত দেখতে পেল ফিতে দিয়ে ছাপ মাপার সময় উত্তেজনায় হেরম্যানের হাত কাঁপছে। ছাপ মেপে উঠে দাঁড়িয়ে হেরম্যান বললেন, "সাড়ে এগারো ইঞ্চি! কোনো জ্যান্ত মানুষের পায়ের ছাপ এত বড় হতে পারে না! আছে! সে অবশ্যই আছে!"

মিস্টার রাই বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, আমার ধারণা প্রাণীটা অবশ্যই আছে। আমার কথা সেদিন কেউ বিশ্বাস করেনি, সবাই ওই শয়তান লামাটার কথাই বিশ্বাস করল। এবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল তো? আমার ধারণা তুষারচিতাটাকে ওই দানব প্রাণীটাই তুলে নিয়ে গিয়েছে এবং সে ওই মঠেই গিয়েছে। বন্দুকের নলের সামনে দাঁড় করালে বুড়োটা সব সত্যি কথা বলবে। ও জানে, ওরা কোথায় আছে। এখনই ওই মঠে যাওয়া দরকার।"

বীরবাহাদুর তাঁর কথা শুনে মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন, "কিন্তু কোনো প্রমাণ ছাড়া শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে লামার কাছে কৈফিয়ত চাওয়া কি ঠিক হবে? তা ছাড়া মঠে তল্লাসি চালাবার জন্য সরকারি অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয়, সেটা আমার কাছে নেই। কাজটা বেআইনি হবে।"

মিস্টার রাই বললেন, "আরে, রাখো তোমার বেআইনি কাজ। যেখানে কোনো মানুষ থাকে না, সেখানে আবার আইন-বেআইন কী?"

সুদীপ্তর এবার সেই কথাটা মনে পড়ে গেল, যা লামা ডং রিম্পুচি বলতে বলেছেন মিস্টার রাইকে।

সুদীপ্ত এবার একটু ইতস্তত করে রাইকে বলল, "আপনাকে একটা কথা লামা জানাতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, আপনি এ অঞ্চল থেকে তাড়াতাড়ি না চলে গেলে আপনার বিপদ হবে।"

সুদীপ্তর কথা শোনা মাত্রই লাল হয়ে উঠল মিস্টার রাইয়ের মুখ। ক্রোধে ফেটে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে অট্টহাস্য করে উঠে বললেন, "বিপদ হবে! ওই হাড়গিলে লামাটারই বরং বিপদ আসছে, এখন তো দেখছি ওখানে আমাকে যেতেই হবে," এ কথা বলে তিনি বীরবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা না গেলে আমি একলাই যাব।"

মিস্টার রাই লামার উপর এমন খেপে আছেন যে, তাঁকে একা মঠে যেতে দিলে অপ্রীতিকর কোনো ব্যাপার ঘটতে পারে, এমন আঁচ করেই সম্ভবত বীরবাহাদুর বললেন, "ঠিক আছে, তবে লামার কাছে সকলে মিলে গিয়ে একবার কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।"

এসব কথাবার্তার মাঝেই হেরম্যানের চোখ ঘুরছিল চারপাশে। হঠাৎ তিনি তাকের গায়ের পাথুরে দেওয়ালের গা থেকে কী যেন একটা জিনিস তুলে নিয়ে হাতের চেটোয় রেখে বললেন, "যার পায়ের ছাপ রয়েছে, সেই প্রাণীটা সম্ভবত এই দেওয়াল বেয়েই

তাকে ওঠা-নামা করেছিল। বানর শ্রেণির প্রাণী ছাড়া অন্য কোনো চতুষ্পদ প্রাণীর এই খাড়া দেওয়াল বেয়ে ওঠা-নামা সম্ভব নয়। এই দেখুন, হেরম্যান তাঁর হাতের তালুটা মেলে ধরলেন। তাঁর তালুতে এক গোছা ঘন বাদামি লম্বা লোম!

মিস্টার রাই লোমগুলো হাতে নিয়ে একবার পরীক্ষা করে বললেন, "না, এটা তুষারচিতার লোম নয়, সম্ভবত সেই প্রাণীরই হবে, যাকে আমি দেখেছিলাম।"

হেরম্যান একটা কাগজে লোমগুলোকে সযত্নে মুড়ে নিজের পকেটে রাখলেন।

সুদীপ্তরা একে-একে এরপর আবার দড়ি বেয়ে সেতুর উপরে উঠে এলেন। তারপর সকলে মিলে রওনা হলেন মিগু গুম্ফার দিকে। বীরবাহাদুর আর রাইরা আগে-আগে চলেছেন। কিছুটা তফাতে সুদীপ্ত আর হেরম্যান। চলতে-চলতে হেরম্যান চাপা স্বরে সুদীপ্তকে বললেন, "দেখুন, লামা আমাদের মঠে আশ্রয় দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে উনি কোনো অভব্য আচরণ করেননি। তিনি বৃদ্ধ মানুষ। রাইয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত মনোমালিন্য থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে নেই। বুড়ো লোকটার সঙ্গে এত লোক মিলে যদি কোনো খারাপ আচরণ করেন, সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের লামার পাশেই দাঁড়ানো উচিত। আপনি কী বলেন?"

সুদীপ্ত বলল, "হ্যাঁ, আমার মতও তাই। তবে আমার মনে হয়, লামা রিম্পুচি ও মিস্টার রাইয়ের মধ্যে গণ্ডগোলটা নিছকই প্রাণীটার উপস্থিতি লামা অস্বীকার করেছেন বলে নয়, এর পিছনে অন্য কোনো কারণ আছে।"

হেরম্যান বললেন, "হতে পারে, তবে কোনো পক্ষেরই কোনো বেআইনি কাজে আমরা সামিল হব না।"

আকাশে আবার একটা ঘোলাটে ভাব দেখা দিয়েছে। তুষারপাতের পূর্বাভাস। চলতে-চলতে হেরম্যান বললেন, "তবে একটা ব্যাপার, প্রাণীটার উপস্থিতির ব্যাপারে রাই সম্ভবত যে মিথ্যা বলেননি, তার প্রমাণ কিন্তু আমরা একটু আগে নিজের চোখেই দেখলাম।"

সুদীপ্তরা একসময় মঠে পৌঁছে গেলেন। ঝিরিঝিরি তুষারপাতও শুরু হল ঠিক সেই সময়। মিস্টার রাই সুদীপ্তদের বললেন, "আপনারা বুড়োটাকে ডাকুন।" সুদীপ্ত বেশ ক'বার ঘা দিল দরজায়, কিন্তু কোনো সাড়া নেই। হেরম্যান এর পর বেশ কয়েকবার হাঁক দিলেন। তবুও কোনো জবাব মিলল না।

মিস্টার রাই এবার ব্যঙ্গোক্তি করে বললেন, "আমাকে তাড়ানোর আগে বুড়োটা নিজেই ভয়ে পালিয়ে গেল নাকি? ঠিক আছে, এখানে অপেক্ষা করি। দরজা কখন খোলে দেখি, ওর সঙ্গে আমি একটা শেষ বোঝাপড়া করব।"

চত্বরটায় ঘুরে বেড়াতে লাগল সকলে। হঠাৎ মিস্টার রাইয়ের নজর গেল গুহাটার দিকে। কৌতূহলবশত তিনি এগিয়ে গেলেন গুহার দিকে, তারপর বলে উঠলেন, "আরে, এর ভিতর তো মানুষ যাওয়া-আসা করে। পায়ের ছাপ রয়েছে, খালি পায়ের ছাপ। সম্ভবত বুড়ো লামাটারই ছাপ!"

সুদীপ্তও এগিয়ে গেল গুহামুখের কাছে। রাই হেরম্যানকে বললেন, "আপনারা এ

গুহাটায় লামাকে ঢুকতে দেখেছেন?"

হেরম্যান কোনো জবাব দিলেন না। তাঁকে নিশ্চুপ দেখে রাই বললেন, "বুঝেছি, এ গুহাটার ভিতর কী আছে, একবার ঢুকে দেখতে হবে।" এই বলে কাঁধ থেকে রাইফেল খুলে নিয়ে রাই গুহার ভিতর পা রাখতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় সেই পাহাড়ি উপজাতি লোকগুলোর একজন তাঁকে বলল, "মালিক, এ গুহার কথা আমি শুনেছি। এর নাম 'মিগু গুহা'। গুম্ফার নামও এ গুহা থেকেই হয়েছে। এ গুহায় ঢুকলে কেউ নাকি ফেরে না। ভিতরে আপনার চট করে ঢোকা ঠিক হবে না, তার বদলে . . ." এই বলে সে ইশারা করল কিছু দূরে বীরবাহাদুর আর তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা আর দু'জন লোকের দিকে। রাই হাঁক দিলেন তাঁদের। বীরবাহাদুর তাঁদের নিয়ে গুহার কাছে এলেন। হেরম্যানও উপস্থিত হলেন সেখানে। রাই বললেন, "এ গুহার ভিতরে লোকের আনাগোনা আছে। ভিতরে কী আছে দেখতে হবে। কে যাবে ভিতরে?"

যে লোকটা গত রাতে চিতাটাকে গুলি চালিয়েছিল, সে লোকটা সম্ভবত একটু ডাকাবুকো ধরনের। সে এগিয়ে এসে বলল, "আমি যাব।"

তুষারপাত আরও জোরে শুরু হয়েছে, তার সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা বাতাস। বীরবাহাদুর বললেন, "যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। যা অবস্থা তাতে সেতু পেরিয়ে এরপর আর ফেরা যাবে না।"

লোকটার কোমরে দড়ি বাঁধা হল। কারণ, এসব গুহায় অনেক সময় গর্ত থাকে। তাতে পড়ে গেলে যাতে টেনে তোলা যায় তাই এই ব্যবস্থা। এক হাতে টর্চ আর অন্য হাতে রাইফেল নিয়ে গুহার ভিতর ঢুকল লোকটা। একজন লোক শক্ত নাইলনের দড়ি ধরে বাইরে দাঁড়াল। সুদীপ্তরাও সকলে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আকাশ থেকে তুলোর মতো নেমে আসা তুষারে ধীরে-ধীরে ঢেকে যাচ্ছে সকলের সর্বাঙ্গ। লোকটা ভিতরে এক পা, এক পা করে এগোচ্ছে। সরসর শব্দে সরে যাচ্ছে বাইরের লোকটার হাতে ধরা নাইলনের দড়িটা। পঞ্চাশ ফুট মতো দড়ি সরে যাওয়ার পর রাই বাইরে থেকে একবার হাঁক দিলেন লোকটারা উদ্দেশে, "সব ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে," লোকটার কণ্ঠস্বর এল গুহার ভিতর থেকে।

খুব ধীরে দড়ি সরছে। লোকটা এগোতে-এগোতে মাঝে-মাঝে মনে হয় থামছে। বাইরে দাঁড়িয়ে সুদীপ্তরা। হেরম্যান একসময় মন্তব্য করলেন, "এসব গুহা অনেক সময় কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হয়।"

বীরবাহাদুর তাঁর কথা শুনে কী যেন একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা ক্ষীণ আর্তনাদের শব্দ যেন ভেসে এল গুহার অন্ধকার থেকে। দড়িটা হাত থেকে এক ঝটকায় ফুটখানেক এগিয়েই থেমে গেল। কী হল? লোকটার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন অন্যরা। কিন্তু কোনো সাড়া মিলল না, দড়িটাও আর সরছে না!

বীরবাহাদুর বলে উঠলেন, "দড়িতে টান দাও। নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে।"

গুহার কিছুটা ভিতরে ঢুকে দু'জন লোক টান দিতে শুরু করল দড়িটা। কিছুটা টানের জোরে, কিছুটা নিজের চেষ্টায় হামাগুড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এল লোকটা। তার

হাতের টর্চ, রাইফেল, কোথায় যেন খসে পড়েছে। গুহার বাইরে এসে লোকটা একবার উঠে দাঁড়াল। যেন অসহ্য আতঙ্কে আর বিস্ময়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার চোখ! দেহের সব রক্ত এসে জমাট বেঁধেছে মুখে। দমবন্ধ হয়ে আসছে তার। পৃথিবীর এক মুঠো বাতাস নেবার জন্য সে একবার মুখটা হাঁ করল, তারপর কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গিয়ে খাবি খেতে লাগল! বীরবাহাদুর সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "ওকে এখনই তাঁবুতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাঁবুতে অক্সিজেন সিলিন্ডার আছে, অক্সিজেন দিতে হবে। নইলে লোকটা বাঁচবে না।"

রাই যেন কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বীরবাহাদুর এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "এখন আর কোনো কথা নয়, তাড়াতাড়ি লোকটাকে তোলো।"

এ কথা বলে তিনি হেরম্যানকে বললেন, "আপনারা এখন কী করবেন?"

সুদীপ্তরা কী করবে বুঝে উঠতে পারছেন না। তাদের তাঁবু, জিনিসপত্র সব মঠের ভিতর। দু'জন শেরপা ইতিমধ্যে ধরাধরি করে উঠিয়ে নিয়েছে সংজ্ঞাহীন শিকারিকে। তাঁদের কোলে শোওয়া লোকটার হাত দু'টো দেহের দু'পাশে ঝুলছে। হঠাৎ তার ঝুলন্ত ডান হাতের মুঠো খুলে গেল। আর তার হাতের মুঠো থেকে বরফের উপর খসে পড়ল কী একটা, সুদীপ্ত কুড়িয়ে নিল সেটা। এক গোছা ঘন বাদামি লোম!
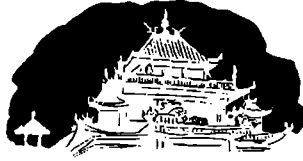
দলটা রওনা হয়ে গেল। সুদীপ্তরা তখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার হাত থেকে খসে পড়া লোমের ব্যাপারটা সম্ভবত খেয়াল করেননি অন্যরা বা খেয়াল করলেও পরিস্থিতির বিচারে তেমন গুরুত্ব দেননি। হেরম্যান পকেট থেকে কাগজের মোড়কটা বের করে তার ভিতরের লোমগুলোর সঙ্গে সদ্য পাওয়া লোমগুলোকে মিলিয়ে দেখে বললেন, "একই লোম। প্রাণীটা কি তা হলে এই গুহায়ই থাকে? আর এ ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তবে লামা নিশ্চিত ভাবেই ব্যাপারটা জানেন।"

সুদীপ্ত বলল, "সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন কী করবেন বলুন? লামা কি মঠ ছেড়ে চলে গেলেন? তা হলে তো এখানে থাকলে সারা রাত আমাদের বাইরেই কাটাতে হবে।"

সুদীপ্ত আর হেরম্যান চোর্তেনের নীচে আশ্রয় নিয়ে কী করবে আলোচনা করতে লাগলেন।

তুষারপাত এক সময় কমে এল, আকাশের ঘোলাটে ভাবটা কেটে গিয়ে পাহাড়েরআড়াল থেকে উঁকি মারতে লাগল সূর্য। পাহাড়ের আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা ভার! তবে তুষারপাত বন্ধ হয়ে সূর্য মুখ দেখাতেই কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন দু'জনেই। হেরম্যান বললেন, "চলুন, একটা কাজ করা যাক। আমরা এখন বীরবাহাদুরদের তাঁবুতে

যাই। দেখি যদি যে লোকটা গুহায় ঢুকেছিল, সে যদি জ্ঞান ফিরে কিছু বলতে পারে! তারপর আমরা আবার এখানে ফিরে আসব, অথবা পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।"

সুদীপ্তরা রওনা হল বীরবাহাদুরদের তাঁবুর দিকে। তুষারপাত বন্ধ হলেও কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইছে তখনও। সদ্য পড়া তুষারে সুদীপ্তদের কাঁটা লাগানো জুতোর গোড়ালি পর্যন্ত বসে যাচ্ছে। ধীর গতিতে হাঁটতে হচ্ছে তাদের। বেশ ধীর গতিতে চলতে-চলতে একসময় বরফ সেতুর প্রায় কাছাকাছি চলে এল তারা। একটা বাঁক, তারপরই সেতুতে ওঠার রাস্তা। হঠাৎ বাঁকের মুখে অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ শুনতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। সুদীপ্ত উঁকি দিয়ে দেখল, তাদের কয়েক হাত তফাতেই বাঁকের ওপাশে পাথরের চাতালের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলছেন রাই আর বীরবাহাদুর। রাই বেশ উত্তেজিত ভাবে বীরবাহাদুরকে বলছেন, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? চিতাটাকে আমরা না মেরেই চলে যাব। ওটাকে মারতে পারলে সরকার থেকে পুরো দু'লাখ টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। আমার এখন খুব টাকার প্রয়োজন।"

বীরবাহাদুর বললেন, "আমার ধারণা চিতাটা মারা গিয়েছে।"

রাই বেশ জোর গলায় বললেন, "বলছি তো চিতাটা মরেনি। গুলিতে সামান্য চোট খেয়েছে মাত্র। তারপর প্রাণীটা ওকে নিরাপদ জায়গায় তুলে নিয়ে যায়। বলছি তো একটু আগে আমরা যে প্রাণীটার চিৎকার শুনলাম, সেটা ওরই গর্জন। প্রাণীটা খেপে গিয়েছে, ও আবার হানা দেবে।"

বীরবাহাদুর বললেন, "সে যাই হোক, প্রাণীটা বেঁচে থাক বা মরে যাক। কাল ভোরেই আমি ফিরে যাব এখান থেকে। দরকার হলে ক'দিন পর আবার আসব।"

রাই বললেন, "চলে যাব? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তা হলে বরং তোমার থেকে ধার বাবদ যে তিন লাখ টাক পাই, সেটা নীচে নেমেই আমাকে ফেরত দিও।"

বীরবাহাদুর কথাটা শুনে একটু নরম ভাবে বললেন, "টাকাটা আমার কাছে থাকলে নিশ্চয়ই ফেরত দিতাম। আর ক'টা দিন সবুর করো, পেয়ে যাবে।"

রাই বললেন, "সবুর করতে-করতে তো তিন বছর কেটে গেল। চিতাটা মারতে পারলেও তো কিছু সুবিধে হত। বাজারে আমারও অনেক ধার। আমাকেও সেগুলো শোধ দিতে হবে। তোমার অবস্থা খারাপ দেখে আমি তোমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলাম। এখন আমার খারাপ অবস্থা।"

হেরম্যান আর সুদীপ্ত শুনতে লাগল তাঁদের কথোপকথন।

বীরবাহাদুর জবাবে বললেন, "তোমার পাশেও তো আমি থাকার চেষ্টা করছি। তোমার সম্বন্ধে বাজারে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেদের মধ্যে নানারকম কানাঘুষো শোনা যায়। তবুও আমি উপরওলাদের বোঝালাম যে, বাঘটাকে মারতে হলে বা ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো প্রাণীকে কোনো কারণে মারতে হলে তোমার মতো দক্ষ শিকারিই দরকার। তোমার চাকরির তো একটা ব্যবস্থা হল।"

রাই তাঁর কাঁধের বন্দুকটা হাতে নিয়ে নাচাতে-নাচাতে বললেন, "এই অস্থায়ী চাকরিতে আর ক' পয়সা পাব? চিতাটাকে না মারতে পারলে কোনো লাভ নেই।'

বীরবাহাদুর তাঁকে যেন আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, "চিতওয়ানে একটা হাতি খেপে গিয়েছে। তিনজন মানুষকে মেরেছে হাতিটা। গভর্নমেন্ট হাতিটাকে 'রোগ' ডিক্লেয়ার করতে চলেছে। ওকে মারার জন্যও এর মধ্যেই একজন শিকারির দরকার হবে। আমি উপরওলাদের বলে তোমাকে কাজটা দেবার চেষ্টা করব। বেশ টাকা পাবে।"

রাই ব্যঙ্গোক্তি করে বললেন, "হাতিটাকে মারার দরকার কী আছে? ওকে বরং তোমার চিতওয়ানের বাড়িতে ঘুম পাড়িয়ে রাখো। তোমার বাড়ির বাঁদর, কুকুর আর খরগোশগুলোর মতো ওদেরও আর ঘুম ভাঙবে না। হাতি মারার টাকাটা তুমিই পেয়ে যাবে।"

রাইয়ের এ কথাগুলোর অর্থ অবশ্য বুঝতে পারল না সুদীপ্ত বা হেরম্যান।

রাই-এর পর বেশ কর্কশ ভাবে বললেন, "ওসব হাতির গল্প ছাড়ো! হয় নীচে নেমে টাকা ফেরত দাও, আর নয় চিতাটাকে না মারা পর্যন্ত এখানেই থাকব। তোমাকে টাকাটা দেওয়া তখনই আমার ভুল হয়েছে। তোমার ওই ঠান্ডা ঘরে আমার টাকা আর ফেলে রাখতে পারব না। যত সব হাবিজাবি কাজের পিছনে টাকা নষ্ট করলে তুমি!"

বীরবাহাদুর তাঁর কথা শুনে বললেন, "যে ব্যাপারে তুমি বোঝো না, সে ব্যাপার কথা বোলো না। টাকাটা আমি তোমার মতো কাঠমাণ্ডুতে জুয়া বা বাজে নেশায় নষ্ট করিনি, বিজ্ঞানসাধনার কাজে লাগিয়েছি। যে সাধনার কাছে টাকা-পয়সা তুচ্ছ। এর জন্য অনেক পড়াশোনা করতে হয়। জানো, আমার প্রপিতামহ দুর্গাবাহাদুর ঘর ছাড়ার আগে রানার দেওয়া হিরেটা আমার ঠাকুরদার হাতে দিয়ে কি বলেছিলেন? বলেছিলেন, 'হিরের চেয়ে পুঁথিপত্তর দামি জিনিস। তাই তোদের কম দামি জিনিসটা দিয়ে আমি বেশি দামি এই পুঁথিটা নিয়ে গেলাম।' পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে আমার বাবা সেই হিরে বিক্রি করেন পাঁচ লাখ টাকায়। কিন্তু দুর্গাবাহাদুরের কাছে তা ছিল মূল্যহীন। তাঁর রক্তই তো বইছে আমার ধমনীতে।"

রাই আবার ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলেন, "তা তোমার ঠাকুরদা হিরের বদলে পুঁথিটাই রাখতে পারতেন, যখন সেটা অত দামি ছিল!"

বীরবাহাদুর বললেন, "আমি হলে হয়তো সেটাই করতাম। কিন্তু আমার ঠাকুরদা ছিলেন বৈষয়িক মানুষ, তাঁর কাছে হিরেটাই দামি ছিল। তবে পুঁথির ক'টা পাতা আমাদের বাড়িতেই রয়ে গিয়েছিল। আমার বাবা তখন খুব ছোট। আমার পিতামহ আর প্রপিতামহের কথা শুনে শিশুসুলভ ভাবনায় তাঁর মনে হয়, হিরের চেয়ে পুঁথিগুলো যখন দামি, তখন ক'টা পাতা সরিয়ে রাখা যাক। তাই প্রপিতামহের অগোচরে ক'টা পাতা সরিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। পরে অবশ্য তিনি ওই ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করতেন। কিন্তু ওই পাতাগুলোই . . ." কী একটা বলতে গিয়েও যেন থেমে গেলেন বীরবাহাদুর।

রাই শুনে বললেন, "এসব শুনতে আর ভালো লাগছে না। আচ্ছা, তোমার কাছে আমার একটা ব্যাপার জানার আছে। কাল রাতে তুমি কোথায় বেরিয়েছিলে বলো তো? অন্যরা খেয়াল না করলেও আমি বরফসেতুর উপর তোমার পায়ের ছাপ দেখেছি। যে

ছাপ অনুসরণ করেই চিতাটা ওপাশে যাচ্ছিল।"

বীরবাহাদুর এবার যেন একটু থতমত খেয়ে বললেন, "হ্যাঁ, বেরিয়েছিলাম। রাতে ঘুম আসছে না দেখে একটু বাইরে বেরিয়েছিলাম।"

বীরবাহাদুরের জবাব শুনে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল রাইয়ের মুখে। যে হাসি বুঝিয়ে দিল, তাঁর কথা মোটেই বিশ্বাস করছেন না রাই।

বীরবাহাদুর এরপর বললেন, "আমরা অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এবার চলো। অন্যরা এতক্ষণে তাঁবুতে পৌঁছে গিয়েছে। তবে আমি কিন্তু সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছি না। কাল ভোরে এ তল্লাট ছেড়ে চলে যাব আমরা। এটাই শেষ কথা। তবে তোমার হাতে আজ রাতটা তো রইল। দ্যাখো, প্রাণীটাকে মারতে পার কিনা?"

রাই একথা শুনে বললেন, "তা হলে চিতাটার জন্য টোপের ব্যবস্থা করতে হবে।"

বীরবাহাদুর বললেন, "সে যা ব্যবস্থা করার কারো।" এই বলে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন বরফসেতুর দিকে।

সুদীপ্ত দেখতে পেল, রাইয়ের মুখে এবার কেমন যেন দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল। কী একটা ভেবে নিয়ে নিঃশব্দে হেসে তিনি বীরবাহাদুরকে অনুসরণ করলেন। সুদীপ্ত রাই আর বীরবাহাদুরের মধ্যে কথাবার্তা তর্জমা করে দিল হেরম্যানকে। সুদীপ্তরা তাঁদের কথাবার্তা এতক্ষণ ধরে শুনছিল। তারা এবার বাইরে বেরিয়ে এলেন। রাই আর বীরবাহাদুর তখন সেতু পেরোচ্ছেন। সুদীপ্তরাও এগোল সেতুর দিকে। যেতে-যেতে হেরম্যান বললেন, "রাই আর বীরবাহাদুরের কথাগুলোর মধ্যে অন্য একটা ব্যাপারেরও ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে," শুধু একথাটা বলে লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন হেরম্যান।

সুদীপ্তরা যখন সেতু পেরিয়ে তাঁবুর কাছে ফিরল, তখন একটা তাঁবুর সামনে সেই লোকটাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সকলে। মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে লোকটাকে। অক্সিজেন মাস্ক পরানো আছে তার মুখে। মাঝে-মাঝে চোখ খুলছে লোকটা। আর মাস্ক পরানো অবস্থাতেই বিস্ফারিত চোখে একটা অদ্ভুত শব্দ করছে, "গ্যা-গ্যা-গ্যা-গ্যা . . ."

শেরপাদের মধ্যেও একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছে। আতঙ্কের স্পষ্ট ভাব ফুটে উঠেছে তাদের মুখে। সুদীপ্তরা সেখানে দাঁড়ানোর পর বীরবাহাদুর বললেন, "শেরপারা আর কিছুতেই এখানে থাকতে চাইছে না। এ লোকটার অবস্থা দেখে ওরা আতঙ্কিত। সকালবেলা ওই বিরাট পায়ের ছাপ দেখে ওদের মধ্যে এমনি একটু অস্বস্তি হয়েছিল। এখন ওদের ধারণা হয়েছে, ওই গুহাটা নাকি এই তুষারদেশের রাজার গুহা। রাজার গুহায় অনধিকার প্রবেশের শাস্তি পাচ্ছে এ লোকটা। আজ রাতে এখানে থাকলে নাকি তাদের ক্ষতি হবে। সূর্য ডুবতে আরও ঘণ্টাচারেক বাকি আছে। তার মধ্যেই ওরা নীচে নেমে যাবে, বলছে। নীচে মানে, হাজার দুই ফুট নীচে যে ছোট উপত্যকা আছে সেখানে।"

একথাগুলো বলে তিনি রাইকে বললেন, "তোমার কী মত?"

রাই বেশ অসন্তুষ্ট ভাবে বললেন, "তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছিলে যে, আজ

রাত পর্যন্ত চিতাটা মারার সুযোগ দেবে। সেই পাহাড়ি লোক দু'টোকে আমি পাঠিয়েছি চিতাটার খোঁজ কোথাও পাওয়া যায় কিনা তা অনুসন্ধান করতে। আজ রাতটা অন্তত এখানে থাকতেই হবে।"

ঠিক এই সময়ে শেরপাদের যে দলপতি, সে রাইয়ের কথা শুনে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, "আপনাদের এখানে থাকতে ইচ্ছে হয় থাকুন সাহেব। আমরা থাকব না। রাজা রেগে গিয়েছেন। এ লোকের কী অবস্থা হল দেখতেই পাচ্ছেন। ও চিতাটা রাজার পোষা। ওকে গুলি করা ঠিক হয়নি। রাজা যদি সশরীরে তাঁবুতে এসে উপস্থিত হন, তবে আপনাদের রাইফেল তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাঁর পায়ের ছাপ যখন দেখা গিয়েছে, তখন তিনি কাছেই আছেন।"

বীরবাহাদুর বললেন, "তা হলে একটা কাজ করা যাক রাই। একটা তাঁবু রেখে যাচ্ছি, তুমি বরং রাতটা এখানেই কাটাও। আমি এদের নিয়ে নীচে যাচ্ছি। কাল সকালে তুমি নীচে গেলে তারপর ফেরার পথ ধরব আমরা।"

রাই কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। এ প্রস্তাবে আমার আপত্তি নেই।"

বীরবাহাদুর এর পর সুদীপ্তদের জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কী করবেন?"

হেরম্যান বললেন, "আমরা থাকব। আমাদের সব জিনিসপত্র তো মঠে পড়ে আছে।"

বীরবাহাদুর বললেন, "রাই আর তার দু'জন লোক তো রইলই, আপনারাও রইলেন। ভালোই হল, কোনো অসুবিধে হলে একপক্ষ অপর পক্ষকে সাহায্য করতে পারবেন।"

বীরবাহাদুর এবার তাঁবু গোটানোর তোড়জোড় শুরু করলেন। রাই বললেন, "আমিও তাঁবুটা তুলে নিয়ে সেতুর ওপাশে যাব। চিতাটা তো ও পাশেই আছে," তিনিও লেগে গেলেন তাঁবু গোটানোর কাজে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরবাহাদুর তৈরি হয়ে গেলেন। বিদায় নেওয়ার জন্য তিনি করমর্দনের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "চলি তা হলে, আবার হয়তো কাল অথবা বেস্‌ক্যাম্পে দেখা হবে।"

হেরম্যান তাঁর হাত ধরে বললেন, "আপনি যাওয়ার আগে আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। সেতুর নীচে সেই তাকটাতে আমরা যার পায়ের ছাপ দেখলাম, দেওয়ালের গায়ে যার লোম পেলাম, সে সম্বন্ধে আপনাদের মতামত কী? এ ব্যাপারটা তো মনে ঝড় তোলার মতো ব্যাপার! যার খোঁজে হিলারি-নোরগের মতো বিখ্যাত মানুষরাও একদিন হিমালয়ে এসেছিলেন, তার উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েও আপনি বা মিস্টার রাই এত নিস্পৃহ কেন? অন্য কেউ হলে তো ওই চিতার ব্যাপার ছেড়ে ওই বিশেষ প্রাণীটার ব্যাপারেই অনুসন্ধান চালাত। অথচ আপনি সব কিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?"

অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল বীরবাহাদুরের মুখে। রাই কিছু দূরে তাঁবুর দড়িদড়া গুটোচ্ছেন, সেদিকে আড়াচোখে তাকিয়ে তিনি চাপা স্বরে বললেন, "কপ্টার থেকে রাই যা দেখেছিল, তা সত্যি হলেও আসলে সেটা সত্যি নয়, রাই সেটা নিজেও

জানে। তাই ও নিজেও নিস্পৃহ আর আমিও। আজকের ওই ছাপ বা লোমের ব্যাপারটাও সাজানো আসলে . . .” কী একটা বলতে গিয়েও যেন থেমে গেলেন তিনি। আর কোনো কথা না বলে হেরম্যানের হাত ছাড়িয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন।

সুদীপ্তরাও ফেরার পথ ধরল। চলতে-চলতে হেরম্যান বললেন, “বীরবাহাদুর পুরো ব্যাপারটা খোলসা করলেন না। ব্যাপারটা যদি সাজানো হয়, তবে কে কেন সাজালেন? রাই, বীরবাহাদুর নাকি . . .”

তবে বীরবাহাদুরের কথাটা শোনার পর হেরম্যান যে স্পষ্ট বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন, তা তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারল সুদীপ্ত। কত দূর দেশ থেকে তিনি প্রাণীটার খোঁজে ছুটে এসেছেন, আর শেষ পর্যন্ত যদি সেটাই মিথ্যে হয়ে যায় তবে বিমর্ষ তো হওয়ারই কথা! সূর্য ডুবতে চলেছে। পাহাড়ের আড়াল থেকে বিকেলের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বরফস্নাত প্রান্তরে। অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ চারপাশে। হেরম্যান শুধু একবার বললেন, “ওঁরা যাই বলুন, ফিরে গিয়ে লামাকে যদি পাওয়া যায়, তবে তাঁকে একবার সোজাসুজি জিজ্ঞেস করব বরফের রাজার ব্যাপারে।”

আর কোনো কথা না বলে মঠের উদ্দেশে হাঁটতে লাগল দু’জন।

মঠ চত্বরে পা রেখেই সুদীপ্তরা দেখতে পেল লামা ডং রিম্পুচিকে। এমন ভাবে তিনি মঠের সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন যে, সুদীপ্তদের তাঁকে দেখে মনে হল, তিনি যেন তাঁদের প্রতীক্ষাতেই আছেন।

দৃষ্টিহীন মানুষদের অন্য ইন্দ্রিয়গুলো নাকি প্রখর হয়। সুদীপ্তরা তাঁর কাছাকাছি পৌঁছতেই তুষারে তাঁদের অস্পষ্ট পায়ের শব্দ সম্ভবত টের পেলেন তিনি। তাঁদের উদ্দেশে লামা বললেন, “সারাটা দিন কোথায় কাটালেন?”

সুদীপ্ত প্রথমে জবাব দিল, “আমরা তো আপনাকে খুঁজতে এসেছিলাম। অনেক ডাকাডাকির পরও দরজা বন্ধ রইল। তারপর . . .” তারপর সারা দিনের সব ঘটনা সুদীপ্ত মোটামুটি ভাবে জানিয়ে দিল তাঁকে।

লামা মনোযোগ দিয়ে সুদীপ্তর কথা শুনলেন, তারপর বললেন, “ভিতরে আসুন।”

তাঁর পিছন-পিছন মঠের ভিতর পা রাখল সুদীপ্তরা। লামা তাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন প্রার্থনাকক্ষে। একটা প্রদীপ জ্বলছে বুদ্ধমূর্তির সামনে। তার আলোয় বেদির সামনের কিছুটা অংশ আলোকিত। বাকি ঘরটা গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা।

লামা গিয়ে দাঁড়ালেন বেদির নীচে রাখা সেই লম্বা কাঠের বাক্সর সামনে। বাক্সের উপর রাজার মাথাটা রাখা। প্রদীপের আলোর একটা রেখা এসে পড়েছে মাথাটার মুখে। আলো-আঁধারিতে বীভৎস দেখতে লাগছে সেই মাথা। অজানা কোনো পথিক যদি মঠের

এ ঘরে ঢুকে এই মুহূর্তে হঠাৎ মাথাটা দ্যাখে, তবে নির্ঘাত সে ভিরমি খাবে!

কাঠের বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর শীর্ণ হাত দু'টো বুকের উপর রেখে লামা সুদীপ্তদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। প্রদীপের আলোয় তাঁর সাত ফুট লম্বা দীর্ঘ অবয়বটা কেমন যেন ভৌতিক মনে হচ্ছে!

হেরম্যান, সুদীপ্তর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে একটু ইতস্তত করে লামার উদ্দেশ বললেন, "আপনার কাছে আমার একটা ব্যাপারে জানার ছিল।"

"এই রাজার মাথা বা যে পায়ের ছাপ আজ আপনারা দেখেছেন, বা যার গল্প শুনেছেন তার ব্যাপারে কি?" সুদীপ্তদের অবাক করে দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন লামা ডং রিম্পুচি।

বিস্মিত হেরম্যান বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা জানলেন কীভাবে? থট রিডিং?"

লামার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "না, থট রিডিং নয়, অনুমান। প্রথমত, নীচের মঠে আপনারা দু'জন মাথাটা দেখার পর এ বিষয় যে আলোচনা করছিলেন, সে খবরটা মাথাটা যাঁরা এখানে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন, তাঁরা আমাকে বলেছিলেন আপনাদের চেহারার বিবরণও তাঁরা দিয়েছিলেন। কাজেই আপনাদের দেখার পর প্রাথমিক ভাবে আপনাদের উপর আমার একটা সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু আপনারা ভদ্রলোক, অত দূর থেকে আসছেন বলে আমি আপনাদের ফেরাইনি। দ্বিতীয়ত, আপনারা আমাকে বলেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মদর্শন ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আপনারা জানতে এসেছেন এখানে। কিন্তু এ ব্যাপার আপনারা আমাকে কোনো প্রশ্ন করেননি বা আগ্রহ প্রকাশ করেননি। কত মঠ তো ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে। হঠাৎ আপনারা কেন এলেন এই দুর্গম মঠে? এ মঠে তো তেমন কিছু দেখার নেই, কোনো সম্পদও সে অর্থে নেই। তবে কীসের টানে আপনারা ছুটে এলেন এখানে? হ্যাঁ, একটা ব্যাপার এ মঠকে কেন্দ্র করে ইদানীং প্রচারিত হচ্ছে, তুষার দেশের রাজার গল্প! যাকে কেউ বলে মিগু, কেউ বা বলে ইয়েতি, আবার কেউ বা ডাকে বড়-পা বলে। তাকে নাকি দেখা যায় এখানে! তবে কি তারই খোঁজে এসেছেন আপনারা? বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য বা মঠের জীবনযাত্রা জানার জন্য তো রাত জেগে বসে থাকতে হয় না? পায়ের ছাপ খুঁজে বেড়াতে হয় না এই বরফের রাজ্যে? কাজেই . . ." একটানা কথাগুলো বলে থামলেন লামা।

সুদীপ্তরা অবাক হয়ে গেল লামার কথা শুনে। বুঝতে পারলেন তাঁরা ধরা পড়ে গিয়েছেন। হেরম্যান এবার বললেন, "হ্যাঁ, আমরা তার খোঁজেই এসেছি। আসলে আমি একজন ক্রিপ্টোজুলজিস্ট। ক্রিপ্টিড অর্থাৎ গল্পকথার প্রাণীদের খুঁজে বেড়াই। অর্থের জন্য নয়, রহস্যের টানে। পাছে আপনি মঠে আশ্রয় না দেন, সে ভয়ে এটুকু মিথ্যা বলতে হয়েছে। এ জন্য ক্ষমা করবেন। তবে নাম, ঠিকানা আমরা মিথ্যে বলিনি। কোনো খারাপ অভিপ্রায় নিয়ে আমরা এখানে আসিনি। সত্য অন্বেষণে এসেছি।"

হেরম্যানের কথা শুনে অপলক দৃষ্টিতে লামা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর মৃদু হেসে বললেন, "আপনারা যাকে খুঁজছেন, সে কোথায় আছে জানেন? এই বাক্সের মধ্যে। চিতাগুলোর মতো তুষারদেশের রাজাকেও পোষ মানিয়েছি আমি।"

বাক্সের মধ্যে! অবাক হয়ে গেল সুদীপ্তরা। বাক্সটা তো প্রায় দশ ফুট লম্বা। তা হলে

সত্যিই ওর মধ্যে আছে?

"আসুন তা হলে তাকে দেখাই। ও অনেকক্ষণ ধরে বাক্সে আটকে আছে, ওর কষ্ট হচ্ছে।"

সুদীপ্তরা বাক্সের কাছে এগিয়ে গেল। লামা বাক্সের উপর থেকে মাথাটা তুলে প্রথমে সুদীপ্তর হাতে দিলেন। সেটা ধরে শরীরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল সুদীপ্তর। লামা ডং এর পর বাক্সের ডালাটা ধীরে-ধীরে ওঠালেন। সুদীপ্তর বুকের ভিতর যেন কেউ হাতুড়ি পিটছে, হেরম্যানের চোখে-মুখেও তীব্র উত্তেজনার ছাপ। শুধু লামার ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি।

বাক্সের বিরাট ডালাটা প্রদীপের আলোটাকে আড়াল করে রেখেছে। বাক্সের ভিতর জমাট বাঁধা অন্ধকার। সুদীপ্ত ঝুঁকে পড়ে বাক্সের ভিতর দেখতে গিয়েও থেমে গেল। প্রাণীটা লামার পোষা, কিন্তু সুদীপ্তদের তো নয়। বলা যায় না। সে বাক্সের ভিতর থেকে লম্বা হাত বের করে সুদীপ্তর গলা চেপে ধরতে পারে!

তাদের চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লামা তাঁর লম্বা হাত বাড়িয়ে প্রদীপটা তুলে নিয়ে বাক্সের সামনে ধরলেন। কিন্তু এ কী? বাক্সের মধ্যে তো কিছু নেই! সুদীপ্তরা অবাক হয়ে তাকালেন লামার মুখের দিকে। লামা ডং রিম্পুচি এর পর বাক্সের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে একে-একে বের করে আনলেন লোমের তৈরি বিরাট এক জোব্বার মতো পোশাক, বিরাট দস্তানা, বড় পায়ের জুতো। বিস্মিত সুদীপ্তরা তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। লামা সেই পোশাক, দস্তানা, জুতোগুলো পরে ফেললেন। তারপর সুদীপ্তর হাত থেকে তুষারদেশের রাজার মাথাটা নিয়ে হেলমেটের মতো পরে ফেললেন নিজের মাথায়। মাথা আর বিরাট সোলওয়ালা জুতোর জন্য তাঁর উচ্চতা আরও বেড়ে গেল। সুদীপ্তদের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছেন প্রায় আট ফুট লম্বা তুষার দেশের রাজা! কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর আবার সেগুলো ধীরে ধীরে খুলে বুদ্ধমূর্তির সামনে বেদির উপর রাখলেন লামা।

সুদীপ্ত বা হেরম্যান তাঁকে কী বলবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না দেখে লামা মুখ খুললেন, তিনি বললেন, "এ সবই পাহাড়ি ভাল্লুকের লোম দিয়ে তৈরি। এ পোশাকেই রাই আমাকে দূর থেকে দেখেছিল এই চত্বরে। তখন সঙ্গে ওই চিতাটাও ছিল। তবে কপ্টার থেকে নয়। একটা পাথুরে তাকে সে দাঁড়িয়ে ছিল, আর কপ্টারটা নামানো ছিল কিন্তু দূরে। এখানে কপ্টার নামানোর ব্যাপারটা লোককে বললে সে বিপদে পড়ত। সে কারণেই আকাশ থেকে অদ্ভুত প্রাণী দেখার গল্পটা শুনেছে সে। যদিও বেশ কয়েকবার এখানে কপ্টার নামিয়েছে সে।" "কেন?" জানতে চাইলেন হেরম্যান।

বৃদ্ধ লামা জবাব দিলেন, "তুষারচিতা শিকার করার জন্য। ওর চামড়ার তো অনেক দাম। গোটাতিনেক প্রাণী মেরেছে ও। মাউন্টেনিয়ারদের পৌঁছে দিয়ে বা অন্য কাজে পিকে গিয়ে ফেরার পথে ওই কাজটা করে। কেউ ধরতেও পারত না ব্যাপারটা। যে চিতাটা মানুষের উপর খেপে গিয়েছে, তাকেও গুলিটা ও-ই করেছিল। একটা পায়ে চোট লেগেছে প্রাণীটার। ও আসলে পোচার। ছদ্মবেশী চোরাশিকারি," একথা বলে বৃদ্ধ লামা

তাকালেন সুদীপ্তর দিকে।

প্রদীপের স্বল্প আলোতেও হঠাৎ সুদীপ্তর কেন জানি মনে হল, লামার চোখের মণি দু'টো যেন আর স্থির নয়, সে দু'টো একবার তার, অন্যবার হেরম্যানের মুখের উপর ঘুরছে!

সুদীপ্ত এবার একটু ইতস্তত করে প্রশ্নটা করেই ফেলল, "আপনি কি দেখতে পান? নইলে কীভাবে আপনি বুঝলেন যে, রাতে জানলা থেকে আমরা আপনাকে দেখেছি?"

লামা রিম্পুচি বললেন, "হ্যাঁ পাই, তবে যোগাভ্যাসের মাধ্যমে আমি দীর্ঘক্ষণ চোখের মণি স্থির রাখতে পারি, এমনকী, নিশ্বাস বন্ধ করেও থাকতে পারি।"

"কিন্তু দৃষ্টিহীন সাজার বা তুষারদেশের রাজা সাজার কী প্রয়োজন?"

"আমি এ সবই সেজেছি প্রকৃতির সন্তান, অদ্ভুত সুন্দর প্রাণী ওই তুষারচিতাগুলোকে বাঁচানোর জন্য। বড় পায়ের ছাপ দেখে স্থানীয় কুসংস্কারগ্রস্ত শিকারিরা যাতে এ তল্লাটে না আসে, সেজন্য। আর দৃষ্টিহীন সেজে থাকলে আমার সামনে কেউ কিছু গোপন করে না। ভাবে, আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছু। একবার আমার সামনেই এক শিকারি একটা প্রাণীকে মারার জন্য বন্দুক তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মারতে পারেনি। সাংকেতিক আওয়াজে আমি সতর্ক করে দিই প্রাণীটাকে। তবে রাইয়ের মতো শিক্ষিত শিকারিকে আমি শেষ পর্যন্ত মনে হয় ধোঁকা দিতে পারিনি। সে বুঝতে পেরেছিল, ব্যাপারটায় কোনো গণ্ডগোল আছে। তুষারদেশের রাজা বা ইয়েতির ব্যাপারটা আসলে সাজানো। রাই সেই ভেবেই মনে হয় গল্পটা প্রচার করেছিল, যাতে লোকজন ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান করতে আসে এবং ব্যাপারটা ধরে ফেলে আমাকে অপদস্থ করে, যাতে আমি মঠ ছেড়ে চলে যাই, তার কাজের সুবিধে হয়। বিমান কোম্পানির লোকেরাও খুঁজতে এসেছিল, কিছু পায়নি। উলটে আমি তাদের কাছে রাইয়ের আসল পরিচয় জানিয়ে দিই," একটানা কথাগুলো বলে থামলেন লামা রিম্পুচি।

সুদীপ্ত বলল, "আর সে জন্যই মনে হয় ওর চাকরিটা যায়। কিন্তু আপনার কথাই বা বিমান কোম্পানির লোকেরা বিশ্বাস করল কেন?"

লামা বললেন, "কিছু দূরে একটা পাহাড়ি তাকের গায়ে একটা গুহা আছে। তার মুখে ইস্পাতের গরাদ বসিয়ে একটা ঘরের মতো বানিয়েছিল শিকারিরা। বানিয়েছিল অবশ্য আমার চোখের সামনেই, আমাকে দৃষ্টিহীন ভেবে। এ ব্যাপারটা অবশ্য রাইও ঠিক ধরতে পারেনি। ঘরটায় শিকার করা পশুর দেহ-চামড়া, বন্দুক ইত্যাদি রাখা হয়। যারা ইয়েতির ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে এসেছিল, আমি তাদের সেখানে নিয়ে যাই। সেখানে বিমান কোম্পানির এমব্লেম আঁকা রাইয়ের জ্যাকেটসহ তার কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র মেলে। তার মধ্যে একটা রাইফেলও ছিল।"

নিস্তব্ধ ঘর। লামা এর পর বললেন, "আজ রাতেই এ মঠ ছেড়ে আমি চলে যাব। চিতাগুলো রয়ে গেল, রাইয়ের মতো লোকেরাও রইল। জানি না, এর পর কী হবে?"

সুদীপ্ত বলল, "আচ্ছা, রেঞ্জার বীরবাহাদুর বলে লোকটাকে আপনি চেনেন? সেও কি এসব কাজ করে?"

লামা রিম্পুচি যেন মৃদু চমকে উঠলেন বীরবাহাদুরের নাম শুনে। বললেন, "না, না, সে ভালো লোক।"

প্রদীপের আলোটা দপদপ করতে শুরু করেছে। মনে হয় সেটা নেভার সময় হয়ে এসেছে। লামার ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি। তিনি বললেন, "চলে যাওয়ার আগে এই বুদ্ধমূর্তির সামনে শেষবারের জন্য উপাসনায় বসব আমি, সামান্য কিছু জিনিসও গুছিয়ে নিতে হবে। এবার তা হলে আপনারা আসুন। আজ রাতটা মঠেই বিশ্রাম নিন। কাল তো নিশ্চয়ই আপনারাও মঠ ছেড়ে রওনা হবেন। ভগবান বুদ্ধর আশীর্বাদে আপনারা, এই পাহাড়, উপত্যকা, ওই চিতাগুলো সবাই ভালো থাকুক।"

হেরম্যান দীর্ঘক্ষণ চুপ করে ছিলেন। সাত সমুদ্র পেরিয়ে তুষারদেশের রাজা, ইয়েতির খোঁজে আসা হেরম্যানের আশাভঙ্গের বেদনা কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারছে সুদীপ্ত। তিনি এবার লামাকে বললেন, "যাওয়ার আগে আপনার কাছে আমার একটা শেষ প্রশ্ন আছে। তবে কি ইয়েতি বা তুষার দেশের রাজাকে নিয়ে যুগ-যুগ ধরে চলে আসা সব গল্পই মিথ্যে? কিছু লোকের আত্মপ্রচার বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কোনো কৌশল? কোনো দিনই কি কোনো ধরনের প্রাণী ছিল না এই বিশাল, বিপুল, অচেনা, অজানা হিমালয়ের কোলে?"

লামা যেন কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেলেন, তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, "হয়তো তারা একদিন ছিল। প্রাচীন কিছু বৌদ্ধ পুঁথিতে তাদের উল্লেখ আছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাদের উপাসনা করতেন। এত বড় প্রাণীকে বশ করে রাখার জন্য বছরের পর-বছর তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখার কৌশলও জানতেন তাঁরা। প্রয়োজনে আবার তাদের জাগিয়ে তুলতে পারতেন, এসব কথাও লেখা আছে পুঁথিতে," এরপর পর একটু থেমে তিনি বললেন, "আমি যখন গৃহী ছিলাম, তখন একটা বইয়ে পড়েছিলাম, আদিম দানবাকৃতি বাঁদর জায়গান্টোপিথিকাসের একটা শাখা নাকি এই হিমালয়েও বসবাস করত। হয়তো তাদের কথাই বলা আছে প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথিতে।"

লামার এ কথা শুনে সুদীপ্তরা বুঝতে পারল, শুধু বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন নয়, তার বাইরেও অন্য ধরনের জ্ঞানভাণ্ডার আছে এই লামার। নইলে জায়গান্টোপিথিকাসের কথা বলতেন না তিনি।

হেরম্যান বলে উঠলেন, "আপনার কি মনে হয়, ওরকম প্রাণীর অস্তিত্ব এখনও এই তুষারদেশে থাকতে পারে?'

বৃদ্ধ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "হয়তো আমার মতের সঙ্গে আপনার মতো মিলবে না, তবুও বলি, তাদের কেউ যদি এই তুষাররাজ্যে টিকেও থাকে তবে তাকে খুঁজতে যাবেন না, তাকে তুষারদেশের রাজা হয়েই থাকতে দিন। মানুষের লোভ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। তুষারচিতাগুলোর অবস্থা দেখছেন না!"

এ কথা বলে বাক্সটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "আপনারা কি সত্যিই সন্দেহ করেছিলেন যে তুষারদেশের রাজা এই বাক্সের মধ্যেই আছে? প্রথমদিন তো বারবার এই বাক্সটার দিকে দেখছিলেন," এই বলে তিনি সুদীপ্তর দিকে তাকালেন।

হেরম্যান এর পর আরও কী একটা প্রশ্ন করতে গেলেন, কিন্তু তিনি হাত তুলে হেরম্যানকে থামিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, অনেক কথা হয়েছে, আর কোনো কথা নয়, এবার কক্ষ ত্যাগের সময় হয়ে গিয়েছে।

সুদীপ্তরা লামাকে নমস্কার জানিয়ে প্রার্থনাকক্ষের বাইরে বেরোতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে কার যেন চিৎকার চেঁচামেচি, হাঁকডাকের শব্দ শোনা গেল। বুদ্ধমূর্তির সামনে উপাসনায় বসতে গিয়েও শব্দটা শুনে লামা সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সুদীপ্ত লক্ষ করল, লামার চোখের মণি দু'টো সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে স্থির হয়ে গেল।

সদর দরজার সামনে বেরিয়ে এল সুদীপ্তরা। তাঁদের পিছন-পিছন লামাও এলেন। বাইরে এসেই তারা দেখতে পেল রাইয়ের সেই দু'জন উপজাতি শিকারির মধ্যে একজনকে। লোকটা হাউমাউ করে চিৎকার করে যা বলল, তার মর্মার্থ হল, কিছুক্ষণ আগে রাইয়ের নেতৃত্বে তারা দু'জন চিতাটার সন্ধানে বেরিয়েছিল। হঠাৎই পাহাড়ের গায়ে একটা সংকীর্ণ বাঁকের মুখে তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় প্রাণীটার। কারওরই তখন পিছোনের আর উপায় নেই। কারণ, পথের একপাশে পাথরের মসৃণ দেওয়াল, আর অন্যপাশে গভীর খাদ। রাই প্রথমে ছিলেন, সংকীর্ণ পথে তিনি কাঁধ থেকে বন্দুক খোলার আগেই প্রাণীটা ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইয়ের উপর। তারপর রাইকে ক্ষতবিক্ষত করে, নিজে খাদে পড়ে যায়। রাই নীচে না পড়লেও তাঁর ঘাড় ভেঙে দিয়েছে প্রাণীটা। লোক দু'জন তাঁকে কোনোরকমে ধরাধরি করে কাছেই একটা গুহায় নিয়ে রেখেছে। রাই সম্ভবত বাঁচবেন না। একজনকে তাঁর কাছে রেখে এ লোকটা মঠে তাঁদের ডাকতে এসেছে, যদি শেষ মুহূর্তে তাঁকে কোনো ভাবে বাঁচানো যায় সে জন্য।

তার কথা শুনে লামা মন্তব্য করলেন, "এরকমই কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে বলে আমার আশঙ্কা ছিল। প্রাণীটা ওকে ভালো ভাবে চিনে ফেলেছিল। এ জায়গা ছেড়ে ওকে চলে যেতে বলেছিলাম, গেল না। প্রাণীটা মরার আগে প্রতিশোধ নিল, ও লোকটা যতই খারাপ হোক, ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক।"

সুদীপ্ত বলল, "তা হলে এখন আমাদের কী করা উচিত?"

লামা ডং রিম্পুচি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সূর্য অস্ত যেতে বসেছে, আমার প্রার্থনার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। লোকটা যখন মৃত্যুপথযাত্রী, তখন সে ভালো-মন্দ যে লোকই হোক, তার কাছে কারও একবার যাওয়া উচিত। হয়তো শেষ মুহূর্তে আপনাদের কাছে অপরাধ কবুল করলে ওর আত্মার মুক্তি ঘটবে। যান ঘুরে আসুন, সাবধানে যাবেন।" এই বলে লামা পিছন ফিরে এগোলেন প্রার্থনাকক্ষের দিকে।

হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, "চলুন, তা হলে ওখান থেকে একবার ঘুরেই আসি। আমাদের তো আর কোনো কাজ নেই, কাল ভোরেই ঘরে ফেরার পালা," বিষণ্ণতার সুর স্পষ্ট হেরম্যানের গলায়।

সুদীপ্ত বলল, "হ্যাঁ, যাব। একটু দাঁড়ান। যাওয়ার আগে ঘর থেকে আমাদের মেডিক্যাল কিটটা নিয়ে নিই, যদি তা দিয়ে লোকটাকে কোনো ভাবে সাহায্য করা যায়।"

সুদীপ্ত উপরে উঠে মেডিক্যাল কিট নিয়ে যখন নীচে নামল, তখন প্রার্থনাকক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে ভেসে আসছে লামা ডং রিম্পুচির মন্ত্রোচারণ আর জপযন্ত্র ঘোরানোর ঘরঘর শব্দ। প্রার্থনায় বসে গিয়েছেন তিনি। সুদীপ্তরা যখন সেই লোকটার সঙ্গে মঠ ছেড়ে রওনা হলেন, তখন দিনের শেষ আলো পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে।

গুহাটা যেখানে, সে জায়গা মঠ থেকে বেশি দূর নয়, আলো থাকতেই লোকটার সঙ্গে তাঁরা সে জায়গায় পৌঁছে গেলেন। গুহাটা একটা সংকীর্ণ তাকের শেষ প্রান্তে। তার একপাশে মসৃণ পাথুরে দেওয়াল, অন্য পাশে গভীর খাদ। ইগুলুর প্রবেশমুখের মতো গুহার মুখটা পাহাড়ের গা থেকে বেশ কিছুটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। গুহার সামনে, তার ছাদে স্তূপাকৃত তুষার জমা হয়ে আছে। সেই তুষারের ভিতর থেকে অন্ধকার গুহামুখটা শুধু উঁকি দিচ্ছে। তার সামনে কোলে বন্দুক শুইয়ে একটা পাথরের চাঁইয়ের উপর হতাশ ভাবে বসে ছিল শিকারিদের অন্যজন। সুদীপ্তরা কাছে গিয়ে দাড়াতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ ভাবে বলল, "সাহেব মনে হয়। আর বাঁচবেন না। শুধু আপনাদের কথা বলছেন। ও কষ্ট আমার আর সহ্য হচ্ছে না। তাই বাইরে বেরিয়ে এলাম," এই বলে ছোট বাচ্চার মতো ডুকরে কেঁদে উঠল। সেই শিকারি।

"কই দেখি?" বলে হেরম্যান সুদীপ্তকে নিয়ে গুহার ভিতর পা রাখলেন। কিন্তু দেখবেন কী? বিরাট ঘরের মতো গুহাটার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বাইরের আলো প্রবেশ করতে পারছে না। সেখানে খেলা করছে জমাট বাঁধা অন্ধকার। সুদীপ্ত বলল, "কই, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না তো?"

পিছন থেকে গুহার প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থাকা শিকারি বলল, "দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে ওঁকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এগোন, লেখতে পাবেন।"

আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল তারা। কিন্তু পাথুরে দেওয়ালের শেষ প্রান্তে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ সুদীপ্তর খেয়াল হল, তার পকেটে একটা ছোট টর্চ আছে। সেটা বের করে দেওয়ালের গায়ে আলো ফেলল সুদীপ্ত। কিন্তু কোথাও তো কেউ নেই। গুহার শূন্য পাথুরে দেওয়ালে পিছলে যাচ্ছে টর্চের আলো। সুদীপ্তরা পিছন ফিরে দরজার কাছে দাড়ানো লোক দু'জনকে ব্যাপারটা কী হল জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘড়াং করে প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ হল। চমকে উঠে পিছন ফিরে সুদীপ্ত দেখতে পেল, বাইরে মাথার উপর থেকে গুহার মুখে নেমে এসেছে লোহার গরাদওয়ালা একটা

খাঁচা! গুহার ভিতর আটকা পড়ে গিয়েছেন সুদীপ্তরা, আর সে দু'জন লোক গুহার বাইরে দাড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে!

"ব্যাপারটা কী হ'ল?" হেরম্যান জিজ্ঞেস করলেন তাদের। তারা কোনও জবাব না দিয়ে হাসতে থাকল। আর এর পরই গুহার মাথার উপর থেকে লাফ দিয়ে গরাদের ওপাশে গুহার মুখে নামলেন মিস্টার রাই। তিনি সুদীপ্তদের বললেন, "আমাকেই তো খুঁজছিলেন আপনারা? না। আমাকে এখনও বাঘে খায়নি। এই তো আমি!" হেরম্যান বলে উঠলেন, "এ সবের মানে কী?" রাই বললেন, "মানে হল, আজ রাতে আপনারা আমার অতিথি। অবশ্য বুড়োটাকেও সঙ্গে আনতে পারলে ভাল হত। আমরা তো তিনজন, তা হলে আপনাদের তিনজনকে নিয়ে তিন জায়গায় পারতাম।"

হেরম্যান উত্তেজিত ভাবে বললেন, "আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। হেঁয়ালি ছাড়ুন। গুহামুখে দরজাটা পড়ে গেল কীভাবে? দরজাটা খুলুন।"

রাই হেসে বললেন, "উত্তেজিত হবেন না। ব্যাপারটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। তুষারাচিতাটাকে মারতে হবে তো! তাই আপনাদের আনালাম।"

"আমরা তো শিকারি নাই, আমাদের আনালেন কেন?" তাঁর কথার মাঝে বলে উঠল সুদীপ্ত।

রাই বললেন, "ব্যস্ত হবেন না। সে কথাই তো বলছি। চিতাটা তো আর এমনি আসবে না। প্রাণীটার জন্য টোপ ফেলতে হবে। আর সে টোপ হবেন আপনারা।"

"শয়তান!" চিৎকার করে উঠলেন হেরম্যান। রাই কিন্তু উত্তেজিত হলেন না। তিনি বললেন, "আপনাদের দু'জনের খুব কষ্ট হবে না। একটা রাত শুধু হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বরফের উপর বসে রাত কাটাতে হবে। ঘাবড়াবেন না। আমার বা আমার সঙ্গীদের হাতের রাইফেলের নিশানা খুব ভাল। দুশ্চিন্তা করবেন না, তুষারচিতাটা আপনাদের ঘাড়ে ঝাঁপানোর আগেই এক গুলিতে তার ঘাড় ভেঙে দেব।"

সুদীপ্ত বলল, "আপনি এসব কী পাগলামি করছেন? দরজাটা ওঠান, আমাদের বাইরে বেরতে দিন। আমরা দু'জনেই বিদেশি নাগরিক। আমরা যে এখানে এসেছি, তা সরকারি খাতায় নথিবদ্ধ আছে। আমাদের কিছু হলে সরকার আপনাকে..."

সুদীপ্তর কথা শেষ হওয়ার আগেই রাই বলে উঠলেন, "সরকারি খাতায় আপনাদের নাম আছে তো কী হয়েছে, কত লোকেরই তো সরকারি খাতায় নাম থাকে, কিন্তু হিমালয় এসে তারা ফেরে না। তুষার চাপা পড়ে বা পা পিছলে খাদের নীচে হারিয়ে যায়। আপনাদের বেলায়ও তেমন হলে সরকারি নথিতে সেরকম কিছুই লেখা থাকবে," এই বলে গরাদ ধরে দাড়িয়ে মূর্তিমান শয়তানের মতো হাসতে লাগলেন। অন্য দু'জনও তাঁর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল।

হেরম্যান বললেন, "আপনি চিতাবাঘের হাতে মৃতপ্রায় বলে আপনার জন্য আমরা ছুটে এলাম। এখানে আর আপনিই আমাদের বাঘের মুখে ফেলে দিচ্ছেন!"

রাই অট্টহাস্য করে বলে উঠলেন, "একজনকে বাঁচাতে হলে অনেক সময় অন্য একজনকে মরতে হয়। প্রকৃতির এই নিয়মটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। তাই আমাকে

বাঁচাবার জন্য আপনারা...”

এই সময় সুদীপ্ত একটা কাণ্ড করে বসল। রাইকে আর কোনও ভাবে বোঝানো যাবে না বুঝতে পেরে গরাদের কাছে ছুটে এসে রাইয়ের একটা হাত গরাদের ভিতর টেনে ধরে চিৎকার করে। বলে উঠল, “তা হলে এই হাতও গরাদের ভিতরই থাকবে।” রাইয়ের হাতটা নিয়ে গরাদের এপাশে-ওপাশে একটা ধ্বস্তাধস্তি শুরু হল। সুদীপ্তর টেনে ধরা হাতটা কিছুতেই বাইরে নিতে পারছেন না। রাই। তিনি “হাত ছাড়-ছাড়!” বলে চেঁচাতে লাগলেন।

হেরম্যান সম্ভবত ঘটনার আকস্মিকতায় মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। বাইরের অন্য দু'জন শিকারি কিন্তু ছুটে এসেছে। তাদেরই একজন হঠাৎ গরাদের ফাক দিয়ে রাইফেলের পিছন দিকটা ভিতরে গলিয়ে তার কুঁদো দিয়ে সজোরে আঘাত করল সুদীপ্তর মাথায়। সুদীপ্ত দু'হাতে টেনে রেখেছিল রাইয়ের হাত, তাই সে সরে গিয়ে আঘাত এড়াতে পারল না। মাথায় রাইফেলের কুঁদোর বাড়ি খেয়ে সে পড়ে গেল মাটিতে। আর রাইও গুহার বাইরে বরফের মধ্যে ছিটকে পড়লেন। পরক্ষণেই কিন্তু তিনি আবার স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাশের শিকারির হাত থেকে রাইফেল টেনে নিয়ে গরাদের ফাঁকে নল ঢুকিয়ে গুলি করতে উদ্যত হলেন মাটিতে পড়ে থাকা সংজ্ঞাহীন সুদীপ্তকে।

ততক্ষণে অবশ্য হেরম্যান এসে সুদীপ্তর দেহটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন। গুলি চালালে গুলিটা তখন তাঁর গায়েই লাগবে। রাই হয়তো গুলি চালাতেনও, কিন্তু শিকারি দু'জন সে কাজ থেকে নিবৃত্ত করল। তাঁকে। তারা বলল, “এখন গুলি চালালে তার শব্দে তুষারাচিতাটা দূরে পালিয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে কাজ মিটে গেলে এ দু'জন লোককে খাদে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে।”

রাই শেষ পর্যন্ত তাদের যুক্তি মেনে নিলেন। হেরম্যানের উদ্দেশে তিনি বললেন, “তাঁবু থেকে ফিরে এসে তোদের মজা দেখাচ্ছি। আর বুড়ো লামাটার মজাও এ তল্লাট ছেড়ে যাওয়ার আগে দেখিয়ে যাব। ওকেও চাঁদমারি বানাব। বদমাশটার ইয়েতি সাজা বের করছি। চিতাটাকে আগে নিকেশা করি, তারপর ওকে।”

শিকারিদের একজন গরাদের ভিতর পড়ে থাকা সুদীপ্তকে দেখিয়ে বলল, “ভালই হল, এ লোকটার মাথা ফেটেছে। ওর রক্তের গন্ধ চিতাটাকে টোপের কাছে টেনে আনবে। সামান্য রক্তের গন্ধও ওরা বহু দূর থেকে টের পায়।”

রাই এর পর আর কোনও কথা না বলে তাঁর সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে রওনা হলেন তাঁদের তাবুর দিকে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ বাইরে ঝুপ করে সন্ধে নামল। অন্ধকারে ঢেকে গেল গুহার ভিতরে-বাইরে। তাঁরা দূরে চলে যাওয়ার পর হেরম্যান গুহার মেঝে হাতড়ে-হাতড়ে উদ্ধার করলেন সুদীপ্তর টর্চ আর মেডিকেল কিটটা। তারপর টর্চ জ্বলিয়ে এগিয়ে এলেন মাটিতে পড়ে থাকা সুদীপ্তর দিকে। তার আঘাত গুরুতর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গুহার মাটি। তাড়াতাড়ি মেডিক্যাল কিটটা খুললেন হেরম্যান।

সুদীপ্তর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন বাইরে চাঁদ উঠেছে। তার আলোয় গরাদের ফাঁক

দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের তুষার শৃঙ্গ, গুহার সামনে তুষারবিছানো পথ। চাঁদের আলোয় রুপোলি দেখাচ্ছে সব কিছু। সব যেন গলিত রুপো দিয়ে তৈরি। গরাদের ফাঁক গলে একফালি চাদের আলো এসে পড়েছে সুদীপ্তর পায়ের সামনে। গুহার অন্ধকার তাতে কিছুটা কেটেছে। সুদীপ্ত উঠে বসে প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল গরাদের বাইরের অপরূপ পৃথিবীর দিকে। সে এভাবে বসে আছে কেন? প্রথমে তার কিছুই মনে পড়ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সংবিৎ ফিরে পেয়ে উঠে দাড়াতে যেতেই পাশ থেকে হেরমান তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, “থাক, ওঠার দরকার নেই। এখন বসে থাকো।”

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, “ওরা কি আর এসেছিল?” হেরমান জবাব দিলেন, "না, আসেনি। তবে সম্ভবত এখনই আসবে। অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল। রাত প্রায় আটটা বাজে।”

আটটা বাজে! তার মানে দু’ঘণ্টারও বেশি সময় অজ্ঞান হয়ে ছিল সুদীপ্ত। মাথায় হাত দিল সে। অজ্ঞান অবস্থায়ই তার মাথায় মেডিক্যাল কিট থেকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন হেরম্যান। তবে রক্তপাতের জন্য বেশ দুর্বল লাগছে সুদীপ্তর শরীর। সুদীপ্ত বলল, “এটাই মনে হয় সেই গুহা, যার কথা লামা বলেছিলেন। যেখানে চোরাশিকারিরা তাদের জিনিসপত্র রাখে।”

সুদীপ্ত এর পর বলল, “গরাদটা কোনওভাবে ভাঙা বা খোলা যাবে না ?”

হেরম্যান বললেন, “না, যাবে না। ইতিমধ্যে আমি কয়েকবার ও চেষ্টা করেছি। পুরনো হলেও ইস্পাতের ভারী গরাদ। ভাঙা যাবে না, আর উপর থেকে এটা টেনে না তুললে খোলাও যাবে না। আমরা যখন এখানে ঢুকি, তখন ওটা গুহার ছাদে তুষার চাপা দেওয়া অবস্থায় ছিল, আমরা তাই খেয়াল করতে পারিনি।"

“তা হলে এখন কী উপায় ?”

“ভাগ্যের উপর নির্ভর করে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় তো এখন দেখছি না। তবে ওরা ফিরলে শেষ মুহূর্তে একটা লড়াই আমিও লেব!” জবাব দিলেন হেরম্যান।

“কীভাবে লড়বেন ?” সুদীপ্তকে একটু চমকে দিয়ে হেরম্যান তার পোশাকের নীচ থেকে একটা রিভলভার বের করে বললেন, “এটা দিয়ে। তবে এ জিনিসটা কিন্তু বেআইনি নয়, এটা এদেশে আনার ও সঙ্গে রাখার বৈধ অনুমতিপত্র আমার আছে। বন-জঙ্গল, পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই তো, তাই আত্মরক্ষার্থে এটা কাছে রাখতে হয়। এ জিনিসটা তখন বের করিনি, কারণ, গুহার ভিতর থেকে বাইরের তিনটে রাইফেলের মোকাবিলা এটা করতে পারত না। আমাদের বাঁধতে নিশ্চয়ই কাউকে গুহার ভিতর খাঁচা খুলে ঢুকতে হবে। সে কাছে এলেই এটা তার কপালে চেপে ধারব। তারপর যা হয়, হবে।”

হেরম্যানের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হল সুদীপ্ত। অন্ধকার গুহায় বসে হেরম্যান একবার আক্ষেপের সুরে বললেন, “ওই শিকারির কথায় বিশ্বাস করে এখানে আসাটা চূড়ান্ত হঠকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে। লামাও যদি কোনও ভাবে ব্যাপারটা জানতে পারতেন, তবে নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করতেন।”

অন্ধকার গুহায় সুদীপ্তরা রাই আর তার অনুচরদের ফিরে আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সময় এগিয়ে চলল। সুদীপ্তরা খেয়াল করলেন, একসময় বাইরে ঝিরিঝিরি

তুষারপাত শুরু হল। চাঁদের আলোয় অসংখ্য রুপোলি রাং তার টুকরো যেন ভাসতে-ভাসতে নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। অপূর্ব সেই দৃশ্য! কিছুক্ষণের জন্য সুদীপ্তরা যেন গরাদের বাইরের সেই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ভুলে গেলেন তাঁদের বিপদের কথা। এমনই আশ্চর্য সুন্দর সেই দৃশ্য।

হঠাৎ গুহার বাইরে কীসের অস্পষ্ট একটা শব্দে হুশ ফিরল। সুদীপ্তদের। একটা অস্পষ্ট খসখসে আওয়াজ। হেরম্যান চাপা স্বরে বললেন, "ওরা মনে হয় ফিরে আসছে!" সতর্ক ভাবে মেঝে ছেড়ে উঠে দাড়ালেন তাঁরা দু'জন। আর তারপরই তাঁরা দেখতে পেলেন তাকে। না তাঁরা নয়। গুহামুখের বাইরে কিছুটা তফাতে দেওয়ালের গা ঘেসে বরফের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে প্রাণীটা! উজ্জ্বল সবুজ চোখে গুহার ভিতর তাকিয়ে আছে সে। ওই উজ্জ্বল চোখটাই প্রাণীটার উপস্থিতি বুঝিয়ে দিল সুদীপ্তদের। একটা পূর্ণবয়স্ক তুষারাচিতা! প্রাণীটা সম্ভবত টের পেয়েছে সুদীপ্তদের উপস্থিতি। গুহার দিকে তাকিয়ে সম্ভবত অচেনা মানুষদের প্রতি আক্রোশে সামনের পা দিয়ে তুষার খুঁড়ছে সে। ওরাই শব্দ কানে এসেছে সুদীপ্তদের।

প্রাণীটা এর পর ধীরে-বীরে এগিয়ে আসতে লাগল। গুহার দিকে। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে প্রাণীটা। সুদীপ্তরা বুঝতে পারলেন, এটাই সেই চিতাটা। যার টোপ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তাঁদের এখানে আটকে রেখেছেন রাইরা। বাতাসে মানুষের গন্ধ প্রাণীটাকে এখানে টেনে এনেছে। সে যত এগিয়ে আসতে লাগল, তত তার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসা চাপা ঘরঘর শব্দ ও কানে আসতে লাগল। মানুষের প্রতি আক্রোশে ফুঁসছে চিতাটা।

গুহার কয়েক হাত তুফাতে এসে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল প্রাণীটা। চাঁদের আলোয় সুদীপ্ত দেখতে পেল তার লেজের ডুগাটা শুধু মৃদু-মৃদু নড়ছে। তার জ্বলন্ত চোখ দুটো দিয়ে যেন তীব্র ঘৃণা ঠিকরে বেরোচ্ছে মানুষের প্রতি। যদিও সুদীপ্ত আর চিতাটার মাঝে ইস্পাতের বেড়া আছে, তবুও হেরম্যান উত্তেজনায় রিভলভারটা বের করে আনলেন।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। আর তারপরই চিতাটা লাফিয়ে পড়ল গুহামুখে খাঁচাটার উপর। তার ভারী শরীরের আঘাতে ঝনঝন করে উঠল লোহার খাঁচাটা। কেঁপে উঠলেন সুদীপ্তরা। বাধা পেয়ে আরও খেপে গেল প্রাণীটা। কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে দ্বিগুণ আক্রোশে আবার সে ঝাঁপ দিল গারাদে। আরও জোরে শব্দ করে উঠল খাঁচাটা।

প্রাণীটা মনে হয় হাল ছাড়ার পাত্র নয়, দ্বিতীয়বারের বাধাও তাকে দমাতে পারল না। ঝাঁপ দেওয়ার জন্য আবারও সে পিছিয়ে গেল। তবে এবার সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপ দিল না। ঝাঁপ দেওয়ার আগে কোথায় আঘাত করলে খাঁচাটা ভাঙা যেতে পারে, সেটা মনে হয় বোঝার চেষ্টা করতে লাগল চিতাটা। মুখটা খোলা তার। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার হিংস্র দাঁতগুলো! ঠিক এই সময় আরও একটা শব্দ কানে এল সুদীপ্তদের। ছাদের উপর ধাপ করে কী একটা শব্দ হল। সেই শব্দ শুনেই সম্ভবত চিতাটাও মাথা উঁচু করে তাকাল ছাদের দিকে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চিতাটার আচরণে অদ্ভুত এক

পরিবর্তন ধরা পড়ল সুদীপ্তদের চোখে। তুষারাচিতাটা গুহার ছাদের উপর কোনও কিছু একটা লক্ষ করে মুখ দিয়ে একটা আদুরে শব্দ করে লেজ নাড়তে শুরু করল। পোষা কুকুর মালিককে দেখলে যেমন আচরণ করে, চিতাটার আচরণ অনেকটা সেইরকম। গুহার ভিতর মানুষদের প্রতি যেন আর কোনও আকর্ষণ নেই তার। বেশ কিছুক্ষণ ওরকম করার পর প্রাণীটা একবার গুহার দিকে তাকিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে গুহার সামনের রাস্তা ধরে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা কী হল, সুদীপ্তরা ঠিক বুঝতে পারল না। হেরম্যান চাপা স্বরে বললেন, "লামা কি এখানে এসে উপস্থিত হলেন নাকি?" তাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই এক অদ্ভুত ঘটনা দেখতে পেলেন তাঁরা। চাঁদের আলোয় ছাদের মাথা থেকে নেমে এল বিরাট বড় দু'টো রোমশ হাত। সুদীপ্ত প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও বুঝতে পারলেন, ঠিক এইরকম বিরাট দস্তানাই লামা বাক্স থেকে বের করে দেখিয়েছিলেন তাঁদের। লামাকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু তাঁর হাত দু'টোকেই ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। সুদীপ্ত উৎফুল্ল ভাবে বলে উঠল, "লামা এসে গিয়েছেন! আর চিন্তা নেই!"

হাত দু'টো এর পর লোহার গরাদ ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই টং করে একটা ধাতব শব্দ হল। একটা গরাদ ভেঙে ফাঁক হয়ে গেল! সুদীপ্ত আর হেরম্যান সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এসে সেই ভাঙা গরাদটাকে এক যোগে চাপ দিতে শুরু করল। হাতটা সঙ্গে-সঙ্গে উপরে উঠে গেল। গরাদ ঠেলতে-ঠেলতে হঠাৎ সুদীপ্ত দেখতে পেল, গরাদের বাইরে সাদা বরফের উপর চাঁদের আলোয় একটা কালো ছায়া এসে পড়েছে। বেশ লম্বা একটা ছায়া। গুহার ছাদের উপর দাড়ানো কোনও মানুষ যেন চাঁদের আলোয় ছায়া হয়ে ধরা দিচ্ছে বরফে।

সুদীপ্ত আর হেরম্যানের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেল ভাঙা গরাদটা। একটু কসরত করে একে-একে তারা দু'জন সেই ফাঁক গলে বাইরে বেরিয়ে এল। বরফের উপর ছায়াটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। গুহার ছাদের উপরও কেউ নেই! ছাদের দিকে তাকিয়ে সুদীপ্ত হাক দিল, "লামা ডং, লামা রিম্পুচি কোথায় আপনি?" বারদুয়েক ডাকার পরও যখন তাঁর সাড়া মিলল না, তখন হেরম্যান সুদীপ্তকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আর চিৎকার করবেন না, রাইরা সম্ভবত কাছেই আছে, সেই জন্য তিনি আত্মগোপন করলেন। চিৎকার করলে আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি।"

সুদীপ্ত বলল, "তা হলে আমরা এখন কী করব ?"

হেরম্যান তাঁর হাতের রিভলবারটা উঁচিয়ে ধরে চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "মঠে ফেরার চেষ্টা করব, এবার আমাদের আটকানো সহজ হবে না। মঠের ভিতর ঢুকতে পারলে আমরা অনেক নিরাপদ।"

ঝিরিঝিরি তুষারপাত শুরু হল আবার। একদিকে খাদ, অন্য দিকে অনেক উঁচু পাথরের দেওয়ালের গা ঘেঁষে রিভলভার উঁচিয়ে সন্তর্পণে মঠে যাওয়ার জন্য এগোতে থাকল দু'জনে। কিছু দূর এগোতেই তারা দেখতে পেল, বরফের উপর কী যেন পড়ে আছে! চাঁদের আলোয় সেটা চিকচিক করছে। কাছে গিয়ে জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়ে লেখা

গেল, সে জিনিসটা একটা রাইফেলের ব্যারেল অর্থাৎ নল। সেটাকে রাইফেলের বাঁটের থেকে বিচ্ছিন্ন করে কে যেন দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। কিছুটা তফাতে পড়ে থাকা ভাঙা বাঁটটাও এর পর লেখলেন তাঁরা। হেরম্যান মন্তব্য করলেন, "রাইফেলটা সম্ভবত রাইদের কারও হবে। কিন্তু এটার এমন দশা করল কে?"

এগোতে-এগোতে একটা বাঁকের মুখে পৌঁছল তারা। আর এর পরই সুদীপ্তরা দেখতে পেল রাইয়ের সঙ্গী সেই শিকারিকে। আতঙ্কিত চোখে উদভ্রান্তের মতো সংকীর্ণ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। হঠাৎ সে লোকটা তাকাল সুদীপ্তরা যে দেওয়াল ঘেষে দাড়িয়ে আছে, তার মাথার দিকে। আর তারপরই প্রচণ্ড আতঙ্কে দুর্বোধ্য একটা আর্তনাদ করে সোজা লাফ দিল রাস্তার পাশে অতল খাদের ভিতর। সুদীপ্তর মুহূর্তের জন্য যেন মনে হল, যখন লোকটা আর্তনাদ করে উঠল, ঠিক তখনই যেন একটা ছায়া এসে পড়েছিল বরফের উপর। একটা মানুষের আকৃতির ছায়া। হতে পারে ব্যাপারটা নিছক সুদীপ্তর মনের ভুল, তবুও সে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে মাথার উপরটা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু দেওয়ালটা এত উঁচু যে, তার মাথার উপর কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে নীচ থেকে তাকে দেখা সম্ভব নয়।

আবার এগোতে থাকলে তারা। তুষারপাত হয়েই চলেছে। কুচি-কুচি বরফে ঢেকে যাচ্ছে পোশাক। চলার গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে তাদের। তবুও চলতে-চলতে একটা সময় তারা পৌঁছে গেল মঠে ওঠার রাস্তার কাছে।

একটা বাঁক নিলেই মঠে ওঠার রাস্তা। সেই বাঁকটা নিয়েই সুদীপ্তরা হঠাৎ মুখোমুখি হল রাইয়ের। তাঁর বন্দুকের নল সোজা সুদীপ্তদের দিকে তাক করা। রাইয়ের চোখে একটা হিংস্র ভাব। সুদীপ্তদের দেখে পৈশাচিক হেসে বললেন, "খেলা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। আমার দু'টো লোক খাদে পড়ল ইয়েতি সাজা লামাটার ভয়ে। কিন্তু আমাকে ঠকানো সহজ নয়, এবার আমি বদলা নেব।"

হেরম্যানের হাতের রিভলভার ও রাইয়ের দিকে তাক করা। মাঝে কুড়ি ফুটের মতো ব্যবধান। কোনও পক্ষেরই কোনও দিকে পালাবার উপায় নেই, একদিকে পাথুরে দেওয়াল, অন্যদিকে অন্ধকার খাদ। অসহ্য রুদ্ধশ্বাস কয়েকটা মুহূর্ত! গুলি চালানোর আগের মুহূর্তে হেরম্যান আর রাই পরস্পরকে জরিপ করে নিচ্ছেন। দু'জনের হাতের আঙুলিই ধীরে-বীরে চেপে বসতে যাচ্ছে ট্রিগারের উপর। ঠিক এই সময়ই পাথুরে দেওয়ালের উপর থেকে একটা সাদা বিদ্যুৎ যেন উড়ে এসে পড়ল রাইরের ঘাড়ে। রাই

আর হেরম্যান, দু'জনেরই হাতের আঙুলই মনে হয় শেষ মুহূর্তে চেপে বসে ছিল ট্রিগারে। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। কিন্তু দু'জনের গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল ওই উড়ে আসা বিদ্যুতের জন্য। সুদীপ্তরা দেখলে পেলেন, উপর থেকে নেমে আসা তুষারাচিতাটা রাইকে পেড়ে ফেলেছে মাটিতে। প্রাণীটা আর রাইয়ের মধ্যে শুরু হল প্রবল ধ্বস্তাধস্তি। রাই এক হাতে গলা চেপে ধরেছে প্রাণীটার আর সেও চার হাত-পায়ের আঘাতে ফালা-ফালা করে দিচ্ছে রাইয়ের পোশাক। সুদীপ্তদের কিছু করার নেই, নীরব দর্শকের মতো তারা দেখতে লাগল সেই ভয়ংকর লড়াই। কিন্তু অসীম ক্ষমতা আর সাহস বটে রাইয়ের। হঠাৎ সে চিন্তাটার পেটের নীচে পা গলিয়ে প্রচণ্ড লাথিতে তাকে ছিটকে ফেলল খাদে।

প্রাণীটা নীচে পড়তে-পড়তেও দু'টো থাবা দিয়ে খাদের কিনার ধরে ঝুলতে লাগল। রাই উঠে দাঁড়ালেন। সারা দেহ তাঁর রক্তাক্ত। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েই তিনি হেরম্যানের রিভলভারের সামনে পড়ে গেলেন। চিতাটার সঙ্গে লড়াইয়ের সময় তাঁর হাতের রাইফেল ছিটকে পড়েছে খাদে। চিতাকে লড়াইয়ে হারালেও হেরম্যানের হাতের অস্ত্রটা দেখে কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন রাই। তিনি আর না দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করলেন মঠে ওঠার রাস্তায়। সুদীপ্তরাও তাঁর পিছু ধাওয়া করল। রক্তাক্ত অবস্থাতেও সুদীপ্তদের চেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটছেন রাই, ব্যবধান প্রতি মুহূর্তেই বাড়ছে। আসলে সুদীপ্তরা তো তাঁর মতো এ অঞ্চলে ছোটাছুটিতে অভ্যস্ত নয়। তাদের পা বসে যাচ্ছে নরম তুষারে। ছুটতে-ছুটতে রাই একসময় উঠে পড়লেন মঠ চত্বরে। আর তাঁর পিছন পিছন সুদীপ্তরা।

ঠিক এই সময় সুদীপ্তদের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে রাইয়ের দিকে ছুটে গেল সেই তুষারাচিতাটা। রাইয়ের মতো মরণকে ফাঁকি দিয়ে বুলতে থাকা অবস্থায়ও শেষ পর্যন্ত উপরে উঠে এসেছে। তাঁদের তিনজনকে অনুসরণ করে সেও এখানে পৌছে গিয়েছে রাইয়ের উপর প্রতিশোধ নিতে। মঠ চত্বরে চোর্তেনের কাছে পৌঁছে থমকে একবার পিছনে ফিরলেন রাই। তিনি দেখতে পেয়ে গেলেন ধাবমান চিতাটাকে।

তাই দেখে তিনি যেন মঠের দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাতে ছুটলেন পাথুরে দেওয়ালের গায়ের সেই গুহার দিকে। তুষারাচিতাটাও তুষারবৃষ্টির মধ্যে ছুটল সে দিকে। রাই তখন গুহাটার প্রায় কাছাকাছি পৌছে গিয়েছেন, কিন্তু চিতাটারও তাঁকে ধরতে আর একটা মাত্র লাফ বাকি, হঠাৎ রাইফেলের গর্জনে কেঁপে উঠল চারদিক। আর তারপরই চিতাটা যেন শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। সে আর উঠল না। আর রাইও অদৃশ্য হয়ে গেলেন অন্ধকার গুহার ভিতর।

দাঁড়িয়ে পড়লেন সুদীপ্ত আর হেরম্যান। গুলিটা কে চালাল, বোঝার চেষ্টা করলেন তাঁরা। তখনও রাইফেলের গর্জন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এ পাহাড় থেকে সে পাহাড়ে। সুদীপ্তদের চোখ গেল। মঠের তোরণের দিকে। সেখানে দাড়িয়ে আছে দীর্ঘকায় এক ছায়ামূর্তি। তার হাতে ধরা রাইফেলের নলটা চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। তা হলে লামাই বেরিয়ে এসে গুলিটা চালালেন।

রাইফেল নামিয়ে সে লোকটা এর পর চত্বরের মধ্যে এগিয়ে আসতে শুরু করল। সে কিছুটা এগোবার পরই তার পোশাক দেখে সুদীপ্ত বুঝতে পারল, এ লোকটা লামা নন,

বীরবাহাদুর! সুদীপ্তরাও এগোল তাঁর দিকে।

বীরবাহাদুরের মুখোমুখি হয়ে হেরম্যান বিস্মিত ভাবে বলে উঠলেন, "আপনি ফিরে এসেছেন! কেন?"

বীরবাহাদুরের চোখেও কম বিস্ময় নয়। তিনি বললেন, "কেন এলাম, পরে বলছি। কিন্তু আপনারা এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? লামা বললেন, রাই নাকি চিতার কামড়ে আহত। আপনারা তাকে দেখতে গিয়ে আর ফেরেননি। কিন্তু রাইকে দেখে তো কিছু..."

তাঁর কথা শেষ করার আগেই হেরম্যান অতি সংক্ষেপে ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য বললেন, "রাই ফাঁদ পেতে আমাদের নিয়ে গিয়ে আটকে ফেলেছিলেন লোহার গরাদ বসানো এক গুহায়। ওই গুহায় চোরাই জিনিসপত্র রাখেন রাইরা। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আমাদের বেঁধে চিতাটার টোপ করবেন। কিন্তু আমাদের আটকে রাখার পর তিনি ফেরার আগেই পালাই আমরা। তবে ফেরার পথে আবার হঠাৎ মুখোমুখি হই ওঁর। রাই আমাদের গুলি করার আগেই আত্মগোপনকারী চিন্তাটা আক্রমণ করে ওঁকে। চিতাটাকে ছিটকে ফেলে রাই এখানে পালিয়ে আসে। তারপর..."

বীরবাহাদুরের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে তারা গিয়ে দাঁড়াল গুহার মুখে। বীরবাহাদুরের গুলি খেয়ে চিতাটা সেখানে পড়ে আছে। তুষারপাতে ধীরে-ধীরে ঢেকে যাচ্ছে তার দেহ। প্রকৃতির সন্তানকে যেন নিজের বুকে পরম মমতায় লুকিয়ে ফেলছে প্রকৃতি। চিতাটার দিকে তাকিয়ে আক্ষেপের সুরে বীরবাহাদুর বললেন, "ওকে মারতে খুব খারাপ লাগল। কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। তবে ওর খেপে যাওয়ার পিছনে কিন্তু প্রাণীটার নিজের দোষ ছিল না। রাইয়ের মতো মানুষদের লোভই এর জন্য দায়ী। লামা আমাকে আজ সব বলেছেন।"

সুদীপ্ত বলল, "হ্যাঁ, আমাদেরও বলেছেন। তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, রাই যে-কোনোও মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারেন!" ব্যাপারটা হয়তো কাকতালীয়, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে গুহার ভিতর থেকে টলতে-টলতে বেরিয়ে এলেন রাই। তাঁর চোখ দু'টো যেন ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, মুখ ফুলে উঠেছে। সব রক্ত যেন জমা হয়েছে তাঁর মুখে। মুখ ফাঁক করে আগের সেই শেরপাটার মতোই এক মুঠো বাতাসের জন্য হাকুপাঁকু করছেন। তিনি বেরিয়ে আসতেই তাঁর দিকে রিভলভার তাক করলেন হেরম্যান। কিন্তু রাইকে বাগে আনতে কোনও কিছুরই আর প্রয়োজন হল না। কয়েক পা এগিয়েই রাই হুমড়ি খেয়ে চিতাটার পাশে পড়ে গেলেন। সুদীপ্তরা বুকে পড়লেন তাঁর উপর। বীরবাহাদুর রাইয়ের মুখটা ঘুরিয়ে তাঁকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "কী হয়েছে তোমার? গুহার ভিতর কী আছে?"

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মুহূর্তের জন্য একবার চোখ খুলে রাই অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "গ্যাস ! নাইট্রোজেন।" তারপরই সংজ্ঞা হারালেন রাই। বীরবাহাদুর বললেন, "তার মানে প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন গ্যাসের ভাণ্ডার আছে এখানে। ওই শেরপাটা মুখ দিয়ে গ্যা গ্যা শব্দ করে গ্যাস কথাটাই বলতে চাইছিল।"

সুদীপ্ত বলল, "এখন আমাদের কী করা উচিত?" হেরম্যান বললেন, "লামা বাইরে

থেকে মঠে ফিরে না আসা পর্যন্ত মঠেই তাঁর জন্য অপেক্ষা করি।”

হেরম্যানের কথা শুনে বীরবাহাদুর বললেন, “বাইরে থেকে ফেরা মানে? উনি তো মঠের বাইরে যাননি। তবে এখন চলে যাবেন। আমি তার থেকে বিদায় নিয়ে এই তো এখন বাইরে বোরলাম। তারপর এই কাণ্ড!”

বিস্মিত সুদীপ্ত বলল, “লামা বাইরে যাননি মানে? তিনিই তো ওই চামড়ার পোশাক পরে গুহার ছাদ থেকে হাত বাড়িয়ে গরাদটা প্রথমে ভাঙলেন। তাঁকে আমরা দেখতে না পেলেও ইয়েতির দস্তানা পরা হাত, তাঁর ছায়া বরফের উপর স্পষ্ট দেখেছি।”

বীরবাহাদুর বললেন, “তা কী করে সম্ভব? আপনারা যখন মঠ ছেড়ে বেরিচ্ছেন, তখন আমি আপনাদের দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। আর তারপরই আমি মঠে এসে ঢুকেছিলাম। লামা মঠেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গেই তো আমি মঠে এতক্ষণ ছিলাম। আপনাদের ওখানে যাওয়া তো দূরের কথা, একবারের জন্যও তিনি ঘর থেকে বেরোননি।”

তাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হেরম্যান বেশ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, “এ ধাঁধার সমাধান একমাত্র লামা রিম্পুচিই করতে পারবেন। উনি মঠ ছেড়ে যাওয়ার আগেই এ ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার,” এই বলে তিনি ছুটলেন মঠের দিকে। তাকে অনুসরণ করলেন সুদীপ্ত আর বীরবাহাদুর।

ভিতরে ঢুকে প্রার্থনাকক্ষের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন সকলে। হেরম্যান উত্তেজিত ভাবে লামার উদ্দেশে বললেন, “লামা রিম্পুচি? আপনি কি ভিতরে আছেন? আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা বলতে চাই।”

বার কয়েক ডাকার পরও যখন তাঁর কোন ও সাড়া মিলল না, তখন দরজায় ধাক্কা দিতেই কপাট খুলে গেল। ভিতরে বুদ্ধমূর্তির সামনে একটা প্রদীপ জ্বলছে। কিন্তু লামাকে সেখানে লেখতে পেলেন না তাঁরা। মূর্তির কাছাকাছি পৌঁছতেই সুদীপ্তর প্রথমে যা নজরে এল, তা হল বেদির গায়ে ঝুলতে থাকা ভালুকের চামড়ার সেই পোশাকটা! রাজার মাথাটা বা লাল শালুমোড়া পুঁথিটা আর অবশ্য নেই। বাক্সটার ডালা খোলা, তার ভিতরটা শূন্য।

হেরম্যান, বীরবাহাদুরকে জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা, এই ইয়েতির পোশাক-দস্তানা, পায়ের ছাপওয়ালা জুতোগুলো কি এখানেই ছিল?” বীরবাহাদুর বললেন, “হ্যাঁ, আমি ঘরে ঢোকার পর থেকে এগুলো এমন ভাবেই এখানে ছিল। পুঁথি আর রাজার মাথাটাও ছিল।” ঠিক এই সময় সুদীপ্ত খেয়াল করল, বেদির উপর বুদ্ধমূর্তিটা যেন একপাশে বেশ কিছুটা সরে গিয়েছে। সুদীপ্ত ব্যাপারটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করতেই তার চোখে পড়ল সরে যাওয়া বুদ্ধমূর্তির নীচে দেখা যাচ্ছে একটা বেশ বড় গহ্বর। একজন মানুষ অবশ্যই প্রবেশ করতে পারে সেখানে। বীরবাহাদুর বেদির সেই ফোকরে টর্চের আলো ফেলতেই দেখা গেল থাক-থাক পাথুরে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে ভিতরে। হেরম্যান তাঁর টর্চের আলোটা প্রার্থনাকক্ষের চারপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে লামা ঘরের কোথাও আছেন কি না তা দেখে নিয়ে বললেন, “লামা সম্ভবত এই গহ্বরের পথেই গিয়েছেন, চলুন নীচে নামা যাক।”

সুদীপ্তরা এর পর একে-একে প্রবেশ করল সুড়ঙ্গে। সিঁড়ি বেয়ে বেশ অনেকটা নীচে নামল তারা। সামনে আরও-একটা লম্বা সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গের দেওয়ালে টর্চের আলো পড়তেই ফুটে উঠছে নানা অলঙ্করণ। কোথাও বা বুদ্ধমূর্তি, কোথাও জাতক কাহিনির নানা দৃশ্য, কোথাও আবার বৌদ্ধ ধর্মের নানা উপাচারের দৃশ্যাবলী। অবাক হয়ে সেগুলো দেখতে-দেখতে সুড়ঙ্গ ধরে এগোতে থাকলেন তাঁরা। তবে ছবিগুলো অনেক পুরনো। হেরম্যান মন্তব্য করলেন, "এসব ছবি কম সে কম তিন-চারশো বছরের পুরনো হবে।"

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এগোনোর পর একটা প্রাচীন কাঠের দরজার সামনে এসে উপস্থিত হল তারা। সেই দরজার মাথায় টর্চের আলো পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন সকলে। একটা ছবি আঁকা আছে সেখানে। অদ্ভুত এক ছবি। বানর জাতীয় বিরাট এক রোমশ প্রাণী বসে আছে একটা বেদির উপর, আর তাকে ঘিরে বসে আছেন উপাসনারত মুণ্ডিতমস্তক লামার দল। প্রাণীটার কাছে মানুষগুলোকে আকৃতিতে নেহাতই বামন বলে মনে হচ্ছে। হেরমান বিস্মিত ভাবে বললেন, "এ ছবিটা কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছে, তা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। ছবিটা কি নিছক কল্পনা করে এঁকেছিলেন প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা, নাকি এ ছবির মধ্যে সত্যি লুকিয়ে আছে?"

সুদীপ্তরা দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল। সে জায়গাটা বেশ বড় একটা গুহার মতো ঘর। অনেক ক'টা সুড়ঙ্গ নানা দিকে চলে গিয়েছে সে ঘর থেকে। হেরম্যান আর বীরবাহাদুর তাঁদের টর্চের আলো চারপাশে ঘোরাতেই ঘরটা দেখে বিস্মিত হয়ে গেল সকলে। অসংখ্য পাথরের তৈরি নল এ দেওয়াল ও দেওয়াল বেয়ে গিয়ে মিলেছে ঘরের ঠিক মাঝে একটা বেদির উপর রাখা বিরাট বড় স্ফটিকের তৈরি চৌবাচ্চার গায়ে। সে ঘরের সারা মেঝে আর দেওয়ালের গায়ের তাক জুড়ে রয়েছে অদ্ভুত আকৃতির নানা পাত্র। তাদের কোনটা স্বচ্ছ পাথরের যন্ত্রপাতি। কয়েকটা ধাতব নলও আছে চৌবাচ্চার গায়ে। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে হেরম্যান বললেন, "দেখে মনে হচ্ছে এটা প্রাচীন কোনও গবেষণাগার।"

তবে ঘরটা কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা। তুষারপাতের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার সময়ও কিন্তু এত ঠান্ডা লাগেনি সুদীপ্তর। হাড় কেঁপে যাচ্ছে, এমন ঠান্ডা ঘর। টর্চের আলোয় ধরা পড়ল দেওয়ালের চারপাশে কয়েকটা কুলুঙ্গিতে বেশ কয়েকটা বড়-বড় প্রদীপ রাখা আছে। সুদীপ্ত একটা প্রদীপ হাতে নিয়ে বুঝতে পারল, প্রদীপগুলো এখনও জ্বালানো হয়। ব্যাপারটা দেখে হেরমান ঘরের দেওয়ালের চারপাশে ঘুরে-ঘুরে লাইটার দিয়ে একে-একে সব প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে দিলেন। বেশ আলোকিত হয়ে উঠল ঘরটা। আরও ভাল করে ঘরটা এবার দেখে তিনজনেই বুঝতে পারল, সত্যিই এটা একটা ল্যাবরেটরি। সুদীপ্তর মনে হল, ঘরের মাঝখানে এগোতে-এগোতে বীরবাহাদুর নিজের মনেই বললেন, "আমি এরকমই কিছু একটা অনুমান করেছিলাম।"

কয়েক পা এগিয়ে একটা ছোট পাথরের টেবিলের উপর চোখ আটকে গেল। সুদীপ্তর। সেখানে রাখা আছে বেশ কয়েকটা পুরনো পুঁথি আর সেই বইটা, ক্রায়োনিক্স-ক্রয়োজেনিক্স।

সুদীপ্ত সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "আরে, দেখুন লাইব্রেরি থেকে নিখোঁজ সেই বইটা!"

হেরমান বইটা হাতে উঠিয়ে নিয়ে বললেন, "ক্রায়োনিক্স শব্দের মানেটা এবার মনে পড়েছে। ক্রায়োজেনিক্সের যে পদ্ধতিতে প্রাণীর শরীরকে বছরের পর-বছর ধরে অক্ষত রাখতে পারে, তাকে বলে ক্রায়োনিক্স। কেউ-কেউ বলেন ক্রায়োনিক্স সাহায্যে কোনও জীবন্ত প্রাণীকে বছরের পর-বছর শীতঘুমে রাখা যেতে পারে, পরে আবার তাকে জীবন্ত করা যেতে পারে। কী, ঠিক বললাম তো?" এই বলে হেরম্যান মৃদু হেসে তাকালেন বীরবাহাদুরের দিকে।

বীরবাহাদুর হেরম্যানের কথা শুনে একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

হেরমান এর পর তাকে বললেন, "আপনার কাছে ক্রায়োজেনিক্সের বই, আর এখানেও ক্রায়োজেনিক্সের বই, এ দুইয়ের মধ্যে কোথাও যেন একটা সম্পর্ক আছে তাই না? আমার অনুমান লামা হলেন আপনার..."

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বীরবাহাদুর বললেন, "হ্যাঁ, লামা রিম্পুচি আমার বৃদ্ধ পিতামহ। কিন্তু ব্যাপারটা আপনি আন্দাজ করলেন কীভাবে?"

হেরম্যান জবাব দিলেন, "আপনার প্রপিতামহর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার গল্প, তার সঙ্গে আপনার পিতামহর দেখা করতে আসা, আপনার গোপনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সর্বোপরি আপনাদের দু'জনের উচ্চতা ও দৈহিক গঠনের মধ্যে অদ্ভুত এক সাদৃশ্য, এসব মিলিয়েমিশিয়ে আমি ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিলাম। পুরো ব্যাপারটা সম্বন্ধে, আপনি কিছুটা আলোকপাত করবেন কি? তবে তার আগে ভাল করে দেখে নেই ঘরটা," এই বলে হেরম্যান এগোলেন ঘরের মাঝখানে বেদির দিকে।

হেরম্যানের কথায় স্মিত হেসে বীরবাহাদুর তাঁর সঙ্গে পা মেলালেন।

সুদীপ্তরা এসে দাঁড়ালেন ঘরের মাঝখানে সেই বেদিটার সামনে। তার উপর রাখা আছে স্বচ্ছ স্ফটিকের তৈরি লম্বা বাক্সটা। লম্বায় সেটা অন্তত বারো ফুট, চওড়ায় চার ফুট হবে। বাক্সের ডালাটা তার পিছনেই রাখা। বাক্সের ভিতরের দেওয়ালের চারপাশেও অসংখ্যা সরু-সরু পাথরের নল বসানো। টর্চের আলোয় বাক্সের গায়ের দাগ দেখে সুদীপ্তদের অনুমান হল, একসময় বাক্সটা কোনও ধরনের তরল বা গ্যাসে পূর্ণ ছিল। সারা ঘরের দেওয়ালে যে নলগুলো আছে, তার মাধ্যমেই কোনও তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ জমা হত এই বাক্সে। হঠাৎ বাক্সের কোনায় পড়ে থাকা কী একটা জিনিস তুলে আনলেন। হেরম্যান। এক গোছা বেশ বড় লোম। পকেট থেকে সেই কাগজের মোড়কটা বের করে তার ভিতরের লোমগুলোর পাশে নতুন লোমগুলোকে রাখলেন। হুবহু একই লোম।

বীরবাহাদুর বলে উঠলেন, "আমি এরকমই একটা আন্দাজ করেছিলাম।"

"কী আন্দাজ?" প্রশ্ন করল সুদীপ্ত।

বীরবাহাদুর বললেন, "আমি যতটুকু অনুমান করতে পারছি আর পারিবারিক সূত্রে যতটুকু জানি, তা আপনাদের এবার বলি। দুর্গাবাহাদুর গৃহত্যাগ করে যে এ মঠে এসেছিলেন, তা আমার পিতামহ জানতেন। তিনি তাঁর সঙ্গে মাঝে-মাঝে লেখা করতে

আসতেন, আমার বাবাও কয়েকবার এসেছিলেন, কিন্তু মঠের ভিতর তাঁদের প্রবেশাধিকার ছিল না। দুর্গাবাহাদুর ওরফে লামা ডং রিম্পুচি তাঁদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে সদর দরজা থেকেই বিদায় দিতেন।

"প্রাথমিক অবস্থায় আমি পারিবারিক সূত্রে এখানে আমার প্রপিতামহর উপস্থিতির কথা জানলেও তাঁর সম্বন্ধে তেমন একটা আগ্রহ প্রকাশ করিনি। কিন্তু তাঁর রক্তই তো বইছে আমার শরীরে। সম্ভবত সেই কারণেই আমার মধ্যেও পড়াশোনা ও বিজ্ঞানচর্চার নেশা শুরু হয়। দুর্গাবাহাদুর আমাদের চিতওয়ানের হাভেলিতে একটা লাইব্রেরি আর একটা ল্যাবরেটরি তৈরি করেছিলেন। এ দু'টো প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করতে শুরু করে আমাকে। এক-এক সময় আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগত, যে মানুষটা পড়াশোনা আর বিজ্ঞানচর্চায় এত আগ্রহী ছিলেন, তিনি হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে নির্জনে দিন কাটাতে গেলেন কেন? শুধু ধর্মের টানে রানার দেওয়া পুঁথি পড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন তিনি? এমন কী লেখা ছিল সেই পুঁথিতে ? সৌভাগ্যক্রমে পুঁথির কয়েকটা পাতা ছিল আমার বাড়িতে। বড় হওয়ার পর সে পুঁথির পাতা পড়তে সক্ষম হই আমি। ওই ক'টা পাতায় কোনও এক প্রাচীন লামা যা লিখে গিয়েছিলেন তার মর্মার্থ হল, হিমালয়ের কোলে কোনও এক মঠে তাঁরা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন দেবরূপে পূজিত এক অতিমানবকে, যিনি অতীব শক্তিধর। একদিন তিনি শীতদুম ভেঙে আবার জেগে উঠবেন। কীভাবে তাঁকে শীতঘুমে পাঠানো হয়েছিল, কীভাবে তাঁকে আবার জাগানো হবে, তা লেখা আছে। ওই পুঁথিতে। যে পুঁথিটা বুদ্ধমূর্তির কোলে রাখা আছে দেখতেন, সেটাই ছিল ওই পুঁথি।"

এর পর একটু থেমে বীরবাহাদুর বললেন, "পুঁথির আসল পাতাগুলো দুর্গাবাহাদুর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ওই তিনটে পাতাই আমার মনে রেখাপাত করে। "শীতঘুমে অতিমানবকে রাখা হয়েছে মানে কী? আর এর পরই তাঁর লাইব্রেরি ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বেশ কিছু ক্রায়োজেনিক্স সম্পর্কিত বই পেয়ে যাই আমি। বইগুলো পেয়ে আমি দেখলাম, তার মধ্যে যেখানে-যেখানে ক্রায়োনিক্স সম্পর্কে, বিশেষত জীবদেহ সংরক্ষণের ব্যাপারে লেখা আছে, সেখানে-সেখানে কালি দিয়ে দাগিয়ে রেখেছেন তিনি। এমনিতে কিন্তু কোনও বইয়ে কালি দিয়ে দাগাবার অভ্যোস তাঁর ছিল না। আমি তার বহু বই ঘাটাঘাঁটি করেছি।

"পুঁথির সেই 'শীতঘুম' আসলে কি তবে ক্রায়োনিক্স? একের পর-এক প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করে আমার মনে। ক্রায়োনিক্স, ক্রায়োজেনিসক্স নিয়ে আমি পড়াশোনাও শুরু করি। কিছু পরীক্ষাও চালাই। কিন্তু তাতে আমি সফল হইনি। মাঝখান থেকে এসব কাজ করতে গিয়ে প্রচুর ধারকর্জ হয়, রাইয়ের থেকে টাকা ধার করে ফাঁদে পড়ি আমি। সব দিক থেকে যখন আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, তখন দু'টো খবর আমার কানে আসে। এক, মিগু গুম্ফায় রাইয়ের অদ্ভুত অতিমানব দর্শন, আর মঠ ত্যাগ করে লামার অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার উদ্যোগ। দ্বিতীয় খবরটা আমি পেয়েছিলাম নীচের গুম্ফায় এক পরিচিত সন্ন্যাসীর কাছে। তুষারদেশের রাজার মাথাটা এ মঠের থেকে দেওয়া-নেওয়ার জন্য তিনি এখানে আসা-যাওয়া করতেন, কিন্তু মঠে তাঁরও প্রবেশাধিকার ছিল না। আমি ঠিক করে নিই, লামা মঠ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ

করার চেষ্টা করব। যদি তাঁর থেকে কিছু উত্তর মেলে আমার প্রশ্নগুলোর। চিন্তাটাকে মারার সরকারি নির্দেশ আমাকে সে সুযোগ করে দেয়। ইতিমধ্যে রাইও এসে হাজির হয়। তার টাকা ফেরত দিতে না পারায় তাকে খুশি করতে কাজে নিতে বাধ্য হই আমি। তখন অবশ্য আমি জানতাম না যে, চিতাটাকে সে-ই গুলি করেছিল। যাই হোক, তাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করি আমি। আমার সঙ্গে ছিল পুঁথির ক'টা পাতা। এখানে এসে গত রাতে তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করি আমি। তারপর আজ আবার এসেছিলাম, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

"আজ আবার এসেছিলেন কেন?" জানতে চাইল সুদীপ্ত। বীরবাহাদুর বললেন, "গত কাল তো তেমন কোনও কথা হয়নি। আজ এসেছিলাম তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য, আর পুঁথির পাতা কটা ফেরত দেওয়ার জন্য। তিনি পাতা ক'টা ফেরত দিতে অনুরোধ করেছিলেন। কারণ, ওই মাথাটা আর পুঁথিটাই শুধু তাঁর সঙ্গে যাবে বলে তিনি বলেছিলেন। আমার ধারণা ওই মাথাটাও সত্যিই তাদের কারও ছিল। আর কোনও প্রমাণ রেখে গেলেন না তিনি।"

হেরম্যান ব্যগ্র ভাবে বললেন, "কী-কী ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা হল? তবে কি ওই পুঁথি বা প্রাণীটার সম্বন্ধে কোনও কথা?"

বীরবাহাদুর জবাব দিলেন, "এখানকার নানা ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গে কথা হল। তবে ওই পুঁথি বা প্রাণীটার প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে। আমি কোনও আলোচনা করব না। যদি ওরকম কিছু থেকেও থাকে, তবে তাকে সবার অগোচরেই থাকতে দেওয়া উচিত। গল্পগাথার প্রাণী হয়ে তার আড়ালেই বেঁচে থাকুক সে।"

কথাগুলো বলে বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে বাক্সটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বীরবাহাদুর বললেন, "এখন ব্যাপারটা আমার কাছে অনেকটাই স্পষ্ট। এই মঠসংলগ্ন গুহার মধ্যে আছে নাইট্রোজেন গ্যাসের প্রাকৃতিক ভাণ্ডার। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ক্রায়োজেনিক্স বিদ্যার অন্যতম প্রধান উপাদান হল তরল হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই হাইড্রোজেনকে কাজে লাগিয়ে এই পাথরের আধারেই সম্ভবত ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের সেই অতিমানবকে। সভ্য পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের অনেক আগেই তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন ক্রায়োনিক্সের কৌশল।"

হেরম্যান বললেন, "আমারও তাই অনুমান। এবার বুঝতে পারছি লামার মুখ কেন অমন ফোলা-ফোলা লাগত। ওই নাইট্রোজেন গ্যাস পূর্ণ গুহায় যাওয়া-আসার কৌশল রপ্ত করলেও গ্যাসের প্রভাব থেকে নিজেকে তিনিও সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে পারতেন না।"

বিস্মিত সুদীপ্ত বলে উঠল, "তা হলে আমরা বরফে কার ছায়া দেখলাম? কে আমাদের গরাদ ভেঙে মুক্ত করল?"

হেরম্যান বললেন, "সন্দেহ একটা আগেই আমার হয়েছিল। লামা যত শক্তিশালী মানুষই হোন না কেন, ওরকম একটা লোহার খাঁচা কি তিনি শুধু হাতে ভেঙে ফেলতে পারেন? বেঁকিয়ে ফেলতে পারেন রাইফেলের ব্যারেল? খাড়া দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে যেতে পারেন?"

বীরবাহাদুর সুদীপ্তকে বললেন, "ও কাজগুলো যে করেছে। সম্ভবত সে হল সেই প্রাণী, লামার কথামতো যে গল্পগাথার প্রাণী হয়েই বেঁচে থাকবে এই হিমালয়ের বুকে। যাকে কেউ ডাকে বড়-পা বলে, কেউ বলে ইয়েতি, কেউ বা বলে, বরফদেশের রাজা।"

দিন দশেক পর কাঠমাণ্ডুর এক হোটেলে মুখোমুখি বসেছিল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। সুদীপ্তদের দলটা নির্বিঘ্নে সামিট করে, বেসকাম্প হয়ে গত কালই কাঠমাণ্ডু নেমেছে। তাদের সঙ্গেই নীচে নেমেছে সুদীপ্ত আর হেরম্যান। সুদীপ্তরা আজই কলকাতায় ফেরার জন্য রওনা হবে। আর হেরম্যানও ধরবেন দেশে ফেরার বিমান। বীরবাহাদুর চিতওয়ানে চলে গিয়েছেন দিন কয়েক আগে, আর রাই কোনও এক হাসপাতালে আছেন। গ্যাসের প্রভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছেন তিনি, আর কোনওদিন রাইফেল ধরতে পারবেন না লোকটি। বীরবাহাদুর ব্যাপারটা সুদীপ্তদের জানিয়েছেন।

সে রাতের ঘটনার পর দু'দিন ধরে অনেক খোঁজ চালানোর পরও লামা ডং রিম্পুচির আর কোনও খোঁজ মেলেনি। পাওয়া যায়নি। সেই পুঁথি আর রাজার মাথাটাও। তবে আজ স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রে একটা অদ্ভুত খবর বেরিয়েছে। সে কাগজটা সুদীপ্তদের সামনে টেবিলের উপরই রাখা। কাগজে লেখা হয়েছে চারদিন আগে নন্দাদেবীর পথে প্রায় পনেরো হাজার ফিট উচ্চতায় দিনের শেষে তাঁবু ফেলেছিল এক অভিযাত্রী লাল। জায়গাটার কাছেই একটা গিরিবর্ত আছে। তঁবু ফেলার পর একজন ছোকরা শেরপা কী একটা কারণে সেই গিরিবর্তের মুখটায় গিয়ে দাড়ায়। তখনই সে নাকি দেখতে পায় এক অদ্ভুত দৃশ্য। আনুমানিক পাঁচশো ফিট দূরে উলটো দিকে একটা পাহাড়ের তাকে বসে আছেন একজন লামা ও বিরাট দর্শন কালো লোমে ঢাকা বাঁদরের মতো এক জন্তু। তার আকৃতি আনুমানিক বারোচোদ্দো ফুট হবে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই তাঁরা দেখতে পেয়ে যান ছেলেটাকে। সেই লামা সঙ্গে-সঙ্গে আঁকড়ে ধরেন প্রাণীটার গলা এবং প্রাণীটাও তাঁকে পিঠে নিয়ে খাড়া দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করে। ছেলেটা যখন সে দৃশ্য দেখানোর জন্য তাঁবুতে দৌড়ে গিয়ে অন্যদের সেখানে নিয়ে পৌঁছয়, তখন আর সে জায়গায় কেউ নেই। শেষ বিকেলের বিষণ্ণ লাল আলো আর হিমেল বাতাস শুধু খেলা করছে নিঃসঙ্গ পাহাড়ের গায়ে। খবরের কাগজের রিপোর্টারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এত উঁচুতে ওই ছেলেটা এই প্রথম উঠেছে। মস্তিষ্কে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় হ্যালুসিনেশন হতে পারে তার। তা ছাড়া আগের দিন রাতেই নাকি তাঁবুতে ইয়েতির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, সেটাও তার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাকে

ওই অলীক দৃশ্য দেখাতে পারে। যাই হোক না কেন, ছেলেটাকে নীচে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

সদ্য পড়া কাগজটার দিকে চোখ রেখে নিশ্চুপ ভাবে বসে ছিল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। সুদীপ্ত একসময় বলল, "ধরে নিলাম। লামা আর প্রাণীটাকে দেখেছিল ওই ছেলেটা। কিন্তু তা বলে লামাকে পিঠে নিয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে ওঠা! এটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? কোনও প্রাণীকে কি এতটা পোষ মানানো সম্ভব?"

হেরম্যান মুহূর্তখানেক নিশ্চপ থেকে বললেন, "অসম্ভব নয়। ইন্দোচিন সীমান্তে থাইল্যান্ডের ঘন জঙ্গলে নাকি 'পিটং-লুয়াং' নামের এক ধরনের বাঁদর আছে, যাদের মস্তিষ্ক উন্নত ও হাত-পায়ের গড়ন অবিকল মানুষের মতো। গল্প-কাহিনিতে শোনা যায় যে, সে দেশের রাজা চুলালঙকর্ণ নাকি তার রাজদরবারে ওই বাঁদরদের একজনকে বালক-কাজের লোক হিসেবে লাগিয়েছিলেন। সব গল্পের পিছনেই কিছুটা সত্যি লুকিয়ে থাকে। হতে পারে লামা ডং রিম্পুচির সঙ্গী অতিকায় আদিম বাঁদর জায়গান্টোপিথিকসের কোনও টিকে যাওয়া বংশধারা। পিটং-লুয়াংয়ের মতো সে বাঁদরই, শুধু আকারে বড়।"

হেরম্যান এর পর উঠে গিয়ে দাড়ালেন খোলা জানলার সামনে। সুদীপ্তও গিয়ে দাঁড়াল তাঁর পাশে। জানলার বাইরে দূরে মেঘমুক্ত নীল আকাশের নীচে আপন গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উত্তুঙ্গ গিরিরাজ হিমালয়। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে তার তুষারধবল কিরীটিমালা। সেদিকে তাকিয়ে সুদীপ্ত মুগ্ধ হয়ে বলল, "আশ্চর্য সুন্দর!"

হেরম্যান বললেন, "হিমালয় শুধু সুন্দর নয়, রহস্যময়ও বটে। ওরই কোনও তুষারস্নাত প্রান্তরে অথবা নির্জন গিরিসংকটে হয়তো লামা ডং রিম্পুচিকে পিঠে নিয়ে অজানার উদ্দেশে এগিয়ে চলেছে আমার সেই ক্রিপটিড। যাকে কেউ বলে ইয়েতি, কেউ বলে বড়-পা, আবার কেউ ডাকে বরফ দেশের রাজা!"

কোস্টারিকার রক্তচোষা

সুদীপ্তদের ফকার প্লেনটা বেশ নিচ দিয়েই উড়ে চলছিল উত্তর-পূর্ব অভিমুখে। কোস্টারিকার রাজধানী সানহোসের বিমানবন্দরকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে তারা। সূর্যস্নাত সকালে পাখির মতো উড়ে চলেছে সুদীপ্তদের ছোট্ট সাদা প্লেনটা। তাদের গন্তব্য ক্যারিবিয়ান উপকূলের কোস্টারিকা-নিকারগুয়া সীমান্তের একটা ছোট্ট জনপদ। সূর্যালোক ওপর থেকে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জনপদ-শস্যক্ষেত্র-বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অতিক্রম করে নিচে দেখা দিতে শুরু করেছে রুক্ষ পাহাড়ের সারি। উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে সে পাহাড় শ্রেণি চলে গেছে দক্ষিণ-পূর্বে। ওপর থেকে যেদিকেই তাকিয়ে ছিল সুদীপ্ত। একটা পাহড়ের মাথায় বেশ বড় একটা গহ্বর চোখে পড়ল তার। ক্রেটার! সুদীপ্ত পাশে বসা হেরম্যানকে বলল, 'ওই দেখুন, একটা জ্বালামুখ!'

সুদীপ্তর কথাটা মনে হয় কানে গেল 'ফোর মিস্টার ফকার প্লেনের পাইলটের পাশে বসা কো-পাইলটের। তিনি সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে বললেন। এই পর্বতমালাতে চারটে আগ্নেয়গিরি আছে। এর দক্ষিণভাগে ইরাজু নামে আগ্নেয় পর্বত সবচেয়ে উচ্চতম এবং তা এখনও মাঝে মাঝে তা জেগে ওঠে। ছাইয়ের চাদরে এখন চারপাশ ঢেকে যায়।'

হেরম্যান, সুদীপ্তকে বললেন, 'এই আগ্নেয়গিরিগুলোর খনিজ পদার্থ মিশ্রিত ছাই-ই কিন্তু কোস্টারিকার মাটিকে উর্বরতা দান করেছে। একদিকে উন্নত কৃষিজমি, আর অন্যদিকে সমুদ্রর সান্নিধ্য, এই দুয়ে মিলে দেশটাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এ দেশের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল ভাগ একটু শুষ্ক, কিন্তু আমরা যে দিকে যাচ্ছি সেই ক্যারিবিয়ান সাগর উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যার ফলে ও অঞ্চলে জলা-জঙ্গলের আধিক্য আছে। জনসংখ্যা ওদিকে দেশের অন্য অংশর তুলনায় কম। কিছু মেস্টিজো আর নেটিভ আমেরিকানরা বাস করে ওখানে। পশুপালনই তাদের জীবিকা। আচ্ছা, তুমি 'কোস্টারিকা' নামের অর্থ জানো তো?'
সুদীপ্ত হেসে বলল, 'হ্যাঁ, জানি। সান হোসের এয়ারপোর্টে একটা ব্রোশিওর-এ দেখলাম। 'কোস্টারিকা' শব্দের অর্থ 'সমৃদ্ধ উপকূল'। স্পেনিয়ার্ডরা ওই ক্যারিবিয়ান উপকূল দিয়ে তাদের ব্যবসাবাণিজ্য চালাত। ওখানকার বন্দরগুলোর মাধ্যমে ক্যারিবিয়ান সাগরে তাদের সামরিক আধিপত্যও কায়েম রাখত। একসময় নাকি কোস্টারিকার বিস্তীর্ণ সমুদ্রতটে ক্যারিবিয়ান জলদস্যুদের ঘাঁটি ছিল। তবে আপনার বলা ওই 'মেস্টিজো' শব্দের মানে আমার জানা নেই।'

হেরম্যান বললেন, 'স্পেনীয়রা দীর্ঘদিন এ দেশে ছিল। স্পেনীয় ও নেটিভ আমেরিকানদের রক্তর সংমিশ্রণে যাদের জন্ম তাদের বলা হয় মেস্টিজো। আমরা যে পশুখামার মালিকের

আতিথেয়তা গ্রহণ করতে যাচ্ছি মিস্টার—গ্যাব্রিয়েল জাতিতে একজন মেস্টিজো। ওদের ওই গ্রামটা নাকি প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো। স্পেনীয়দের একটা প্রাচীন চার্চকে ঘিরে গ্রামের বিস্তার। দেশের ওই অংশের মানুষদের মতো ওই গ্রামের মানুষেরও প্রধান জীবিকা পশু পালন। আর বুঝতেই পারছ সেই পশুগুলোর ওপর যদি একের পর এক আক্রমণ নেমে আসে, কেউ যদি একের পর এক প্রাণীগুলোকে হত্যা করে তাদের রক্ত চুষে নেয় তবে খামার মালিকদের অবস্থা কী হতে পারে।' হেরম্যানের কথার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হল না সুদীপ্তর। সে বলল, 'ব্লাড সাকার' বা 'রক্তচোষা' কথাটা শুনলেই প্রথমেই মনে হয় 'ভ্যাম্পায়ার ব্যাট' বা 'রক্তচোষা বাদুড়ের' কথা।'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'তা ঠিক। এ দেশের ট্রপিকাল রেন 'ফরেস্টে বহু প্রজাতির বাদুড় পাওয়া যায়। এবং এ আরও ঠিক যে তাদের মধ্যে কয়েক প্রজাতির ভ্যাম্পায়ার ব্যাটও আছে। কিন্তু তারা খুব ক্ষুদ্র, আকারে হাতের তালুর চেয়েও ছোট। গবাদি পশুর গা বেয়ে উঠে ঘাড়, গলা, পাঁজর বা দুগ্ধ বাট থেকে রক্তপান করে। কিন্তু তারা প্রাণী হত্যা করতে পারে না। যে ঘটনাগুলোর কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্পষ্ট যে, কোন রক্তচোষা বড় প্রাণীর সংক্রমণেই মৃত্যু হচ্ছে গবাদি পশুদের। পুর্তোরিকা, চিলি, মেক্সিকো, সেন্ট্রাল আমেরিকার বিভিন্ন দেশে চুপাকাবরার হানার যেসব ঘটনা শোনা গেছে তার সাথে হুবহু মিল পাওয়া যাচ্ছে এ ঘটনার। মৃত প্রাণীগুলোর বুকে গভীর ক্ষত। রক্তহীন দেহ!'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'এই ক্রিপটিডটা দেখতে কেমন হতে পারে?'

হেরম্যান বললেন, 'এ ধরনের প্রাণীর সংবাদ মেলে ১৯৭৫ সালে পুর্তোরিকোর মোকা নামের এক শহরে। সেটাই প্রথম খবর। তারপর পুর্তোরিকোর কনভেনাস নামে আর এক ছোট শহরে হানা দিয়ে বহু প্রাণীকে হত্যা করে সেই রক্তচোষা। মাঝে কুড়ি বছর আর তার কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। সে আবার প্রচারের আলোতে আসে ১৯৯৫ সালে। পুর্তোরিকোর এক খামারে এক রাতে সাতটা পশুকে হত্যা করে সে। আর তার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে সেন্ট্রাল আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে চুপকাবরার হানার সংবাদ মিলছে। মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, হান্ডুরাস, কোস্টারিকা...। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী প্রাণীটা আকারে পাঁচ ফুট মতো। দেহ-আবরণ রোম হীন কালো খসখসে। ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত মেরুদণ্ড বরাবর করাতের দাঁতের মতো হাড়ের কাঁটা আছে। কিছু প্রজাতির ডাইনোসরদের যেমন থাকত। লাল টকটকে দুটো চোখ, ছোট নাসারন্ধ্র, ছুঁচালো চোয়াল, পাতলা ঠোঁট, চোয়ালে বসানো আছে সাপের মতো সার সার তীক্ষ্ম বাঁকানো দাঁত। হাত পায়ের আঙুলও নখর যুক্ত। উত্তেজিত হলে পিঠের কাঁটাগুলো করাতের মতো জেগে ওঠে। বানরের মতো সে খুব জোরে ছুটতে পারে, লাফাতে পারে। নিকারাগুয়াতে একবার জাগুয়ার শিকারিদের ফাঁদে পড়ে মারা গেছিল হুবহু অমন দেখতে এক প্রাণী। জীববিজ্ঞানীরা তার দেহ পরীক্ষা করে এক অদ্ভুত তত্ত্ব দেন। তারা বলেছিলেন প্রাণীটা নাকি কোনো একক প্রাণী নয়, বহু জীবের সংমিশ্রণ ঘটেছে তার দেহে। সংকর প্রাণী। অদ্ভুত পাঁচটি জীবের মিশ্রণ আছে সে দেহে। সে দেহ এখন সংরক্ষিত থাকলেও

কোন অজানা কারণে ভবিষ্যতে আর বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। এটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা।'

হেরম্যানের কথা শুনে সুদীপ্ত একবার সেই বীভৎস প্রাণীর অবয়ব মনে মনে কল্পনা করে নিল। ইতিপূর্বে সুদীপ্ত আর হেরম্যান বহু অভিযানে সামিল হয়েছে 'ক্রিপটিড' অর্থাৎ রূপকথা-লোককথায় বর্ণিত, অথবা পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত প্রাণীদের খোঁজে। কখনও ইজিপ্টের প্রাচীন নগরীতে সিংহ মানুষের খোঁজে, অস্ট্রেলিয় সমুদ্রের গভীরে দানব অক্টোপাস বা বোর্নিওর আগ্নেয়গিরিকে প্রাগৈতিহাসিক উড়ুক্কু দানব 'সাহুলের খোঁজে। কখনও বা আবার তারা পাড়ি জমিয়েছে তুষারাবৃত হিমালয়ের পর্বত কন্দরে 'ইয়েতি' অথবা পিগমি অধ্যুষিত আফ্রিকার বুরুন্ডিতে 'সবুজ মানুষের সন্ধানে। কিন্তু সেসব প্রাণী যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন তারা কেউ 'রক্তচোষা' ছিল না। 'রক্তচোষা' শব্দটার মধ্যেই কেমন যেন একটা ভয়ঙ্কর ভাব আছে! যে শব্দটা কানে এলেই শিহরণ জাগে। হিমেল রক্তের স্রোত বয়ে ধমনীতে! সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'ওই প্রাণীটার সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী?'

সুদীপ্তদের প্লেনটা আগ্নেয় পর্বতের মাথা অতিক্রম করে অন্য দিকে প্রবেশ করছে। পাহাড়ের অন্যদিকে চোখে পড়ছে ঘন বনাঞ্চল। ওপর থেকে সেদিকে তাকিয়ে হেরম্যান বললেন, 'কোস্টারিকার কুয়াশাবৃত ঘন বর্ষা বনে এখনও এমন অনেক জায়গা আছে যার সম্বন্ধে সভ্য পৃথিবী তেমন কিছু জানেনা। সেখানে প্রাগৈতিহাসিক অথবা অচেনা কোনো জীবের লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। হয়তো সেখান থেকেই রক্তর সন্ধানে লোকালয়ে এসে হানা দেয় সে প্রাণী! তবে চুপাকাবরা নিয়ে আর একটা অদ্ভুত তত্ত্ব দেন কেউ কেউ...।'

'কী তত্ত্ব?' প্রশ্ন করল সুদীপ্ত।

হেরম্যান বললেন, 'তুমি নিশ্চই জানো কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা পৃথিবীর বুকে ভিনগ্রহর প্রাণীর আগমনের ব্যাপারে বিশ্বাসী? ব্যাপারটা বিতর্কিত হলেও সে সম্বন্ধে বেশ কিছু যুক্তিও খাড়া করেন তারা। প্রচলিত ধারণায় শিক্ষিত বিজ্ঞানীরাও কিন্তু তাদের সব যুক্তি খণ্ডন করতে পারেননা। 'এলিয়ন' বা ভিনগ্রহীদের নিয়ে যারা চর্চা করেন তাদের বক্তব্য 'চুপাকাবরা' হল কোনো ভিনগ্রহর প্রাণী ও পৃথিবীর প্রাণীর সংমিশ্রণে তৈরি প্রাণী। ভিনগ্রহী গ্রে-এলিয়ন আর পৃথিবীর কোনো হিংস্র প্রাণীর রক্তে সৃষ্ট চুপকাবরা। বিজাতীয় হিংস্রতা নিয়ে যে আক্রমণ করে তার শিকারকে। হঠাৎই আবির্ভূত হয়, আবার হঠাৎই মিলিয়ে যায় তারা। কারো কারো ধারণা চুপকাবরা অদৃশ্য হতে পারে। তবে এ ভাবনা মানুষের একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়। প্রাণীটা খুব ক্ষিপ্রগতির বলেই সম্ভবত মানুষের মনে এ ধারণা তৈরি হয়েছে।'

এয়ার পকেটে পড়ে একবার বেশ দুলে উঠল সুদীপ্তদের ছোট্ট প্লেনটা। নিজেকে সামলে নিয়ে নিচের কুয়াশামাখা বনাঞ্চলের দিকে চোখ রেখে সুদীপ্ত বলল, 'আজ পর্যন্ত আমরা যত ক্রিপটিডের সন্ধানে গেছি তাদের সঙ্গে কিন্তু ভিনগ্রহের প্রাণীর সম্পর্কর কথা শুনিনি। চুপকাবরা সম্বন্ধে এমন ভাবনার পিছনে কোনো বিশেষ কারণ আছে কি?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'তা একটা আছে। সে ব্যাপারটাও বেশ বিতর্কিত পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের কাছে। যেখানে যেখানে চুপাকাবরার খবর মিলেছে সেখানকার আকাশেই

কিন্তু দেখা গেছে 'আন আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট' বা 'ইউ.এফ.ও'। চলতি কথায় যাকে ভিনগ্রহীদের মহাকাশ যান বলা হয়। তুমি তার কথা শুনেছ নিশ্চই?'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'শুনেছি। কল্পবিজ্ঞানের গল্পে পড়েছি। বেশ কয়েকটা হলিউড সিনেমাও দেখেছি ওই 'ইউ.এফ.ও' বা 'ফ্লাইং সসার নিয়ে।' হেরম্যান বললেন, 'কারো কারো বক্তব্য ওইসব 'ইউ এফ ও' থেকে পরিকল্পনামাফিক ছাড়া হচ্ছে 'চুপাকাবরা' বা 'গোট সাকারদের'। প্রথমে তারা নির্জন জায়গাতে নিরীহ প্রাণীদের ওপর হত্যার তালিম নিচ্ছে। এরপর এক সময় তারা দ্রুত বংশবিস্তার করে আক্রমণ হানবে মানুষের ওপর। এইসব ছোট ছোট দেশকে প্রথমে জনশূন্য করে ভিনগ্রহীরা প্রথমে ঘাঁটি গাড়বে এ সব জায়গাতে। তারপর আক্রমণ করবে সারা পৃথিবীকে। আমি অবশ্য এ সব তত্ত্বে বিশ্বাসী নই। আমার ধারণা প্রাণীটা কোস্টারিকার জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা এই পৃথিবীরই নতুন কোনো সংকর জীব বা কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী। ভিনগ্রহর প্রাণী বা তার সংকরের ব্যাপারটা ঠিক আমার কল্পনায় আসে না।'

সুদীপ্ত বলল, 'তবে একটা কথা বলা যেতেই পারে যে আজ পর্যন্ত যেসব ক্রিপটিডের সন্ধানে আমরা পাহাড়-জঙ্গল-সমুদ্র-মরুভূমি চষে বেড়িয়েছি তাদের মধ্যে চুপাকাবরাই নবীনতম। আর তার আচরণও হয়তো বা সবচেয়ে বেশী নৃশংস।'

হেরম্যান বললেন, 'আর, ক্রিপটিডের সন্ধানে আমেরিকা মহাদেশে এটাই আমাদের প্রথম অভিযান।'

'আপনারা কি তবে চুপাকাবরার খোঁজে সান মারিয়া যাচ্ছেন?'—প্রশ্নটা কানে যেতেই সুদীপ্তরা দেখল তাদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছেন কো পাইলট ভদ্রলোক। তার ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি। সম্ভবত তিনি এতক্ষণ সুদীপ্তদের কথা শুনছিলেন ও প্রশ্নটা করলেন।

ব্যাপারটা আর তার কাছে গোপন করে লাভ নেই তাই হেরম্যান বললেন, 'তা বলতে পারেন। নতুন নতুন প্রাণী খোঁজা আমাদের নেশা। আপনি তো ওখানে যাওয়া আসা করেন। ওই প্রাণীর ব্যাপারে আপনার কোনো কিছু জানা আছে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'খবরের কাগজে যেটুকু খবর বেরিয়েছে সেটুকুই জানা। আমরা এয়ারপোর্টের বাইরে যাইনা। গ্রামটা এয়ারপোর্ট থেকে বেশ খানিকটা দূর। আমার ধারণা চুপাকারবার ব্যাপারটা গ্রামবাসীদের বানানো গল্প। বেশ কয়েকটা পশুখামার আছে ওখানে। চারণ জমির দখল নিয়ে তাদের মধ্যে রেষারেষি হয় বলে শুনেছি। সম্ভবত তারাই একে অন্যের খামারে পশু হত্যা করছে। তবে চুপাকাবরার বাপারটা খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় গ্রামটার কথা অনেকদূর ছড়িয়েছে। সাধারণ বাইরের লোক খুব একটা ওখানে আসা-যাওয়া করেনা। আমরা সরকারি লোক বা খামার মালিকদের নিয়ে আসা-যাওয়া করি তাদের প্রয়োজন মতো। আপনারা যেমন ওখানে যাচ্ছেন তেমনই দু-দিন আগে এক স্পেনীয় ভদ্রলোককে ওখানে নামিয়ে দিয়ে এলাম।'

হেরম্যান বললেন, 'তিনিও কি চুপাকবরার সন্ধানেই ওখানে গেছেন?'

কো-পাইলট হেসে বললেন, 'তিনি কিছু বলেননি। তবে এখন মনে হচ্ছে তিনিও

হয়তো আপনাদের মতো একই কারণে ওখানে গেছেন। যা শুনেছি ও গ্রামে দেখার মতো কিছু নেই। বাইরের লোক এত খরচা করে ওখানে হঠাৎ ছুটে যাবে কেন?'

পাইলট এবার যেন কী একটা বললেন কো-পাইলট ভদ্রলোককে। তা শুনে তিনি কথা থামিয়ে হেডফোন তুলে কানে লাগিয়ে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন।

হেরম্যান তাকালেন সুদীপ্তর দিকে। তার কপালে যেন কয়েকটা ভাঁজ ফুটে উঠেছে। সুদীপ্ত বলল, 'কী ভাবছেন, ওই স্পেনিয়ার্ড ভদ্রলোক আমাদেরই মতো কেউ কিনা?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'না হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। দেখা যাক...

গিরিশ্রেণি অতিক্রম করে অন্যপাশে উপস্থিত হয়েছে সুদীপ্তরা। অনেক নীচে পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে আদিম মহাবৃক্ষর জঙ্গল। মেঘ ভাসছে তার মাথার ওপরে। কোনো কোনো জঙ্গল আবার মেঘে আচ্ছাদিত। ওপর থেকে সেদিকে দেখিয়ে হেরম্যান বললেন, 'ওগুলোকে বলে ক্লাউড ফরেস্ট। রেন ফরেস্টের মতো ক্লাউড ফরেস্টেও কোস্টারিকাতে আছে। যা পৃথিবীর খুব অল্প জায়গাতেই দেখা যায়।'—এ কথা বলে সে দিকে তাকিয়ে কী যেন চিন্তায় ডুবে গেলেন হেরম্যান। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ওপর থেকে এক জায়গাতে ফাঁকা জমি দেখা গেল। তার মাথার ওপর পাক খেয়ে সেদিকে নামতে সুরু করল সুদীপ্তদের ছোট্ট ফকার প্লেনটা। কিছুক্ষণের মধ্যে মাটি ছুঁলো তারা।

পাহাড়ের ঢালের ঠিক নীচে এক ফালি লম্বাটে জমিতে কাঁটাতার ঘিরে এয়ারপোর্ট বানানো হয়েছে। দেখে বোঝাই যায় বড় প্লেন নামতে পারেনা সেখানে। প্রস্থান তোরণের গায়েই কাঠের তৈরি একটা দোতালা বাড়ির মাথায় রাজার বসানো এয়ারট্রাফিক কন্ট্রোল রুম। সামান্য কয়েকজন কর্মচারী সেখানে। এয়ারপোর্ট থেকে চেক-আউটের সময় একটা খাতায় সুদীপ্তদের নাম-ঠিকানা, আসার কারণ লিপিবদ্ধ করতে হল। হেরম্যান সেখানে আসার কারণ হিসাবে লিখলেন 'নেচার অবজারভেশন' অর্থাৎ 'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ'। তা দেখে যে বিমানবন্দর কর্মী সুদীপ্তদের সামনে খাতাটা মেলে ধরেছিলেন তিনি মন্তব্য করলেন, 'আজকাল অনেকেই দেখছি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে এখানে আসছেন! বেশ ভালো ব্যাপার।'

কথাটা শুনে হেরম্যান লোকটার দিকে তাকাতেই সে খাতার এক জায়গাতে আঙুল ছোঁয়াল। সেখানে সুদীপ্তদের মতোই লেখা আছে এক স্পেনীয়র নাম—গঞ্জালো-ডি-কোস্টা। এখানে আসার কারণ হিসাবে তিনিও সুদীপ্তদের মতো একই কথা লিখেছেন—'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ!' হেরম্যান সে জায়গা ছেড়ে বেরোবার সময় বললেন, 'যাক, ভদ্রলোকের নাম জানা গেল। নিশ্চই তার সাথে সাক্ষাৎ হবে। তিনি যদি আমাদেরই মতো ক্রিপ্টোজুলজিস্ট হন, তবে তাঁর আপত্তি না থাকলে একসাথে চুপাকাবরার সন্ধান করা যেতে পারে।'

সুদীপ্তরা এয়ারপোর্টের বাইরে ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গাতে এসে দাঁড়াতেই তাদের দেখে সামনে এসে দাঁড়ালেন এক ভদ্রলোক। পরনে টি-শার্ট আর জিনস। হাইহিল বুট। মাথায় কাউবয়দের মতো বারান্দা অলা চামড়ার টুপি। ঠোঁটের কোণে গোঁজা আছে একটা পাইপ। মৃদু ধূম উদ্‌গিরণ হচ্ছে তার থেকে। গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা লালচে দাড়িঅলা সেই ভদ্রলোক বাঁ হাতে মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে, ডান হাতটা হেরম্যানের উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে মৃদু হেসে তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনি নিশ্চই হেরম্যান? আমি পেড্রো। আমি ভাবতেই পারিনি শেষ পর্যন্ত আপনারা এখানে সত্যিই আসবেন!'

হেরম্যান পেড্রোর সাথে করমর্দন করে সুদীপ্তর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর। সুদীপ্তও করমর্দন করল তার সাথে। হেরম্যান এরপর লোকটার উদ্দেশ্যে বলল, 'আজকাল ইন্টারনেটের যুগে পৃথিবীটা বেশ ছোট হয়ে গেছে। তাই আপনার খোঁজ পেতে, আপনার সাথে যোগাযোগ করতে খুব বেশি অসুবিধা হল না। কুড়ি বছর আগে হলেও এ ব্যাপারটা অকল্পনীয় ছিল।'

হেরম্যানের কথা শুনে ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'তা ঠিক। নইলে কোথায় জার্মানি, কোথায়-ইন্ডিয়া, আর কোথায় আমাদের এই ছোট্ট দেশ কোস্টারিকা! সান সারিয়াতে আপনাদের স্বাগত। চলুন এবার। আধ ঘণ্টা মতো পথ আপনাদের গাড়িতে যেতে হবে।' এই বলে তিনি সুদীপ্তদের নিয়ে এগোলেন কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যান্ডরোভারের দিকে। চালকের সামনে উঠে বসলেন পেড্রো। সুদীপ্তরাও উঠে বসল গাড়িতে। চলতে শুরু করল ল্যান্ডরোভার। এয়ারপোর্টের বাইরে একটা ছোট বাজার। ফল, ফুল বিক্রি হচ্ছে সেখানে। ফুলের টুকরি হাতে রঙচঙে পোশাক পরা মহিলা আর পানামা হ্যাট পরা লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। শস্য বোঝাই বেশ কয়েকটা দাঁড়ে টানা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তাদের চাকাগুলো বেশ রঙচঙে। এই 'বুল কার্ট' হল কোস্টারিকার জাতীয় প্রতীক-এ ব্যাপারটা সুদীপ্তদের জানালেন পেড্রো।

বাজার ছাড়িয়ে পাহাড়ের ঢালের কোণ ঘেষে চলতে শুরু করল সুদীপ্তদের গাড়ি। কিছুটা পথ এগোবার পরই রাস্তার একপাশে শুরু হল ঘাসে ছাওয়া জমি। একপাশে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের ঢাল, অন্যদিকে সেই ফাঁকা জমি। সেই জমিগুলোর মাঝে মাঝে নামফলক পোঁতা আছে।

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'ওগুলো কীসের নাম ফলক?'

গাড়ি চালাতে চালাতে পেড্রো বললেন, 'এগুলোই হল 'গেজিং-ফিল্ড' বা চারণ ভূমি।

সরকারের থেকে এ সব জমি ইজারা নিই আমরা। জমির মালিকরা ওই নামফলক বসিয়ে তাদের জমির সীমানা নির্ধারণ করেছে।'

তার কথা শেষ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর থেকে একটা বিশাল ভেড়ার পালকে চড়তে দেখল সুদীপ্তরা। তাদের তদারকিতে কয়েকজন ঘোড়ার পিঠে চাপা কাউবয়।'

হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, আপনারা যারা খামার মালিক, আপনাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন?'

পেড্রো বললেন, 'ভালো-মন্দ মিলিয়ে। একটা সময় ছিল যখন পতিত চারণ ভূমি নিয়ে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকত। এবং তার নিষ্পত্তি যেত পিস্তল ডুয়েলের মাধ্যমে। সে অবশ্য একশো বছর আগের কথা। এখনও যে ঝগড়া-বিবাদ হয় না তা নয়, তবে সরকারি লোকরা সে বিবাদের নিষ্পত্তি করেন। গ্রামে একজন পুলিশ অফিসারও আছে। তিনিও কিছুটা সামাল দেন সমস্ত ব্যাপার।'

সুদীপ্ত বলল, 'এমনও তো হতে পারে যে অন্য কোনো খামার মালিক আপনার ক্ষতি করার জঘন্য কাজটা করছে? পশুহত্যা করছে?'

রাস্তার দিকে চোখ রেখে হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে পেড্রো জবাব দিলেন। চারটে খামারে এ ঘটনা ঘটেছে গত তিনমাসে। আমার প্রতিবেশী এক খামার মালিকের সাথে আমার বিবাদ আছে। তারও চারটে প্রাণী মারা পড়েছে। যদিও আমার ক্ষতির পরিমাণই সব থেকে বেশি। মোট উনিশটা প্রাণীর মৃত্যু ঘটেছে ওই রক্তচোষার আক্রমণে। এ কথা বলার পর পেড্রো প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের আসল পরিচয়টা কী? জীববিদ, নাকি প্রেতচর্চা করেন অথবা কোনো কাগজের সাংবাদিক। সান মারিয়া থেকে ইতিমধ্যে কজন সাংবাদিক গ্রামে গ্রামে ঘুরে গেছেন। নইলে অতদূর থেকে এখানে ছুটে এলেন?'

এখানে আমার আগে পেড্রোকে টেলিফোনে হেরম্যান শুধু জানিয়েছিলেন তিনি চুপাকাবরার আক্রমণের ঘটনা সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। উপযুক্ত অর্থের বিনিময় যদি পেড্রো তার খামারে তাদের দুজনের থাকার ব্যবস্থা করেন তবে উপকার হয়। হয়তো হেরম্যান চুপাকাবরা রহস্যর সমাধান করতে পারবেন এ কথাও পেড্রোকে তিনি টেলিফোন মারফত জানিয়েছিলেন। হেরম্যানের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন পেড্রো। কিন্তু পেড্রো বিশেষ কিছু জানেন না সুদীপ্তদের সম্পর্কে। পেড্রোর প্রশ্ন শুনে হেরম্যান বললেন, 'ওই প্রথমটাই ভাবতে পারেন। আমরা ক্রিস্টোজুলজিস্ট। বিভিন্ন প্রাণীর খোঁজে আমরা ঘুরে বেড়াই। তবে বিশেষ ধরণের প্রাণী। রূপকথা-লোক কথাতে যেসব প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়, অথবা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রাণী, অথবা নতুন অদেখা কোনো প্রাণী,—যাদের 'ক্রিপ্টিড' বলে তাদের সন্ধান করি আমরা।'

হেরম্যানের জবাব শুনে পেড্রো একটু চুপ থেকে বললেন, 'তবে হয়তো হতাশ হতে হবে আপনাদের। চার্চের পাদ্রী ডিসুজা বলেছেন, 'এ রক্তচোষা কোনো মানুষ নয়। ও হল শয়তান। পৃথিবী পাপে ভরে গেছে, তাই শয়তানের আবির্ভাব ঘটেছে। এরপর সে মানুষদের হত্যা শুরু করবে। লোকজনও একই কথা বলছে।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'আপনাদের গ্রামের অবস্থা এখন কেমন?'

পেড্রো বললেন, 'দিনের বেলা সবকিছু ঠিকঠাক চলে। কিন্তু সূর্য ডুবতে শুরু করলেই আতঙ্ক চেপে বসে সবার মনে। আর মেঘাচ্ছন্ন রাত হলে তো কথাই নেই। যে কবার ওই শয়তান হানা দিয়েছে সেই রাতগুলো ছিল মেঘাচ্ছন্ন। ক্লাউড ফরেস্টের মেঘ ঢেকে রেখেছিল চাঁদকে। ওরকম রাত হলে সূর্য ডোবার পর ঘরের বাইরে কেউ বেরোচ্ছে না। সাধারণত শিশু আর দুগ্ধবতী প্রাণীদের আমরা রাতে খোঁয়াড়ে আটকে রাখি। এই গ্রীষ্মকালে আমরা বাকি পশুদের চারণ ভূমিতেই রাতে ছেড়ে রাখি কাউবয়দের তত্ত্বাবধানে। খামারে একসাথে অত প্রাণীর স্থান সঙ্কুলান হয় না বলে। আতঙ্কে কাউবয়রা পাহারা দিতে চাচ্ছেনা। সারা রাত ভাগ্যের হাতেই পশুগুলোকে ফেলে রাখতে হচ্ছে আমাদের। দেখুন যদি আপনারা গিয়ে কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন।'

হেরম্যান এবার জানতে চাইলেন, 'যে সাংবাদিকরা আপনাদের গ্রামে এসেছিলেন, তারা ছাড়া আপনাদের গ্রামে নতুন কোনো অতিথির আগমন হয়েছে কি?'

একটু যেন ভেবে নিয়ে পেড্রো জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, দু-জনের আগমন ঘটেছে। তাদের মধ্যে একজন মার্কিনি, অপরজন স্পেনীয়। স্পেনীয় ভদ্রলোক এসেছেন দুদিন আগে, আর মার্কিন ভদ্রলোক এসেছেন একমাস হতে চলল।

'তারও কী চুপাকাবরার খোঁজেই এসেছেন?' জানতে চাইলেন হেরম্যান

পেড্রো বললেন, 'মার্কিন ভদ্রলোক একজন শিকারি। ক্লাউড ফরেস্টে নেকড়ে শিকারে এসেছেন। তার ধারণা চুপাকাবরা বলে কোনো প্রাণী নেই। নেকড়ের আক্রমণেই মৃত্যু হয়েছে পশুগুলোর। একথা ঠিকই যে জঙ্গলে খাদ্যাভাব ঘটলে অনেক সময় তারা নিচে নেমে খামারে হানা দেয়। আর স্পেনীয় ভদ্রলোককে দেখলেও তার সাথে এখনও পরিচয় গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া সে এসে আশ্রয় নিয়েছে আমার খামারের অর্লান্ডোর খামারে। অর্লান্ডোর সাথে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধ আছে। কাজেই তার অতিথির সাথে পরিচয় করার আগ্রহ প্রকাশ আমি করিনি।' কথা বলতে বলতে সুদীপ্তরা একসময় পৌঁছে গেল সান-মারিয়াতে।

ছবির মতো ছোট্ট সুন্দর গ্রাম সান-মারিয়া। পাহাড়ের একদম নিচের ধাপে বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামটা। পাহাড়ের পাদদেশকে বেষ্টন করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে সেই তৃণভূমি-পশুচারণ ক্ষেত্র। আর তার মাঝেই গ্রাম। গ্রাম বলতে বেশ অনেকটা করে জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা এক একটা খামার বাড়ি বা ফার্ম হাউস। তাদের সামনে দিয়ে সমান্তরাল একটা রাস্তা চলে গেছে ফার্ম হাউসগুলোকে ছুঁয়ে। আর ফার্ম হাউসগুলোর পিছন থেকেই ঘন অরণ্যে ছাওয়া পাহাড় শ্রেণি ধাপে ধাপে উঠে গেছে আকাশের দিকে। পাহাড়ের কিছুটা ওপর থেকেই শুরু হয়েছে কুয়াশার স্তর। সেই কুয়াশা গাঢ় হতে হতে মুছে ফেলেছে পাহাড়ের মাথার দিকটাকে। ক্লাউড ফরেস্ট!' গ্রামের প্রবেশ মুখে একটা উন্মুক্ত বৃত্তাকার জায়গা। সেখানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ্তদের চোখে পড়ল চার্চটা। দেখেই বোঝা যায় সেটা বেশ প্রাচীন। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে খুব বড় না হলেও উচ্চতায় অনেক। তার ঘণ্টা ঘরটা অন্তত সত্তর ফুট উঁচুতে হবে। বৃত্তাকার জায়গাটার এক পাশে স্পেনিয়ার্ডদের চার্চ আর অন্যপাশে একটা আস্তাবল আর কয়েকটা দোকানপাট।

আর সেই চকের ঠিক মাঝখানে উঁচু একটা বেদির ওপর রাখা আছে কোস্টারিকার জাতীয় প্রতীক রঙচঙে একটা বুল কার্ট, ষাঁড়-টানা গাড়ি। বেশ কিছু লোকজনও আছে সেখানে। গ্রামেরই লোক সব। সে জায়গা অতিক্রম করে কিছুটা এগিয়ে কাঁটা তারে ঘেরা নিজের খামারে সুদীপ্তদের নিয়ে প্রবেশ করলেন খামার মালিক পেড্রো। বেশ বড় খামার। আস্তাবল, পশুদের রাখবার জন্য লম্বা ছাদঅলা খোঁয়াড়, খামারের বাসিন্দাদের থাকবার জন্য বেশ কয়েকটা ছোট-বড় কাঠের কটেজ সব কিছুই আছে। গাড়ি থামল খামারের পিছন দিকের একটা কটেজের সামনে। মালপত্র নিয়ে নামল সুদীপ্তরা। কাঠের তৈরি কটেজের বিষয়ে সুদীপ্তদের নিয়ে প্রবেশ করলেন পেড্রো। বেশ ছিমছাম ঘর। পেড্রো বললেন, 'এটাই আমার অতিথিশালা। আশা করি, আপনাদের কোনো অসুবিধা হবেনা থাকতে। আপনারা বিশ্রাম নিন। খাবার চলে আসবে। তবে আজ আর আপনাদের সাথে দেখা হবে না আমার। কাউবয়দের সন্ধানে বেরোব। দেখি যদি বেশি টাকার টোপ দিয়ে কাউকে রাত পাহারার জন্য রাজি করানো যায়। তাই ওদের ডেরায় যাব। বিকালবেলা আশেপাশে ঘুরে আসতে পারেন। চার্চের সামনে ওই ম্যালটায় বিকালে গ্রামের অনেকে জড়ো হয়। সেখানেও যেতে পারেন।'—এ কথা ও আরও দু-একটা কথা বলে বিদায় নিলেন পেড্রো। তিনি চলে যাবার পর ঘরের পিছনদিকের জানলাটা খুলল সুদীপ্ত। কটেজের প্রায় পিছন যেতেই অরণ্য বেষ্টিত পাহাড়শ্রেণি উঠে গেছে ওপর দিকে। জমাট বাঁধা কুয়াশা খেলা করছে পাহাড়ের মাথায় সুদীপ্তর পাশে এসে দাঁড়িয়ে সেই কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে হেরম্যান বললেন, 'এমনও হতে পারে চুপাকাবরার বাসস্থান ওই অঞ্চল। ওপর থেকে নিচে নেমে এসে সে গ্রামে হানা দেয়? ওই মেঘাচ্ছন্ন অরণ্য, ক্লাউড ফরেস্টে কোনো প্রাণীর পক্ষে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। দেখো কেমন রহস্যময় লাগছে জায়গাটা! একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। চার্চের ও জায়গাতে যাব। দেখি স্থানীয় মানুষদের সাথে কথা বলে যদি কোনো খবর সংগ্রহ করা যায়।'

খাবার চলে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। মাংস আর শাক-সবজি মেশানো একটা পদ। তার সাথে রুটি। খাওয়া সেরে বেশ কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে বিকাল নাগাদ ঘর ছেড়ে বেরোল সুদীপ্তরা। তারা হাঁটতে শুরু করল চার্চের সেই চকের দিকে। কাছে-দূরের চারণ ভূমিতে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে পশুর দল। ভেড়া, ছাগল, কিছু গোরু আর শূকরও আছে। তাদের ডাক শোনা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে তারা এক সময় পৌঁছে গেল চার্চের সামনে।

বেশ লোক সমাগম সে জায়গাতে। দিনের শেষে ফলমূল, শাক-সবজি নিয়ে বসেছে বিক্রেতার দল। গ্রাম্য মহিলারা ঘাসে বোনা টুকরি নিয়ে কেনাকাটা করছে। শস্যের বস্তা নিয়ে বেশ কয়েকটা ষাঁড়ে টানা গাড়িও উপস্থিত হয়েছে সেখানে। আস্তাবল সংলগ্ন কফিশপের সামনে আড্ডা দিচ্ছে একদল কাউবয়। পরনে জিন্‌স আর মোটা কাপড়ে বোনা শার্ট। মাথায় চামড়ার বারান্দা অলা টুপি, হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার জুতো। দু-একজনের কাঁধে গাদা বন্দুক বা কোমরে পিস্তলও আছে। যেন ছবির বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা মানুষ সব। কয়েকটা রোমশ কুকুর ঘুরছে তাদের পায়ের কাছে। সম্ভবত তাদেরই কুকুর

হবে। সুদীপ্তদের চেহারা দেখে তারা বিদেশি বুঝতে পেরে মাঝে মাঝে সবাই একটু বিস্মিত ভাবে তাকাচ্ছে তাদের দিকে। কিন্তু একটু চোখাচোখি হলেই তারা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। চার্চের ঠিক সামনেই কথোপকথনরত দুজন লোককে দেখতে পেল সুদীপ্তরা। তাদের একজনের পরনে লম্বা ঝুলের সাদা পোশাক, গলায় ঝোলানো রূপোর ক্রশটা পাহাড়ের মাথা থেকে ছুঁইয়ে আসা বিকালের আলোতে ঝলমল করছে। পোশাক দেখেই চেনা যায় লোকটা। পাদ্রী। সম্ভবত সেই ডিসুজা নামের লোভ। যার কথা আসার পথে বলছিলেন পেড্রো। সাদা দাড়ি-ওলাবৃদ্ধ পাদ্রীর সঙ্গী সুঠাম চেহারার মাঝবয়সি ভদ্রলোককে দেখে ঠিক এ গ্রামের লোক বলে মনে হল না সুদীপ্তদের। ভদ্রলোকের চোখে চশমা, লালচে দাড়ি গায়ে ওয়েস্ট কোর্ট, বুশ শার্ট ও ট্রাউজার্স। তাদেরকে দেখতে পেয়ে যেদিকে এগিয়ে গেলেন হেরম্যান, তাকে অনুসরণ করল সুদীপ্ত।

তারা দু-জন তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কথা থামিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালেন সেই পাদ্রী আর তার সঙ্গী ভদ্রলোক। কিন্তু তার আগেই পাদ্রীর মুখ থেকে একটা শব্দ কানে এল সুদীপ্তদের—'চুপাকাবরা!' সম্ভবত তা নিয়েই কথা হচ্ছিল তাদের দুজনের মধ্যে। পাদ্রী ভদ্রলোক সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে স্মিত হেসে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কি বিদেশি? আজই এসেছেন এখানে? আগে দেখিনি তো!'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, বিদেশি। আজই এসেছি আপনাদের গ্রামে খামার মালিক পেড্রোর আতিথেয়তায়।' এ কথা বলার পর হেরম্যান তাঁর সার সুদীপ্তর নাম পরিচয় ব্যাক্ত করলেন। সে কথা শুনে সাদা পোশাক পড়া বৃদ্ধ তার বুকের ক্রশটা তুলে ধরে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললেন, 'গড ব্লেস্ ইউ। আমি ফাদার ডিসুজা। এই চার্চের পাদ্রী। মান মারিয়াতে আপনাদের স্বাগত জানাই।

সুদীপ্তরা বুঝতে পারল তাদের অনুমানই ঠিক। ডিসুজা এরপর তার পাশে দাঁড়ালো ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি গঞ্জালো-ডি-কোস্টা। ইনিও আপনাদের মতো বিদেশী। স্পেন থেকে এসেছেন। তবে এক সময় এ দেশটা ওনাদেরই মানে স্পেনীয়দের শাসনাধীন ছিল। এই চার্চটাও একসময় চলারাই তৈরী করেন।'

ডিসুজা একথা বলার পর সিস্টার গঞ্জালো করমর্দনের জন্য সুদীপ্তদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনারা কি টুরিস্ট? কিন্তু যতটুকু জানি টুরিস্টরা এই অখ্যাত গ্রামে আসেনা। আপনাদের পেশা কী?'

হেরম্যান, জবাব দিলেন, 'আমরা ক্রিপ্টোজুপ্টলজিস্ট।'

এ কথা বলার পর হেরম্যান ক্রিপ্টোজুলজিস্ট শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই গঞ্জালো হেসে ফেলে বললেন, 'ক্রিপ্টোজুলজিস্ট শব্দের অর্থ আমি জানি। বইতে পড়েছি। ওই যারা উদ্ভট প্রাণীর খোঁজ করে বেড়ান। যেমন : হিমালয়ের ইয়েতি, মাদাগ্যাস্কারের নরখাদক গাছ, রূপকথার ফিনিক্সপাখি এসবের খোঁজে। তবে এও জানি যে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী বৃদ্ধ আপনাদের ঠিক পাত্তা দেন না। আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তবে আপনারা 'চুপাকাবরার' সন্ধানে এখানে এসেছেন?'

গঞ্জালোর কথা বলার ঢং দেখে হেরম্যানের মনে হল যেন বিদ্রুপ লুকিয়ে আছে তার

কথায়। তার কথার প্রত্যুত্তরে হেরম্যান যথাসম্ভব ভদ্রোচিত স্বরে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আমাদের কাজটা ওরকমই। এ কথাও ঠিক পুঁথিপড়া পণ্ডিত বিজ্ঞানীরা আমাদের কাজের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, কিন্তু এ কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি যে রূপকথার ফিনিক্স পাখি বা ডানাওলা পক্ষীরাজ ঘোড়ার সন্ধান না পেলেও কিন্তু ভিয়েতনামের 'গোল্ডেন টার্টল', জাপান সমুদ্রে 'জয়েন্ট স্কুইড', সি সার্পেন্টিস, আফ্রিকান ইউনিকর্ন বা 'ওকাপি', ইন্দোনেশিয়ার 'কমোডো ড্রাগন', শ্রীলঙ্কার 'ডেভিল বার্ড' বা 'জায়েন্ট আউল' এর সন্ধান দেন ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা। এ তালিকা আরও দীর্ঘ হতে পারে। মাত্র ক-একশো বছর আগেও তো ইউরোপীয়ানরা ক্যাঙারুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত না। তা বলে কি অস্ট্রেলিয়ায় ক্যাঙারু ছিল না? কয়েক কোটি বছর আগের জীব সিলিকান্থ, মাছেরও তো শেষ পর্যন্ত দেখা মিলল। বিজ্ঞানীরা তার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। শেষে তাঁরা ঢোক গিলে তার নাম দিলেন 'জীবন্ত জীবাশ্ম।"

হেরম্যান তার কথা এমন ভাবে শেষ করলেন যে তার কণ্ঠস্বর শুনে গঞ্জালো বুঝতে পারলেন তার কথা বলার ঢঙে মৃদু আহত হয়েছেন হেরম্যান। গঞ্জালো বললেন, 'আমি কিন্তু আপনাকে আমার কথায় আঘাত করতে চাইনি। লোকে যা বলে তাই বললাম। আপনাদের কাজকে আমি সম্মান জানাই। কষ্টটাও আমি বুঝি। কারণ আমার কাজ নিয়েও অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রুপ সহ্য করতে হয় আমাকে।'

তার ব্যথা শুনে হেরম্যান মৃদু বিস্মিত হয়ে বললেন, "এয়ারপোর্টের রেজিস্টারে তো দেখলাম যে আপনি 'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ' করেন। সে কাজের জন্য আপনাকে বিদ্রুপ শুনতে হবে কেন?'

গঞ্জালো হেসে বললেন, 'আমার আসল পরিচয় লেখায় মান-হোসের এয়ারপোর্টে লোকজন হাসাহাসি করছিল। আর সেটা এড়াতেই এখানকার এয়ারপোর্টে নিজের পরিচয় দিয়েছি প্রকৃতি পর্যবেক্ষক।'

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'তবে আপনার আসল পরিচয় কী?'

গঞ্জালো হেসে বললেন, "আপনাদের মতো আমিও এক অদ্ভুত জিনিসের খোঁজে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াই। আমাকেও আপনাদের মতোই অনেক বিজ্ঞানীর ঠাট্টা শুনতে হয়। 'ইউ.এফ.ও' কথার অর্থ নিশ্চই জানেন? আমি 'ইউ.এফ.ও' খুঁজে বেড়াই।"

বিস্মিত সুদীপ্ত বলে উঠল, 'ইউ.এফ.ও'—'আন আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট!' যাকে চলতি কথায় বলে ভিনগ্রহীদের মহাকাশ যান?

তার সন্ধান করেন আপনি?

গঞ্জালো বললেন, 'ঠিক তাই। আপনারা যেমন চুপাকাবরার সন্ধানে এখানে এসেছেন, তেমনই আমি এখানে এসেছি ওই 'ইউ.এফ.ও'র খোঁজে। এখানে যেদিন প্রথম চুপাকাবরার হানা হয়। তার ঠিক আগের রাতে কয়েকজন কাউবয় চারণভূমিতে পাহারা দিচ্ছিল। তারা হঠাৎ দেখতে পায় একটা উজ্জ্বল চাকতি আকাশ থেকে ঘুরতে ঘুরতে এসে নামল ওই ক্লাউড ফরেস্টে। খুব ছোট করে হলেও একটা কাগজে খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর

চুপাকাবরা নিয়ে এত হইচই শুরু হল যে সে খবরটা হারিয়ে গেল। এমনও হতে পারে যে আপনাদের চুপাকাবরা ভিনগ্রহরই কোনো জীব?'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, এমন একটা তত্ত্ব আছে বটে। কারণ যেসব জায়গাতে চুপাকাবরার হানা হয়েছে সেখানেই কেউ কেউ 'ইউ.এফ.ও' দেখেছেন বলে দাবি করেছেন।'

গঞ্জালো বললেন ঠিক তাই। 'ইউ.এফ.ও' নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে আমি প্রথমে এক জায়গাতে চুপাকাবরার প্রসঙ্গ পাই। আর সেই সূত্র ধরে জানতে পারি ক্রিপ্টিভ বা ক্রিপ্টোজুলজির কথা।'

হেরম্যান একটু চুপ করে থেকে বললেন, "হয়তো 'ইউ-এফ-ও'র সাথে চুপাকাবরার আবির্ভাবের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত চুপাকাবরার এ পৃথিবীরই কোনো প্রাণী হবে।'

পাদ্রী ডিসুজা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন গঞ্জালো আর সুদীপ্তদের কথোপকথন। তিনি এবার গঞ্জালো আর হেরম্যানের বক্তব্য খণ্ডন করে বললেন, 'আপনাদের বক্তব্য সঠিক নয়। কোনো ভিনগ্রহর যান ওই ক্লাউড ফরেস্টে নামেনি। আর ছুপাকাবরাও পৃথিবীর কোন জীব নয়। সে সাক্ষাৎ শয়তান। পৃথিবী পাপে ভরে গেছে। তাই সে আবির্ভূত হয়েছে এ পৃথিবীতে তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। আর যাকে মহাকাশযান বলে ভাবা হচ্ছে সেটা তা নয়। কাউবয়রা আসলে 'তারা' খসে পড়তে দেখেছিল পাহাড়ে। অশুভ দৃশ্য। পৃথিবীতে যখন দুর্যোগ নেমে আসে, শয়তানের আবির্ভাব হয়, তখন আকাশ থেকে তারা খসে পড়ে। তবে ওই পাহাড়েই ঘাঁটি গেড়েছে শয়তানটা। ওখান থেকেই সে নেমে আসছে গ্রামে।'

হেরম্যান বা গঞ্জালো ওরা দুজনেই হয়তো এ প্রসঙ্গে ডিসুজার সাথে বিতর্কে যেতে পারতেন, কিন্তু বৃদ্ধ পাদ্রীর ভাবনায় আঘাত না করে তারা চুপ করে রইলেন।

পাদ্রী ডিসুজা এরপর বললেন, 'তবে ওই শয়তানকে তাড়াবার ব্যবস্থা আজ রাতেই আমি করব। যাতে ওই রক্তচোষা আর এ গ্রামে হানা না দেয়। তার জন্য প্রস্তুতিও প্রায় সারা।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল,'কীভাবে তাড়াবেন সেই রক্তচোষাকে?'

ডিসুজা বললেন, 'কিছু জিনিসকে শয়তানরা রক্তচোষারা ভয় পায়। যেমন, রসুনের মালা, বুনো কাঠ গোলাপ ও তার ডাল, পবিত্র ধুনো। এসব জিনিস আমি সংগ্রহ করেছি। এ জায়গাটাইতো গ্রামের প্রধান স্থান। রাস্তার ঠিক মাঝখানে, অর্থাৎ ওই যে দেখতে পাচ্ছেন যে বেদির ওপর সেখানে গোরুর গাড়িটা রাখা আছে ঠিক ওই বেদির নীচে রসুনের মালা, কাঠ গোলাপের ডাল বিছিয়ে ধুনো জ্বালাব আমি। আর রক্তচোষা আসবে না এ গ্রামে। ও সবের স্পর্শে, গন্ধে ধ্বংস হয় তারা।'

এ কথা বলার পর আকাশের দিকে তাকালেন ডিসুজা। বিকাল হয়ে গেছে। মেঘে ঢাকা জঙ্গল-পাহাড়ের মাথায় সূর্য ঢলে পড়তে শুরু করেছে। ডিসুজা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর কিছু সময়ের মধ্যেই সূর্য ডুববে। আকাশ দেখে মনে হচ্ছে রাতের আকাশও মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। শয়তানের আবির্ভাবের পক্ষে উপযুক্ত রাত। তার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে আমাকে। আবার কাল দেখা হবে আপনাদের সাথে।' এ কথা বলে বিদায়

নিয়ে বৃদ্ধ পাদ্রী ধীর পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন চার্চের ভিতর।

তিনি চলে যাবার পর হেরম্যান, গঞ্জালোকে বললেন, 'আপনার অনুসন্ধিৎসু ভাবনাকেও আমি স্বাগত জানাই। এই পৃথিবীতে এই মহাবিশ্বে কত কী মানুষের অজানা থেকে গেছে! নিত্য নতুন কত কিছু তো এখনও আবিষ্কার হয়ে চলেছে। যতক্ষণ না তার দেখা মেলে ততক্ষণ পণ্ডিতদের একাংশ তাকে আমল দেয় না।'

গঞ্জালো হেসে বললেন, 'সামনে আমি আপনি এক নৌকার যাত্রী। তবে আপনাদের তুলনায় আমাদের অবস্থা আরও একটু করুণ। আপনারা তবু বেশ কয়েকটা শ্রেণির উপস্থিতি প্রমাণ করতে পেরেছেন পৃথিবীর কাছে। ল্যাবরেটারিতে কাজ করা অথবা পুঁথি পড়া পণ্ডিত বিজ্ঞানীরা মুখে আপনাদের সম্বন্ধে যাই বলুন কিন্তু মনে আপনাদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন না। আর আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হল যে ভিনগ্রহীদের পৃথিবীতে আগমন সম্পর্কে বেশ কিছু পরোক্ষ প্রমাণ ও যুক্তি থাকলেও আমরা যারা 'ইউ-এফ-ও' নিয়ে চর্চা করি তারা এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু প্রমাণ হাজির করতে পারিনি পৃথিবীর সামনে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একদিন তা প্রমাণিত হবেই।'

হেরম্যান তার কথা শুনে হেসে বললেন, 'কামনা করি যে একদিন যেন আপনারা ব্যাপারটা প্রমাণিত করতে পারেন।'

সুদীপ্ত বলল, 'আমিও একই ব্যাপার কামনা করি। প্রচলিত ধারণার বাইরে যারা নতুন কিছু ভাবার চেষ্টা করে, প্রমাণ করার চেষ্টা করে তখন তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের অবস্থা তো তাও ভালো, চার্চের মতের বিরুদ্ধে, প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী ব্রুনো, বা গ্যালিলিও যখন বলেছিলেন যে সূর্য নয়, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে, তখন ব্রুনোকে পুড়ে মরতে হয়েছিল, আর গ্যালিলিওকে নতজানু হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হয়েছিল অসহায় ভাবে। কিন্তু তাদের বক্তব্যই যে সত্যি ছিল তা ভবিষ্যতে প্রমাণিত হয়েছে।'

এ সব নানা কথা শুরু হল গঞ্জালোর সাথে সুদীপ্ত-হেরম্যানের। হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল করল তারা। সূর্য মেঘ অরণ্যের মাথায় যত হেলে পড়ছে তত যেন শূন্য শূন্য হতে শুরু করেছে সে জায়গা! ঘরে ফেরার জন্য একটা ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সবার মধ্যে। আস্তাবলের সামনে জটলা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বেচা-কেনা, দোকানগুলোর ঝাঁপ। অদৃশ্য কোনো কিছুর আতঙ্ক যেন ঘর মুখী করে তুলছে স্থানীয় মানুষদের। ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারল সুদীপ্তরা। জায়গাটা জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে দেখে তারা তিনজনও ফেরার জন্য পা বাড়াল।

ফেরার পথে হেরম্যান গঞ্জালোকে বললেন, 'আমরা মিস্টার পেড্রোর খামারে আছি। আপনি শুনেছি মিস্টার অর্লান্ডোর অতিথি। তাদের দুজনের মধ্যে শুনেছি গোলযোগ, মামলা মোকদ্দমা আছে। আশা করি সে ছাপ আমাদের সম্পর্কে পড়বে না?'

গঞ্জালো বললেন, 'না, কখনই না। তাদের বৈরিতা বৈষয়িক ব্যাপার। আশ্রয়ের খোঁজে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে উঠতে হয়েছে। আমার আপনার মধ্যে তো আর বৈষয়িক সংঘাত নেই। বরং আমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করব। ওই যে যেটা অরণ্য দেখছেন সেখানে পাড়ি দেব ভাবছি। এমনও হতে পারে যে ওই ওখানেই লুকিয়ে আছে আপনার

চুপাকাবরা। ওখান থেকেই সে গ্রামে এসে হানা দেয়। ইচ্ছা হলে আপনারাও আমার সঙ্গী হতে পারেন।'

হেরম্যান সেই মোহাচ্ছন্ন পাহাড় অরণ্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ওই অরণ্য সত্যি রহস্যময়। আমরা এখনও আমাদের কর্মপন্থা ঠিক করিনি। নিশ্চয়ই আপনার প্রস্তাব ভেবে দেখব। আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ।'

হাঁটতে হাঁটতে সুদীপ্তরা এক সময় পৌঁছে গেল তাদের খামারের প্রবেশ মুখে। তাদের থেকে বিদায় নিয়ে গঞ্জালো এগোলেন সামনের দিকে তার আশ্রমের দিকে। সূর্য ডুবে গেছে কুয়াশাচ্ছন্ন অরণ্যের মাথায়। দিনের শেষ আলো নিঃশেষ হয়ে আসছে। খামারের চারপাশ থেকে ভেসে আসছে দিন শেষে পশুদের ডাক। একযোগে বিভিন্ন ধ্বনিতে ডাকছে গোরু-শুয়োর-ভেড়া-ছাগলেরা। খামারে প্রবেশ করতে করতে হেরম্যান বললেন, 'এ গ্রামের দুজন বিদেশির মধ্যে একজনের সাথে দেখা হল। গঞ্জালোকে মন্দ লাগল না। তবে সেই মার্কিন নেকড়ে শিকারির সাথে দেখা হল না। আশা করি তার সাথেও সাক্ষাৎ হবে। সুদীপ্তরা তাদের কটেজে প্রবেশ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই পশুদের কলরব থেমে গেল। সান-মারিয়ার চারণ ভূমির বুকে নেমে এল অন্ধকার। তারপর এক সময় হয়তো চাঁদ উঠল ঠিকই কিন্তু কটেজের পিছনের খোলা জানলা দিয়ে সুদীপ্ত দেখল পাথরের মাথার ওপর থেকে মেঘ ভাসতে ভাসতে ঢেকে দিল চাঁদকে। অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড় শ্রেণি। কুয়াশার চাদরে মুছে গেল কোস্টারিকার ছোট্ট গ্রাম সান-মারিয়া। রাত আটটা নাগাদ একজন লোক খাবার দিয়ে গেল। খাওয়া সেরে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার ক্লান্তি দূর করতে যখন সুদীপ্তরা বিছানায় গেল তখন কুয়াশা মাখানো একে ভৌতিক পরিবেশ নেমে এসেছে এই ছোট্ট জনপদে খামারের বুকে।

মোরগের ডাকে পরদিন ভোরে যখন সুদীপ্তদের ঘুম ভাঙল তখন সুর্যদেব উদয় হচ্ছেন পৃথিবীর বুকে। ঘুম থেকে একই সাথে উঠে বিছানা ছাড়ল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। জানলা বন্ধ করে তারা শুয়েছিল। উঠে গিয়ে জানলা খুলে সুদীপ্ত বাইরে তাকাতেই দেখতে পেল এক অপূর্ব দৃশ্য। পিছনের উত্তুঙ্গ পাহাড়ের মাথায় কুয়াশা যেন অনেকটাই কেটে গেছে। পাহাড়ের মাথা থেকে সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়ছে বনানীর গায়ে। নিচের পৃথিবীতে। খামারের চারপাশ থেকে পশুদের ডাক ভেসে আসছে। যেন প্রভাতী সূর্যকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে তারা। হেরম্যান সুদীপ্তর পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রভাতী সূর্যালোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অপূর্ব! কী সুন্দর সকাল!'

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'আজ আপনার পরিকল্পনা কী?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'আজ গ্রাম ঘুরে চুপাকাবরা সম্পর্কে নতুন কোনো খবর সংগ্রহ

করা যায় নাকি দেখি! গঞ্জালোর প্রস্তাবও ভেবে দেখব। তারপর সবকিছু ভেবে নিয়ে দুজনে আলোচনা করে আমাদের কর্মপন্থা ঠিক করব। প্রাতরাশ খেয়েই বেরিয়ে পড়ব আমরা।'

সুদীপ্তরা কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল। ততক্ষণ লোক এসে প্রাতরাশও দিয়ে গেল। কফি আর বিন-চাল-পেঁয়াজ-মুরগির মাংস মিশ্রিত একটা ভারী প্রাতরাশ। যে খাবার দিয়ে গেল তাকে প্রশ্ন করে সুদীপ্ত জানতে পারল যে এ খাবারের নাম নাকি 'গালো পিন্টো'। কোস্টারিকার গ্রামাঞ্চলে সবাই এই ভারী প্রাতরাশই খায়। কারণ, কৃষিজাত বা পশুচারণের কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে অনেক সময় তাদের দুপুরে খাওয়া হয় না। তখন তাদের এই প্রাতরাশ কাজে লাগে। হেরম্যান তা শুনে হেসে বললেন, 'তবে আমরাও খেয়ে নিই। আমরা কখন কোথায় যাই তার ঠিক নেই। এটা আমাদেরও কাজে লাগতে পারে।' কফি সহযোগে সুদীপ্তরা ধীরে ধীরে উদরস্থ করল সেই গ্যালো পিন্টো'।

খাওয়া শেষ করে হেরম্যান বললেন, 'খাবার ছেড়ে বাইরে যাবার আগে একবার মিস্টার পেড্রোর সাথে দেখা করে যাব। তিনি এখন নিশ্চই খামারে আছেন। গতকাল এ ঘরে পৌঁছে দেবার পর আর তো তার সাথে দেখাই হল না!'

হেরম্যান পেড্রোর নাম নেবার সাথে সাথেই কাকতালীয় ভাবে তাদের ঘরে প্রবেশ করলেন খামার মালিক পেড্রো। চোখেমুখে তার স্পষ্ট উত্তেজনার ছাপ! হেরম্যান আর সুদীপ্ত তাকে 'গুড মর্নিং' জানাতেই পেড্রো কোনোরকমে তাদের প্রতি সম্ভাষণ জানিয়ে উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে' চুপাকাবরা আবার হানা দিয়েছে!'

হেরম্যান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেছেন, 'তাই নাকি? কোন খামারে? আপনার নাকি অন্য কারও?'

খবরটা শুনে উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সুদীপ্তও বলল, 'কটা প্রাণীকে হত্যা করল সে? কী প্রাণী?'

পেড্রো তাদের প্রশ্নর জবাবে ভীষণ উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'না, কোন গবাদি পশু নয়, তার আক্রমণের শিকার মানুষ এবার সে নরহত্যা করে তার রক্তপান করেছে!'

'মানুষ!'—একই সাথে শব্দটা উচ্চারণ করল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। পেড্রোর কথায় এতটা চমক তারা আশা করেনি।

পেড্রো বললেন, 'গতকাল রাতে মার্কেস নামে যে ছোকরা কাউবয়কে পশু পাহারার জন্য নিয়োজিত করেছিলাম সেই একটু আগে এসে খবরটি দিল। সে জানাল সে আর কোনো টাকার বিনিময়ই রাত পাহারা দেবে না। কারণ, গত রাতে ওই ভয়ঙ্কর রক্তচোযার হানায় মৃত্যু হয়েছে স্বয়ং পাদ্রী ডিসুজার! গ্রামের প্রবেশ মুখে চার্চের কাছেই রাস্তার মাঝখানে যেখানে ষাঁড়ের গাড়িটা রাখা আছে সেই বেদির নিচে পড়ে আছে ফাদার ডিসুজার রক্তশূন্য দেহ। গভীর ক্ষতচিহ্ন তার বুকে। সেই ক্ষত থেকে তাঁর রক্তপান করেছে চুপাকাবরা!"

সুদীপ্তরা স্তম্ভিত হয়ে গেল পেড্রোর কথা শুনে। একটু ধীরস্থ হবার পর হেরম্যান বললেন, 'চলুন, আমরা সে জায়গাতে যাই।'

পেড্রোও সম্মতি প্রকাশ করলেন হেরম্যানের প্রস্তাবে। কটেজ ছেড়ে, খামার ছেড়ে তারা তিনজন রওনা হল সে জায়গার উদ্দেশ্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যে অন্য স্থলে উপস্থিত হল তারা। বুলকার্টটা যে বেদিতে রাখা আছে ঠিক তার নীচে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু জনতা। মাথার টুপি খুলে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে তারা। তাদের চোখে-মুখে উত্তেজিত ভয়ার্ত দৃষ্টি। কেউ কেউ চাপা স্বরে আলোচনা করছে। সুদীপ্তরা সেই ভিড়ের মাঝখানে গিয়ে উঁকি দিল ভিতরে। তাদের চোখে পড়ল এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। বেদির ঠিক নিচে পড়ে আছে বৃদ্ধ পাদ্রীর প্রাণহীন দেহ। তাঁর বুকে জেগে আছে এক ভয়ঙ্কর ক্ষতচিহ্ন! তার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে রসুনের মালা, বুনো কাঠ গোলাপ আর তার ডাল। উলটো পড়ে আছে ধাতুর তৈরি ধুনোর পাত্র। তখনও তার থেকে মৃদু ধোঁয়া উঠছে।

বেশিক্ষণ সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না সুদীপ্তরা। ভিড় ছেড়ে তারা বাইরে বেরিয়ে এল।

কিছুটা তফাতে তারা এরপর দেখতে পেল তিনজনকে। তাদের একজনকে দেখেই সুদীপ্তরা বুঝতে পারল যে পুলিশকর্মী। তার পরনে সবুজ পোশাক, সবুজ টুপি, কোমরে চওড়া বেল্টে গোঁজা রিভলবার। একটা নোটবুকে সে সম্ভবত অন্য দুজনের এজাহার লিপিবদ্ধ করেছিল। সেই দুজনের একজন স্থানীয় যুবক-কাউবয়। অন্যজনের সবুজ জংলা-ছাপ পোশাক, হাই হিল জুতো, কাঁধে রাইফেল। ছিপছিপে চেহারার মাঝ বয়সি সেই লোকটাকে দেখে কেন জানি সুদীপ্তর ঠিক স্থানীয় লোক বলে মনে হল না।

পেড্রো তাদের দেখিয়ে চাপা স্বরে বললেন, 'ওই কাউবয়ের নামই হল মার্কেস, আর বন্দুকধারী হলেন সেই মার্কিন শিকারি মিস্টার বাজ সম্ভবত এজাহার নেওয়ার শেষ পর্ব চলছিল তখন। কথাবার্তা মিটে যেতেই সেই পুলিশকর্মী লোক দুজনকে ছেড়ে দিয়ে ভিড় ঠেলে প্রবেশ করল মৃতদেহর কাছে তার বাকি কাজ সম্পন্ন করার জন্য।

তিনি চলে যেতেই পেড্রো সুদীপ্তদের নিয়ে উপস্থিত হলেন সেই লোক দুজনের সামনে। তারপর কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন, 'ব্যাপারটা কী? পুলিশ আপনাদের এজাহার নিল কেন?'

শিকারি বাজ জবাব দিলেন, 'কারণ, আমরা দুজনই শুধু গতকাল রাতে ঘরের বাইরে ছিলাম। আর ফাদার ডিসুজার মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করি।'

'ব্যাপারটা কী রকম' বিস্মিতভাবে জানতে চাইলেন গঞ্জালো।

এরপর মিস্টার বাজ আর কাউবয় যুবক মার্কেসের বক্তব্যে সুদীপ্তরা যা বুঝতে পারল তা হল এই যে পেড্রোর সাথে রাত পাহারার ব্যাপারে মার্কেসের কথা হবার পর সে কাজের জন্য ঘোড়া সংগ্রহর জন্য গতকাল অন্ধকার নামার বেশ অনেক্ষণ পর এ জায়গাতে আসে মার্কেস। এ জায়গাতে তখন কোনো লোকজন নেই। সন্ধ্যা থেকেই কুয়াশার চাদরে মোড়া ছিল আকাশ। তার ওপর আবার গ্রামে ইলেকট্রিসিটি না থাকার কারণে স্ট্রিট লাইট নেই। খামারগুলোর ঘরে শুধু সৌর বিদ্যুতের আলো জ্বলে মিট মিট করে। সেই আলো বাইরে পৌঁছয় না। চার্চে আবার সৌর বিদ্যুৎও নেই। চারপাশের দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ

হয়ে গেছিল সন্ধ্যা নামার আগেই। কাজেই জনশূন্য এ জায়গার চার্চ, আস্তাবল সবই ডুবে ছিল আধো-অন্ধকারে। আনুমানিক আটটা নাগাদ এখানে এসে আস্তাবল থেকে ঘোড়া সংগ্রহ করে সে যখন তার পিঠে চেপে এগোতে যাচ্ছে ঠিক তখনই তার চোখ পড়ে কিছুটা তফাতে রাস্তার ঠিক মাঝখানে বেদির ওপর যেখানে বুলকার্টটা রাখা আছে সেখানে। মুহূর্তর জন্য ঠিক সে সময়ই চাঁদের গা থেকে মেঘের আবরণ সরে গেছিল। মার্কেস দেখে যে একটা বড় কুকুরের মতো চতুষ্পদ প্রাণী প্রথমে যেন মানুষের মতো দু-পায়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেল ফুট-পাঁচের উঁচু বেদির ওপর রাখা গাড়িটার ছইয়ের ভিতর। মার্কেসের সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল প্রাণীটা হয়তো কোন কাউবয়ের ভুল করে ছেড়ে রেখে যাওয়া কুকুর হবে। রাতের ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য সে আশ্রয় নিল গাড়ির ভিতর। পরদিন তার মালিক এসে নিশ্চই নিয়ে যাবে তাকে। যাই হোক তারপর সে রওনা হয় মাইল দেড়েক দূরে জঙ্গলের ঠিক নিচে পাহাড়ের ঢালে চারণ ভূমিতে যেখানে পেড্রোর পশুগুলো চরে বেড়াচ্ছে সে জায়গাতে। রাত ন-টা নাগাদ শিকারি বাজ এসে উপস্থিত হল তার কাছে। তিনি তার কাছে জানতে চান নেকড়ে জাতীয় কোন প্রাণী মার্কেস গ্রামের রাস্তায় দেখেছে নাকি? নেকড়ে শিকারের জন্য বাজ ঘাঁটি গেড়েছেন পাহাড়ের ঢালে জঙ্গলের প্রবেশ মুখের একটু ভিতরে স্থানীয় শিকারিদের পরিত্যক্ত এক কুটিরে। ওর আশেপাশের ঢাল বেয়েই নিচের চারণ ভূমি পেরিয়ে গ্রামে প্রবেশ করেছে। তা দেখে শিকারি বাজ যখন পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসেন ততক্ষণে অন্ধকারে মুড়ে গেছে গ্রাম। পথে কোথাও লোকজন নেই, খামারগুলোর দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামে ঢুকে প্রাণীটার অনুসন্ধান চালাতে থাকেন বাজ। কিন্তু নেকড়ে কেন, একটা কুকুরেরও দেখা পাননি তিনি। এভাবে ঘণ্টা তিনেক সময় কেটে যাবার পর চারণভূমিতে গিয়ে তিনি সাক্ষাৎ পান মার্কেসের এবং তাকে প্রশ্নটা করেন। আর এই প্রশ্নটা শুনে মার্কেসের মনে পড়ে যায় সেই দৃশ্যর কথা। এবং আরও এতটা জিনিস খেয়াল হয় তার। বেদিটা পাঁচ ফুট উঁচু। আর তার ওপর গাড়ির ছইটা অন্তত চার ফুটউঁচু। সব মিলিয়ে রাস্তা থেকে ছইয়ের ভিতর প্রবেশ করার জন্য অন্তত ন-দশ ফুট লাফ দিতে হবে কোনো প্রাণীকে। যা সাধারণ কুকুরের পক্ষে সম্ভব নয়, আর প্রাণীটার আকারও যেন বড় মনে হয়েছিল তার! কথাগুলো মাথায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই বাজের প্রশ্নর জবাবে সে কথাগুলো জানায় তাকে। হ্যাঁ, কুকুর নয়, তবে নেকড়ের পক্ষে অতটা লাফ দেওয়া সম্ভব। বাজ অনুমান করেন প্রাণীটা সেই নেকড়েই। কাজেই মার্কেসের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে রওনা হয় এ জায়গার উদ্দেশ্যে। পদব্রজে এখানে আসতে তার বেশ কিছুটা সময় লাগে। তিনি যখন এখানে এসে উপস্থিত হন তখন আস্তাবলের ভিতর থেকে একযোগে পা ঠোকার শব্দ করছিল জন্তুগুলো। যেন ভয়ঙ্কর কোনো কিছুর উপস্থিতি টের পেয়ে একযোগা পা ঠুকছিল ঘোড়াগুলো! এরপর বাজের মনে হয় বেদির ঠিক নিচে রাস্তার মধ্যে যে যেন পড়ে আছে। বাজ কাছে গিয়ে টর্চের আলো ফলতেই দেখতে পান এক বীভৎস দৃশ্য! পড়ে আছে ফাদার ডিসুজার প্রাণহীন দেহ। তার ঠিক বুকের কাছে জেগে আছে বীভৎস ক্ষতচিহ্ন! বাজের তখন ধারণা হয় প্রাণীটা হয়তো বা আস্তাবলে বা আবার ওই ছইয়ের

মধ্যে আত্মগোপন করেছে। কাজেই সে কিছুটা তফাতে সরে গিয়ে বন্দুক হাতে নিয়ে লক্ষ করতে লাগে জায়গা দুটো। যাতে প্রাণীটা বাইরে বেরোলেই তাকে গুলি করা যায়। এভাবে এখানে দাঁড়িয়েই সারা রাত কেটে যায় তার। এক সময় ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায় ঘোড়াদের পা ঠোকার শব্দে। আলো ফুটতে শুরু করে। সে সময় তার রাত পাহারা শেষ করে ঘোড়া রাখার জন্য হাজির হয় মার্কেস। বাজ তখন তাকে মৃতদেহটা দেখায়। মার্কেসই এরপর গ্রামের সবাইকে গিয়ে ব্যাপারটা জানায়। মৃতদেহর ক্ষত দেখে তার নিশ্চিত ধারণা ব্যাপারটা চুপাকাবরার কাজ। কারণ ক্ষত থাকলেও মৃতদেহের গায়ে কোনো রক্ত নেই। তার রক্ত চুষে নিয়েছে রক্তচোষা চুপাকাবরা!

ইতিমধ্যে সুদীপ্তদের দেখে তাদের পাশে হাজির হয়েছেন গঞ্জালো। এই ভয়ঙ্কর খবর ইতিমধ্যে সব খামারেই পৌঁছে গেছে। সুদীপ্তর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি শুনছিলেন বাজ আর মার্কেসের কথা। তাদের কথা শেষ হতে গঞ্জালোর দিকে পেড্রো কৌতূহলী ভাবে তাকাতেই সুদীপ্ত গঞ্জালোর সাথে পেড্রোর পরিচয় করিয়ে দিলেন। আর পেড্রোও বাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন সুদীপ্ত আর হেরম্যানের।

সুদীপ্ত এরপর মাঝবয়সি শিকারি বাজকে প্রশ্ন করল, 'আপনার কি ধারণা যে নেকড়ের আক্রমণের ফলেই মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধ পাদ্রীর?

বাজ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমার ধারণা তাই। পাদ্রী ধুনোদানি নিয়ে গেছিলেন ও জায়গাতে। আর প্রাণীটা লুকিয়ে ছিল ওই ছেইয়ের মধ্যে। সাধারণত বন্য প্রাণীরা ধোঁয়া আগুনকে ভয় পায়। পাদ্রীর হাতে ধুনোদানি তখন নিশ্চই বেশ ধুঁয়ো ছড়াচ্ছিল। সেই ধুঁয়ো প্রবেশ করে বুল কার্টের ছইয়ের ভিতর। আর তাতেই নেকড়েটা বাইরে বেড়িয়ে আসে। আর ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃদ্ধর বুকের ওপর।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কেস বলল, 'আপনার এই বক্তব্য আমি সমর্থন করি। হ্যাঁ, ওই ধোঁয়াতেই বাইরে বেরিয়ে এসেছিল প্রাণীটা। তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফাদার ডিসুজার ওপর। তবে প্রাণীটা নেকড়ে নয়, চুপাকাবরা। নইলে ফাদারের দেহটা সাদা ফ্যাটফ্যাটে রক্তহীন হল কীভাবে?

হেরম্যানও মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন তার কথায়।

একটু ভেবে নিয়ে মার্কিন শিকারি বাজ বললেন, 'আমি শিকারি। শ্বাপদের আক্রমণে ইতিপূর্বে আমি মানুষের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছি। সিংহ, বাঘ, নেকড়ের মতো প্রাণীরা অনেক সময় মৃত প্রাণীর উষ্ণ রক্ত পান করে। ঘটনাচক্রে প্রাণীটা যখন বৃদ্ধর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তার দাঁতের আঘাতে বা নখরাঘাতে ছিন্ন হয়ে যায় মৃতর হৃৎপিণ্ড সংলগ্ন বুক। হৃৎপিণ্ডই তো রক্তের আধার। রক্ত বেরোতে শুরু করে আর তা চেটে খেতে থাকে নেকড়েটা।' হেরম্যান সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'তাহলে রক্ত পান করার পর নেকড়েটা শিকারের মাংস ভক্ষণ করল না কেন? সেটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। নিশ্চই শিকারের সন্ধানেই সে পাহাড় থেকে নিচে নেমেছিল?'

বাজ বললেন, 'হয়তো সে যখন মাংস ভক্ষণ করতে যাচ্ছে ঠিক তখনই আমাকে দূর থেকে আসতে দেখে গা ঢাকা দেয়। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসই নেকড়েটাই ওই কাণ্ড

ঘটিয়েছে। ওই সব চুপাকাবরার ঘটনা এখানকার সরল গ্রামবাসীদের অন্ধকুসংস্কার। আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন জঙ্গলে অন্তত কুড়ি বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। অনেক দুর্লভ প্রাণী দেখেছি আমি। কিন্তু ও প্রাণীর অস্তিত্ব কোনো দিন টের পাইনি।' বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই কথাগুলো বললেন তিনি।

হেরম্যান চুপ করে গেলেন তার কথা শুনে।

মার্কিন শিকারি বাজ এরপর বললেন, 'পাদ্রী হত্যার ঘটনাটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। সারা রাত জেগে কাটিয়েছি। বিশ্রাম নেবার জন্য আমাকে এবার ফিরতে হবে। কিন্তু যাবার আগে আমার মতো আপনাদের তিন বিদেশির এখানে আসার কারণটা জানতে পারি কি?'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'হেরম্যান আর আমি ক্রিপ্টোজুলজিস্ট। রূপকথা-উপকথা-পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত প্রাণী বা নতুন ধরনের প্রাণী খোঁজা আমাদের নেশা। চুপাকাবরার সন্ধানেই আমরা এখানে এসেছি।'

আর তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গঞ্জালো বললেন, 'আর আমি ওখানে এসেছি 'ইউ.এফ.ও' বা ভিনগ্রহর মহাকাশ যানের সন্ধানে।'

তাদের কথা শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে থেকে বাজ বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। চুপাকাবরা বা মহাকাশ যান-এ দুটোর কোনোটার অস্তিত্বেই আমার বিশ্বাস নেই। এখন চলি। আবার আপনাদের সাথে আমার আশা করি দেখা হবে।' এ কথা বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি এগোলেন তাঁর ডেরায় ফেরার জন্য। তিনি চলে যাবার পর পেড্রো মাথা নেড়ে পাদ্রী ডিসুজার মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করে বললেন, 'আমাকেও এবার খামারে ফিরতে হবে। খামারের পশুগুলো আর গ্রামের মানুষদের ভাগ্যে ভবিষ্যতে কী লেখা আছে কে জানে?'

পেড্রো খামারের উদ্দেশ্যে রওনা হবার পর কাউবয় মার্কেসও অন্যদিকে সরে গেল। সে। আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত সেই পুলিশ কর্মীর নেতৃত্বে পাদ্রী ডিসুজার মরদেহ উঠিয়ে সাদা কাপড়ে ঢেকে চার্চের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। ভিড়টা ফাঁকা হয়ে গেল। সেখানে শুধু দাঁড়িয়ে রইল সুদীপ্ত-হেরম্যান আর গঞ্জালো।

হেরম্যান গঞ্জালোকে প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী?'

গঞ্জালো জবাব দিলেন, 'মৃতদেহটা দেখে আমার ধারণা এটা সাধারণ কোনো প্রাণীর কাজ নয়। মৃত পাদ্রীর দেহে অন্য কোনো জায়গাতে আঘাতের চিহ্ন নেই নিশ্চই খেয়াল করেছেন? যেন রক্তপানের উদ্দেশ্যেই পাদ্রী ডিসুজার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করেছে প্রাণীটা। তার লভ্য বস্তু ছিল ফাদার ডিসুজার বুকটাই।

হেরম্যান বলবেন ঠিক তাই। ক্ষতচিহ্নটা আমিও খেয়াল করেছি। বেশ অদ্ভুত ক্ষত চিহ্ন! তিনটে ছিদ্র! কেউ যেন তিনটে শলাকা সোজাসুজি বসিয়ে দিয়েছে তার হৃৎপিণ্ডে। নেকড়ের আক্রমণ হলে তার নখ বা দাঁতের আঘাতে ও জায়গার মাংস ফালাফালা হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তা হয়নি। ছিদ্র করে রক্তপান করেছে রক্তচোষা।'

এ কথার বলার পর হেরম্যান তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার আগামী পরিকল্পনা কী?'

গঞ্জালো দূরে পাহাড়ের গায়ে মেঘ অরণ্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ধারণা

সব রহস্য লুকিয়ে আছে কুয়াশাচ্ছাদিত ওই অরণ্যর মধ্যে। ওখানেই তো ইউ.এফ.ও নামতে দেখা গেছে। চুপাকাবরা কোনো মহাজাগতিক প্রাণী বলেই আমার ধারণা। আর সে যদি এ পৃথিবীর কোনো প্রাণী হয় তাহলেও নিশ্চই তার আশ্রয়স্থল ওই মেঘ অরণ্য। সে নিশ্চই গ্রামে থাকবে না। রক্তর সন্ধানেই যে নিচে নেমে গ্রামে হানা দিচ্ছে।'

সুদীপ্ত বলল, 'হ্যাঁ, যে কোনো প্রাণীর পক্ষেই ওই মেঘাচ্ছাদিত অরণ্য লুকিয়ে থাকার পক্ষে আদর্শ স্থান।'

গঞ্জালো একটু চুপ করে থেকে এরপর বললেন, 'কাল ওই যে মেঘপাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হব আমি। আপনারাও যাবেন নাকি? মহাকাশে শব্দক্ষেপণের জন্য আমার কাছে একটা যন্ত্র আছে। গতকাল রাতে যখন তার হেডফোন কানে লাগিয়ে বসেছিলাম তখন এক অদ্ভুত শব্দ তরঙ্গ কানে এল। এবং সেটা যেন এল ওই পাহাড়ের দিক থেকেই। ওর মাথা থেকে।

প্রস্তাব শুনে হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, যাওয়া যেতে পারে। তবে আজকের রাতটা দেখে নেই। তেমন হলে কাল আপনার সঙ্গী হব আমরা।' এরপর তারা তিনজনই ফেরার পথ ধরল। সুদীপ্তরা প্রবেশ করল নিজেদের খামারে। আর গঞ্জালো চলে গেলেন তার নিজের জায়গাতে। ঘরে ফিরে সুদীপ্ত হেরম্যানকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, সত্যি যদি এমনটা হয় যে চুপাকাবরা কোনো ভিনগ্রহী তবে তা কি ক্রিপ্টিড বলে গণ্য হবে?

হেরম্যান হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। রূপকথা, উপকথার প্রাণী, পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত প্রাণী যদি ক্রিপ্টিড হয় তাহলে মহাকাশের জীব নয় কেন? তবে আমার ধারণা চুপাকাবরা এ পৃথিবীরই কোনো প্রাণী হবে।'

দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে বিকালের দিকে একবার বাইরে বেরোল সুদীপ্তরা। হাঁটতে হাঁটতে তারা গিয়ে উপস্থিত হল সেই চকে। বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেই বলদের গাড়িটা। কিন্তু গতকাল বিকালেও সব মানুষের ভিড় তারা সেখানে দেখেছিল তার চারভাগের এক ভাগও মানুষ নেই সেখানে। দু-একটা দোকান খোলা ঠিকই কিন্তু লোকজনের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যস্ততার ভাব, চোখেমুখেও উত্তেজনার চিহ্ন স্পষ্ট। যেন, যথা সম্ভব দ্রুত কাজ সেরে ঘরে ফিরে যেতে চায় তারা। গবাদি পশুর মৃত্যুর ব্যাপারটা তো ছিলই কিন্তু পাদ্রী-ডিসুজার মৃত্যু ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে। বৈকালিক পরিক্রমা শেষ করে সুদীপ্তরা যখন খামারে প্রবেশ করতে যাচ্ছে ঠিক তখনই তাদের সাথে দেখা হয়ে গেল খামার মালিক পেড্রোর সাথে। আতঙ্কের ব্যাপারটা প্রতিধ্বনিত হল তার কথাতেও। তিনি বললেন, 'কাউবয়রা আর কোন ভাবেই কাজ করতে রাজি নয়। পাঁচজন প্যারিশ্রমিক পেলেও নয়। পশুদের ওপরই আমাদের জীবন জীবিকা নির্ভরশীল। খামার মালিকদের সভায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে রাত পাহারার কাজ আমরা নিজেরাই করব। প্রত্যেক খামার মালিকের কাছেই তো বন্দুক আছে। অবস্থার পরিবর্তন না হলে আগামীকাল রাত থেকে আমাকেও বেরোতে হবে নিজের পশুগুলোকে রক্ষা করার জন্য। ভাগ্যে কী লেখা আছে কে জানে?' হতাশ ভাবে কথাগুলো বলে মাথা নাড়তে নাড়তে পেড্রো খামারে প্রবেশ করে এগোলেন তার আস্তানার দিকে। অন্যদিন শেষ বিকালে এই সময় খামার

মুখরিত হয়ে ওঠে পশুদের ডাকে। কিন্তু আজ খামারটাও কেমন যেন নিস্তব্ধ। পশুদের কোনো হাঁক-ডাক নেই। যেন কোনো অজানা আতঙ্ক সঞ্চারিত হয়েছে প্রাণীগুলোর মধ্যেও। নিজেদের ঘরে ফিরে এল সুদীপ্তরাও। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারের চাদরে মুড়ে যেতে শুরু করল গ্রাম। তারপর এক সময় পাহাড়শ্রেণির মাথায় চাঁদ উঠল বটে, কিন্তু মেঘ পাহাড়ের মেঘ মাঝে মাঝেই ঢেকে দিতে লাগল তাকে। খোলা জানলা দিয়ে সুদীপ্তদের চোখে বাইরের পৃথিবী যতটুকু দৃশ্যমান তা আরও রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগল আলো-ছায়ার লুকোচুরিতে। সারা খামার জুড়ে, সারা গ্রাম জুড়ে বিরাজ করতে লাগল এক অপার্থিব নিস্তব্ধতা। এই নিস্তব্ধতা যেন অশুভ কোনো কিছুর অদৃশ্য আগমন বার্তা। হেরম্যান পর্যন্ত খাওয়া সেরে বিছানাতে যাবার আগে বললেন, 'পাহাড়ে, জঙ্গলে, তাঁবুতে বা খোলা আকাশের নিচে বহু রাত কাটিয়েছি আমরা। সেখানে কোথাও শ্বাপদের হানা ছিল, মানুষের আক্রমণের ভয় ছিল, কিন্তু এমন গা-ছমছমে ভৌতিক পরিবেশ কোথাও দেখিনি!'

সুদীপ্ত বিছানা নিতে নিতে মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ বুরুন্ডিতে সিংহর আক্রমণ ছিল, সুন্দাদ্বীপে কমাডো ড্রাগনের ভয় ছিল, অস্ট্রেলিয় সমুদ্রে দানব অক্টোপাসের টেনে নিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল, কিন্তু সেসব জায়গাতে রক্তচোষার ভয় ছিল না। রক্তচোষা শব্দটার মধ্যেই কেমন যেন আতঙ্ক আর ভৌতিক ভাব আছে। আর এখানকার পরিবেশটাও ওই শব্দটার পক্ষে উপযুক্ত।

কথা বলতে বলতে শুয়ে পড়ল তারা দুজন।

শেষ রাতে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল সুদীপ্তর। সে দেখতে পেল খাট থেকে নেমে হেরম্যান জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছেন! খাটে উঠে বসে সে হেরম্যানকে প্রশ্ন করল, কি হল?'

বাইরের আধো-অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে হেরম্যান জবাব দিলেন, 'বাইরে বেশ কয়েকবার বন্দুকের শব্দ হল! তবে কাছ থেকে নয়, যেন একটু দূর থেকে। অন্তত তিনবার তো শব্দটা হল বটেই। পাহাড়ের গায়ে বেশ সময় নিয়ে প্রতিধ্বনিত হল শব্দটা। শেষ শব্দটা হল মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে।'

সুদীপ্ত অনুমান করল হয়তো বা সে শব্দেই ঘুম ভেঙে গেছে তার। বিছানা ছেড়ে চটপট উঠে জানলার সামনে হেরম্যানের পাশে এসে দাঁড়াল সে। সুদীপ্তর রেডিয়াম বসানো হাতঘড়িতে ভোর চারটে বাজে। জানলার বাইরে তখনও কুয়াশা মাখানো অন্ধকার বিরাজ করছে। দূরের পাহাড় শ্রেণি অস্পষ্ট একটা রেখার মতো আঁকা হয়ে আছে আকাশের বুকে। সেদিকে তাকিয়ে সুদীপ্ত বলল, 'ঠিক বলেছেন গুলির শব্দ?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। প্রথমবারের শব্দটা সম্ভবত আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। তারপর পর পর দু-বার স্পষ্ট শুনলাম গুলির আওয়াজ!'

সুদীপ্ত স্বগোতক্তির স্বরে বলল, 'এই ভোররাতে গুলি চালাল কে!'

হেরম্যান বললেন, 'এমন হতে পারে নেকড়েকে লক্ষ করে গুলি চালিয়েছে সেই শিকারি বার্ক। অথবা অন্য কোনো কারণে অন্য কেউ। ভোরের আলো না ফুটলে ব্যাপারটা জানা যাবে না।'

সুদীপ্ত আর হেরম্যান জালনার বাইরে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্য একটা শব্দ কানে এল তাদের। কুয়াশা-মাখানো অন্ধকার ভেদ করে ঘোড়ার খুরের শব্দ। দূর থেকে শব্দটা এগিয়ে এসে খামারে প্রবেশ করল। আর তারপর একটা হাঁকডাক আর কিছু কথোপকথনের শব্দও যেন খামারের যেদিকে খামার মালিকের বাসস্থান সেদিক থেকে ভেসে এল সুদীপ্তদের কানে। এরপর আবার সেই ঘোড়ার খুরের শব্দ খামার ছেড়ে বেরিয়ে মিলিয়ে গেল অন্যদিকে।

হেরম্যান বললেন, 'আমার অনুমান বাইরে কোনো কিছু ঘটেছে!'

খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগল তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ হল।

দরজা খুলেই সুদীপ্ত দেখতে পেল পেড্রোকে। তার সঙ্গে লণ্ঠন হাতে খামারেরই একজন লোক। পেড্রোর পরনে রাতপোশাক। বোঝাই যাচ্ছে যে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছেন তিনি। লণ্ঠনের আলোতে উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখে। সুদীপ্ত আর হেরম্যানকে দেখে উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আবারও চুপাকাবরা হানা দিয়েছে গ্রামে। আক্রমণ করেছে একটা লোককে। এই মাত্র একজন ক্রমে খবরটা দিয়ে গেল!

হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, 'ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে?'

পেড্রো জবাব দিলেন, 'গ্রামের শেষ মাথায় বুড়ো উইলসনের খামারে। উইলসন গুলিও চালিয়েছেন, কিন্তু গুলিটা সেই পিশাচের গায়ে লাগেনি। একটা লোককে মারাত্মক যখম করে রক্তচোষাটা পালিয়েছে। উইলসনেরই এক কর্মচারী এসে জানাল ব্যাপারটা। অন্য খামার মালিকদেরও সে খবরটা দিতে গেল।'

হেরম্যান প্রথমে সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহত লোকটা তবে দেখেছে প্রাণীটাকে। কথা বলতে হবে তার সাথে।' তারপর পেড্রোর উদ্দেশ্যে বললেন, 'ওই আহত লোকটা কি ওই খামারেই আছে? এখনই একবার সেখানে যাওয়া যেতে পারে?'

পেড্রো পিছন ফিরে বাইরের আঁধো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমি ভাবছিলাম আরও একটু আলো ফুটলে সেখানে যাব। এই অন্ধকারের প্রাণীটা যদি কোথাও ওৎ পেতে থাকে?'

হেরম্যান বললেন, 'বন্দুকের শব্দে প্রাণীটা নিশ্চই কিছুটা হলেও ভয় পেয়ে থাকবে। ভোরের আলোও কিছুক্ষণের মধ্যে ফুটবে। আমার কাছে রিভলবার আছে। আপনার খামারেও বন্দুক আছে। সে সব সঙ্গে নিয়ে বেরোলে খুব একটা বিপদের আশঙ্কা আছে বলে মনে হয় না।'

খামার মালিক পেড্রো একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে আপনারা তৈরি হন। আমিও তৈরি হচ্ছি।'—এই বলে তিনি তার সঙ্গীকে নির্দেশ দিলেন আস্তাবল থেকে তিনটে

ঘোড়া বার করার জন্য।

সুদীপ্তদের তৈরি হতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগল। তারা বাইরে বেরোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই পেড্রোর কাঁধে বন্দুক নিয়ে হাজির হলেন। ঘোড়াও এসে গেল। ঘোড়ার পিঠে চেপে খামার ছেড়ে বাইরের কুয়াশা মাখানো রাস্তায় আঁধো অন্ধকার ভেদ করে সুদীপ্তরা এগিয়ে চলল অকুস্থলের দিকে। যেতে যেতে হেরম্যান উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'চুপাকাবরার চেহারার আমূল বর্ণনা এবার লোকটার থেকে জানা যাবে।'

মিনিট কুড়ি চলার পর গ্রামের শেষ প্রান্তে উইলিয়ামের খামারে যখন তারা উপস্থিত হল তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। কাঠের তৈরি একটা বাড়ি, একটা আস্তাবল, আর একটা ছোট খোঁয়াড় নিয়ে উইলিয়ামের খামার। বাড়ির পিছনের ছোট্ট চারণ ভূমিটা সোজা গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের পাদদেশে। এক সময় অন্য খামারগুলোর মতোই কাঠের গুড়ির বেড়াবেষ্টিত ছিল খামারটা। কিন্তু বর্তমানে তার অনেকটাই অদৃশ্য। খামারে ঢুকে বাড়িটার পিছন দিক থেকে বেশ কিছু লোকজনের গলার শব্দ শুনে সুদীপ্তরা উপস্থিত হল সে জায়গাতে। বেশ কিছু লোকজন ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছে সেখানে। বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। ঘোড়া থেকে নেমে সুদীপ্তরা পেড্রোর পিছু পিছু উপস্থিত হল সে জায়গাতে। ভিড়ের মধ্যে একজন অতিবৃদ্ধ লোক তার বন্দুকের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অন্য লোকদের কী যেন বলছে। তাকে দেখিয়ে পেড্রো বললেন, 'উনি হলেন এই খামারের মালিক উইলিয়াম। অন্য লোকগুলোর মধ্যে শিকারি বাজ আর গঞ্জালোকে দেখতে পেল সুদীপ্ত। তারাও উপস্থিত হয়েছেন ইতিমধ্যেই। সুদীপ্তরা এরপর সেই বৃত্তাকার জায়গাটার ভিতর উঁকি দিতেই তাদের চোখে পড়ল আর এক দৃশ্য। মাটিতে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে একজন লোক। প্রচণ্ড আতঙ্কে অথবা যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে তার শরীরটা। তার বুকের বাঁ-পাশে কাপড় চেপে ধরে বসে আছে একজন লোক। রক্তে লাল হয়ে উঠেছে কাপড়টা। বোঝাই যাচ্ছে আহত লোকটার রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছে না কিছুতেই। তাকে নিয়ে কী করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করছে উপস্থিত জনতা। মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে পেড্রো একটু বিস্মিত ভাবে বললেন, 'আরে! এ যে হার্নান্দো?'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'লোকটা কে?'

পেড্রো জবাব দিলেন, 'লোকটা চোর। খামার থেকে পশু চুরি করে। এ জন্য বার কয়েক জেলও খেটেছে লোকটা। আমার খামারেও একবার হানা দিয়েছিল হার্নান্দো।' এ কথা বলার পর বুড়ো উইলিয়ামের সাথে চোখাচোখি হতে পেড্রো তাকে প্রশ্ন করলেন, 'ঘটনাটা কী?'

বুড়ো উইলিয়াম ইতিমধ্যে ঘটনাটা বার কয়েক বলেছেন অন্যদেরকে। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'জানোই তো যে গতকাল রাতে কোন কাউবয়ই রাজি ছিল না পশুগুলোকে পাহারা দিতে। তার ওপর আমার খামার আবার গ্রামের শেষপ্রান্তে। গতকাল বিকালে যখন খামারে ফিরছি তখন খামারের বাইরে ঘুরঘুর করতে দেখলাম এই হার্নান্দোকে। মনের ভিতর এতটুকু—ডাকল। একে রক্তচোষার হামলা হচ্ছে তার ওপর

আবার হার্নান্দো ঘুরে বেড়াচ্ছে খামারের কাছে। এদিকে আবার আমার তিনটে ছাগল সাতটা বাচ্চা দিয়েছে। আমি অনিদ্রার রোগী। রাতে ভালো ঘুম হয় না। ভাবলাম আমি তবে পাহারার কাজটা করি। তবে চুপাকাবরার জন্য ঘরের বাইরে বেরিয়ে কাজটা করার সাহস পেলাম না। ঘরের ভিতর বসে জানলা দিয়ে বন্দুক বাগিয়ে কাজটা করব ঠিক করলাম। এ জায়গাটা আমার জানলা দিয়ে দেখা যায়। মা সমেত ছাগলের বাচ্চাগুলোকে সন্ধ্যা নামার আগে আমি গ্যাব্রিয়লকে দিয়ে তাড়িয়ে এনে জড়ো করলাম এখানে। আমার ভৃত্য গ্যাব্রিয়ল। যে তোমাদের দুর্ঘটনার খবরটা দিল। আমরা দু-জন মানুষ শুধু এ খামারে থাকি। যাই হোক খাওয়া সেরে আমি একটা চেয়ার নিয়ে বন্দুক বাগিয়ে বসলাম জানলার ধারে। বাইরে তখন চাঁদ উঠলেও মেঘ পাহাড়ের মেঘ মাঝে মাঝে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদকে। বাইরের সেই অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যেই আমি ঘরের ভিতর থেকে পশুগুলোর ওপর নজর করার চেষ্টা করছিলাম। এভাবেই রাত কাটতে লাগল। শেষ রাতে একটু তন্দ্রা মতো লেগেছিল আমার। কিন্তু হঠাৎই একযোগে বেশ কয়েকটা ছাগলের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল আমার। বাইরে তখন মেঘ সরে গেছে কিছুক্ষণের জন্য। এ জায়গাটা ও পাশে পাহাড়ের ঢালের জঙ্গলে, ওই যে পাহাড়ে ওঠার সুঁড়ি পথটা সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সে সময়। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম একজনকে। ধীর পায়ে থমকে থমকে সে এগোচ্ছে পাহাড়ের দিকে পিছন রেখে বারবার তাকাচ্ছে পিছনে পাহাড়ের ঢালের দিকে। কিন্তু সে ওদিকে তাকাচ্ছে কেন? কয়েক মুহূর্তর মধ্যে আমি তার পোশাক আর অবয়ব দেখে অনুমান করে নিলাম যে লোকটা এই হার্নান্দো! সে এসে দাঁড়াল ওই যে গাছটা দেখছ ওর নিচে। চারপাশে ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে সে এরপর সোজা এগোতে যাচ্ছিল আমার বাড়িটার দিকেই। হয়তো বা পশুচুরি নয়, জিনিসপত্র চুরির মতলবেই সে এসেছিল। কিন্তু তার এগোনো হল না। গাছের ওপর থেকে একটা কালো ছায়া যেন এসে পড়ল তার ঘাড়ে। তাকে নিয়ে হার্নান্দো মাটিতে পড়ে গেল। আতঙ্কে যেন আর্তনাদ করে উঠল সে। একটা ঝটাপটি শুরু হল তাদের দুজনের মধ্যে। ছাগলগুলো আতঙ্কে ডাকতে শুরু করল। আমি এরপর আর চুপ থাকতে পারলাম না। গরাদের ফাঁক দিয়ে বন্দুকের মুখ আকাশের দিকে রেখে ট্রিগার টানলাম দু-দুবার কয়েক মুহূর্ত সময়ের ব্যবধানে। বন্দুকের প্রচণ্ড শব্দে ভয় পেয়ে প্রাণীটা মনে হয় ছেড়ে দিল হার্নান্দোকে। মেঘ তখন আবার ঢেকে দিচ্ছে চাঁদটাকে। সেই অস্পষ্ট আলোয় আমি মুহূর্তের জন্য দেখলাম সেই রক্তচোষাকে। আকারে সে বড় বালকের মতো হবে মনে মনে। কিন্তু চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে লম্বা লম্বা লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের ঢালের দিকে। মেঘ ঢেকে দিল চাঁদকে। আমি আর রক্তচোষাকে ঠাহর করতে পারলাম না। ইতিমধ্যে তার কবল থেকে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল হার্নান্দো। বুক চেপে ধরে টলোমলো পায়ে সে এগোতে লাগল আমার বাড়ির দিকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত এ জায়গায় এসে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বাড়ি ছেড়ে আসি আর গ্যাব্রিয়ল লণ্ঠন নিয়ে এ জায়গাতে এসে দেখলাম মাটিতে পড়ে ছটফট করছে হার্নান্দো। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুক। আর এরপরই আমি গ্যাব্রিয়লকে পাঠালাম আপনাদের সবাইকে খবরটা দেবে।'

হেরম্যান বললেন, 'কিন্তু এভাবে লোকটা এখানে পড়ে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। এখনই ওকে হাসপাতালে নেওয়া প্রয়োজন।'

এ কথা শুনে পেড্রো বললেন, 'গ্রামে একটা মাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তাতে একজন ডাক্তার, আর একজন নার্স। ডাক্তার আবার মানহোমে গেছেন ওষুধ আনতে, তার ফিরতে আরও দু-দিন সময় লাগবে।'

আর একজন বলল, 'তাই তো ভাবছি এখন একে নিয়ে কী করা যায়? মহাসংকটে পড়া গেল!

হেরম্যান বললেন, 'এ লোকটা কি প্রাণীটার সম্বন্ধে কিছু বলেছে আপনাদের? প্রাণীটা কি ওকে তাড়া করেছিল?'

উইলিয়াম জবাব দিলেন, 'না, কোনো কথা বলেনি। শুধু মাঝে মাঝে আর্তনাদ করছে।'

উইলিয়ামের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা চোখ মেলে মাথাটা একটু ওঠাবার চেষ্টা করে বলে উঠল—'জল, একটু জল...।'

হেরম্যান তাড়াতাড়ি তার কিট ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করে তার কাছে এগিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলেন তার সামনে। তারপর তার মাথাটা একটু তুলে ধরে ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা জল ঢালতে লাগলেন তার ঠোঁটে।

একটু জল পান করল লোকটা। হেরম্যান তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কে তোমাকে আক্রমণ করল? কোথা থেকে এল প্রাণীটা?'

প্রশ্ন শুনে লোকটা তার ডান হাতটা তুলে যেন পাহাড়ের ঢালটা দেখাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার দুর্বল হাতটা একটু ওপরে উঠেই মাটিতে পড়ে গেল। সে শুধু একটা শব্দ বলে উঠল—'চুপাকাবরা!' আর তারপরই প্রচণ্ড মৃত্যু যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠে চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে গেল। তার শূন্য দৃষ্টি শুধু স্থির হয়ে গেল পাহাড়ের মাথার দিকে তাকিয়ে। সূর্য উঠতে শুরু করলেও আদিম মেঘের আস্তরণে ঢেকে আছে সে জায়গা।

যত্ন করে লোকটার মাথাটা মাটিতে নামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হেরম্যান বললেন, 'চোর হোক বা ভদ্রলোক, কারও এমন মৃত্যু কাম্য নয়।'

উপস্থিত অন্যরাও মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে টুপি খুলল। যে লোকটা মৃতর বুকে কাপড় চাপা দিয়ে ধরেছিল, সে এবার সরিয়ে নিল কাপড়টা। মৃতদেহর বুকের ক্ষতচিহ্নটা ভোরের আলোতে এবার নজরে পড়ল সুদীপ্ত-হেরম্যানের। পাশাপাশি তিনটে গভীর ছিদ্র। কেউ যেন তিনটে সুতীক্ষ্ম শলাকা বিদ্ধ করেছে লোকটার বুকে। ঠিক এমনই ক্ষতচিহ্ন ছিল ফাদার ডিসুজার বুকের! হুবহু একই চিহ্ন! চুপাকাবরা!!!

হেরম্যান এরপর ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে এগোলেন সেই গাছটার দিকে। যার মাথা থেকে প্রাণীটা ঝাঁপ দিয়েছিল মৃত হার্নান্দোর ওপর। সুদীপ্ত অনুসরণ করল তাকে।

গাছটা বেশি বড় নয়। অচেনা গাছ। মাটি থেকে আঠারো-কুড়ি ফুট ওপরে উঠে ডালপালা বিস্তার করেছে গাছটা। ঘন সন্নিবিষ্ট ডালপালা। তা দেখতে অনেকটা অর্ধবৃত্তাকার আইসক্রিমের মাথার মতো। গাছের নীচে ঘাসের ওপর এক জায়গাতে বেশ কিছু রক্ত পড়ে আছে। হতভাগ্য হার্নান্দোর রক্ত নির্ঘাত। হঠাৎ গাছের গুড়ির গায়ে একটা জিনিসের

ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়ায় হেরম্যান এগিয়ে গেলেন গুড়িটার সামনে। পকেট থেকে পেনসিল নাইফ বার করে গুঁড়ির গা থেকে একটা ছোট্ট জিনিস উপরে সেটা হাতের তালুতে রেখে মেলে ধরলেন সুদীপ্তর সামনে।

সুদীপ্ত জিনিসটা দেখে বলে উঠল, 'আরে এটাতো একটা বুলেট?'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, তবে বন্দুক রাইফেলের নয় রিভলবারের। বুড়ো উইলিয়ামের বন্দুকটা দোনলা। তিনি বললেন যে দুটো গুলি ছুড়ে ছিলেন তিনি। আমি গুলি ছোড়ার তৃতীয় যে শব্দটা শুনেছিলাম সেটা যেন হালকা অস্পষ্ট ছিল। রিভলবারের শব্দ অত দূরে যাবার কথা নয়। কিন্তু সামনেই পাহাড়। উন্মুক্ত জায়গা বলে পাহাড়ে শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাদের কানেও পৌঁছেছিল। অর্থাৎ বুড়ো উইলিয়াম ছাড়াও আরও কেউ সম্ভবত প্রাণীটাতে লক্ষ করে গুলি চালিয়েছিল?'

সুদীপ্ত বলল, 'কে সে? শিকারি বাজ?'

হেরম্যান বললেন, 'কিন্তু তার কাঁধে তো রাইফেল।'

বেশ কিছুক্ষণ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করলেন হেরম্যান তারপর তারা আবার ফিরে চলল মৃতদেহটা যেখানে পড়ে আছে সেদিকে। মৃতদেহকে ঘিরে জটলাটা ততক্ষণে ভেঙে গেছে। গ্রামের সেই পুলিশকর্মীকে খবর পাঠাবার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে। উপস্থিত জনতার কেউ কেউ ফেরার পথ ধরছে। তবে তখনও মৃতদেহের কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে খামার মালিক উইলিয়ম, পেড্রো, মার্কিন শিকারি বাজ, গঞ্জালো, আরও দু-একজন লোক। সুদীপ্তকে নিয়ে হেরম্যান তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে উইলিয়মকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি ঠিক দুটো গুলি ছুড়ছিলেন তাইতো? আর কোনো গুলির শব্দ শুনেছিলেন?'

বৃদ্ধ উইলিয়াম তার বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরে বললেন, 'আমার এই দোনলা বন্দুকে মাত্র দুটো গুলিই ধরে। দুটো গুলিই ছুড়েছিলাম। পাহাড়ের গায়ে বেশ অনেকক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল গুলির শব্দ? তবে যখন রক্তচোষা আর হার্নান্দোর মধ্যে ধস্তাধস্তি হচ্ছিল তখন যেন একবার তীক্ষ্ম কিচমিচ শব্দ শুনেছিলাম আসি। সেটা প্রাণীটার গলার শব্দও হতে পারে। অনেকটা তা বানরের ডাকের মতো।'

তাঁর কথা শুনে হেরম্যান জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের ঢালের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে যেতে বললেন, 'আপনি তো পাহাড়ের ঢালের দিকেই পালিয়ে যেতে দেখেছিলেন প্রাণীটাকে। আপনার কথা আর মৃত লোকটার ইঙ্গিত দেখে মনে হচ্ছে এখান থেকেই নেমে এসেছিল প্রাণীটা।'

হেরম্যানের কথা শুনে পেড্রো বলল, 'অন্যদের সাথে আলোচনা করে আমারও তাই ধারণা হল। আমরা, অর্থাৎ এখানে উপস্থিত খামার মালিকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলাম যে পাহাড় থেকে নীচে নামার ওই যে মুখ দেখা যাচ্ছে সেখানে আজ সন্ধ্যা থেকে আগুন জ্বালিয়ে রাখব। ওই রক্তপিশাচ চুপাকাবরা যদি পাহাড়ের জঙ্গল থেকে নেমে নীচের গ্রামে হানা দিয়ে থাকে তবে ওখানে আগুন জ্বালালে তার নীচে নামার পথ বন্ধ হবে।'

গঞ্জালো এতক্ষণ কথোপকথন শুনছিলেন, তিনি এবার বললেন, 'আমারও কিন্তু ধারণা সব রহস্য লুকিয়ে আছে ওই ক্লাউড ফরেস্টেই। আজই আমি রওনা হব ওদিকে। আপনারা চাইলে সঙ্গী হতে পারেন এ প্রস্তাব আমি আগেই আপনাদের দিয়ে রেখেছি।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শিকারি বললেন, 'আমি বেশ কিছুদিন ওই পাহাড়ের জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে আছি। কিন্তু প্রাণীটা যদি ও জায়গাতে থাকত তবে তার সাথে কি একদিনও সাক্ষাৎ হত না আমার? তাছাড়া যে ধরনের প্রাণীরা কথা বলছে গ্রামবাসীরা, তেমন প্রাণীর অস্তিত্বে আমার ঠিক বিশ্বাস নেই।'

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'আপনি ঠিক কোন জায়গাতে থাকেন?'

শিকারি বাজ জবাব দিলেন, 'ওই সুঁড়িপথ বেয়ে কিছুটা ওপরে উঠে ডানদিকে আমার তাঁবু।'

সুদীপ্ত বলল, 'এমনও হতে পারে যে প্রাণীরা আরও ওপরে থাকে। আপনার অলক্ষেই সে নীচে নেমে আসে?'

হেরম্যান শিকারি বাজকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার এখনও কী ধারণা যে নেকড়ের আক্রমণেই মৃত্যু হয়েছে হার্নান্দোর?'

এ প্রশ্ন শুনে চুপ করে গেল শিকারি বাজ।

হেরম্যান এরপর গঞ্জালোর উদ্দেশ্যে বললেন আপনার প্রস্তাবে আমরা রাজি। সত্যি পাহাড়টা বেশ রহস্যময় লাগে দূর থেকেই। ওর ওই মেঘের আড়ালে কী রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে? দেখে আসা যেতে পারে জায়গাটা।'

তার কথা শুনে গঞ্জালো বললেন, 'আপনারা ওখানে যেতে চাচ্ছেন যান, কিন্তু পাহাড়ের মাথার দিকে কিন্তু নেকড়েদের আড্ডা। আপনারা কেউ শিকারি নন। নেকড়েরা অনেক সময় দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করে। আমি নিজে শিকারি হয়েও তাই ভরসা পাইনি বেশি ওপরে ওঠার। আমার কথাটা একটু খেয়াল রাখবেন।' এই বলে সুদীপ্তদের থেকে বিদায় নিয়ে বাজ এগোলেন পাহাড়ের দিকে।

বাজ চলে যাবার পর গঞ্জালোর সাথে মেঘ পাহাড়ে অভিযানের ব্যাপারে প্রাথমিক কথাবার্তা সারা হয়ে গেল সুদীপ্তদের। তারপর খামারে ফেরার জন্য ঘোড়ায় উঠে বসল তারা। প্রভাতী সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামের মাথায়। দুলকি চালে ফিরতে ফিরতে হেরম্যান পেড্রোকে বললেন, ওই মেঘে ঢাকা পাহাড়ের ভিতর কী আছে সে ব্যাপারে কোন ধারণা দিতে পারেন?'

পেড্রো জবাব দিলেন, 'মাঝে মাঝে কাঠ সংগ্রহ করতে গ্রামের লোক দলবদ্ধ ভাবে পাহাড়ে যায়। তবে নেকড়ের ভয়ে তারা বেশি ওপরে ওঠেনা। ওখানে বড় বড় গাছ আর ঘন মেঘের রাজত্ব। তবে বাপ-ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি যে মহাযুদ্ধর সময় নাকি একদল বিদ্রোহী স্পেনিয়ার্ড একটা ঘাঁটি গেড়ে ছিল ওই পাহাড়ের মাথায়। ওখানে নাকি একটা বাড়ি আছে। আরও একটা কথা জানাই, গ্রামে শয়তানটার হানা শুরু হবার কদিন আগে একদল কাঠুরে পাহাড়ে একটা হরিণের দেহ পেয়েছিল। তার বুকেও তিনটে ক্ষত ছিল। শয়তানটার ডেরা হয়তো পাহাড়টাই। নীচে নেমে যে গ্রামে হানা দিচ্ছে।

হেরম্যান বললেন, 'আমরা তো পাহাড়টায় যাচ্ছি। নেকড়ে আর অন্য বন্য জন্তুদের উৎপাত হতে পারে। আপনার একটা বন্দুক ধার দেবেন?'

পেড্রো বললেন, 'দেব, খামারে একটা বাড়তি বন্দুক আছে। ওটা অনেক সময় ট্রাঙ্কুলিন গান হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। খামারে খ্যাপা ষাঁড়কে বশ মানাতে ওটা দিয়ে ঘুম পাড়ানি গুলিও ছোড়া হয়।'

কথাটা শুনে উল্লসিত হেরম্যান বলে উঠলেন, 'চমৎকার। যদিও প্রাণীটাকে ধরার জন্য আমরা খাঁচা, ফাঁদ এনেছি। তবে ওটা আরও ভালো সাহায্য করতে পারে আমাদের। ট্রাঙ্কুলিন সিরিঞ্জও কটা দয়া করে দেবেন।'

পেড্রোর খামার বাড়িতে পৌঁছে অভিযানের জন্য জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিল সুদীপ্তরা। একটা হালকা তাঁবু, বিশেষ ভাবে বানানো একটা হালকা অথচ মজবুত ফোল্ডিং খাঁচা, শুকনো খাবার, ওষুধপত্র ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। পেড্রো এসে বন্দুক, ঘুমপাড়ানি গুলি, কার্তুজের বাক্স দিয়ে গেলেন। এসব সঙ্গে নিয়ে ঠিক বেলা দশটায় খামার ত্যাগ করল সুদীপ্তরা। কিছুটা এগোবার পরই পাশের খামারের বাইরে সুদীপ্তদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন গঞ্জালো। তার কাঁধেও একটা রাইফেল। সুদীপ্তদের তিনি জানালেন তাদের মতো তিনিও তাঁর অস্ত্রটা সংগ্রহ করেছেন তাঁর খামার মালিকের কাছ থেকে। হেরম্যানের পিঠে গোটানো খাঁচাটা দেখে গঞ্জালো বললেন, 'আপনারা দেখছি সব ব্যবস্থাই করে এগোচ্ছেন!'

সুন্দর সকাল। উজ্জ্বল আলোতে সবুজ চারণভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে গবাদি পশুর দল। মাঝে মাঝের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পাখির দল। আর তারই মাঝে সুন্দর ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে ঢালু ছাদওলা খামার বাড়িগুলো। পশুর ডাক, মোরগের ডাক ভেসে আসছে তাদের ভিতর থেকে। সবকিছু কত সুন্দর কত স্বাভাবিক। দেখে কে বলবে যে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই এ জায়গা কেমন বদলে যায়! কুয়াশা আর আতঙ্কের চাদরে মুড়ে যায় সারা গ্রামটা। একটা আধি ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় গ্রাম জুড়ে, হানা দেয় সেই রক্তচোষা।

প্রথমে গ্রাম তারপর চারণভূমি অতিক্রম করে সুদীপ্তরা পৌঁছে গেল পাহাড়ে ওঠার সুঁড়ি পথের মুখে। সে পথ বেয়ে ওঠার মুখে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাল সবাই। ঘন জঙ্গল ধাপে ধাপে উঠে গেছে ওপর দিকে। পাহাড় কিছুটা ওপরে ওঠার পর থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে মেঘের আনাগোনা। ধীরে ধীরে তার আড়ালে হারিয়ে গেছে অরণ্য। পাহাড় শ্রেণির মাথার ওপর দিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না নীচ থেকে। সত্যিই সেখানে মেঘের অরণ্য—ক্লাউড ফরেস্ট। সুদীপ্তর নীচ থেকে সেদিকে তাকিয়ে

মনে হল, কোন আদিম পৃথিবী যেন লুকিয়ে আছে ওই মেঘ-অরণ্যের আড়ালে। ওটাই কি চুপাকাবরার বাসস্থান?

সুঁড়ি পথ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল তারা। ধীরে ধীরে পাকদণ্ডি উঠে গেছে ওপর দিকে। দু-পাশে ঘন গাছের জঙ্গল। ঋজু গাছের গুঁড়িগুলো সোজা উঠে গেছে ওপর দিকে। তাদের নীচে জমা হয়ে আছে পাতার রাশি। তাতে সুদীপ্তদের পা পড়াতে যতটুকু শব্দ হচ্ছে তা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'কী কী প্রাণী আছে এই জঙ্গলে?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'প্রায় পাঁচশো প্রজাতির প্রাণী। তবে অধিকাংশ প্রাণী ছোটখাট। নেকড়ে, দু-এক প্রজাতির হরিণ, শূকর আর টেপির ছাড়া তেমন কোনো বড় প্রাণী নেই। তবে কিন্তু প্রায় পাঁচশ ধরনের নতুন প্রজাতির প্রাণী জীব বিজ্ঞানির আবিষ্কার করেছেন এই মেঘঅরণ্য থেকে। তার মধ্যে 'গোল্ডেন টড' অন্যতম। যদিও আবিষ্কৃত প্রাণীগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির, তবে কে বলতে পারে বড় কোনো নতুন প্রজাতির প্রাণী এ জঙ্গলে নেই?'

গঞ্জালো হেরম্যানের কথা সমর্থন করে বললেন, 'নীচ থেকে মাথার ওপরের ওই মেঘ অরণ্য দেখে তো মনে হচ্ছে যে? যে-কোনকিছুই লুকিয়ে থাকতে পারে ওই মেঘের রাজ্যে। ওখানে তো মানুষের পা পড়েনা বলে মনে হয়।'

চলতে চলতে হেরম্যান গঞ্জালোকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, এই 'ইউ.এফ.ও', ভিনগ্রহর প্রাণী, এ সব ব্যাপারে আপনার আগ্রহ জন্মাল কীভাবে?'

গঞ্জালো বললেন, 'বলা যেতে পারে বই থেকে। ছেলেবেলায় স্কুল লাইব্রেরিতে জুলেভার্ন, এইচ. জি. ওয়েলস-এর বই পড়েছিলাম। বহির্বিশ্ব সম্পর্কে আগ্রহর পোকাটা সম্ভবত সে সময়তেই মাথায় ঢুকেছিল। সেই সময়ে প্রোগ্রামে গিলতাম মহাকাশ অভিযান, ভিনগ্রহর প্রাণী এসব ব্যাপার নিয়ে লেখা। তবে যদিও সে সময় ব্যাপারটা তার চেয়ে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা আমার জীবনে। আমার বাবা ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। তখন পয়সার অভাব আমাদের তেমন একটা ছিল না। পড়াশোনা শেষ করে যুবা বয়সে একবার ইজিপ্ট ঘুরতে গেলাম আমি। ঘটনাচক্রে গাইড আমাকে পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন স্থাপত্যের গায়ে এক ছবি দেখাল। এক নভশ্চরের ছবি। তার পোশাক, হেলমেট, পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার সব কিছু আধুনিক নভশ্চরের মতো! পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন দেওয়াল গাত্রে কে খোদাই করল এ ছবি? শুধু কল্পনা থেকে কি এমন ছবি আঁকা সম্ভব? আমার মাথার মধ্যে ছোটবেলার ঘুমিয়ে থাকা পোকাটা আবার নড়ে উঠল। দেশে ফিরে এসে পড়াশোনা শুরু করলাম এসব নিয়ে। পড়তে পড়তে দেখলাম পৃথিবীর নানা দেশের ইতিহাসে বা গল্পকাহিনিতে এমন সব ঘটনার কথা উল্লেখ আছে যা ইঙ্গিত দেয় গ্রহান্তরের মানুষদের পৃথিবীতে আগমনের। যেমন পৃথিবীর সব পৌরাণিক গাথাতেই আকাশ থেকে দেবতাদের মর্ত্যে নেমে আসার কথা উল্লেখ আছে। যাদের দেবতা বলা হচ্ছে তারা কি গ্রহান্তরের মানুষ? এ প্রশ্ন নিয়ে একটা চমৎকার বইও আছে দানিকেনের। তার সব প্রশ্নর উত্তর কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনও দিতে পারেননি। সভ্যতার ঊষা লগ্নে তো মানুষ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহার তেমন জানত না বলেই মনে হয়। তবে কে তৈরি করল 'অ্যাজটেক

ক্যালেন্ডার?' মহাকাশ সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান না থাকলে যা বানানো সম্ভব নয়। নিখুঁত জ্যামেতিক নকশায় প্রাচীন মিশরীয়দের পিরামিড বানাতে কে শেখাল? অথবা মাচুপিচুতে প্রাচীন ইনকারা কিভাবে বানাতে শিখল ভূমিকম্প নিরোধক বাড়ি? অথবা তাদের মাকমাহুনান স্থাপত্যে কিভাবে তারা গ্রানাইট পাথর গলাল? তার জন্য যে উত্তাপের প্রয়োজন তা তো আধুনিক ল্যাবরেটরি ছাড়া তৈরি সম্ভব নয়! তবে ভিনগ্রহীদের পৃথিবীতে উপস্থিতির একটা অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন রাশিয়ার নৃতত্ত্ববিদরা। ইউরাল পার্বত্য অঞ্চলে ১৯৯২ সালে খননের সময় তারা পেল এক অদ্ভুত জিনিস—'ন্যানো স্পাইরাল'। আণুবীক্ষণিক ধাতব স্প্রিং। অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তিতে যা ব্যবহার করা হয়, পরীক্ষায় দেখা গেছে তার বয়স কমসে কম এক লক্ষ বছর। টাংস্টেন বা মলিবডেনম সংকর ধাতুতে তৈরি ওই স্প্রিং মানুষ বানিয়েছে এই তো সেদিন ১৯৭০ সালে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে। এক লক্ষ বছর আগে তখন পৃথিবীর বুকে বিরাজ করছে নিওথান্ডারাল মানুষরা। তারা ওই স্প্রিং বানাল কীভাবে? যা ভবিষ্যতের পৃথিবীর মানুষদের বানাতে এক লক্ষ বছর সময় লেগে গেল! তাহলে কি আদিম পৃথিবীতে, অথবা সভ্যতার ঊষা লগ্নে বহির্বিশ্ব থেকে এমন কেউ বা কারা এসেছিল যারা পৃথিবীর মানুষের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল? এসব প্রশ্নই আমার মনের দরজা খুলে দিল।'

গঞ্জালোর কথা শুনতে শুনতে পাকদণ্ডী বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল সুদীপ্তরা। পথের দু-পাশে ক্রমশ ঘন, আরও ঘন হয়ে উঠছে অরণ্য। টুপটাপ পাতা খসে পড়ার শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। যত তারা ওপরে উঠছে পরিবেশটা যেন তত স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা ভেজা হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গঞ্জালো ওপরে উঠতে উঠতে আবার চলে গেলেন 'ইউ.এফ.ও'র প্রসঙ্গে। তিনি বলতে লাগলেন, 'ও সব ব্যাপারই আমাকে আকৃষ্ট করল 'ইউ.এফ.ও', ভিনগ্রহী ইত্যাদির প্রতি। আমি যুক্ত হয়ে গেলাম এসব নিয়ে যারা কাজ করেন তেমন কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে। আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সংস্থা কিন্তু নিয়মিত ভাবে তদন্ত চালায়। 'ইউ.এফ.ও' নিয়ে। আমেরিকার সরকারি নথিতেও ১৯৪৮ সালে 'ইউ.এফ.ও' দেখার উল্লেখ আছে। এই 'ইউ.এফ.ও' অনুসন্ধানের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর অধীনে গঠিত হয় দুটি সংস্থা—প্রোজেক্ট মাইন ও প্রোজেক্ট ব্লু-বুক। দ্বিতীয় সংখ্যাটি ১৮ বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে 'ইউ.এফ.ও' সংক্রান্ত ১২৬০০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংগ্রহ করে। আর তার মধ্যে ৭০০-র বেশি ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি বিশেষজ্ঞর দল। বহু দেশের সিক্রেট সার্ভিস এজেন্সি প্রতিনিয়ত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে ইউ.এফ.ও নিয়ে। সরকারি দপ্তরগুলোতে জমে উঠছে গোপন ফাইল। ১৯৮৯ সালে রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা 'টাস'-তো একবার ঘোষণাই করে দিয়েছিল যে রাশিয়ার সরকারের কাছে 'ইউ.এফ.ও' সংক্রান্ত অকাট্য প্রমাণ আছে! প্রাচীন ইতিহাসেও কিন্তু 'ইউ.এফ.ও'র প্রমাণ আছে। মিশরে এক প্রাচীন প্যাপিরাসে বলা হচ্ছে ৩৫০০ বছর আগে ফারাও তৃতীয় থুটমাস নিজে আকাশের বুকে চাক্ষুস করেছিলেন এক মহাকাশ যান। রোমের প্রাচীন ইতিহাসেও লেখা আছে আকাশ যানের কথা। অনেক নীচ থেকে দেখে তাদের মনে হত সার সার বৃহদাকৃতির ধাতব কাক যেন

উড়ে চলেছে আকাশ পথে।'

ওপরে উঠতে উঠতে 'ইউ.এফ.ও' সংক্রান্ত আলোচনায় আরও যে কথা বললেন গঞ্জালো তাতে বিস্মিত হল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। তিনি বললেন;—'সুদীপ্ত তুমি তো ভারতীয়। তোমাদের দেশে প্রাচীন ভাষা ছিল সংস্কৃত। ও ভাষায় 'বিমানিকা শাস্ত্র' বলে এক প্রাচীন পুঁথির সন্ধান মিলেছে। কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন পুঁথি। যা একসময় পড়ানো হতো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তো মাত্র ১৯০৩ সালে বিমান আবিষ্কার করেন। কিন্তু ওই পুঁথিতে চার ধরনের আকাশযানের উল্লেখ আছে। শাকুনা, রুকমা, ত্রিপুরা আর সুন্দরা। শাকুনা বিমানের আকৃতি ছিল বৃত্তাকার প্রকাণ্ড বাড়ির মতো। ৫০০ লোক ধরত তাতে। বিশেষ মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরি সে বিমানে জ্বালানি হিসবে ব্যবহৃত হত সৌর শক্তি। অথচ সৌরশক্তির ব্যবহার তো শুরু হয় ১৯৬০ সালের পর! তবে এ বিমান, এ প্রযুক্তির ব্যবহার প্রাচীন ভারতীয়রা জানল কীভাবে? নির্ঘাত তারা এ সম্বন্ধে জেনে ছিল কোনো মহাকাশ যানকে দেখে। আর যারা তা বানিয়েছিল তারা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অনেক বেশি উন্নত ছিল পৃথিবীর মানুষের চেয়ে যারা মহাকাশ থেকে নেমে এসে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত করেছিল পৃথিবীর মানুষকে...।"

চলতে চলতে গঞ্জালোর কথা শুনতে শুনতে সুদীপ্ত আর হেরম্যান বুঝতে পারলেন যে 'ইউ.এফ.ও'র ব্যাপারটা সত্যি হোক বা না হোক এসব নিয়ে বেশ পড়াশোনা আছে ভদ্রলোকের। এরপরই হঠাৎ বেশ বড় হরিণের পাল দেখতে পেল তারা। প্রাণীগুলো তাদের সামনের রাস্তা লাফ দিয়ে পেরিয়ে গেল। গঞ্জালো একসময় হেরম্যানের কাছে পালটা জানতে চাইলেন, 'আপনি এই ক্রিপ্টোজুলজি ব্যাপারটার সাথে যুক্ত হলেন কীভাবে?'

হেরম্যান হেসে বললেন, 'প্রাথমিক অবস্থায় আমার এ ব্যাপারে আগ্রহ জন্মেছিল আপনারই মতো গল্পের বই পড়েই। বইয়ের চেয়ে বড় বন্ধু আর কেউ নেই। ছোটবেলায় পড়েছিলাম লেখক আর্থার কোনান ডয়েলের 'দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড' গল্পটা। যে গল্প খুব নাড়া দিয়েছিল আমার মনে। আমার মনে হয়েছিল এই বিপুলা পৃথিবীর এখনও তো অনেক কিছুই অজানা মানুষের কাছে। তুষারাবৃত পর্বত কন্দর, গহীন অরণ্য প্রদেশ, মহা সমুদ্রর অতলে এখনও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে পৃথিবীর মানুষ পৌঁছতে পারেনি। আমাদের পরিচিত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন সেই অদেখা অজানা পৃথিবীতে কি 'লস্ট ওয়ার্ল্ড' গল্পের মতো কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী অথবা নতুন কোনো জীব লুকিয়ে থাকতে পারেনা? জীববিদ্যার ওপর আমার বরাবরই আগ্রহ ছিল। আর তা নিয়ে পড়ার জন্য ভর্তি হলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর সেখানে পড়তে গিয়ে দেখলাম এখনও পৃথিবীর বুকে নানা ধরনের নতুন প্রাণী আবিষ্কার হয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে এক অংশের প্রাণীকে ধরা হতো পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী, যেমন লক্ষ কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হওয়া 'সিলিকান্থ' মাছ। অথবা তাদের একসময় ধরা যেত রূপকথা-গল্পকথার প্রাণী হিসাবে। যেমন ইন্দোনেশিয়ার জীবন্ত ড্রাগন দানবাকৃতির কমাডো গিরগিটি। আর এপরই আমি বইয়ের মাধ্যমে পরিচিত হলাম বিজ্ঞানী হুভেলসম্যানের 'ক্রিপ্টোজুলজি' শব্দের সাথে। আমি জানলাম হিমালয়ের পর্বত কন্দরের বাসিন্দা ইয়েতির কথা, ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি অধ্যুষিত জঙ্গলে প্রাগৈতিহাসিক

উড়ন্ত দানব সাহুলের কথা, নিউজিল্যান্ডের নেকনেমির জলদানব, সমুদ্রতলের দানব অক্টোপাস বা মাদা গাস্বারের নরখাদক গাছের কথা বা আফ্রিকার সিংহ মানুষের কথা। আর এ সব জানার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভেবে নিলাম আমি কী করব। অধ্যাপক বা গবেষক তো সবাই হন, কিন্তু নিশ্চিন্ত জীবন, মোটা বেতনের চাকরি ছেড়ে অজানার সন্ধানে ছোটে কজন? আমি তাই এ পথটা বেছে নিলাম। এখনও আমি তেমন কিছু ক্রিপ্টিড সত্য পৃথিবীর কাছে উপস্থিত না করতে পারলেও উত্তুঙ্গ হিমালয় থেকে সমুদ্রতল, বুরুন্ডির পিগমি অধ্যুষিত বনভূমি থেকে বোর্নিওর আগ্নেয় পর্বত কত জায়গাতেই ক্রিপ্টটিডের খোঁজে ঘুরে বেড়ালাম আমরা দুই বন্ধু, পরিচয় হল কত মানুষের সঙ্গে। এক জীবনে এতো কিছু দেখার, জানার সৌভাগ্যই বা কজনের হয়? এই সব অভিযানের আনন্দ বা রোমাঞ্চ কি ক্লাসরুম বা ল্যাবরেটরিতে বসে পাওয়া যেত?

গঞ্জালো বললেন, 'ঠিক তাই প্রচলিত পথে না হেঁটে অন্য পথে হাঁটার মধ্যে অন্য একটা রোমাঞ্চ আছে। আমিও যেমন ছুটে বেড়াচ্ছি অজানার সন্ধানে পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। এমনকী ইউ.এফ.ও-র সন্ধানে রাশিয়াতেও গিয়েছিলাম বেশ কয়েক মাস। কত অর্থ আমি খরচ করি এ সবের খোঁজে। এ জন্য অনেক লোক আমাকে পাগলও ভাবে।'

এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ধরুন আপনারা যদি প্রাণীটাকে বন্দি করতে পারেন তবে তাকে নিয়ে কী করবেন?'

হেরম্যান বললেন, 'তবে তাকে নিয়ে সভ্য সমাজের পণ্ডিতদের দেখাব, তাদের ব্যঙ্গবিদ্রুপের জবাব দেব। ইওরোপ-আমেরিকার যে কোনো চিড়িয়াখানা বা গবেষণাগারও কিন্তু তখন তাকে কয়েক লক্ষ ডলারে কিনতে চাইবে। তবে প্রাণীটাকে ধরার পিছনে টাকা কখনই মূল উদ্দেশ্য নয়, মূল উদ্দেশ্য হল এই আবিষ্কারের মাধ্যমে ক্রিস্টোজুলজি চর্চাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা। যাতে ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের কাজ নিয়ে আর হাসাহাসি না করেন পণ্ডিত বিজ্ঞানীরা।'

ক্রিপ্টোজুলজি, ইউ.এফ.ও.-এ সব ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে সুদীপ্তরা ক্রমশ এগিয়ে চলল। সময়ও এগিয়ে চলল তাদের সঙ্গে সঙ্গে। ওপরে ওঠার ক্লান্তি দূর করার জন্য বার কয়েক মিনিট বিশ্রামও নিল তারা। সুদীপ্তরা যত ওপরে উঠতে লাগল তত চারপাশে পরিবেশ আরও স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা ভেজা হয়ে উঠতে লাগল। গাছগুলোর গায়েও পুরু হয়ে উঠতে লাগল শ্যাওলার স্তর। এর মধ্যে আরও বেশ কবার হরিণের দেখা মিলল। বেশ বড় আকারের হরিণ। শেষ বিকালে তারা এসে উপস্থিত হল পথের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গাতে। তাদের সামনের রাস্তা আরও কিছুটা ওপরে উঠে মেঘের রাজ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হেরম্যান সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসল মেঘ অরণ্য ওই জায়গা থেকেই শুরু হচ্ছে বলে মনে হয়। আজ এখানেই তাঁবু ফেলা যাক। কাল আমরা প্রবেশ করব ওই মেঘ অরণ্যে। গঞ্জালোও সম্মত হলেন তার প্রস্তাবে।

গঞ্জালোও সঙ্গে একটা তাঁবু এনেছিলেন। কিছু সময়ের মধ্যেই পাশাপাশি দুটো তাঁবু খাটিয়ে ফেলা হল। স্পিরিট স্টোভ জ্বালিয়ে চা বানানো হল। চা পানের পর গঞ্জালো তার জিনিসপত্তর ভিতর থেকে একটা বেশ লম্বা দূরবিন বার করে বললেন, 'রাতে আকাশ দেখা আমার একটা

নেশা। রাতে কিছুক্ষণ আকাশ না দেখলে আমার ঘুম আসেনা।'

সুদীপ্তদের তাঁবু দুটোর এক পাশে কিছুটা তফাতে পাহাড়ের ঢাল শুরু হয়েছে। সেদিকে গাছগুলো একটা ফাঁকা ফাঁকা। সামান্য একফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে সেখান দিয়ে। একটা ছোট স্ট্যান্ডের ওপর সেখানে লম্বা চোঙার মতো, দূরবিন বসাতে বসাতে এক সময় আকাশ টেলিস্কোপের মুখটা নীচের দিকে করে গঞ্জালো বললেন, 'গ্রামবাসীরা দেখছি ইতিমধ্যেই তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে।' তার কথা শুনে সুদীপ্ত গিয়ে চোখ রাখল দুরবীনের নলে। অনেক ওপরে উঠে এসেছে সুদীপ্তরা। কিন্তু টেলিস্কোপে চোখ রাখতেই পাহাড়ের পাদদেশটা যেন তার কয়েক হাতের ব্যবধানে চলে এল। সুদীপ্ত দেখল পাহাড় ওঠার সেই সুঁড়ি পথের মুখটায় আগুন জ্বালানো শুরু হয়েছে। যারা সে কাজে নিয়োজিত তাদের মুখগুলোও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খামার মালিক পেড্রোকেও দেখা যাচ্ছে সে কাজের তদারকি করতে। চুপাকাবরার আক্রমণ ঠেকাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা।

সূর্য চলে পড়তে শুরু করল এক সময়। আর তার সাথে সাথেই যেন মেঘ অরণ্যর মেঘ ধীরে ধীরে ওপর থেকে নীচের দিকে নামতে শুরু করল। গঞ্জালোর টেলিস্কোপ বসানো হয়ে গেছিল। কিন্তু ক্রমশ নীচে নেমে আসা মেঘের দিকে তাকিয়ে একটু বিমর্ষ ভাবে বললেন, 'যা অবস্থা তাতে মেঘের জন্য আকাশ দেখা হবে না। তাঁবুতে ঢুকে মহাকাশে শব্দ তরঙ্গ ক্ষেপণ যন্ত্রটার হেডফোন নিয়ে বসি। যদি কিছু সংকেত পাই।' কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদীপ্ত আর হেরম্যান নিজেদের তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। গঞ্জালোও গিয়ে ঢুকলেন তাঁর তাবুতে। গঞ্জালোর কথাই সত্যি প্রমাণিত হল। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই রাশি রাশি মেঘ এসে ঘিরে ধরল তাদের তাঁবুদুটোকে। তাঁবুর ভিতর একটা বাতি জ্বালিয়ে গল্প করতে বসল হেরম্যান আর সুদীপ্ত। এক সময় চাঁদ উঠল। পাহাড়ের ঢালে গাছের ফাঁক দিয়ে কিছু সময়ের জন্য চাঁদের আলো এসে পড়ল। ঠিক সময় আমার ওপর মেঘঅরণ্য থেকে একদল প্রাণীর সমবেত ডাক ভেসে এল। হেরম্যান বললেন, "নেকড়ের ডাক। চাঁদের দিকে তাকিয়ে রাত্রিকে আহ্বান জানাচ্ছে আদিম প্রকৃতির সন্তানরা। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে অনেক দেশে এই নেকড়েদেরও রক্তচোষা মনে করা হয়। ওদের বলে 'ওয়ার উলফ', যুদ্ধে যারা মারা যায় তারা নেকড়ের রূপ ধারণ করে মানুষের রক্ত পান করে। ইউরোপের বেশ কিছু পার্বত্য দেশে যেমন রোমানিয়া, হাঙ্গেরি ইত্যাদি জায়গাতে এ ধারণা বিশেষ ভাবে প্রচলিত।'

নেকড়ের কথায় সুদীপ্তর মনে পড়ে গেল নেকড়ে শিকারি বাজের কথা। সুদীপ্ত বলল, 'শিকারি বাজ কিন্তু বেশ দৃঢ়ভাবেই বলছিল যে পাদ্রী ডিসুজার হত্যার ব্যাপারটা চুপাকাবরা নয়, নেকড়েরই কাণ্ড।'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'তার কথা হয়তো বা কিছুটা বিশ্বাস করা যেত যদি না দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের কোনো প্রত্যক্ষদর্শী থাকত। তবে আমার দৃঢ় ধারণা যে ওই দুর্ঘটনার সময় তৃতীয় আরও একজন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল যে প্রাণীটাকে লক্ষ করে গুলি চালিয়েছিল। হয়তো বা সে কোনো গ্রামবাসী হবে। হয়তো বা তার ধারণা হতে পারে তারই গুলি বুকে লেগেছে চোরটার। তাই ব্যাপারটা সে চেপে গেছে।'

মেঘ আবার ঢেকে দিল চাঁদকে। একসময় বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সুদীপ্তরা। পথশ্রমের

ক্লান্তিতে ঘুম নেমে এল তাদের চোখে।

তখন প্রায় রাত শেষ হতে চলেছে। হঠাৎ যেন একটা তীব্র কিছু কিচ কিচ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সুদীপ্তর। মেঘের চাদরের ফাঁক গলে কীভাবে যেন বৃত্তাকার চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাঁবুর একপাশে। ঘুম ভেঙে পাশ ফিরতেই হঠাৎ সুদীপ্তর চোখ পড়ল সে জায়গাতে। সুদীপ্ত দেখতে পেল সিনেমার পর্দার মতো সেই বৃত্তাকার আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছায়া। তার অবয়ব মানুষ বা দোপেয়ে কোনো প্রাণীর মতো। মুহূর্তর জন্য সে দেখতে পেল এই দৃশ্য। আর তারপরই ছায়াটা যেন লাফিয়ে সরে গেল। মাথার কাছেই রাখা ছিল হেরম্যানের রিভলবারটা। সুদীপ্ত সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিয়ে লাফিয়ে উঠে তাবুর পর্দা ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকাল। সামনেটা ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। আট-দশ হাত দূরেও কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। হেরম্যানও উঠে বসলেন এবার। সুদীপ্ত ঘটনাটা জানাল তাকে। হেরম্যান বললেন, 'আলো ফোটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সূর্যের আলো ফুটতে শুরু করল। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে সুদীপ্তরা দেখতে পেল ধীরে ধীরে বাইরের মেঘ সরে যাচ্ছে। বাইরের মেঘের বলয় যখন একটু দূরে সরে গেল তখন সুদীপ্তরা তাঁবুর বাইরে বেরোল। খাদের মাথার ওপর মেঘ-অরণ্য কিন্তু একই রকম মেঘের পর্দায় ঢাকা। তারা দেখতে পেল গঞ্জালোও তার তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাকে সুপ্রভাত জানিয়ে হেরম্যান জানতে চাইছেনল, 'কখন তাঁবুর বাইরে বেরোলেন?'

গঞ্জালো জবাব দিলেন, 'এই তো এইমাত্র। বাইরে যা মেঘ ছিল তাতে বেরোনোর কোনো উপায় ছিল কি?'

হেরম্যান আর সুদীপ্ত এরপর একবার প্রদক্ষিণ করল তাদের তাঁবুর চারপাশটা। সুদীপ্ত যার ছায়া দেখেছিল যদি তার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় সে জন্য। কিন্তু তেমন কোনো চিহ্ন তাদের নজরে পড়ল না। সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, 'এমনও হতে পারে যে ব্যাপারটা আমার মনের ভুল।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাতরাশ সারা হল। তাঁবু দুটোও গুটিয়ে ফেলা হল। তারপর শুরু হল পাকদণ্ডী বেয়ে মেঘ অরণ্যের দিকে যাত্রা। চড়াই ভেঙে ক্রমশ তারা প্রবেশ করল মেঘের রাজ্যে।

ক্লাউড ফরেস্ট! মেঘ অরণ্য! সত্যিই মেঘের রাজ্য! পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। খণ্ড খণ্ড মেঘ। তাদের ছোঁয়া যায়, ধরা যায়। সেই মেঘের জলকণা এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে সুদীপ্তদেরকে। তাদের গায়ে প্যারাশুট কাপড়ের জ্যাকেট আছে ঠিকই, কিন্তু ভ্রূ, মুখমণ্ডল ভিজে যাচ্ছে জলকণায়। চারপাশে বিরাট বিরাট গাছ। শতাব্দী প্রাচীন শ্যাওলার আবরণে তারা আবৃত। তাদের ফাঁক গলে মেঘের আনাগোনা। অসম্ভব স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ

চারপাশে। ভেজা মাটিতে, নুইয়ে পড়া মৃত গাছের গুঁড়ির ওপর জন্মেছে বিশাল বিশাল ছত্রাক, কোথাও কোথাও মস-ফার্নের জঙ্গল। পায়ের নীচের মাটিও ভেজা ভেজা। সেই মেঘ অরণ্যের মধ্যেই দুরবীন দিয়ে গঞ্জালো মাঝে মাঝে দেখার চেষ্টা করছিলেন যে মেঘের পর্দা ভেদ করে কোথাও কিছু দেখা যায় কিনা?

ধীরে ধীরে ওপরে, আরও ওপরে উঠতে লাগল তারা। নিঝুম চারপাশ। শুধু পাতা থেকে টুপটাপ জল খসে পড়ার শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। সেই অস্পষ্ট টুপটাপ শব্দ যেন অরণ্যর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

চলতে চলতে গঞ্জালো হঠাৎ তার দুরবীনে চোখ রেখে বললেন, 'ওপর দিকে একটা বাড়ি মত কী যেন দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।'

সুদীপ্ত আর হেরম্যান তার দূরবিনে চোখ রেখে দেখল সত্যিই যেন তেমন কিছুর একটা অবয়ব দৃষ্টিগোচর হচ্ছে বেশ কিছুটা ওপরে মেঘ জঙ্গলের আড়ালে। তা দেখে হেরম্যান বললেন খামার মালিক পেড্রো বলেছিলেন যে পাহাড়ের ওপর স্পেনিয়ার্ডদের একটা আস্তানা ছিল। হতে পারে ওটা সেটাই। চলো দেখা যাক।' হেরম্যানের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একপাল হরিণ সুদীপ্তদের চমকে দিকে বনের এক পাশ থেকে অন্য পাশে চলে গেল। তারপর জঙ্গলের চড়াই ভেঙে ওপরে এগোতে শুরু করল সুদীপ্তরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল বাড়িটা। এক সময় সত্যি তারা পৌঁছে গেল বাড়িটার কাছাকাছি। মেঘ জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা সমতল ফাঁকা জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে পাথর আর কাঠের তৈরি বেশ বড় বাড়িটা। তার গঠনশৈলী দেখেই অনুমান করা যায় সেটা বয়সে খুব প্রাচীন। তিন চারশো বছর বয়সও হতে পারে। বাড়িটার চালের একটা অংশ, দরজা জানলা ইত্যাদি খসে পড়লেও কাঠামোটা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ আছে। চারপাশের গাছগুলো থেকে খসে পড়া পাতার রাশি মনে হয় বাতাসে উড়ে এসে জমা হয়েছে বাড়িটার সামনে, তার অর্ধভগ্ন চালের মাথায়। মাঝে মাঝে মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে তার ঢালু ছাদটাকে। কেমন যেন অদ্ভুত থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে চারপাশে।

হেরম্যান বললেন, 'বাড়িটার ভিতরটা একবার ঘুরে দেখে আসা যাক। যদিও বাড়ির ভিতরে কেউ আছে বলে মনে হয় না।'

পঁচা পাতার রাশি মাড়িয়ে সুদীপ্তরা প্রবেশ করল বাড়িটার ভিতর।

বাড়িটা অধিকাংশ ঘরগুলোই ফাঁকা ফাঁকা। কপাটহীন জানলা-দরজা, মাথার ওপরের ভাঙা ছাদের ফাঁক দিয়ে ধুলো আর পাতার রাশি জড়ো হয়েছে ঘরগুলোর ভিতরে। এ ঘর ও ঘর অতিক্রম করে বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল সুদীপ্তরা। হঠাৎ একটা ঘরের সামনে এসে অবাক হয়ে গেল সুদীপ্তরা। বনের থেকে কাঠ কেটে এনে পাল্লা বানানো হয়েছে সে ঘরের দরজার। হয়তো বা দরজাটা বসানো হয়েছিল কয়েক মাস আগে। লোহার কবজাতে এখনও মরচে পড়েনি। কিছু বাড়তি কাঠ, করাত ইত্যাদিও পড়ে আছে দরজার বাইরে।

হেরম্যান সে সব দেখে বললেন, 'সম্ভবত এ জায়গাতে আস্তানা গেড়ে ছিল কেউ!'

সুদীপ্ত বলল, 'কারা হতে পারে?'

হেরম্যান বললেন, 'গ্রামবাসীদের কেউও হতে পারে। হয়তো বা হরিণ শিকার বা কাষ্ঠ

সংগ্রহর জন্য তারা এখানে এসেছিল। অন্য কোন কারণও হতে পারে।' দরজার পাল্লাটা ফাঁক করাই ছিল। সুদীপ্তরা প্রবেশ করল সেই ঘরের ভিতর। আধো-অন্ধকার ঘর। একটা জানলা আছে তবে সেটা বন্ধ। সেটাও মনে হয় নতুন বসানো হয়েছিল। সুদীপ্ত জানলার কাছে গিয়ে সেটা খুলে দিতেই আলো প্রবেশ করল ঘরে। বেশ বড় ঘর। সুদীপ্ত ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল যে কাঠের পাটাতন দিয়ে সেটার মেরামত করা হয়েছিল। হেরম্যান হঠাৎ চাপ দিলেন সুদীপ্তর কাঁধে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সুদীপ্ত দেখতে পেল ঘরের কোণে মেঝেতে একটা নর কঙ্কাল পড়ে আছে। বিস্মিত সুদীপ্তরা গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে। মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে কঙ্কালটা। দেহের মাংস পচে গলে গেছে। কিন্তু তার পোশাক এখনও লেপ্টে আছে দেহের সাথে। কিছুটা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া সাদা পোশাক। কোমড়ের বেল্ট আর পায়ের বুট জুতোও আটকে আছে দেহের সাথে। এ নরকঙ্কাল কোথা থেকে এল? সুদীপ্তরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল কঙ্কালটা। হেরম্যান বললেন, 'লোকটার পোশাক দেখে মনে হচ্ছে লোকটা বৈমানিক হবে। পোশাকটা সাদা ছিল। তাছাড়া ওর কাঁধের ব্যাজ আর বেল্টের মাঝখানে দেখো পাখির দুটো ডানার এমব্লেম আঁকা আছে। আরও একটা জিনিস খেয়াল করো, কঙ্কালের জামার বুকের বাঁ পাশটা কেমন যেন ছিন্নভিন্ন!'

হেরম্যানের কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেই সম্ভবত গঞ্জালো বলে উঠলেন, 'বুকের বাঁ দিকে ক্ষত! তবে কী চুপাকাবরার আক্রমণেই প্রাণ হারিয়েছিল এ লোকটা? এ বৈমানিক এখানে কোথা থেকে এল?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'হতে পারে লোকটা চুপাকাবরার আক্রমণেই প্রাণ হারিয়েছিল। লোকটা এখানে কোথা থেকে এল জানা নেই। তবে কঙ্কালটা দেখে একটা কথা বলাই যায় যে লোকটা ভিন গ্রহর কোনো প্রাণী ছিল না, এটা মানুষেরই কঙ্কাল।'

গঞ্জালো হেরম্যানের কথার জবাবে কোনো কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তার চোখ পড়ল মাটিতে পড়ে থাকা একটা জিনিসের ওপর। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মাটি থেকে তিনি কুড়িয়ে নিলেন সেটা। চ্যাপ্টা বাক্সর মতো একটা জিনিস, ছোট একটা অ্যান্টেনা, একটা ছোট স্ক্রিন আর কয়েকটা নব আছে তার গায়ে। সুদীপ্ত আর হেরম্যান ঝুঁকে পড়ল গঞ্জালোর হাতে ধরা যন্ত্রটার ওপর। গঞ্জালো তার হাতের যন্ত্রর নব বা চাবিগুলো ঘোরাতেই একবার বিপবিপ শব্দ করল যন্ত্রটা। তার পর্দায় আবছা একটা আলোও যেন মুহূর্তর জন্য ফুটে উঠল। তারপর আলোও নিভে গেল, শব্দও থেমে গেল।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'এ যন্ত্রটা কী?'

গঞ্জালো জবাব দিলেন, 'সম্ভবত এটা একটা ট্রান্সমিটার। তবে কী কাজের জন্য ব্যবহৃত হত জানা নেই।' কথাগুলো বলে গঞ্জালো নব ঘুরিয়ে আবার চেষ্টা করতে লাগলেন যন্ত্রটা চালু করার। কিন্তু সেটা আর চলল না। জিনিসটা তার ব্যাগে ভরতে ভরতে গঞ্জালো বললেন, 'জিনিসটা রেখে দেই, দেখি পরে চেষ্টা করে চালু করা যায় কিনা? এই মেঘ পাহাড়ে 'ইউ.এফ.ও' নামতে দেখা গেছিল। এমনও তো হতে পারে যে কঙ্কাল হয়ে যে লোকটা শুয়ে আছে সে এখানে ঘাঁটি গেড়ে এই যন্ত্রর মাধ্যমেই ভিনগ্রহীদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিল? তারপর কোন কারণে মৃত্যু হয় লোকটার? হয়তো বা তাদের সঙ্গে আসা কোনো

প্রাণীর আক্রমণেই। আমার কিন্তু ধারণা যে আপনাদের চুপাকাবরা ভিন গ্রহর কোনো প্রাণী হবে।'

হেরম্যান কোনো মন্তব্য করলেন না তার কথায়। সেই ঘর সংলগ্ন আরও একটা ঘর আছে। সুদীপ্তরা প্রবেশ করল সে ঘরটাতে। কয়েকটা ছোট প্যাকিং বাক্স রাখা আছে সে ঘরে। সুদীপ্তরা ঢাকনা খুলে দেখল বাক্সগুলো। শুকনো খাবারের প্যাকেট, খাবারের প্লেট, কম্বল ইত্যাদি আরও কিছু নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস রাখা আছে বাক্সগুলোর মধ্যে। সেসব ব্যবহার করা হয়নি। সম্ভবত এ বাড়িতে বেশ কিছুদিন থাকার জন্যই জিনিসগুলো আনা হয়েছিল এখানে।'

বাড়ির অন্য ঘরগুলোতেও এরপর কিছু দেখতে পাওয়া যায় কিনা সে জন্য খোঁজাখুঁজি করল সুদীপ্তরা। কিন্তু অনেক খোঁজার পরও অন্য কোথাও কিছু মিলল না। যে বা যারা এখানে এসেছিল তারা সম্ভবত ও ঘরদুটোই তাদের বাসস্থান হিসাবে নির্বাচিত করেছিল। বাড়ির ভিতর তল্লাশি চালিয়ে এক সময় বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল তারা। হেরম্যান বললেন, 'এবার এ জায়গায় আশপাশটা একটু ঘুরে দেখা প্রয়োজন। যদি কিছুর খোঁজ মেলে?'

বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে আবার অরণ্যে প্রবেশ করল তারা। পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি গিরিশিরার এ অরণ্য যেন আরও অনেক বেশি থমথমে, নিস্তব্ধ। সুদীপ্তরা অনেক সময় নিজেদের পায়ের শব্দেই চমকে উঠছিল। চলতে চলতে একসময় ভেজা মাটিতে বেশ কিছু হরিণের পায়ের ছাপ দেখতে পেল। হেরম্যান বললেন হরিণ দেখছি প্রচুর আছে ও জঙ্গলে। তাই নেকড়েও আছে। পরস্পরের মধ্যে খাদ্য খাদকের সম্পর্ক আছে তো। হেরম্যানের বক্তব্য যেন কিছুক্ষণের মধ্যে মিলে গেল। দূরবিনটা মাঝে মাঝে চোখে লাগিয়ে সামনের যাত্রাপথটা দেখে নিচ্ছিলেন গঞ্জালো। তিনি দূরবিনটা সুদীপ্তদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন শিকারি শিকার ধরেছে!'

সুদীপ্তরা দূরবিনে চোখ রেখে দেখল সামনের যাত্রাপথে একটা গাছের নীচে একটা হরিণের দেহ ছিঁড়ে খাচ্ছে দুটো বড় কুকুর জাতীয় প্রাণী। নেকড়ে! সুদীপ্তরা বন্দুক নামিয়ে সামনে এগোতেই তাদের পদশব্দ পেয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল প্রাণী দুটো। সুদীপ্তরা গিয়ে দাঁড়াল হরিণটার মরদেহর সামনে। নেকড়ে দুটো মনে হয় মেরে খাওয়া শুরু করেছিল দেহটা। পায়ের ওপরের অংশের কিছুটা তারা ছিঁড়ে খেয়েছে মাত্র। কিছুক্ষণ ছোট আকারের হরিণটার মৃতদেহর দিকে তাকিয়ে থাকার পর হেরম্যান হঠাৎই নীচু হয়ে উল্টে দিলেন প্রাণীটাকে। একটা অদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হল সুদীপ্তর। হরিণটার বুকের কাছে তিনটে গভীর ছিদ্র। ঠিক যেন সেখানে শলাকা বিঁধিয়ে দিয়েছে কেউ!

হেরম্যান এরপর বললেন, 'নেকড়ে কি এভাবে ছিদ্র করতে পারে? হুবহু ওই একই চিহ্ন! দেখো বুকের কাছে ছিদ্রর গায়ে ছাড়া নেকড়ে যেখানে কামড় বসিয়েছে সেখানেও কোনো রক্ত নেই। কেউ যেন শুষে নিয়েছে তার রক্ত। নেকড়ে প্রাণীটাকে মারেনি। তারা মৃত হরিণের মাংস খাচ্ছিল। প্রাণীটার সম্ভবত মৃত্যু হয়েছে চুপাকাবরার হানায়।

সুদীপ্ত বলল, 'হরিণটার দেহে এখনও পচন শুরু হয়নি দেখছি।'

হেরম্যান বললেন, 'খুব বেশি আগে হলে ভোর রাতেই প্রাণ হারিয়েছে হরিণটা। নইলে দেহে পচন ধরত।'

হেরম্যানের কথা শুনে গঞ্জালো উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'তাহলে কি সেই ভিনগ্রহর জীবটা এখানেই আছে? এটাই কি তার ডেরা?'

সুদীপ্ত বুঝতে পারল ভিনগ্রহর ব্যাপারটা সবসময় কাজ করে গঞ্জালোর মাথায়।

হেরম্যান বললেন, 'বাড়ির মধ্যে পড়ে থাকা কঙ্কালটা, এই হরিণটা তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ফাদার ডিসুজা বলেছিলেন শয়তানটা পাহাড় থেকেই নেমে আসে। পেড্রো বলছিলেন এমনই একটা হরিণের মৃতদেহ নাকি এ পাহাড়ে খুঁজে পেয়েছিল গ্রামবাসীরা। খামার মালিক উইলিয়াম তো প্রাণীটাকে এই পাহাড়ের দিকেই পালিয়ে আসতে দেখেছিলেন। গতকাল বিকালে পাহাড় থেকে নীচে নামার পথে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। তাই হয়তো শয়তান রক্তচোষা নীচের দিকে না নেমে এই ওপর দিকে উঠে এসেছে।

গঞ্জালো বললেন, 'আপনার যুক্তি ঠিক। কিন্তু রক্তচোষাটা যদি কাছাকাছি থেকে থাকে তবে তাকে ধরা বা মারার জন্য কী ব্যবস্থা করবেন?'

হেরম্যান বললেন, 'প্রাণীটাকে জ্যান্ত ধরতে পারলেই ভালো। তাকে ধরার জন্য খাঁচার ফাঁদ আছে, ট্রাঙ্কুলিন ইঞ্জেকশন অর্থাৎ ঘুমপাড়ানি গুলিও আছে। ভাবছি কাল একটা হরিণ ধরব। যেটাকে চুপাকাবরার টোপ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।'

গঞ্জালো বললেন, 'হরিণ তো প্রচুরই আছে ওখানে। মাঝে মাঝেই তাদের দেখা মিলছে। কিন্তু কীভাবে ধরবেন ওদের?'

হেরম্যান সুদীপ্তর কাঁধের বন্দুকটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা ট্রাঙ্কুলিন গান' অর্থাৎ ঘুম পাড়ানি গুলি ছোড়ার জন্যও ব্যবহার করা যায়। আমাদের কাছে ঘুমপাড়ানি ওষুধের সিরিঞ্জও আছে। কম মাত্রার ওষুধ প্রয়োগ করে কোনো হরিণকে সজ্ঞান করতে পারব আমরা। তারপর সেটাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করব। ভাবছি আজকের রাত বাদ দিয়ে আগামী দুটো রাত এখানেই কাটাব। যদি প্রাণীটার সন্ধান মেলে, যদি সে এসে ধরা দেয় ফাঁদে।'

গঞ্জালো বললেন, 'আপনার পরিকল্পনাটা মন্দ নয়। দেখা যাক সেই ভিনগ্রহর প্রাণীটা আপনার ফাঁদে আটক হয় কিনা?'

বেশ সতর্কভাবে সুদীপ্তরা এরপর আশেপাশের জায়গাগুলোতে তল্লাশি চালাতে চালাতে এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে মেঘের আনাগোনায় অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। দৃষ্টি চলছে না কোনোদিকে। কয়েক হাত তফাত থেকেও কোনো প্রাণী যদি বেরিয়ে আসে সুদীপ্তদের আক্রমণ করে কিছু করার থাকবে না তাদের। যদিও সামনে মেঘের বলয় সৃষ্টি হলেই কাঁধ থেকে বন্দুক খুলে নিচ্ছিল সুদীপ্ত আর গঞ্জালো। হেরম্যানের হাত চলে যাচ্ছিল তার কোমরে গোঁজা রিভলবারের দিকে। একবার তো একটা হরিণকে সামনে মেঘের আড়াল দিয়ে যেতে দেখে অন্য কিছু ভেবে গুলিই চালিয়ে দিচ্ছিল সুদীপ্ত! বিকাল নাগাদ সামান্য একটু ফাঁকা জমিতে উপস্থিত হল সুদীপ্তরা। গঞ্জালো বুঝলেন, 'আজ অনেকটা পথ ঘোরা হয়েছে। এখানেই তাঁবু ফেলা যাক। কাল সকালে উঠে আপনাদের ফাঁদের জন্য হরিণ ধরা যাবে বা আগামি পরিকল্পনা করা যাবে।'

হেরম্যানও সম্মত হলেন তার প্রস্তাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গা ঘেঁষে পর পর দুটো তাঁবু খাটিয়ে ফেলা হল। গতকাল সুদীপ্তরা যেখানে ছিল এদিন তারা তার থেকেও বেশি ওপরে

উঠে প্রবেশ করেছে মেঘ অরণ্যে। সূর্যদেব পশ্চিমে হেলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারপাশ থেকে মেঘরাশি ধেয়ে আসত তাঁবুর দিকে। অগত্যা তাঁবুর ভিতরে ঢুকে যেতে হল সুদীপ্তদের, গঞ্জালোও নিজের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন। নিজেদের তাঁবুতে ঢোকার পর হেরম্যান বললেন, 'আজকের যা অভিজ্ঞতা, ওই লোকটার মৃতদেহ, আর তারপর ওই হরিণটাকে দেখে আমার কিন্তু সত্যিই কেমন যেন মনে হচ্ছে এ জায়গাটাই রক্তচোষার ডেরা। এই মেঘ জঙ্গলের মতো লুকিয়ে থাকার ভালো জায়গা আর হয় না। দেখা যাক কালকের দিনটাতে নতুন কিছুর খোঁজ পাওয়া যায় কিনা? তবে হরিণ ধরে ফাঁদ পাতার ব্যবস্থাটা কালকেই করব। আজকের রাতটাও সতর্ক থাকতে হবে। প্রাণীটা মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে। রক্তপেয়ী প্রাণীদের কাছে মানুষের রক্তই নাকি সবচেয়ে সুস্বাদু। যে কারণে বাঘ-সিংহ একবার মানুষ মারলে অন্য প্রাণীকে ছেড়ে দিয়ে শুধু মানুষই মারার চেষ্টা করে। বলা যায় না রক্তচোষাটা হয়তো আমাদের অলক্ষে অনুসরণ করেছে আমাদের। হয়তো সে তাঁবুতেই হানা দিল। কাজেই প্রথম রাতটা তাঁবুর ভিতর তুমি জেগে কাটাবে, আর শেষ রাতে আমি।'

তাঁবুর ভিতরই খাওয়া সেরে নিল সুদীপ্তরা। তারপর কিছুক্ষণ গল্প করার পর হেরম্যান ঘুমাবার প্রস্তুতি শুরু করলেন। বাইরে তখন অন্ধকার নেমেছে। ঠিক এই সময় তাদের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন গঞ্জালো। একটু ইতস্তত করে তিনি জানতে চাইলেন, 'একটু আগে কি আপনারা কেউ বাইরে গেছিলেন?'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'নাতো। আমরা বাইরে যাইনি। কেন বলুন তো?'

গঞ্জালো একটু চুপ থেকে বললেন, 'একটু আগে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখলাম একটা মানুষ যেন মেঘের মধ্যে দিয়ে তাঁবুর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। তাঁবুর বাইরে বেরোলাম। 'কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। অবশ্য ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি বিভ্রমও হতে পারে। অবশ্য স্নায়ুতন্ত্রের ওপর চাপ পড়লে অনেক সময় এমন হয়।' এই বলে তাঁবু ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন গঞ্জালো।

তিনি চলে যাবার পর হেরম্যান বললেন, 'এখানে লোক আসবে কিভাবে? হয়তো সত্যি এটা ওর দৃষ্টি বিভ্রম। যাই হোক আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

শুয়ে পড়লেন হেরম্যান। কিছুক্ষণ পরই সুদীপ্ত বুঝতে পারল বাইরের ঘন মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার যেন একটু হালকা হয়ে গেল। চাঁদ উঠতে সুরু করেছে। আর এরপরই খুব কাছ থেকে কোথায় যেন নেকড়ের পাল ডেকে উঠল। হ্যাঁ, চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদকে স্বাগত জানাচ্ছে তারা। নেকড়ের ডাক একসময় থেমে গেল। এগিয়ে চলল রাত। হেরম্যান ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর মৃদু নাসিকা গর্জন শোনা যাচ্ছে। বন্দুকটা কোলে নিয়ে তাঁবুতে বসে রইল সুদীপ্ত। হঠাৎ সে খেয়াল করল কোথা থেকে যেন মৃদু বিপবিপ শব্দ আসছে! নিশ্চই পাশের তাঁবু থেকে। তবে কী গঞ্জালো কি এখনও ঘুমান নি?' গঞ্জালো কি তবে মহাকাশে শব্দ নিক্ষেপক যন্ত্রটা নিয়ে কাজ করছেন? নাকি তিনি সেই বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা যন্ত্রটা চালু করতে পেরেছেন। যন্ত্রটা কী? ভোরবেলা জিজ্ঞেস করতে হবে তাঁকে। নানা কথা ভাবতে লাগল সুদীপ্ত। প্রহরের পর প্রহর এগিয়ে চলল। কাছে দূরে আবারও বার কয়েক নেকড়ের ডাক শোনা গেল। একবার যেন একটা হরিণেরও আর্তনাদ শোনা গেল। হয়তো বা নেকড়ের

শিকার হল সে। মাঝরাতে হেরম্যানকে ডেকে উঠিয়ে সুদীপ্ত তার হাতে বন্দুকটা তুলে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

হেরম্যানকে পাহারায় রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল সুদীপ্ত। শেষ রাতে হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে বসল সে। হেরম্যান তার উদ্দেশ্যে বললেন—

'গুলির শব্দ হল একটা। আর তার সাথে নেকড়ের ডাক! অর্থাৎ আরও কেউ আছে এ পাহাড়ে!

তাঁবুর ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সুদীপ্তদের কিছু দৃষ্টিগোচর ল না। মেঘ আর অন্ধকারে মোড়া আছে তাঁবুর বাইরেটা।

ভোর হল একসময়। সুদীপ্তরা আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল। সুদীপ্তরা গঞ্জালোর তাঁবুর ভিতর উঁকি দিয়ে তাকে দেখতে পেল না। তাবুর ভিতর অন্য জিনিসের সাথে একটা রেডিও বাক্সর মতো যন্ত্র আর হেডফোন পড়ে আছে। হেরম্যান সেই যন্ত্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওটা সম্ভবত টর শব্দ। প্রক্ষেপণ যন্ত্র। যারা ইউ.এফ.ও নিয়ে চর্চা করেন তারা শুনেছি এ যন্ত্র কানে লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন। যদি তাদের প্রেরিত শব্দ তরঙ্গর কোনো প্রত্যুত্তর মহাকাশ থেকে ভেসে আসে সে আশায়।' হেরম্যানের কথা শেষ হতে না হতেই মেঘের পর্দা ঠেলে তাঁবুর পিছন দিক থেকে গঞ্জালো এসে দাঁড়ালেন। তার কাঁধে বন্দুক, এক হাতে ধরা গতকালের সেই যন্ত্রটা।

তিনি বললেন, 'শেষ রাতে গুলির শব্দ নিশ্চয়ই শুনেছেন? তাই আলো ফুটতে না ফুটতেই চারদিকটা একবার দেখে এলাম।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'কিছু নজরে পড়ল?'

গঞ্জালো জবাব দিলেন, 'না। খুব বেশি দূরে তো যাইনি। তাছাড়া মেঘও ভালো করে কাটেনি।'

হেরম্যান একটু চিন্তিতভাবে বললেন, 'কিন্তু গুলিটা চালাল কে?'

গঞ্জালো বললেন, 'হতে পারে সেই নেকড়ে শিকারি আমাদের দেখাদেখি পাহাড়ে উঠে এসেছেন।'

হেরম্যান বললেন, 'তা হতে পারে। তবে হয়তো দেখা হয়ে যাবে তার সাথে।'

সুদীপ্ত এরপর গঞ্জালোর হাতের যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওই যন্ত্রটা কি চালু করতে পেরেছেন? মাঝে মাঝে বিপ বিপ শব্দ আসছিল আপনার তাঁবু থেকে। ওটা কি যন্ত্র বুঝতে পারলেন?'

গঞ্জালো বললেন, 'চালু করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে চালু হয়েই আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি যে যন্ত্রটা কী? বেখেয়ালে হাতে যন্ত্রটা

নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছিলাম।' এ কথা বলার পর তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আজকের পরিকল্পনা কী?'

হেরম্যান বললেন, 'তাঁবু তুলব না ভাবছি। আর দুটো রাত এখানেই কাটাব। প্রাথমিক ভাবে চেষ্টা করি ফাঁদ পেতে একটা হরিণ ধরা যায় কিনা? যেটাকে রাতে রক্তচোষার টোপ হিসাবে ব্যবহার করব।'

গঞ্জালে জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে হরিণ ধরবেন?'

হেরম্যান বললেন, 'বনের এক জায়গাতে আমি গাছের আড়ালে একটা সুঁড়িপথ দেখেছি। সেখানে হরিণের অনেক পায়ের ছাপ দেখেছি। সম্ভবত ওটা হরিণ চলাচলের পথ। ওখানে দড়ির ফাঁদজাল পাতব। লবণ ছড়াব ওখানে। হরিণ জাতীয় প্রাণীদের লবণের প্রতি আগ্রহ প্রবল। কিন্তু পাহারি অঞ্চলে লবণ পাওয়া যায়না বলে প্রাণীরা পাহাড়ের ঢালে কোথাও খনিজ লবণ পেলে তা চেটে চেটে খায়। দেখি লবণের ফাঁদ পেতে হরিণ ধরা যায় কিনা?'

গঞ্জালো জানতে চাইলেন, 'সে জায়গা কোথায়?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'যেখানে হরিণের মৃতদেহটা পাওয়া গেছিল তার খুব কাছেই। বেশ কিছুটা আবার যেতে হবে সে জায়গাতে পৌঁছবার জন্য। গঞ্জালো একটু চুপ করে থেকে বললেন, তাহলে তাই করুন। আমার তাঁবুটাও তাহলে এখানেই থাক। তবে আজ আমি আপনাদের সঙ্গ দিতে পারব না। এর পিছনে বিশেষ একটা কারণ আছে। গতকাল রাতে আমার শব্দ প্রক্ষেপণ যন্ত্রর প্রত্যুত্তরে একটা অদ্ভুত তরঙ্গ বার্তা এসেছে। যদিও তার পাঠোদ্ধার আমি করতে পারিনি, তবু বলি সেই শব্দ তরঙ্গ যেন খুব কাছ থেকেই এসেছে, মহাকাশ থেকে নয়। হরিণের মৃতদেহটা তো পূর্ব দিকে পাওয়া গেছিল, তরঙ্গ বার্তাটা সম্ভবত এসেছে পশ্চিমের পাহাড়ের শাখা থেকে। এমনও হতে পারে যে, 'ইউ.এফ.ও'কে পাহাড়ের মাথায় নামতে দেখা গেছিল তার ভিনগ্রহী নভশ্চরটা আসার প্রেরিত শব্দ তরঙ্গর জবাব দিচ্ছে। কাজেই ওদিকে যাব আমি। এতে একটা সুবিধাও হবে। আপনারা যাবেন পূর্বে। আর আমি যাব পশ্চিমে। দু-দিকটাই দেখা হবে আমাদের। বিকালবেলা তাঁবুর কাছে এসে আবার আমরা মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করা যাবে।'

সুদীপ্ত বলল, 'আপনার তাঁবুতে আপনার খোঁজে উঁকি দিয়ে আপনার মহাকাশে শব্দ প্রেরণকারী যন্ত্রটা সম্ভবত দেখলাম। সত্যিই কি ওই যন্ত্রর মাধ্যমে মহাকাশ থেকে আসা শব্দতরঙ্গ ধরা পড়ে? অবিশ্বাস করছি না। ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছি মাত্র।

সুদীপ্তর কথা শুনে গঞ্জালো বললেন "অবশ্যই। আমরা যারা মহাজাগতিক বিষয় নিয়ে চর্চা করি তাদের কাছে এটা একটা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। বহু মহাকাশ গবেষক মহাকাশ থেকে নানা অদ্ভুত বার্তা পেয়েছেন এ ধরনের যন্ত্রর মাধ্যমে। একটা প্রামাণ্য ঘটনার কথা বলি এ ব্যাপারে। যা সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। হার্ভাড স্টেট ইনস্টিটিউটের মহাকাশ গবেষক ডক্টর ডোরির কাজ ছিল রেডিও টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশের বার্তা শোনা। ১৫ আগস্ট ১৯৭৭। অন্যদিনের মতোই তার ইনস্টিটিউটের কাজে এসেছিলেন তিনি। এবং একই কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এ কাজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কানে ইয়ার ফোন লাগিয়ে মনিটরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হয়। এ কাজ করতে করতে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তিনি।

হঠাৎ তার কানে আসে এক সংকেত! দূর মহাকাশ থেকে ভেসে আসছে সেই সংকেত। টানা প্রায় আট মিনিট ধরে আসে সেই বার্তা। কম্পিউটার প্রিন্ট বার করে তার সমার্থ বার করলেন ডেরি। ফুটে উঠল এক অদ্ভুত বিস্ময়কর শব্দ— 'Wow' বা 'ওয়াও'। মহাকাশ থেকে কারা পাঠিয়েছিল এই বার্তা?' বিজ্ঞানীরা অনেক চেষ্টা করেও এ সংকেতের যথার্থ কারণ খুঁজে পাননি। মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই রহস্যময় ঘটনা 'ওয়াও সিগনাল' নামে খ্যাত।' তার কথা শোনার পর হেরম্যান বললেন, 'আপনার বলা এ ঘটনাটা আমি যেন কোন একটা বইতে পড়েছিলাম। যাই হোক আপনার প্রস্তাবটা মন্দ নয়, আমরা দু-ভাগে দু-দিকে যাই। তাতে দু-পাশটা সম্বন্ধে আমাদের জানা হবে। তবে আপনি একলা যাচ্ছেন, কাজেই একটু সাবধানে থাকবেন।' গঞ্জালো হেসে বললেন, 'সতর্ক করার জন্য ধন্যবাদ। তবে আপনারা না এলে আমাকে তো একাই এই মেঘ জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে যেত। সেই রক্তচোষা ভিনগ্রহর প্রাণীটা সম্ভবত ভোরের আলো ফোটার আগেই হানা দেয়। সূর্যোদয়ের পর তার ভয় আছে বলে মনে হয় না। বাকি রইল নেকড়ের ব্যাপার। সঙ্গে বন্দুক তো রইলই। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না।'—এই বলে তিনি ঢুকে গেলেন তাঁবুর ভিতর।

প্রাতরাশ সেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে সুদীপ্তরা বাইরে বেরিয়ে এল। একই সময় বাইরে বেরিয়ে এলেন গঞ্জালো। তার পিঠে বন্দুক। হাতে ধরা আছে গতকাল উদ্ধার করা সেই যন্ত্রটা।

হেরম্যান সেটা দেখে বললেন, 'আবারও খেয়ালবশে যন্ত্রটা সঙ্গে নিচ্ছেন নাকি?'

গঞ্জালো হেসে বললেন, 'এবার সচেতন ভাবেই সঙ্গে নিচ্ছি এটা। দেখি যদি যন্ত্রটা চলার পথে কোনোভাবে চালু করা যায়। এ যন্ত্রের মাধ্যমে ভিনগ্রহীদের সাথে যোগাযোগের সম্ভাবনা কিন্তু আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। হয়তো যার কঙ্কাল দেখলাম তিনিও এখানে সত্যিই এসেছিলেন আমারই মতো কোনো মহাকাশযানের খোঁজ পেয়ে?'

হেরম্যান এ প্রসঙ্গে আর কোনো মন্তব্য করলেন না। তাঁবু ছেড়ে কিছুটা পথ গঞ্জালোকে নিয়েই হাটল সুদীপ্তরা। তারপর একটা সময় তারা রওনা হল পরস্পরের বিপরীতে।

তিনি চলে যাবার পর হেরম্যান বললেন, 'ভিনগ্রহীদের অস্তিত্ব থাক বা না থাক গঞ্জালোর কিন্তু এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একাগ্রতা আছে।' মেঘ অরণ্যর মেঘ আর প্রাচীন গাছের জঙ্গল ধরে এগিয়ে চলল তারা। চলতে চলতে সুদীপ্ত বলল, 'চুপাকাবরা প্রাণীটার যে বিবরণ তার প্রত্যক্ষদর্শী খামার মালিক উইলিয়ামের মুখে শুনলাম তাতে প্রাণীটা সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী?'

হেরম্যান প্রথমে হেসে বললেন, 'সম্ভবত ভিনগ্রহী নয়। রক্তপান তো পৃথিবীর শ্বাপদ শ্রেণির প্রাণীরা করে। মহাকাশের ভিনগ্রহর জীবের দেহেও রক্ত প্রবাহিত হয়? সেখানেও কি বাতাসে অক্সিজেন আছে?'

এরপর তিনি বললেন, 'আমার ধারণা প্রাণীটা নতুন প্রজাতির কোনো প্রাণী। আবার শঙ্কর প্রাণীও হতে পারে। তুমি কি হগজিলার ব্যাপারটা জানো?' আমেরিকার জর্জিয়ার এক জঙ্গলে আবির্ভাব হয়েছিল সেই মহাকায় চতুষ্পদের। কারো কোনো ক্ষতি না করলেও তার দানবীয় আকার ত্রাস সঞ্চার করেছিল স্থানীয় গ্রামবাসীদের মনে। আমাদের মতো ক্রিপ্টিভ

অনুসন্ধানকারীরাও নেমে পড়ে তার খোঁজে। শেষপর্যন্ত প্রাণীটাকে গুলি করে মারা হয়। ঘটনাটা ২০০৪ সালের। প্রাণীটা বারো ফিট লম্বা, ওজন এক হাজার পাউন্ড। তার বাঁকানো দাঁতের দৈর্ঘ্য দু-ফুটের ও বেশি। জীব বিজ্ঞানীরা তার জিনের পরীক্ষা করে দেখেন যে সেটা আসলে ছিল গৃহপালিত শুকরও বন্য বরার সঙ্কর প্রাণী। কোনো কারণে সেই হগজিলা অমন দানবীয় আকার ধারণ করেছিল।'

কথা বলতে বলতে সুদীপ্তরা একসময় পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট জায়গাতে। হরিণটাকে ধূসর নেকড়ে বা কোয়াটের দল প্রায় সাবাড় করে ফেলেছে। শুধু তার শিংসমেত শাখা আর কিছু হাড়গোড় পড়ে আছে সেখানে। যে গাছের নীচে হরিণের দেহাবশেষ পড়ে তার পিছনে লেই হরিণ চলাচলের সুঁড়িপথ। প্রাণীগুলোর অসংখ্য পায়ের ছাপ সেখানে আঁকা। ঘাস নেই মাটিতে। দেখেই বোঝা যায় হরিণের দল নিয়মিত চলাচল করে। হেরম্যান সেখানে খুব সরু অথচ ভীষণ শক্ত নাইলনের দড়িতে ফাঁদ বিছালেন। নুনও ফেলা হল সেখানে। এসব কাজ সাঙ্গ হতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। কাজ শেষ হবার পর হেরম্যান বললেন, 'এবার এখান থেকে সরে পড়তে হবে। ওদের ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ম। আমরা কাছাকাছি থাকলে ওরা এ রাস্তা মাড়াবে না।'

সুদীপ্ত বলল, 'তবে এখন কী করবেন?'

হেরম্যান রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন সকাল দশটাও বাজেনি। এই মুহূর্তে তো তেমন কিছু করার নেই। চলো তাঁবুর কাছে ফিরে যাই। ওদিকে কোথাও খাঁচাটা বসাবার জন্য স্থান নির্বাচন করে খাঁচা বসানোর কাজটা সেরে ফেলি। কাজ এগিয়ে থাকবে। তারপর বিকাল নাগাদ এখানে ফিরে এসে যদি ফাঁদে হরিণ ধরা পড়ে তবে সেটাকে নিয়ে খাঁচার ফাঁদে পুরব।'

হেরম্যানের কথা মতো তাঁবুর দিকে ফেরা শুরু করল সুদীপ্তরা। তাঁবুর কাছাকাছি পাহাড়ের ঢালে খাঁচা বসাবার জন্য একটা জায়গা পছন্দ হল তাদের। বড় বড় বৃক্ষরাজির মধ্যে একটা ফাঁকা জমি। তাঁবুতে ফিরে গোটানো খাঁচাটা নিয়ে সে জায়গাতে রওনা হল তারা। সেখানে পৌঁছে খাঁচাটা বসানো হল। এসব কাজ সমাধা করে বেলা একটা নাগাদ তারা তাঁবুতে ফিরে এল। হেরম্যান বললেন, 'এবার তবে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। যে কোনো অভিযানের পক্ষে ঘুমটা বেশ জরুরি। স্নায়ু ও শরীর চাঙ্গা হয়। কখন রাত জাগতে হয় বলা যায় না। তাছাড়া আমরা দুজনেই গতকাল অর্ধরাত ঘুমিয়েছি। তিনটে নাগাদ আমরা রওনা হব দড়ির ফাঁদে হরিণ পড়েছে কিনা দেখতে।'

তাঁর প্রস্তাব মতোই তাঁবুর ভিতর গিয়ে ম্যাটে শুয়ে পড়ল তারা দুজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হেরম্যানের নাসিকা গর্জনের মৃদু শব্দ হলেও সুদীপ্তর কিন্তু ঘুম হল না। প্রায় এক ঘণ্টা শুয়ে এপাশ ওপাশ করার পর সুদীপ্ত উঠে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে একটা পাথরের ওপর বসল। বনের ভিতর মেঘের খেলা চলছে। মাঝে মাঝেই চারপাশের গাছগুলো মেঘের আড়ালে ঢেকে যাচ্ছে। সুদীপ্ত দেখতে লাগল সেই মেঘের খেলা। কিন্তু হঠাৎই একটা যান্ত্রিক রিনিরিনি শব্দ কানে আসতে লাগল তার। শব্দটা আসছে গঞ্জালোর তাঁবু থেকে। প্রাথমিক অবস্থায় সুদীপ্তর তেমন আগ্রহ জন্মায়নি শব্দটার প্রতি। কিন্তু শব্দটা এতো নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বাজতে লাগল

যে একসময় তা সুদীপ্তর মনোযোগ আকর্ষণ করল। সুদীপ্ত উঠে গিয়ে উপস্থিত হল গঞ্জালোর তাঁবুর সামনে। পর্দা ফাঁক করে সে বুঝতে পারল ওই যান্ত্রিক শব্দটা হচ্ছে সেই মহাকাশে শব্দ প্রেক্ষণকারী রেডিওটর মতো যন্ত্রটার থেকে। ব্যাপারটা দেখে বেশ কৌতূহল জন্মাল সুদীপ্তর মনে। কিন্তু গঞ্জালোর অনুপস্থিতিতে তাঁর তাঁবুতে পা রাখা ঠিক নয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল যে গঞ্জালোর বক্তব্য মতো মহাকাশ থেকে কোনো বার্তা আসছে না তো। সে যদি কোনভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গঞ্জালোকে জানিয়ে দিতে পারে তবে তিনি উপকৃত হতে পারেন। এ কথা ভেবে সে একটু ইতস্তত করে গঞ্জালোর তাঁবুর ভিতর ঢুকল। তারপর সেই যন্ত্রর সাথে সংযোগকারী ইয়ারফোনটা তুলে নিয়ে কানে দিল। সেই ইয়ারফোনের সাথে মুখের কাছে নেমে আসা একটা সরু মাইক্রোফোনও আছে। ইয়ারফোনটা কানে দেয়ার পর সে বলল, 'হ্যালো?'

ওপাশ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হ্যালো? টু-সেভেন-ফাইভ-টু, অস্ত্রোভোস্কি কলিং।'

এটুকুই সে বুঝতে পারল। তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলতে শুরু করল ও পাশে থাকা ব্যক্তি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে কথা বলে চলল। একসময় সুদীপ্ত বলল, 'আই অ্যাম সুদীপ্ত। হু আর ইউ?'

সঙ্গে সঙ্গেই যেন সেই অদ্ভুত ভাষাটা থেমে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে গেল ওপাশের লোকটা। রেডিওর মতো যন্তর সেই রিনিরিনি শব্দটাও আচমকা থেকে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ইয়ারফোন কানে দিয়ে থাকার পরও আর কোনো শব্দ ভেসে এল না। এরপর এক সময় ইয়ারফোনটা কান থেকে নামিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল। বিস্মিত সুদীপ্ত তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, 'কার কণ্ঠস্বর শুনল সে? ভিনগ্রহীরা কি ইংরেজি জানে? সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর প্রথম বাক্যটা ইংরেজিতে বলল কেন?' অদ্ভুত ব্যাপার!

সুদীপ্তর ঘড়িতে আড়াইটে বাজে। হেরম্যানের ঘুম ভাঙাতে হবে। সে নিজেদের তাঁবুতে ঢুকতে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই গঞ্জালো ফিরে এলেন। তিনি সুদীপ্তকে প্রশ্ন করলেন, 'হেরম্যান কই?'

সুদীপ্ত বলল, 'তাঁবুর ভিতর ঘুমচ্ছেন। হরিণ ধরার ফাঁদ পাতা হয়েছে। আর একটু পরই আমরা রওনা হব ফাঁদে হরিণ ধরা পড়েছে কিনা দেখার জন্য।'

এ কথা বলার পর সুদীপ্ত তাকে বলল, 'আপনার তাঁবুতে মহাকাশ শব্দ প্রক্ষেপণকারী যন্ত্র থেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে একটা শব্দ হচ্ছিল। মাফ করবেন, আপনার অনুমতি না নিয়েই আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার তাঁবুতে ঢুকেছিলাম। ইয়ারফোন কানে দিয়ে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে কে যেন বলল 'অস্ত্রোভোস্কি কলিং। তারপর সে কী বলল আমি বুঝতে পারলাম না। এরপর আমি আমার পরিচয় দিতেই লোকটা লাইন কেটে দিল। ভিনগ্রহীরা এক পৃথিবীর ভাষা জানতে পারে? কেমন যেন অদ্ভুত ব্যাপারটা!'

সুদীপ্তর কথা শুনে মুহূর্তের জন্য যেন গম্ভীর হয়ে গেল গঞ্জালোর মুখ। পরক্ষণেই তিনি হেসে ফেলে বললেন, 'না, ওটা মহাকাশ বার্তা নয়। অনেক সময় এই পৃথিবীর নানা বার্তা ধরা পড়ে যন্ত্রে। তেমনই কোনো বার্তা হয়তো আপনি শুনেছেন। যে কথা বলছিল সে তার ভুল বুঝতে পেরে লাইনটা কেটেছে।'

সুদীপ্ত বলল, 'ও, ব্যাপারটা এবার বুঝতে পারলাম না। তা আজ আপনার অনুসন্ধানে কি কিছু মিলল?'

গঞ্জালো জবাব দিলেন, 'না, তেমন কিছু পেলাম। তবে কাছেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। ওই কিছুটা এগিয়ে ওই গাছগুলোর আড়ালে পাহাড়ের ঢালে।'

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'কী দৃশ্য?'

গঞ্জালো হেসে বললেন, 'চলুন নিজের চোখেই দেখবেন। মাত্র কয়েক-পা তো মাত্র ব্যাপার।' এই বলে সুদীপ্তকে ইশারায় তার সাথে আসতে বলে গঞ্জালো এগোলেন সেদিকে।

কাছেই জায়গাটা। মিনিট দুই সময় লাগবে সে জায়গাতে যেতে। সুদীপ্ত অনুসরণ করল গঞ্জালোকে। তার সাথে জায়গাটা পৌঁছল সুদীপ্ত। পাহাড়ের মাথায় এক সারি গাছ। তারপরই অতল খাদ। গাছের আড়ালে খাদের সামনে তারা দুজন এসে দাঁড়াল। গঞ্জালো নীচে খাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

মেঘের রাশি ভেসে বেড়াচ্ছে খাদের উপর। নীচে দৃষ্টি চলছে না। সুদীপ্ত সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু বুঝতে পারছি না।'

গঞ্জালো পাশ থেকে বললেন, 'আর একটু ঝুঁকে ভালো করে দেখুন। ঠিক দেখতে পাবেন। ওই তো আমি দেখতে পাচ্ছি!'

গঞ্জালোর কথামতো সুদীপ্ত খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আরও একটু ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল খাদের নিচটা। আর এর পরক্ষণেই সুদীপ্তর মনে হল হঠাৎই যেন সে দু-হাত পাখির ডানার মতো মেলে নেমে যাচ্ছে মেঘে ঢাকা খাদের ভিতর। একটা অস্পষ্ট শব্দ শুধু বেরোল তার গলা দিয়ে। সুদীপ্ত তলিয়ে যেতে লাগল মেঘের ভিতর!

যেন মেঘের মধ্যে দোল খাচ্ছে সুদীপ্ত। ওপরে মেঘ, নিচে মেঘ, চারপাশে শুধু রাশি রাশি মেঘ। তারই ফাঁক দিয়ে মুহূর্তের জন্য কখনও হয়তো চোখ মেলে সে দেখেছে মাথার ওপরের গোল চাঁদকে, কখনও বা তার মুখে এসে পড়েছে সূর্যকিরণ। তার পরক্ষণেই আবার মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে সবকিছু। চোখের পাতা আবার মুদে এসেছে সুদীপ্তর। এক প্রগাঢ় ঘুমের দেশে যেন চলে যাচ্ছে সে। স্বপ্নর মধ্যেই যেন মেঘের রাজ্যে ভেসে চলেছে সুদীপ্ত। শুধু মেঘ, শুধু মেঘ...

কিন্তু শেষপর্যন্ত এক সময় আচ্ছন্ন ভাবটা তার কাটল। চোখ মেলল সে। কিছু সময়ের জন্য মাথার ওপর থেকে মেঘ সরে গেছে। সূর্যকিরণ সোজাসুজি এসে পড়েছে তার মুখে, সেটাই হয়তো তার আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে দিয়েছে। চোখে খুলে সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রথমে চোখে ধাঁধা লেগে গেল তার। সুদীপ্ত প্রথমে চোখ বন্ধ করে ফেলল, 'তারপর আবার ধীরে ধীরে চোখ মেলল। সুদীপ্ত এরপর উঠে বসার চেষ্টা করতেই দুলে উঠল। ভালো করে চারপাশে

তাকিয়ে সে বুঝতে পারল সে শুয়ে আছে পাহাড়ের গা থেকে হাত কুড়ি তফাতে একটা ঝুলন্ত গাছের মাথার ওপর। পাহাড়ের গায়ের একটা গর্তর ভিতর থেকে মানুষের হাতের মতো শূন্যে ঝুলছে গাছের গুড়িটা। সুদীপ্তর নীচে অতলস্পর্শী খাদ, আর মাথার ওপরে পাহাড়ের কিনারাটা অন্তত তিরিশ ফুট উঁচুতে। বাতাসে মাঝে মাঝে দুলে উঠছে শূন্য ঝুলন্ত গাছটা। এ জন্যই সুদীপ্তর তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মনে হচ্ছিল সে মেঘের ভিতর দোল খাচ্ছে। কিন্তু সে এই ঝুলন্ত গাছের মাথায় কি করে এলো? কিছুক্ষণের মধ্যে তার মনে পড়ে গেল সব কথা। সে খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছিল গঞ্জালোর সাথে। আর তারপর...নিচে তাকিয়ে কি হঠাৎ সুদীপ্তর মাথা ঘুরে গেছিল? ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না সে। সূর্য এখন ঠিক মাথার ওপর। অর্থাৎ একটা রাত কেটে গিয়েছে। প্রায় কুড়ি ঘণ্টা অতিক্রান্ত। সুদীপ্ত ভাবার চেষ্টা করতে লাগল হেরম্যান আর গঞ্জালো কি করছেন। তারা কি খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাকে? যেখান থেকে সুদীপ্ত নিচে পড়েছিল পাহাড়ের মাথার সে জায়গাটা ঝুলন্ত তাকের মতো বাইরে বেরিয়ে আছে। তাই হয়তো সেখানে দাঁড়িয়ে নিচে ঝুলন্ত গাছের ডালপালার আড়ালে আটকে থাকা সুদীপ্তকে তারা দেখতে পাচ্ছেন না। একটু ধাতস্থ হবার পর সাবধানে ডাল আঁকড়ে উঠে বসল সুদীপ্ত। মাথাটা বেশ ভার ভার লাগছে। একটা হাত মাথার পিছনে দিতেই হাতটা চটচট করে উঠল কোন আঠালো তরলে। রক্ত! ওপর থেকে পড়ে গাছের ডালে বাড়ি খেয়ে সে আহত হয়েছে, নাকি অন্য কিছু ঘটেছিল? সুদীপ্তর যেন অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ল যে তাকে খাদের নিচটা দেখাবার ঠিক আগের মুহূর্তে নিজের বন্দুকটা কাঁধ থেকে খুলে নিয়েছিলেন গঞ্জালো। যাই হোক এসব ভাবার সময় এখন নয়। বাতাসে যেভাবে ডালটা মাঝে মাঝে দুলছে থাকে সুদীপ্তর নিচে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। সুদীপ্তকে মুক্তি পেতে হবে এই ঝুলন্ত অবস্থার থেকে। তাই আগে কি ঘটেছিল তা আর না ভেবে সে দেখতে লাগল পাহাড়ের গাটা। হাত কুড়ি দীর্ঘ গাছের গুঁড়িটা যদি সে অতিক্রম করতে পারে তবে সে পৌঁছে যাবে পাহাড়ের খাঁজে। তখন আর নিচে পড়ার ভয় থাকবে না। কিন্তু সমস্যা হল ঝুলন্ত গুঁড়ির গায়ে আঁকড়ে ধরার মতো কোনো শাখাপ্রশাখা নেই। আর গুঁড়িটাও সমূল ও মেঘের আনাগোনার জন্য পিছল স্যাঁতস্যাঁতে। হেঁটে কোনোভাবেই পেরোনো যাবেনা ওই জায়গাটা। কিন্তু এভবে গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। কাজেই কর্তব্য স্থির করে নিল সুদীপ্ত। ডালপালা আঁকড়ে অতি সাবধানে সে প্রথমে পৌঁছে গেল গুঁড়ির কাছে তারপর গুঁড়িটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরল। গিরগিটি যেভাবে গাছের ডাল ধরে এগোয় ঠিক তেমনভাবেই সুদীপ্ত হাত আর পায়ে গুঁড়ি আঁকড়ে বুকে হেঁটে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে শুরু করল। নিচে হাঁ করে আছে অতল খাঁদ। সুদীপ্তর হাত-পা পিছলোলেই মৃত্যু অবধারিত। মাত্র কুড়ি হাত গুঁড়িটা, কিন্তু সেটুকু ওভাবে পেরোতেই সুদীপ্তর মনে হল সে যেন আদি-অনন্তকাল ধরে ওভাবে বুকে হেঁটেই চলেছে! অবশেষে একসময় সে পৌঁছে গেল পাহাড়ের খাঁজে নিরাপদ জায়গাতে। আর তার পরমুহূর্তে একটা ঘটনা ঘটল। গুঁড়িটা হঠাৎ দুলে উঠল তারপর পাহাড়ের গা থেকে শিকড় সমেত উপরে উল্কার বেগে ধাবিত হল নিচে অতল খাদের দিকে। দীর্ঘক্ষণ সুদীপ্তর ভার বইতে বইতে পাহাড়ের গা থেকে শিকড়ের বাঁধন তার খসে আসছিল। সুদীপ্ত তার থেকে নেমে গেলেও গাছটা শেষ পর্যন্ত আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না।

এ ঘটনা যদি আর একটু আগে ঘটত তবে কী ঘটত তা ভেবে সুদীপ্ত শিউরে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ একই জায়গায় বসে রইল সুদীপ্ত। ধীরে ধীরে তার শরীর আর মনে বল ফিরে এল। মেঘের আনাগোনা আবার শুরু হয়েছে। সুদীপ্তকে পাহাড়ের মাথায় উঠতে হবে, খুঁজে বার করতে হবে হেরম্যানকে। তাই সে এরপর পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে একটু তেরছাভাবে পাহাড়ের মাথার দিকে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। ঘুরপথে বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করতে হলেও পাহাড়ের শাখার জঙ্গলে উঠতে খুব বেশি বেগ পেতে হল না সুদীপ্তকে। এক সময় সে এসে দাঁড়াল পাহাড়ের মাথার জঙ্গলে। তারপর সে তাঁবুর অবস্থান কোথায় হতে পারে তা অনুমান করে এগোল সেদিকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পৌঁছে গেল তাঁবুর কাছে।

কিন্তু দুটো তাঁবুই শূন্য। হেরম্যান বা গঞ্জালো কেউ নেই। তবে বন্দুক আর গঞ্জালোর সেই শব্দ প্রক্ষেপন যন্ত্র ছাড়া অন্য সব জিনিসই পড়ে আছে তাঁবুতে। তবে কি তারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন সুদীপ্তকে? তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকিয়ে সুদীপ্ত চিৎকার করে উঠল—'হেরম্যান আপনি কোথায়?'

কিন্তু বার কয়েক হাঁক দেবার পরও হেরম্যানের কোনো সাড়া মিলল না। সুদীপ্তর চিৎকার মেঘ পাহাড়ের জঙ্গলে প্রতিফলিত হয়ে আবার তার কাছেই ফিরে আসতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেছে সুদীপ্তর। তাঁবুতে ঢুকে বোতল থেকে জল খেয়ে আবার সে বাইরে এসে দাঁড়াল। হঠাৎই হাত দশেক তফাতে একটা জিনিস মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল সে। গাছের ফাঁক গলে মৃদু সূর্যকিরণ তার পর এসে পড়ায় জিনিসটা মৃদু চিকচিক করছে। সুদীপ্ত এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা হাতে নিয়েই চিনতে পারল সেটা। হেরম্যানের রিস্ট ওয়াচ। কীভাবে সেটা খসে পড়ল তার হাত থেকে? মাটির দিকে তাকিয়ে এরপর সুদীপ্তর আরও কটা ব্যাপার চোখে পড়ল। কোন একটা ভারি জিনিস যেন ঘসটে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে জায়গা দিয়ে! কি জিনিস হতে পারে? হেরম্যানও কি তবে বিপদগ্রস্ত?

ঘড়িতে বেলা দুটো বাজে। সুদীপ্ত হিসাব করে দেখল মেঘ পাহাড় অন্ধকার নামতে আরও ঘণ্টা তিনেক সময় লাগবে। এ সময়ের মধ্যে হেরম্যানকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করা যেতে পারে। হয়তো তিনি জঙ্গলের মধ্যে কাছাকাছিই কোথাও আছেন। এ কথা ভেবে নিয়ে সে দাগটাকে অনুসরণ করে এগোল সামনের দিকে। কিন্তু বনের ভিতর ঢুকে পাথুরে জমিতে হারিয়ে গেছে সে দাগটা। হেরম্যানের খোঁজে সুদীপ্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল মেঘ অরণ্যে। সময় এগিয়ে চলল, বিকাল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘ অরণ্যর মধ্যে অন্ধকার বাড়তে শুরু করল। একসময় সুদীপ্তর মনে হল যে তাঁবুতে ফেরাই ভালো। হয়তো বা হেরম্যান তাঁবুতে ফিরে এসেছেন? সে এরপর তাঁবুতে ফেরার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু কিছুটা এগোবার পরই সুদীপ্ত বুঝতে পারল, সে মেঘ অরণ্যে পথ হারিয়েছে।

মেঘের দেশে খুব দ্রুত যেন আলো কমে আসছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রাত্রিবাসের জন্য নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে হবে সুদীপ্তকে। সেই প্রচেষ্টাই করতে লাগল সে। অরণ্যের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একদিকে পাহাড়ের খাদের কিনারে অচেনা এক মহাবৃক্ষ দেখতে পেল সে। গগনচুম্বি গাছটার গুঁড়িতে এক বড় মতো ফোকর। একজন মানুষ গুটিসুটি মেরে তার মধ্যে বসে থাকতে পারে। রাতটা কোনোভাবে সেখানে কাটাবার জন্য সে জায়গাটা মনে ধরল

সুদীপ্তর। সে গিয়ে দাঁড়াল গাছটার নিচে। সে সেখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল রাতটা কোনোরকমে গাছের ফোকরে কাটিয়ে ভোরের আলো ফুটলে তাঁবু খোঁজার চেষ্টা করবে। সেখানে হেরম্যানকে না পেলে অথবা তাঁবু খুঁজে না পেলে ঢাল বেয়ে পাহাড়ের নিচে নেমে গ্রামবাসীদের সাহায্যে হেরম্যানকে খোঁজার চেষ্টা করবে।

তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবছিল সুদীপ্ত। পাহাড়ের ঢালটা মেঘে ঢাকা। হঠাৎ সে দিক থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনল পাতা মাড়াবার। সে তাকাল সেদিকে। মেঘের আড়াল থেকে একটা অস্পষ্ট অবয়ব যেন উঠে আসছে তার দিকে। কে ও?'

কয়েক মুহূর্তর মধ্যেই ওপরে উঠে এল সেই মূর্তি। তাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল সুদীপ্ত। আর সুদীপ্তকে দেখেও যেন বেশ অবাক হয়ে গেল লোকটা। সে মার্কিন নেকড়ে শিকারি বাজ। তবে এখন আর তার কাঁধে রাইফেল নেই, একটা রুকম্যাক আছে।

সুদীপ্ত একটু বিস্মিত ভাবে বলল, 'আপনি এখানে?'

বাজ জবাব দিলেন, 'আপনাদের ওপরে উঠতে দেখে আপনাদের পিছু পিছু আমিও ওপরে উঠে এসেছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যা নামতে চলেছে, আপনি এখানে?'

তাঁর প্রশ্ন শুনে সুদীপ্ত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল পুরো ঘটনাটা। তার কথা শুনে একটা অদ্ভুত হাসি যেন ফুটে উঠল শিকারি বাজের ঠোঁটের কোণে।

কথা শেষ করার পর হঠাৎই সুদীপ্তর চোখে পড়ল লোকটার বুকের বাঁ দিকটা। শুকনো রক্ত লেগে আছে তার জামার বুকে। আর একটা ছিদ্রও যেন দেখা যাচ্ছে তার মাঝে। বিস্মিত সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'আপনার বুকে রক্ত কেন? চুপাকাবরা আক্রমণ করেছিল নাকি?'

বাজ মৃদু হেসে বললেন, 'না, চুপাকাবরা নয়। বুকে বন্দুকের গুলি লেগেছিল গতকাল ভোররাতে।'

সুদীপ্ত আরও বিস্মিত ভাবে জানতে চাইল, 'বুকে গুলি খেয়ে আপনি বেঁচে গেলেন কি ভাবে?'

মৃদু চুপ থেকে বাজ তার জামার বোতাম খুলে উন্মুক্ত করলেন তার বুক। সুদীপ্ত দেখল তার জামার নিচে বুকের মধ্যে একটা ধাতব পাত বাঁধা আছে। আর তার মাঝখানে একটা ছোট গোলাকার ছিদ্র। সেটা দেখিয়ে বাজ বললেন, 'নেহাত গুলিটা বেশ দূর থেকে ছোঁড়া হয়েছিল। গুলির শক্তি কিছুটা কমে এসেছিল। তাই গুলিটা পাত ভেদ করে ভেতরে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারেনি। এই ধাতব পাতে গুলিটা আটকে যায়। শুধু তার 'নোজ' অর্থাৎ মাথার দিকের অংশটা চামড়া ছিঁড়ে বুকের ভিতর সামান্য একটু প্রবেশ করে। তাতেই এই রক্তপাত। তবে ওই বুলেটের ধাক্কার অভিঘাতেই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ছিটকে পড়লাম আমি। রাইফেলটা খোয়া গেল। আশ্চর্য নিশানা বটে লোকটার। মেঘে ঢাকা আধো অন্ধকারে একেবারে আমার হৃৎপিণ্ড লক্ষ করে গুলি চালিয়েছিল। অব্যর্থ লক্ষভেদ! তবে গুলি আটকাবার জন্য আমি এই ধাতব বর্ম পরিনি। পড়েছিলাম চুপাকাবরার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। সেটাই আমাকে বাঁচিয়ে দিল।'

সুদীপ্ত তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, 'আপনি যে বলেছিলেন, 'চুপাকাবরা

বলে কিছু নেই? তার মানে সে আছে!'

মৃদু চুপ থেকে বাজ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, সে আছে। আপনারা, আমি, গঞ্জালো আমরা আসলে সবাই তার সন্ধানে এসেছি। তবে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। এ পাহাড়ই প্রাণীটার প্রধান আস্তানা। প্রাথমিক অবস্থায় আমার ধারণা হয়েছিল যে আপনারা গঞ্জালোরই সঙ্গী। লোকে যাতে বুঝতে না পারে তাই আপনারা আলাদা আলাদা ভাবে এসেছেন। তাই ওই রক্তচোষা বনে কোনো প্রাণী নেই, পাদ্রীর মৃত্যুর ঘটনা নেকড়ের আক্রমণ বলে চুপাকাবরা রক্তচোষার খোঁজ থেকে নিবৃত্ত করতে চাইছিলাম আপনাদের। পরে আমার অভিজ্ঞতা ও আপনার কথা শুনে বুঝলাম আপনারা সত্যিই ক্রিপ্টোজুলজিস্ট। আপনাদের সাথে গঞ্জালোর বিশেষ সম্পর্ক নেই।'

সুদীপ্ত বলল, 'কিন্তু কে গুলি চালাল আপনাকে?'

বাজ বললেন, 'ওই গঞ্জালোই, আমার ধারণা সেই আপনাকে আঘাত করে খাদে ফেলে দিয়েছিল। আপনার সঙ্গীকেও অপহরণ করেছে সে।'

সুদীপ্ত বলল, 'কিন্তু কেন?'

বাজ জবাব দিলেন, "সে আসল 'ইউ.এফ.ও' সন্ধানী নয়। ঠিক আমি যেমন পাকা শিকারি নই। তবে সে সব কথা পরে হবে। অন্ধকার নেমে আসছে, আমার ধারণা আপনার সঙ্গী মিস্টার হেরম্যান ভীষণ বিপদের মধ্যে আছেন। তাকে আগে বিপদমুক্ত করা প্রয়োজন।'

সুদীপ্ত বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আগে তার খোঁজ প্রয়োজন। কিন্তু এত বড় মেঘাচ্ছন্ন জঙ্গলে কিভাবে তাকে খুঁজব? অন্ধকারও নেমে আসছে।'

বাজ বললেন, 'হ্যাঁ অন্ধকার নেমে আসাটাই ভয়ের ব্যাপার। রক্তচোষাটা অন্ধকারেই হানা দেয়। দেখি আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি কিনা?'

অন্ধকার হয়ে আসছে। পিঠের রুকস্যাকটা খুলে বাজ তার ভিতর থেকে একটা যন্ত্র বার করে বললেন, 'ব্যাগে থাকায় এ যন্ত্রটা ঢাল বেয়ে পড়ার সময় বেঁচে গেছে। আমার রাইফেলের মতো এ যন্ত্রটা হারালে খুব মুশকিলে পড়তে হতো।'

যন্ত্রটা দেখেই সুদীপ্ত বলে উঠল, 'আরে, এ যন্ত্র আপনি কোথায় পেলেন? এটাতো গঞ্জালো কুড়িয়ে পেয়েছিলেন এ জঙ্গলে স্পেনীয়ার্ডদের পুরনো একটা বাড়ি আছে সেখান থেকে 'ওই বাড়িতে একটা কঙ্কালও ছিল!'

যন্ত্রটার নব টিপে সেটা চালু করে বাজ বললেন, 'এটা একই যন্ত্র। তবে এটা গঞ্জালোর কুড়িয়ে পাওয়া সেই যন্ত্র নয়। সেটা তার কাছেই আছে। এটা আমি সঙ্গে করে এনেছিলাম।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'এটা কী যন্ত্র?'

প্রশ্নর উত্তরটা সরাসরি না দিয়ে বাজ জবাব দিবেন, 'আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়

তবে এ যন্ত্রই আমাদের হেরম্যান আর গঞ্জালোর কাছে পৌঁছে দেবে।'

বিপ বিপ শব্দ করতে শুরু করেছে যন্ত্রটা। তার গায়ের ছোট এল.সি.ডি পর্দায় ফুটে উঠেছে একটা সাংকেতিক নির্দেশ। যদিও সেটা বোধগম্য হচ্ছে না সুদীপ্তর। পর্দাটায় চোখ রেখে বাজ হাঁটতে শুরু করলেন মেঘ আর অন্ধকার নেমে আসা অরণ্যর দিকে। সুদীপ্ত তাকে অনুসরণ করল। সূর্য ডুবে গেল। দিনের শেষ আলোটুকুও মুছে গিয়ে অন্ধকার নেমে এল কোস্টারিকার মেঘ অরণ্যে।

অন্ধকারের মধ্যে হেঁটে চলেছে সুদীপ্তরা। মাঝে মাঝে কেউ ঠোক্কর খাচ্ছে পায়ের নিচে পাথরে বা গাছের ডালে। মৃদু আলো ছড়াচ্ছে বাজের হাতের যন্ত্রটা। তার পর্দায় চোখ রেখে এগোচ্ছেন বাজ। মেঘ আর অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগল তারা। কোন দিকে সুদীপ্ত এগোচ্ছে তা বুঝতে পারছে না। সে শুধু অনুসরণ করছে বাজকে। এক সময় চাঁদ উঠতে শুরু করল আকাশে তার অস্পষ্ট আলো ছড়িয়ে পড়ল মেঘ অরণ্যে। অন্ধকার কিছুটা কেটে গেল। এরপর কিছুটা দ্রুত এগোতে শুরু করল সুদীপ্তরা। একটা জিনিস সুদীপ্ত বুঝতে পারল যে তারা এর আগে অরণ্যের এ অংশে আসেনি। এদিকের গাছগুলো আরও প্রাচীন। তাদের মাথাগুলোও অনেক বেশি ঝাঁকড়া। তবে অরণ্যের অন্য অংশর মতো এদিকের গাছগুলো অতো ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে নেই। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তারা দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে মেঘের আবরণ সরে গেলে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তা দেখে সুদীপ্তর মনে হল তারা ধীরে ধীরে চড়াই ভেঙে পাহাড়ের মাথায় উঠে এসেছে।

চলতে চলতে এক সময় থমকে দাঁড়ালেন বাজ। এক সারি বড় বড় গাছ সেখান থেকে কিছুটা তফাতে তফাতে এগিয়েছে সামনের দিকে। শাখাপ্রশাখা ছড়ানো সেই গাছগুলোর মাথায় জমাট বাঁধা অন্ধকার। বাজের হাতের যন্ত্রটা তীব্র বিপ বিপ শব্দ করে চলেছে। একবার তার পর্দার দিকে তাকিয়ে আর একবার অন্ধকারাচ্ছন্ন গাছগুলোর মাথার দিকে তাকিয়ে বাজ বললেন, 'এবার সাবধানে চলবেন। গাছগুলোর নিচ দিয়ে যাবার সময় ওপর দিকে খেয়াল রাখবেন।'

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'কেন?

শিকারি বাজ জবাব দিলেন, 'রক্তচোষাটা খুব কাছেই আছে। সম্ভবত কোনো গাছের মাথায়।' কথাটা বলে বাজ তার হাতের যন্ত্রটা বন্ধ করে ইশারায় আর কোনো কথা বলতে বারণ করলেন সুদীপ্তকে। অতি সাবধানে এরপর গাছগুলোর নিচ দিয়ে এগোতে থাকেন তারা। নিচ দিয়ে যাবার সময় মাথার ওপর তাকালেও বড় বড় গাছগুলোর মাথার ভিতর ডালপালার আড়ালে কোনো কিছু ঠাহর করা যাচ্ছেনা। ঘন অন্ধকার বিরাজ করছে সেখানে। তার ওপর আবার মেঘ নেমে ঢেকে দিচ্ছে গাছের মাথাগুলো। তাদের নিচ দিয়ে যাবার সময় সুদীপ্তর মনে হতে লাগল মেঘে ঢাকা অন্ধকার গাছগুলোর মাথা থেকে এই বুঝি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কেউ!

একটার পর একটা গাছ টপকে এগিয়ে চলল তারা। এক সময় তারা দেখতে পেল তাদের সামনে একটা উন্মুক্ত জমি। তার একদিকে খাদ, আর অন্যপাশে জমিটাকে অর্ধবৃত্তাকারে বেড়

দিয়ে রেখে সার সার বড় বড় গাছ। ফাঁকা জমিটার মধ্যে খাদের দিক থেকে উড়ে আসা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। তবে ফাঁকা জমিটার মাথাটা গাছপালাতে ঢাকা না থাকায় সরাসরি চাঁদের আলো এসে পড়ছে জমিটাতে। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে জমিটার দিকে তাকাল সুদীপ্তরা। প্রথমে তেমন কিছু তাদের নজরে পড়ল না। কিন্তু খাদের দিকের মেঘ সরে যেতেই তাদের চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য। খাদের দিক ঘেসে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ফুট আটেক লম্বা নেড়া গাছের গুঁড়ি। হয়তো তার মাথাটা ঝড়ে ভেঙে গেছিল বা কেটে কেটে ফেলেছিল। সেই গাছের গুঁড়ির গায়ে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন হেরম্যান! মাঝে মাঝে মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে তাকে, আবার মেঘ সরে গেলেই দৃশ্যমান হচ্ছে তার অবয়ব।

শিকারি বাজ চাপা স্বরে সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গীকে চুপাকাবরার টোপ বানিয়েছে শয়তানটা। সে নিশ্চই কাছাকাছিই আছে!' তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে একটা কর্কশ গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, শয়তানকে স্মরণ করলেই সে আবির্ভূত হয়।'

সুদীপ্তরা ঘুরে দেখল তাদের হাত দশেক দূরে একটা গাছের আড়াল থেকে চাঁদের আলোতে এসে দাঁড়িয়েছেন গঞ্জালো। তার ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি। শিকারকে ফাঁদে ফেললে শিকারি ঠোঁটে যেমন হাসি দেখা যায় ঠিক তেমনই এক নিষ্ঠুর হাসি। তার রাইফেলের নল সোজা তাগ করা সুদীপ্তদের দিকে।

সুদীপ্ত বলে উঠল, 'এ সব আপনি কি করছেন?'

গঞ্জালো ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'মাথার ওপর হাত ওঠাও দু-জনে। নইলে এখনই গুলি চালাব। দুজনেই এখনও বেঁচে আছেন দেখছি! আপনাদের আর বেঁচে থাকার সামান্য আশা যদি এখনও থেকে থাকে কথানা শুনলে আমি তখনই সেটুকুই শেষ করে দেব। আপনারা নিশ্চই বুঝতে পেরেছেন যে মানুষ খুন করতে আমার হাত কাঁপবে না?'

তার কথা শুনে সুদীপ্ত আর বাজ ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুলল।

গঞ্জালো বললেন, 'এবার পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াও।'

এবার তার নির্দেশ পালনে একটু ইতস্তত করতে লাগল সুদীপ্তরা।

গঞ্জালো বলে উঠলেন, 'যা বলছি তাই করো। যে প্রাণীটা কাছাকাছিই আছে। তাকে ধরে অথবা মেরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আমার হাতে বেশি সময় নেই।'

তার কথা শুনে বাজ বলে উঠলেন, 'কিন্তু প্রাণীটাকে নিয়ে নিচে নেমে লোকজনের চোখ এড়িয়ে এ দেশ থেকে কি ভাবে পালাবে? ঠিক ধরা পড়ে যাবে।'

গঞ্জালো প্রথমে জবাব দিলেন, 'নিচে নামতে হবে না। প্রাণীটা যেভাবে এখানে এসেছিল ঠিক তেমনভাবেই তাকে আমি নিয়ে যাব। আমি ওটা দেখেছি। গ্রামবাসী বা সাধারণ মানুষ ধোঁকা খেলেও আমি খাইনি।'

গঞ্জালো কথাগুলো কী বললেন তা সুদীপ্ত ঠিক বুঝতে না পারলেও সুদীপ্ত খেয়াল করল যে তার কথা শুনে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল বাগের মুখ। গঞ্জালো এরপর তার রাইফেলটা তুলে ধরে বাজের বুক তাক করে বললেন, 'ঠিক আছে আমার কথা যখন শুনতে চাচ্ছ না তখন খেলাটা এখনই শেষ করি।'

গুলি চালিয়ে দিতে পারে লোকটা। অগত্যা মাথার ওপর হাত উঁচু করে ঘুরে দাঁড়াল দুজন।

গঞ্জালো নির্দেশ দিলেন, 'সোজা মাঠের দিকে হাঁটুন। অ'সিলে গুলিতে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবেন।'

লোকটার নির্দেশ পালন করে মাঠের মধ্যে ঢুকল তারা দুজন। আর তাদের পিছনে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তাদের দিকে রাইফেল তাক করে গঞ্জালো। সুদীপ্ত আর বাজ মাঠের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াল। গঞ্জালো পরবর্তী নির্দেশ দিলেন, 'এবার খাদের দিকে এগোন।'

সেদিকেই গাছের গুড়িতে বাঁধা আছেন হেরম্যান। গঞ্জালোর কথা মেনে সোজা খাদের দিকে হাঁটতে শুরু করল তারা। হেরম্যানের দিকে তাকাতে তাকাতে এগোল সুদীপ্ত। এক সময় তার কাছাকাছি পৌঁছে গেল সে। একপাশে মাত্র হাত দশেক ব্যবধান তার সাথে। হেরম্যান নড়ছেন না। দড়িবাঁধা অবস্থায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন গাছের গুড়িটার সাথে। তার মাথাটা এক পাশে হেলানো, চোখের পাতা বন্ধ। মনে হয় তিনি অজ্ঞান হয়ে আছেন। দড়ির বাঁধন কেটে দিলেই যেন তিনি মাটিতে পড়ে থাকেন। আরও একটা জিনিস খেয়াল করল সুদীপ্ত। তার জামাটা যেন ভেজা ভেজা মনে হচ্ছে! রক্ত! হেরম্যান কি তবে আহত? সুদীপ্ত সে দিকে এক পা বাড়াতে যাচ্ছিল। কিন্তু সেটা খেয়াল করে গঞ্জালো ধমকে উঠলেন, 'ও পাশে নয়। সোজা খাদের দিকে চলুন। নইলে এখনই গুলি চালাব।' অগত্যা হেরম্যানকে একপাশে ফেলে সুদীপ্তরা এগোল খাদের দিকে।

হেরম্যানকে অতিক্রম করে হাত পনেরো তফাতেই খাদটা। চলতে চলতে খাদের কিনারে এসে থেকে গেল সুদীপ্ত আর বাজ। সুদীপ্তদের পিছনে গঞ্জালোর পায়ের শব্দও থামল। মুহূর্ত খানেকের নিস্তব্ধতা। তারপর গঞ্জালোর কণ্ঠস্বর শোনা গেল পিছন থেকে—'এবার খাদে ঝাঁপ দিন।'

খাদের মধ্যে থেকে মেঘ উঠে আসছে মাঠের ভিতর। তার গভীরতা কত বোঝা যাচ্ছে না। সুদীপ্তরা তাকাল সেদিকে। এরপর সুদীপ্ত বলে উঠল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

গঞ্জালো অট্টহাস্য করে বলে উঠলেন, 'সহজ কথা বলছি। খাদে ঝাঁপ দিন। তাহলে হয়তো আপনাদের মধ্যে কেউ বেঁচে গেলেও বেঁচে যেতে পারেন। ঠিক যেভাবে এর আগে আপনারা একবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছেন। কিন্তু গুলি খেয়ে খাদে ছিটকে পড়লে আপনারা কেউ বাঁচবেন না।'

তার কথা শুনে খাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুদীপ্ত আর বাজ।

গঞ্জালো এরপর বললেন, 'আমি দশ গুনব। আর তার মধ্যে লাফ না দিলেস গুলি চালাব।'

তার কথা শুনে চাপা স্বরে বাজ সুদীপ্তকে বললেন, 'ও ঠিক সাত গুনলে আমরা পিছন ফিরে এক সাথে ঝাঁপাব ওর দিকে। ও একটা গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পাবে। একজন মারা গেলেও অন্য একজন বেঁচে যাবে।'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'আচ্ছা।'

তাদের দুজনকে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে গঞ্জালো এবার গুনতে শুরু করলেন—'এক...দুই...

ধীরে ধীরে সংখ্যাগুলো বলছেন গঞ্জালো। এক একটা মুহূর্ত যেন একটা দীর্ঘসময় মনে হচ্ছে! গঞ্জালো গুনে চলেছেন—'তিন...চার...পাঁচ...পিছনে ফেরার জন্য প্রস্তুত হল সুদীপ্ত।

'ছয়...।'—দীর্ঘ সময় নিয়ে শব্দটা উচ্চারণ করলেন গঞ্জালো।

এবার তিনি সাত গুনবেন। মুহূর্তর নিস্তব্ধতা। কিন্তু তারপরই পিছনে একটা শব্দ শুনে বিদ্যুৎ বেগে গঞ্জালোর দিকে ঘুরে দাঁড়াল সুদীপ্ত আর বাজ। তারা দেখল পিছন থেকে এসে গঞ্জালোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন হেরম্যান। সাত গোনা আর হল না গঞ্জালোর। হেরম্যান আর গঞ্জালো দুজনেই মাটিতে পড়ে গেলেন। অবাক হয়ে গেল সুদীপ্তরা। কিভাবে মুক্ত হলেন হেরম্যান?

কিন্তু ধস্তাধস্তির মধ্যেই হঠাৎ মাটি থেকে স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠলেন গঞ্জালো। হেরম্যানও উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই গঞ্জালো এক লাথিতে তাকে ছিটকে ফেলে তিরবেগে দৌড়ালেন মাঠের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর দিকে।

সুদীপ্ত আর বাজ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল হেরম্যানের দিকে। তারা মাটির ওপর তুলে দাঁড় করালো হেরম্যান। সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, 'আপনার দেহে রক্ত কেন?'

হেরম্যান হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'ও কিছু নয়। আমার না। গায়ে হরিণের রক্ত ঢেলেছিল গঞ্জালো চুপাকাবরাকে আমার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য।'—এ কথা বলার পরই হেরম্যান বললেন, 'ওই যে ও পালাচ্ছে! ওকে ধরতে হবে।'

মাঠের মেঘ কুয়াশা ভেদ করে তির গতিতে গাছগুলোর দিকে ছুটছেন গঞ্জালো। বাজের হঠাৎ চোখে পড়ল কিছুটা তফাতে গঞ্জালোর হাতে থেকে খসে পড়া রাইফেলটার দিকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে নিচু হয়ে বসে ট্রিগারে চাপ দিলেন গঞ্জালোর পা লক্ষ করে গুলি চালাবার জন্য। পরপর দুটো গুলি। তার শব্দে কেঁপে উঠল মেঘ পাহাড়ের বনাঞ্চল। বার বার সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাহাড়ে। কিন্তু মেঘে ঢাকা মাঠে লক্ষভ্রষ্ট হল বাজের নিশানা। গঞ্জালো হারিয়ে গেলেন গাছগুলোর আড়ালে। কিন্তু এরপরই অদ্ভুত এক ঘটনার সাক্ষী হল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। মাঠের অন্য পাশে একটা গাছের মাথা হঠাৎ প্রবল ভাবে আন্দোলিত হল। সুদীপ্তরা মেঘে ডাকা অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে দেখতে পেল সে গাছের মাথা থেকে অন্য গাছের মাথায় ঝাঁপ দিল একটা মিশমিশে কালো বানরের মতো প্রাণী! তারপর সে গাছ থেকে একটা অন্য গাছে। তারপর তার থেকে আরেকটা গাছের মাথায়। গাছগুলোর মধ্যে ব্যবধান কমপক্ষে কুড়ি-পঁচিশ ফুট হবে। কিন্তু সে দূরত্ব অবলীলায় লাফিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে প্রাণীটা। হেরম্যান বিস্মিত ভাবে বলে উঠলেন, 'চুপাকাবরা!'

কয়েক মুহূর্তর মধ্যেই লম্বা লম্বা লাফে প্রাণীটা অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের আড়ালে।

বাজ বলল, 'গুলির শব্দে ভয় পেয়েছে প্রাণীটা। গঞ্জালো সত্যিই এখানে তার উপস্থিতি টের পেয়েছিল। পাছে প্রাণীটা গুলির শব্দে টোপ ছেড়ে পালিয়ে না যায়, তাই গুলি না করে আমাদের খাদে ফেলে মারতে চাচ্ছিল।'

হেরম্যান বললেন, 'প্রাণীটা কোথায় পালাল সেখানে আমাদের যেতে হবে।'

বাজ মুহূর্তখানেক ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমার ধারণা এক জায়গাতে হয়তো প্রাণীটাকে অথবা গঞ্জালোকে পাওয়া যেতে পারে অথবা তাদের দুজনকেই। এই বলে তিনি ব্যাগ থেকে তার সেই যন্ত্রটা বার করে চালু করলেন। বিপ বিপ শব্দ করে যন্ত্রটা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনিটরে কী সব যেন রেখা ফুটে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে বাজ বললেন,

'আমার ধারণা সঠিক। প্রাণীটা অন্তত সেদিকেই যাচ্ছে।'

হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, 'কোথায়? এটা কি যন্ত্র?'

বাজ জবাব দিলেন, 'পরে বুঝবেন সব। এখনই সে জায়গায় পৌঁছতে হবে। গঞ্জালোও যদি ওদিকে গিয়ে থাকে আর আমাদের আগে সে জায়গাতে পৌঁছে যায় তবে হয়তো আর তাকে ধরা যাবে না। আসুন আমার সাথে।' এই বলে তিনি দ্রুত এগোলেন মাঠটা পেরোবার জন্য। সুদীপ্তরা অনুসরণ করল তাকে। মাঠ থেকে বেরিয়ে যে গাছের আড়াল থেকে গঞ্জালো তাদের দেখা দিয়েছিলেন তার গুঁড়িটার পেছনে গঞ্জালোর ছেড়ে রেখে যাওয়া বেশ কিছু জিনিস হঠাৎ নজরে পড়ল সুদীপ্তদের। হেরম্যানের বন্দুক, কার্তুজ আর সিরিঞ্জের বাক্স, স্পেনীয়ার্ডদের বাড়ি থেকে কুড়িয়ে পাওয়া সেই যন্ত্র, সেই রেডিওর মতো মহাকাশে শব্দ প্রেক্ষণকারী যন্ত্র আর একটা রিভলবার। তা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বাজ বললেন, 'প্রাণীটাকে ধরা অথবা মারার জন্য বেশ সেজেগুজেই এখানে বসেছিল লোকটা! রিভলবারটা দিয়েই উইলিয়ামের খামারে প্রাণীটাকে গুলি চালিয়ে ছিল সে। বাজ যন্ত্রদুটো শুধু তুলে তার ব্যাগে পুরলেন। হেরম্যান আর সুদীপ্ত নিয়ে নিল বন্দুক আর কার্তুজ। হেরম্যান বললেন বন্দুকে ট্রাঙ্কুলিন সিরিঞ্জ ভরা। অর্থাৎ প্রাণীটাকে মারা নয় ধরার চেষ্টা করতো সে। গঞ্জালোও কি তবে ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্ট?

তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে মেঘ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগোলেন বাজ। আর তার পিছনে সুদীপ্ত আর হেরম্যান। মেঘ ভাসছে জঙ্গলের মধ্যে। আশেপাশের গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন এক একজন মানুষ। চাঁদের আলোতে তারা ভৌতিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে যেন তারা তাকিয়ে আছে সুদীপ্তদের দিকে। তাদের ফাঁক গলে সুদীপ্তরা যথাসম্ভব দ্রুত এগিয়ে চলল বাজের পেছনে। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সুদীপ্ত হেরম্যানকে প্রশ্ন করল, 'আপনাকে গঞ্জালো বন্দি করল কিভাবে? আর মুক্তও হলেন কীভাবে?'

হেরম্যান বললেন, 'তিনটের একটু আগে ঘুম থেকে উঠে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে দেখলাম তুমি নেই, গঞ্জালো দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন তুমি বনের আড়ালে গেছ; একটু পরই ফিরবে। আমি বললাম আমরা হরিণের খোঁজে যাব। তিনি বললেন তিনিও সঙ্গে যাবেন। তবে যাবার আগে একটু কফি খাওয়া যাক। নিজের তাঁবু থেকে কফি বানিয়ে আনলেন তিনি। ওতে মাদক মেশানো ছিল। হুঁশ ফিরল আজ বিকালে গাছের গুঁড়ির সাথে বাঁধা অবস্থায়। আমার ট্রাউজারের পকেটে একটা ছোট পেনসিল কাটার ছুরি ছিল। অন্ধকার নামার পর অনেক কষ্টে সেটা বার করে বাঁধন কেটে ফেলেছিলাম। আমার যে জ্ঞান ফিরেছে তা আমি বুঝতে দেইনি লোকটাকে। অন্ধকার আর মেঘ ব্যাপারগুলোতে আমাকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু তোমার কি হয়েছিল?'

হেরম্যানের প্রশ্নর জবাবে সুদীপ্ত সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা জানাল তাকে।

একসময় বাজ তাদের কথোপকথন থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আর কথা বলবেন না। আমরা জায়গাটার কাছে পৌঁছে গেছি।'

সুদীপ্তরা দেখল তাদের সামনে কিছুটা দূরে এক সার গাছ ঘন সন্নিবিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বাজ এগোলেন সেদিকেই।

গাছগুলোর কাছাকাছি এক জায়গায় একটা পচাগলা কঙ্কাল পড়ে আছে। তার পরনের পোশাকও সেই বাড়িটাতে পড়ে থাকা কঙ্কালের মতোই। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় বাজ একবার মুহূর্তর জন্য সেদিকে তাকিয়ে আফশোসের সুরে খুব আস্তে বললেন, 'ঈশ্বর তোমাদের আত্মাকে শান্তি দিন।' তারপর পকেট থেকে কার্তুজ বার করে বন্দুকে ভরে নিয়ে এগোলেন সমনের গাছের প্রাচীরের দিকে।

সার সার বড় বড় গাছ গা ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে আছে। খুব বেশি হলে দুটো গাছের মধ্যে হাত তিনেকের ব্যবধান। তবে মাথার ওপরের ডালপালাগুলো মিলেমিশে যাওয়ায় গাছের গুঁড়িগুলোর নিচে জমাট বেঁধে আছে অন্ধকার। তেমনই এক গাছের নিচে বাজের সঙ্গে এসে হেরম্যান আর সুদীপ্ত তাকাল গাছের প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা জায়গাটার দিকে। সাপের মাঠটার মতো এখানেও একটা উন্মুক্ত জমি তবে আকারে একটু বড়। জমিটার তিন দিকে বৃক্ষপ্রাচীর আর একদিকে খাদ। বাইরে দূর থেকে এই জমিটার অস্তিত্ব বোঝার কোনো উপায় নেই। খাদের দিক থেকে মাথার ওপরের পূর্ণ চাঁদের আলো এসে পড়েছে জমিটাতে। মেঘ তেমন একটা নেই এখানে। তাই সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোতে মাঠের ঠিক মাঝখানে একটা জিনিসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেরম্যান আর সুদীপ্ত দুজনেই চমকে উঠল। চুপাকাবরার সাথে সামনাসামনি সাক্ষাৎ হলেও এতটা বিস্মিত হত না তারা। সেখানে রয়েছে বর্তুলাকার একটা যান। পিরিচের ওপর ওল্টানো পেয়ালার মতো দেখতে যানটা মাটি থেকে ফুট আটেক ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে পায়ের সাহায্যে। যানটার ধাতব সঙ্গ বেয়ে চাঁদের আলো পিছলে পড়ছে। এ যানের বহু ছবি হেরম্যান আর সুদীপ্ত দেখেছে বইয়ের পাতায় অথবা সিনেমার পর্দায়। মহাকাশ যান! ইউ-এফ-ও! ফ্লাইং সসার!!

হতবাক সুদীপ্তরা বিস্মিত ভাবে চেয়ে রইল সেই অদ্ভুত যানটার দিকে। মহাকাশ যানের দরজা খোলা। তার থেকে একটা সিঁড়ি নেমে এসেছে মাটিতে। সুদীপ্তর মনে পড়ে গেল গঞ্জালোর কথা। লোকটা তাদের সাথে যে ব্যবহারই করে থাকুক তবে তার বক্তব্যই কি সত্যি? মহাকাশ যান সত্যিই আছে!

চুপাকাবরা কি তবে সত্যিই ভিনগ্রহর জীব? একই প্রশ্ন মুহূর্তর জন্য হলেও নাড়া দিল হেরম্যানের মনকেও। শুধু বাজের সেই মহাকাশ যানটা দেখে কোনো ভাবান্তর হল না। ইশারায় তিনি সুদীপ্তদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে জমিটা আর অন্যদিকের গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে কিসের যেন পরীক্ষা করতে থাকলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা অস্ফুট শব্দ কানে যেতেই সতর্ক হয়ে গেল সুদীপ্তরা। কেউ যেন মাঠের অন্যপাশের গাছের আড়ালে জঙ্গল ভেঙে ছুটে আসছে মাঠের দিকে। কয়েক মুহূর্তর

মধ্যেই গাছের আড়াল থেকে ছুটতে ছুটতে মাঠের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল একজন লোক। গঞ্জালো!

মাঠের ঠিক মাঝখানে মহাকাশ যানটার কাছাকাছি পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে সে চারপাশে তাকাতে লাগল। সুদীপ্তরা অন্ধকারে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে বলে গঞ্জালোর চোখে তারা ধরা পড়ছে না। তবে মহাকাশ যানটা দেখে সে বিস্মিত হয়েছে বলে মনে হল না। সে যেন জানতই যে যানটা এখানে আছে। বরং চারপাশে কাউকে না দেখতে পেয়ে যেন একটা স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

বাজ তার দিকে তাক করে বন্দুক উঁচিয়ে রাখলেও চাপা স্বরে বললেন, 'ও মনে হয় সিঁড়ি বেয়ে ওর ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করবে। ওর কাছে কোনো অস্ত্র নেই। ও সিঁড়ি বেয়ে ওর ভিতরে ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটে যাব। যানটার ভিতরই ওকে আটকে ফেলব আমরা।'

বাজের অনুমানই সত্যি হল। চারপাশে কাউকে না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে মহাকাশ যানের সিঁড়ির দিকে এগোল সে। আট দশটা মাত্র ধাপ আছে সিঁড়িটার। গঞ্জালো উঠতে শুরু করলেন সিঁড়ি বেয়ে। সুদীপ্তরাও প্রস্তুত হল সেদিকে ছোটার জন্য।

গঞ্জালো তখন প্রায় মহাকাশ যানটার দরজার কাছে উঠে গেছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সুদীপ্তদের চমকে দিয়ে মহাকাশ যানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল অনেকটা বানরের মতো দেখতে তবে তার চেয়ে আকারে বড় মিশমিশে কালো একটা প্রাণী। তার গোলাকার চোখ দুটো যেন জান্তব হিংস্রতায় জ্বলছে। তবে তার মুখমণ্ডল নেকড়ের মতো ছুঁচালো না হলেও বর্তুলাকার মুখমণ্ডলে চোয়ালের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত তীক্ষ্ম দাঁতের সারি চাঁদের আলোতে ঝিলিক দিচ্ছে। ঠিক যেন প্রাণীটা শয়তানের প্রতিমূর্তি!

তাকে সামনে দেখতে পেয়েই থমকে গেলেন গঞ্জালো। আর তারপরই তিনি পিছু হটে সিঁড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রাণীটা পরমুহূর্তে ঝাঁপ দিল গঞ্জালোর ওপর। সিঁড়ি থেকে জড়াজড়ি করে তারা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ্তরা গাছের আড়াল থেকে বেড়িয়ে ছুটতে শুরু করল মাঠের দিকে। মাটিতে গঞ্জালো আর প্রাণীটা কাটাকাটি করছে। গঞ্জালোর আতঙ্কিত চিৎকার আর প্রাণীটার বিজাতীয় তীক্ষ্ম কিচমিচ শব্দে খান খান হয়ে যাচ্ছে রাত্রির নিস্তব্ধতা। তাদের বেশি কাছে গেলে শয়তানটা সুদীপ্তদেরও আক্রমণ করতে পারে তাই যুযুধান দুপক্ষের কিছুটা তফাতে সুদীপ্তরা দাঁড়িয়ে পড়ল। গঞ্জালোকে প্রাণীটার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য বাজ শূনে দু-দুবার গুলি চালালেন। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। এতে কাজ হল। রক্তচোষাটা গঞ্জালোকে ছেড়ে দু পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াল। তারপর সুদীপ্তদের দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে চিৎকার করে উঠল—'কিঁ-ই-চ, কিঁ-ই-চ। তারপর একটা লম্বা লাফ দিল সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে। বাঁচবার জন্য প্রাণীটাকে লক্ষ করে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়ে দিল সুদীপ্ত। ভাগ্য ভালো তার গুলি লক্ষভ্রষ্ট হল না। শুন্যে পাক খেয়ে সুদীপ্তদের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে প্রাণীটা আছড়ে পড়ল মাটিতে। সে অবস্থাতে বাজের পরবর্তী গুলি চিরদিনের জন্য শান্ত করে দিল প্রাণীটাকে।

সুদীপ্তরা তিনজনেই ছুটে গেল গঞ্জালোর কাছে। তার অবস্থা দেখে চমকে উঠল সুদীপ্তরা। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছেন গঞ্জালো। তাকে ছেড়ে ওঠার আগেই শয়তানটা গঞ্জালোকে মারণাঘাত

হেনেছে। তিনটে গভীর ছিদ্র তার বুকে। গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে সেখান থেকে। অস্পষ্ট স্বরে একবার তিনি বললেন, 'জল দাও, জল।' বাজ তাড়াতাড়ি জলের বোতল বার করে জল ঢেলে দিল তার মুখে। শেষবারের জন্য একবার চোখ মেললেন গঞ্জালো। তার ওপর ঝুঁকে পড়া মুখগুলো দেখে একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তিনি বললেন, 'আমি তো মরলামই, কিন্তু এ প্রাণীগুলোর হাতে আপনারাও একদিন মরবেন। সে দিন আর খুব বেশি দূরে নেই...। এ কথা বলে অজানা কোনো ভাষায় বিড়বিড় করে কী যেন বলতে লাগলেন তিনি। হয়তো বা সেটা তাঁর মাতৃভাষা হবে। তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না সুদীপ্তরা। কিছুক্ষণের মধ্যে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল গঞ্জালোর দেহ। কোনো মানুষের মৃত্যুই সুদীপ্তদের কাছে কাম্য নয়। তার বিস্ফোরিত চোখের পাতা দুটো হাত দিয়ে বুজিয়ে দিলেন হেরম্যান।

সেদিক থেকে সুদীপ্তরা এরপর এগিয়ে গেল মৃত প্রাণীটার দিকে। মাটিতে পড়ে আছে বাঁদর আর শিম্পাঞ্জির মাঝামাঝি আকৃতির মৃত প্রাণীটা। ছড়কুটে বেরিয়ে আছে তার করাতের মতো সারসার বিভৎস দাঁতগুলো। কুঁচকুঁচে কালো প্রায় রোমহীন দেহ। সুদীপ্তদের দৃষ্টি পড়ল তার হাতের পাতায়। প্রাণীটার দুই হাতেই তিনটে করে দীর্ঘ শলাকার মতো নখ। আকারে অন্তত পাঁচ ইঞ্চি হবে। যা সে বিঁধিয়ে দিত শিকারের বুকে। তবে গল্পে শোনা চুপাকাবরার বর্ণনার মতো শিরদাঁড়াতে কুমিরের মতো কোনো কাটা নেই। তার হাতের ওই বীভৎস নখ আর হিংস্র দাঁতগুলো বাদ দিলে বাঁদর জাতীয় প্রাণীর সাথেই রক্তচোষাটার মিল বেশি। এরপর প্রাণীটাকে আরও ভালো করে লক্ষ্য করে একটা জিনিস চোখে পড়ল সুদীপ্তদের। প্রাণীটার গলায় বকলেসের মতো একটা কলার আছে।

সুদীপ্ত বাজকে প্রশ্ন করল, 'এটা কি ভিনগ্রহর জীব? ওই মহাকাশ যান থেকে নেমে এসেছিল?'

একটু চুপ করে থেকে কী যেন ভেবে নিয়ে বাজ বললেন ওটা কোনো মহাকাশ যান নয়। একটা অত্যাধুনিক আকাশ যান। আর এ প্রাণীটাও কোনো মহাকাশের প্রাণী নয়। ঠিক যেমন গঞ্জালো আর আমার পরিচয়টাও আসল নয়।

বিস্মিত হেরম্যান বললেন, 'তবে আপনাদের পরিচয় কি? ব্যাপারটা খুলে বলুন আমাদের।'

বাজ পিছন ফিরে একবার আকাশ যানটার দিকে তাকালেন। তারপর রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমাকে কিছু সময়ের মধ্যেই রওনা হতে হবে। তবে যাবার আগে আপনাদের কৌতূহল নিরসনের জন্য আমার পক্ষে যতটা সম্ভব বলে যাই আপনাদের। আমার নাম বা আমার দেশের নাম আসলে কী তা আমার পক্ষে জানানো সম্ভব নয়। গঞ্জালোর নিজের নাম বা দেশের নামটাও ভুয়ো। তবে আমরা দুজনেই পৃথিবীর দুটো বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে উন্নত শক্তিধর দেশের সামরিক বাহিনীর সিক্রেট এজেন্সির লোক। এ প্রাণীটার খোঁজেই আমরা দু-জনেই এখানে এসেছিলাম। আমি প্রাণীটাকে ধরে বা মেরে নিজের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যাতে প্রাণীটার হত্যালীলা বন্ধ হয় ও প্রাণীটা অন্য কোনো দেশের বিজ্ঞানীদের হাতে না পড়ে। আর গঞ্জালো পরিচয়ের লোকটা চেয়েছিল প্রাণীটাকে ধরে বা মেরে নিজের দেশের সামরিক বিভাগের জীব বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিতে।'

হেরম্যান বলে উঠলেন, 'প্রাণীটার গলায় কলারটা দেখেই বুঝতে পেরেছি এটা কোনো

পোষা প্রাণী ছিল। কিন্তু এটা কী প্রাণী?'

বাজ পরিচয়ের লোকটা জবাব দিল, 'আপনারা যখন জীববিজ্ঞানের চর্চা করেন তখন আপনারা নিশ্চই 'রেসাস' বানরের নাম শুনেছেন। এদের নিয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। অবশ্য সবটাই করা হয় অত্যন্ত গোপনীয়তার ঘেরাটোপে, অনেক সময় সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে। আপনাদের সামনে যেটা পড়ে আছে সেটা একটা বড় প্রজাতির রেসাস বানর। নানা জেনিটিক মিউটেশান ঘটিয়ে ওর চেহারা, দাঁত ও নখের অমন বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। চরিত্রেরও বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ওকে রক্তপানে অভ্যস্ত করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু ওকে নিয়ে গবেষণা করার সময় কোনো ত্রুটির কারণে প্রত্যাশার তুলনায় আরও অনেক বেশি হিংস্র হয়ে উঠেছিল প্রাণীটা...

'কিন্তু এমন গবেষণার কারণ কি? ওকে হিংস্র করে তোলার কারণ কি?

এ প্রশ্নর জবাবে লোকটা যা বললেন তাতে চমকে উঠলেন হেরম্যান আর সুদীপ্ত।

তিনি বললেন, 'যুদ্ধর জন্য। পৃথিবীর উন্নত শক্তিধর দেশগুলো তাদের সামরিক গবেষণাগারে শুধু উন্নত ধরনের বোমা বন্দুক তৈরির জন্যই গবেষণা করে না, যুদ্ধর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন ভয়ঙ্কর জীবাণু আর প্রাণীদের নিয়েও গবেষণা করে...

হেরম্যান বললেন, 'এ ব্যাপারটা আমি শুনেছি।'

লোকটা বলল, 'আপনাদের সামনে পড়ে থাকা প্রাণীটার ব্যাপারও একই। রেসাস বানরদের বেশ কয়েকটা প্রজাতি স্বভাবগত ভাবে খুনে প্রকৃতির হয়। খেলার ছলে নিজেদের সঙ্গীদেরও খুন করতে ওস্তাদ তারা। রক্তপানেও আসক্ত তারা। তাই এই রেসাস বানরকেই জেনিটিক মিউটেশানের মাধ্যমে আরও হিংস্র করে তোলা হচ্ছিল, করে তোলা হচ্ছিল রক্তপেয়ী। ধরুন শত্রুদেশের এমন কোনো জায়গা যেখানে বোমা ফেলা বা সেনা পাঠানো অসুবিধাজনক তখন সেখানে গিয়ে ছেড়ে আসা হল একদল এই বানরকে। ব্যাপারটা কি বলতে চাচ্ছি তা নিশ্চই বুঝতে পারছেন?'

ব্যাপারটা কল্পনা করে শিউরে উঠল সুদীপ্ত। সত্যিই পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে হত্যা করার জন্য কী নির্মম খেলা শুরু করেছে!

হেরম্যান গম্ভীর ভাবে বললেন, 'কিন্তু এ দেশে প্রাণী এলো কেন? এটা কি আপনাদের শত্রু দেশ?'

সিক্রেট সার্ভিসের লোকটা জবাব দিলেন, "শত্রু দেশ নয়, বরং বন্ধু দেশ। সে জন্যই এ দেশের মেঘপাহাড়ে প্রাণীটাকে আমাদের দেশ থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছিল তাকে নিয়ে আরও গবেষণা করার জন্য ওই আকাশ যানে। ওর আকৃতি ইউ.এফ.ও-র মতো করা হয়েছিল এ কারণে যে, যদি কোনো কারণে কেউ প্রাণীটাকে দেখে তাহলে সে যেন ভাবে প্রাণীটা মহাকাশের জীব। কারণ মহাকাশ যান নামতে দেখা গেছে এখানে। যাই হোক এখানে প্রাণীটাকে আনার পর কোনো অসতর্কতাবশক মুক্ত হয়ে গেছিল প্রাণীটা। সে প্রথমেই খুন করল যারা তাকে এখানে এনেছিল তাদের দুজনকে। ওদের কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেছেন আপনারা। লোকদুটো খুন হয়ে যাবার ফলে দেশে বসে আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না, কী হয়েছে তাদের বুঝতেও পারছিলাম না। তারপর একদিন সংবাদ মাধ্যমে

খবর বেরোল এ গ্রামে রক্তচোষা চুপাকাবরার হানা দেবার সংবাদ, কোস্টারিকার রক্তচোষার সংবাদ। তার হত্যার ধরন দেখে আমরা বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কী ঘটেছে। আমাকে এ দেশে পাঠানো হল প্রাণীটাকে মেরে অথবা ধরে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। গঞ্জালোও সম্ভবত খবরের কাগজের সংবাদটা পেয়েই এখানে এসেছিল। এক দেশ অন্য দেশের ওপর নজর রাখে। সম্ভবত তার দেশের বৈজ্ঞানিকরাও প্রাণীটার ব্যাপারে অনুমান করতে পেরেছিলেন। প্রাণীটাকে তাদের দেশের সামরিক গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করার ইচ্ছা ছিল...

এরপর একটু থেমে তিনি বললেন, "প্রাণীটার গলায় যেটা পরানো আছে সেটা রেডিওকলার। আমার কাছে ছোট যে যন্ত্রটা দেখেছিল ওটা একটা ট্রান্সমিটার। ওর মাধ্যমেই এ প্রাণীটার অবস্থান মোটামুটি বোঝা যায়। এর সাহায্যেই প্রাণীটাকে অনুসরণ করে মারার চেষ্টা করছিলাম। ঘটনাচক্রে গঞ্জালো একইরকম একটা যন্ত্র কুড়িয়ে পায় ও প্রাণীটার গতিবিধি জেনে যায়। তবে আমি কিন্তু গঞ্জালোকে প্রথমে সন্দেহ করিনি, তাকে ইউ.এফ.ও-ম্যানিয়াকই ভেবে ছিলাম। ও রকম খ্যাপাটে লোক আমাদের দেশেও আছে। বরং আমার সন্দেহটা কিছুটা হলেও আপনাদের ওপর হয়েছিল। কারণ আপনারা সরাসরি খোঁজ চালাচ্ছিলেন প্রাণীটার। যে কারণে পাদ্রীর হত্যাকাণ্ডটা নেকড়ের আক্রমণ বলে প্রাণীটাকে খোঁজার ব্যাপারে নিরস্ত করতে চাচ্ছিলাম আপনাদের। কিন্তু উইলিয়ামের খামারের ঘটনার পর সেটা আর নেকড়ের ব্যাপার বলে চালানো গেল না। আপনারা পাহাড়ে উঠে এলেন।

উইলিয়ামের খামারে গাছের গায়ে রিভলবারের বুলেটটা আমি দেখেছিলাম। তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমি। খুব দ্রুত স্থান পরিবর্তন করছিল প্রাণীটা। দ্রুত লাফিয়ে চলে যাচ্ছিল গ্রামের এদিক ওদিক। তার পিছু পিছু ঘুরতে ঘুরতে আড়াল থেকে আমি গঞ্জালোকেও সে রাতে ঘুরতে দেখি। গাছের রিভলবারের বুলেটটা দেখে প্রথমে একটা মৃদু সন্দেহ তৈরি হয় তার ওপর। তবে আমার সব ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায় পরশু সন্ধ্যায়। আপনারা তাবুতে ফিরে আসার পর চারপাশের মেঘ আর অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমি আড়ি পেতেছিলাম গঞ্জালোর তাঁবুতে। তার তাঁবুতে থাকা যন্ত্রটা আসলে একটা রেডিও সিস্টেম যার মাধ্যমে সে নিজের দেশে যারা তাকে পাঠিয়েছিল তাদের সাথে যোগাযোগ করছিল। গঞ্জালোর বিজাতীয় ভাষায় বলা সব কথা বুঝতে না পারলেও তারই মাঝে ইংরাজিতে বলা কিছু কথায় তার পরিচয় আর উদ্দেশ্য বুঝতে পারি। তবে প্রাণীটাকে ধরার জন্য ও যে আপনাদেরও খুন করতে চাইবে এতটা আমার ধারণা ছিল না। সিক্রেট সার্ভিসের লোকদের নানা ধরনের ট্রেনিং থাকে। শেষ পর্যন্ত এই আকাশ যানেই পালিয়ে যেতে চেয়েছিল লোকটা। তবে আমাদের মতো তারও ধারণা ছিল না যে মৃত্যুদূত পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল তার নিজের পরিচিত এই এরোপ্লেনে। এটা করেই তো প্রাণীটা এখানে এসে নেমেছিল। ভয় পেয়ে পোষা প্রাণীরা নিজের খাঁচাতেই সবচেয়ে নিরাপদ মনে করে।'—দীর্ঘক্ষণ কথা বলে আসলেন বাজ।

হেরম্যান আর সুদীপ্ত নিশ্চুপ ভাবে তাকিয়ে রইল মৃত প্রাণীটার দিকে।

লোকটা আবার তার হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আর কোনো দিন আপনাদের সাথে দেখা হবে না আমার। হাতে আমার আর সময় নেই। এবার আমাকে মৃত

প্রাণীটাকে নিয়ে ফিরে যেতে হবে। গুডবাই।

সুদীপ্ত আর হেরম্যান লোকটার দিকে তাকিয়ে অতি কষ্টে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'গুডবাই।'

লোকটা এবার প্রাণীটাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে এগোল তার যানটার দিকে। আর সুদীপ্তরাও রওনা হল ফেরার জন্য। অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে মেঘ অরণ্যে হাঁটতে লাগল তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা শব্দ শুনতে পেল তারা। আলোকিত হয়ে উঠল পাহাড়ের একটা নির্দিষ্ট জায়গা। আর সেখান থেকে বিদ্যুৎ গতিতে আকাশের দিকে উড়ে গেল সেই আকাশ যান। কোস্টারিকার রক্তচোষাকে নিয়ে সে হারিয়ে গেল কোন অজানা দেশের উদ্দেশ্যে। চলতে চলতে সুদীপ্ত এক সময় বলল, 'মানুষই তো মানুষ খুন করতে শেখাচ্ছে প্রাণীদের! এই বীভৎস খেলার শেষ কোথায়?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'মানুষ যদি এসব করা বন্ধ করে তবে গঞ্জালোর কথাই হয়তো একদিন সত্যি হবে। ওদের হাতেই মৃত্যু লেখা আছে আমাদের। বিষণ্ণ ভাবে পথ চলতে লাগল তারা দুজন।

সূর্যোদয় যখন হল তখন অনেকটা নিচে পৌঁছে গেছে তারা। ধীরে ধীরে প্রভাতী সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়ছে ছবির মতো সুন্দর গ্রামটার মাথায়। সেদিকে তাকিয়ে সব বিষণ্ণতা ধীরে কেটে যেতে লাগল। সেই বাজের মুখ থেকে তারা যা শুনেছে সবই যেন গল্পকথা। এক সময় সুদীপ্ত বলে উঠল, 'দেখছেন কী সুন্দর ভোর হচ্ছে!

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'হঠাৎ খুব সুন্দর সকাল। ওই প্রাণীটার মতো কোনো প্রাণী নয়, এমন সুন্দর সকাল যেন চিরদিন জেগে থাকে পৃথিবীর বুকে। মানুষের মনে সেই আশা নিয়েই পথ চলব আমরা।

বিছে মানুষের
দাঁড়া
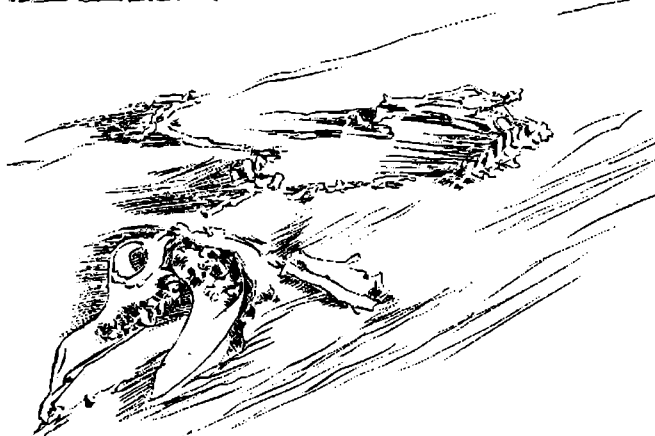
ক্যানভাসের চাদরে মোড়া জিপে ড্রাইভারের পিছনের আসনে পাশাপাশি বসে ছিল সুদীপ্ত, হেরম্যান আর ডক্টর বার্টন। গতকাল রাতেই সুদীপ্তরা সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধ থেকে এই ছোট্ট মরুশহর আলিঘাইতে এসে পৌঁছেছে। বার্টন অবশ্য অভিযানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য আরও দিন সাতেক আগেই ঘাঁটি গেড়েছিলেন এখানে। সকালবেলা তার সাথে বেরিয়ে পড়েছে তারা। সবে মাত্র বেলা সাড়ে সাতটা বাজে, কিন্তু এর মধ্যেই উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে বাইরে তাকালে চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে! মসৃণ রাস্তা এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। চারদিকে শুধু বালি আর বালি! রাস্তার একপাশে অবশ্য দূরে দূরে মাঝে মাঝে কিছু ছিরিছাঁদহীন ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অন্য দিকে শুধু ধু-ধু অন্তহীন মরু সমুদ্র আরবের বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত 'রাব-আল-খালি' মরুভূমি! যেদিকে তাকিয়ে বার্টন বললেন, 'আমরা যারা প্যালিয়েন্টোলজিস্ট' বা 'জীবাশ্মবিদ' তাদের কাছে এই মরুভূমি অঞ্চল হল স্বর্ণখনি। আরব মরুভূমি, সাহারা, গোবি-এ সব জায়গা হল জীবাশ্মের ভাণ্ডার। ভাবতে পারেন, আজ যেখানে আপনারা মরুভূমি দেখছেন সেখানেই লক্ষ-কোটি বছর আগে ছিল মহাসমুদ্র অথবা জলা ভূমি! কত আদিম প্রাণীর বাসস্থান ছিল এই মরু অঞ্চল। এককোষী প্রাণী থেকে বিশাল বপুর ডাইনোসরেরা ঘুরে বেড়াত এখানে। তারপর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলল ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন। যেখানে ছিল মহাসমুদ্র সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াল উত্তুঙ্গ পর্বত অথবা তা ঢেকে গেল বালিতে। কিছু জীব এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে বিবর্তনের ধারায় টিকে গেল, আর কিছু জীব চিরতরে হারিয়ে গেল পৃথিবীর বুক থেকে। না, তবে তারা ঠিক হারায়নি। তাদের দেখা মেলে বালি সমুদ্রর নিচে ফসিল বা জীবাশ্ম রূপে। সারা জীবনতো তাদেরই খোঁজে ঘুরেছি আমি। দেখি শেষ জীবনে যদি বড় কোনো কিছু একটা আবিষ্কার করতে পারি?'

তার কথা শুনে হেরম্যান হেসে বললেন, 'আমাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোনো অভাব হবে না এটুকু কথা দিতে পারি।'

সুদীপ্ত বলল, 'আর, আপনার কাজের সাথে আমাদের কাজের বেশ কিছুটা মিল আছে। আপনি জীবাশ্মের সন্ধান করেন আর আমরা জীবন্ত জীবাশ্মর। আপনি যাচ্ছেন কাঁকড়াবিছের দানব পূর্বপুরুষ ইউরিপ্টেরাস-এর ফসিল খুঁজতে, আর আমাদের উদ্দেশ্য মরুভূমির লোক-কথায় বর্ণিত সেই দানব কাঁকড়াবিছের সন্ধান করা।'

বার্টন বললেন, 'দেখা যাক আমাদের মনস্কামনা কতটা পূর্ণ হয়। এবং আমাদের এই অভিযানের সফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করবে আমাদের পরিশ্রম, সাহস ও কষ্ট-

সহিষ্ণুতার ওপর। এছাড়া কাজের প্রতি একাগ্রতা, ভালোবাসা এসব ব্যাপারতো আছেই। ইন্টারনেটে যখন আমি আমার এই অভিযানের সঙ্গী খোঁজার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম তখন সে ডাকে বেশ কিছু সাড়া মিলেছিল। তাদের মধ্যে কেউ ভূ-তাত্ত্বিক, কেউ জীববিদ, কেউ বা নিছক অ্যাডভেঞ্চারিস্ট, কিন্তু তাদের মধ্যে ক্রিপ্টোজুলজিস্ট কেউ ছিলেন না। আপনাদের এ ব্যাপারটাই আপনাদের সম্বন্ধে প্রথমে আকৃষ্ট করে আমাকে। তারপর কথাবার্তা যত এগোল তত ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম এ অভিযানে আপনারাই আপনার উপযুক্ত সঙ্গী হতে পারেন।

হেরম্যান বললেন, "আপনার এই ভাবনার জন্য ধন্যবাদ। 'ক্রিপ্টিড' অর্থাৎ রূপকথা, লোককথা বা পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীর খোঁজে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে বেড়াবার কিছুটা অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। সে সব অভিযানে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে আমাদের। বেশ কয়েকবার তো মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। সে আমাদের ছুঁয়েও শেষ পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি। তবু আমাদের অভিযান থেমে থাকেনি।'

এ কথা বলার পর একটু থেমে হেরম্যান তার উদ্দেশ্যে বললেন, তবে আপনার সঙ্গী হবার জন্য আপনি যে শর্তগুলো রেখেছিলেন তার মধ্যে একটা শর্ত কিন্তু বেশ মজার বলে মনে হয়েছিল আমার। ওই যে, অভিযাত্রীদের ভূত-প্রেত, ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাসী হলে চলবে না। এই শর্তের কারণটা কি?

প্রৌঢ় জীবাশ্মবিজ্ঞানী ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'কারণ অবশ্যই আছে, সেটা যথা সময় জানতে পারবেন আপনারা।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'এই মরু অঞ্চলের ঠিক কোন জায়গাতে যাব আমরা?'

বার্টন জবাব দিলেন, 'সৌদি আরব, ওম্যান, আরব এমিরেটস আর ইয়েমেন এই চারদেশের মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে এই মরুভূমি। আমরা যাব মরুভূমির হাজার দুই মাইল গভীরে মরুভূমির পশ্চিম ভাগের এক জায়গাতে। সেখানে সম্ভবত এক মৃত নগরী আছে। খ্রিস্টেরও জন্মের অনেক অনেক আগে গড়ে ওঠা নগরী। তবে নগরী বলতে ভাববেন না যে মিনার-গম্বুজ-বা কারুকাজ শোভিত নগরী। সে সময় মানুষের মনে ওই শিল্প ভাবনা জন্মায়নি। মরু অঞ্চলের আদি বাসিন্দারা তখন পাহাড়ের গায়ে খোপ কেটে, গুহা বা সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে তার মধ্যে বসবাস করত। এ সব নগরীর ধ্বংসাবশেষ মরু অঞ্চলের কয়েক হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তবে সব সময় এদের দেখা যায় না। মরু ঝড় এদের বালিতে ঢেকে দেয়। যতদিন না আবার পালটা একটা ঝড় এসে সে বালি সরিয়ে দিচ্ছে ততক্ষণ আর চিহ্ন মেলে না তাদের। এমনও হয় যে কিছুদিনের জন্য সূর্যালোকে মুখ দেখিয়ে আবার হাজার বছরের জন্য চাপা পড়ে গেল সে নগরী। আর সাধারণত এ নগরীগুলো গড়ে উঠেছিল যেখানে মরুভূমির মধ্যে নদীখাত আছে সেখানে। আর ওই নদীখাতগুলোর স্তরে স্তরে পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রাণীর জীবাশ্ম। ছোট মোলস্কা থেকে শুরু করে ডাইনোসর পর্যন্ত। এমনকি ওই নগরীর গুহাগুলোতেও জীবাশ্মর সন্ধান মেলে।'

হেরম্যান বললেন ; আচ্ছা, মরুভূমির যাযাবর উপজাতিরা যে দানব বৃশ্চিকের গল্প

বলে, যারা নাকি মানুষ টেনে নিয়ে যায় তাদের অস্তিত্ব কি থাকা সম্ভব?'

বার্টন মৃদু হেসে বললেন, 'ইউরিপুটেরাস কিন্তু হিংস্র প্রকৃতির ছিল। খুনে ইউরেপুটেরাস। সেই দানব কাঁকড়া বিছে ইউরিপুটেরাস বাস করত প্রায় ষাট কোটি বছর আগে সিলুরিয়ান কালপর্বে। আকারে তাদের কেউ কেউ বিশ ফুটও ছিল। জল ছেড়ে যে সব প্রাণী প্রথমে ডাঙায় উঠে আসে তাদের মধ্যে সে অন্যতম। যে সব প্রাণী কোটি কোটি বছর ধরে একই রকম দৈহিক গড়ন নিয়ে এখনও টিকে আছে তাদের মধ্যেও কাঁকড়াবিছে অন্যতম। শুধু তার আকারটাই ছোট হয়ে গেছে। এর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে। এরা দেহত্বকের ছিদ্র দিয়ে অক্সিজেন নেয়। এদের যখন প্রথম উৎপত্তি হয় সেই উদ্ভিদহীন পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমছিল। এদের দীর্ঘ দেহের অসংখ্য ছিদ্র ওই অক্সিজেন গ্রহণের জন্যই। তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবীতে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের আকারও ছোট হয়ে আসতে থাকে। তবে আপনি যদি জীবন্ত জীবাশ্ম সিলিকান্থ মাছের কথা বলেন তবে বলাই যেতে পারে যে ষাট কোটি বছর আগে যে দানব কাঁকড়াবিছে শ্যাওলা মাড়িয়ে পৃথিবীর বুকে উঠে এসেছিল তাদের ওই দানবীয় আকারেই আজও পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়। শর্ত শুধু একটাই, যে জায়গাতে তার বাসস্থান তার পরিবেশ সেই ষাট কোটি বছর আগের মতোই হতে হবে। 'দু' কোটি বছরের প্রাচীন সিলিকান্থ মাছ সমুদ্রতলে যেখানে বাস করে সেখানে জলের অন্যান্য বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস, জলের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পাঁচশো পাউন্ড। দু-কোটি বছরেও সেখানের পরিবেশের কোনো পরিবর্তন হয়নি বলেই তারা একই আকার নিয়ে বেঁচে আছে। ঠিক যেমন উদ্ভিদদের মধ্যে উত্তর ইউরোপের তুষারাবৃত অঞ্চলে জিংগো বাইলোবা' নামে এক সপুষ্পক উদ্ভিদ তার উনিশ কোটি বছর আগের হুবহু চেহারা নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেখানকার পরিবেশ বদলায়নি বলে। সমুদ্রতল, তুষারাবৃত অঞ্চল ও মরুভূমিতে এখনও এমন বেশ কিছু জায়গা আছে যেখানে লক্ষ কোটি বছরেও পরিবেশের বদল ঘটেনি।'

হেরম্যান ও সুদীপ্ত দু-জনেই বেশ খুশি হলো বার্টনের কথা শুনে। হেরম্যান বললেন, 'যখন ভিডিও কনফারেন্সে আমাদের প্রথম কথাবার্তা হয় তখন আমি ভেবেছিলাম যে আপনি হয়তো নিছক কৌতূহলবশত আমাদের সাথে যোগাযোগ করছেন। কারণ, অনেক পণ্ডিত মানুষরাও আমাদের নিয়ে পরিহাস করেন। অথচ জায়েন্ট স্কুইড বা দানব অক্টোপাস, ইন্দোনেশিয়ার কোমাডো ড্রাগন ইত্যাদি বেশ কিছু ক্রিপ্টিড বা একদা গল্পকথার প্রাণীদের আবিষ্কারের কৃতিত্ব কিন্তু আমাদের মতো ক্রিপ্টেজুলজিস্টদেরই।'

ডক্টর বার্টন নিজের অবিন্যস্ত চুলে হাত বুলিয়ে বললেন ; আমার যতই চেহারা সুঠাম দেখাক না কেন, বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। আমারও অভিজ্ঞতা কম হল না। জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে আমাদের অদেখা, অজানা বিষয়ের পরিমাণই বেশি। নিজে দেখিনি বা জানিনা বলে অন্যের বক্তব্যকে কখনও উড়িয়ে দিই না। তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করি। এই দেখুননা 'টিরানোসেরাস রেক্স'। সে কথার অর্থই হল যে 'যে রাজার পদভারে মেদিনী কাঁপে।' সেই পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা, সাত টন ওজনের

ডাইনোসরের মতো কোনো প্রাণী যে হতে পারে তা এক সময় জীববিজ্ঞানীদের কল্পনাতেও ছিল না। তা বলে কি তারা পৃথিবীর বুকে এক সময় দাপিয়ে বেড়ায়নি। জীবাশ্মবিদরা মাটির গহ্বর থেকে তুলে এনেছেন তাদের আস্ত কাঠামো এবং যত বড় বড় জীবাশ্মর সন্ধান পাওয়া গেছে তার সিংহভাগ কিন্তু মিলেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মরু সম্বল থেকে।' পিচ ঢালা মসৃণ রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। সুদীপ্ত এরপর জানতে চাইল ; 'এই মরু অঞ্চলগুলোই জীবাশ্মের আঁতুড়ঘর কেন?'

ডক্টর রার্টন বললেন, 'ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি। ধরুন কোনো প্রাণীর মৃত্যু হলো। তার মাংস প্রথমে খেয়ে নিল শেয়াল-কুকুর-চিল-শুকুন জাতীয় পশু পাখিরা। অথবা বাতাসের জীবাণুর প্রভাবে তাদের চামড়া-মাংস গলে পচে যাবে। পড়ে থাকবে শুধু হাড়ের কাঠামো। সেই হাড়গুলোও আবার এক সময় রোদ, বৃষ্টির প্রভাবে অস্থিচূর্ণে পরিণত হয়ে মিশে যায় মাটিতে। জীবাশ্ম তৈরির প্রাথমিক শর্তই হল তার ওপর বেশি সময় রোদ-ঝড়-বৃষ্টি পড়বে না। তা ঢেকে যাবে খুব দ্রুত। ঠিক এই রকম পরিবেশ মিলবার সম্ভাবনা থাকে মরুভূমি আর তুষারাবৃত অঞ্চলে। সেখানে জীব বা উদ্ভিদদেহ অনেক সময় লক্ষ কোটি বছর ধরে চাপা পড়ে থাকে বালি বা তুষারের নিচে। বালির স্তরের ওপর বিভিন্ন যুগে আরও বালি চাপা পড়ে, তুষারের ওপর আরও তুষার। অথবা নিচের কোনো স্তর হয়তো পরিণত হয় পাথরে, অথবা বালির ওপর মাটি বা পাথরের আবরণ তৈরি হয়। কিন্তু সময় প্রতিস্তরে তার সাক্ষ্য রেখে যায় ওইসব জীবাশ্মর মাধ্যমে। এটা অনেকটা সাজানো কেকের মতো। বাইরে থেকে বোঝা যায় না তার ভিতরে কী কী আছে। কিন্তু কেকটাকে ছুরি দিয়ে কাটলেই যেমন তার বিভিন্ন স্তরে ফল ইত্যাদি দেখা যায়, তেমনই এই মরুভূমির নিচে বিভিন্ন স্তরে তাদের প্রাচীনতা অনুসারে বিভিন্ন যুগের প্রাণীদের ফাসিল পাওয়া যায়। আমরা যে জায়গাতে অভিযান চালাব সে জায়গাতে প্রায় ষাট কোটি বছর আগে সমুদ্র খাড়ি ছিল। যদিও এখন সমুদ্র অনেক দূরে সড়ে গেছে তবে নিশ্চিতভাবে বালির নিচে মাটির গভীরে সেখানে দেখা মেলে বিভিন্ন প্রাণীর ফসিল। ষাট কোটি বছর আগে যে প্রাণী প্রথম জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছিল সেই মহাবৃশ্চিকের ফসিল সংগ্রহ করতে চাই আমি। ইতিপূর্বে তার যে ফসিল উদ্ধার হয়েছে তা আকারে ন'ফুট। তারও দশকোটি বছর আগে তারা যখন প্রায় কুড়ি ফুট ছিল, তেমনই এক ফসিল সংগ্রহ করতে চাই আমি।'

হেরম্যান বললেন, 'মরু অঞ্চলে যে সব যাযাবর গোষ্ঠী ও জায়গাতে ঘুরে বেড়ায় তারা যখন কোনো কারণে সভ্য পৃথিবীতে আসে তখন কিন্তু তারা বহুবার বলেছে যে তারা চাক্ষুস করেছে সেই দানব বৃশ্চিককে। বিশেষত মরুভূমির যে সব জায়গাতে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন দেখা যায় সেই সব জায়গা নাকি তাদের বাসস্থান। এমন কী দলছুট মানুষকে তাদের দাঁড়ার আঘাতে কোমর থেকে দু-টুকরো করে মাটির গভীরেও নাকি টেনে নিয়েছে তারা। সভ্য পৃথিবীর মানুষ অবশ্য ব্যাপারটাকে অশিক্ষিত মরু যাযাবরদের কল্পনা বলে ভাবে। ঠিক যেমন ইন্দোনেশিয়ার ধীবর সম্প্রদায়ের লোকরা বহুদিন ধরে কমোডো ড্রাগনের কথা বললেও সভ্য পৃথিবীর মানুষরা হেসে উড়িয়ে দিত তাদের কথা।

অথচ কমেডো ড্রাগন ছিল এবং এখনও আছে। বার্টন বললেন, 'আমি এর আগে 'রাব-আল-খালি'তে অভিযান না করলেও আমার বাসস্থান লন্ডনে বসে দীর্ঘদিন ধরে এ তল্লাটের খোঁজ খবর রাখি আমার পেশাগত কারণে। ঠিক যেমন হেরম্যান আপনি জার্মানিতে বসে বা সুদীপ্ত আপনি ইন্ডিয়াতে থেকে সারা পৃথিবীর খবরাখবর রাখার চেষ্টা করেন ক্রিপ্টিডের খোঁজ পাবার জন্য। রাব-আল-খালিতে বেশ কিছু পর্যটক ওই সব প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের পাথুরে দেওয়ালের গায়ে দানব বৃশ্চিকের ছবি দেখেছে। হতে পারে সেগুলো আসলে ছবি নয় ফসিল।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'ফসিল কেন?'

বার্টন বললেন, 'তাহলে আপনাকে একটা ছোট্ট গল্প বলি। আব্রাহাম বলে এক মার্কিন প্রত্নবিদ একবার এক অভিযান চালিয়েছিলেন গোবি মরুভূমিতে সেখানে তিনি এক হারানো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পান। যার পাথরের দেওয়ালে তিনি খুঁজে পান বিভিন্ন অদ্ভুত দর্শন পশুপাখির মূর্তি। তেমনই এক ভাস্কর্যকে তিনি দেওয়াল থেকে অনেক কষ্টে খুলে উটের পিঠে চাপিয়ে হাজির করেন বিজ্ঞানীদের সামনে। জীব বিজ্ঞানীরা সেটা দেখে বুঝতে পারেন যে সেটা পাথর খোদিত ভাস্কর্য নয় সেটা আসলে জুরাসিক যুগের হংসচঞ্চু ডাইনোসর বা ট্রাকোডনের ফসিল। কারণ ইতিপূর্বেই ১৯০৮ সালে স্টানবার্গ নামে এক জীবাশ্ম বিজ্ঞানী আমেরিকার কেনসাসের কাছে বালি খুঁড়ে চামড়া শুদ্ধ এক ট্রাকোডনের জীবাশ্ম উদ্ধার করেছিলেন। প্রাচীন মানুষের যেসব পাথুরে অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন সেসব অঞ্চলে পাথরের বুকে জীবাশ্ম থাকা আশ্চর্য নয়। সমস্যা হল এ সব প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ একবার দেখে আসার পর আবার সেখানে গেলে প্রায়শই খুঁজে পাওয়া যায় না। মরুঝড় ঢেকে দেয় তাদের। তাছাড়া যেসব মরু যাযাবররা মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ায় তারা ওসব জায়গাকে শয়তানের বাসস্থান বলে মনে করে। ওই সব জায়গাগুলোকে তারা পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে, কাউকে তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চায় না সেখানে। ঠিক যেমন আমরা যে জায়গাতে যাব তার নাম মরু যাযাবরদের কাছে 'শয়তানের কবর।' স্বয়ং শয়তান নাকি ঘুমিয়ে আছেন সেই মৃতনগরীতে! কেউ কেউ বলে তিনি নাকি দানব বৃশ্চিকদের দেবতা।'

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'ওই মৃত নগরীতে আমরা পৌঁছব কি ভাবে?'

বার্টন বললেন, 'ওই অঞ্চলে প্রায় পাঁচশো বর্গ মাইল অঞ্চল জুড়ে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে আছে। তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ওই মৃতনগরী। এক ইউরোপীয় পর্যটক বহুকাল আগে ও অঞ্চলে গেছিলেন। তাঁর হাতে আঁকা মানচিত্রর একটা প্রতিলিপি আমি সংগ্রহ করেছি লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে। স্যাটেলাইট মানচিত্রে একবার ধরা পড়েছিল ওই অঞ্চলের ছবি। সে ছবিও আমার কাছে আছে। তবে মুশকিলের ব্যাপার একটা আছে। ওই মানচিত্র ও ছবি আমাদের ওই পাঁচশো মাইল পরিধির মধ্যে পৌঁছে দেবে ঠিকই, কিন্তু মূল নগরীটার উপস্থিতি ম্যাপে দেখানো নেই। সেটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

হেরম্যান বললেন, 'এমন যদি হয় যে ওই মৃত নগরী বালির তলায় বর্তমানে চাপা

পড়া অবস্থায় আছে তবে সেক্ষেত্রে কি ভাবে তার খোঁজ মিলবে?'

বার্টন বললেন, হয়তো একজন আমাদের সাহায্য করতে পারে এ ব্যাপারে। আগে সে ওই অঞ্চলে গেছিল। তাকে আমরা এই অভিযানে সঙ্গে নেব। সেই হয়তো আমাদের শেষ পর্যন্ত সেই শয়তানের কবরে পৌঁছে দেবে। তার সাথেই তো তখন আপনাদের সাক্ষাৎ করাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। তাকে সঙ্গী করে কাল ভোরে রাব-আল-খালিতে অভিযান শুরু করব আমরা।

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'আমাদের কদিন লাগবে ওই অঞ্চলে পৌঁছতে?'

বার্টন জবাব দিলেন, 'ওই পাঁচশো বর্গমাইল অঞ্চলে প্রবেশ করতে অন্তত তিনদিন সময় লাগবে। মোট চারটে গাড়ির ক্যারাভ্যান। একটাতে থাকব আমরা, একটাতে থাকবে খাবার এবং জল একটাতে পেট্রোল ও খননের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি জিনিস আর শেষের গাড়িতে দু-জন কুলি। চারজন ড্রাইভার ও কুলি মিলিয়ে তাদের সংস্থা দশ। আর আমরা চারজন। সব মিলিয়ে চোদ্দো জনের দল।

গাড়ি গন্তব্যে পৌঁছে গেল এক সময়। গাড়ি থেকে নেমে জায়গাটা দেখে একটু অবাক হয়ে গেল সুদীপ্তরা। ছিরিছাঁদহীন বেশ লম্বাটে ধরনের বাড়ি বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাড়িটা। প্রাচীরের মাথায় আবার কাঁটাতার জড়ানো। একটা ওয়াচ টাওয়ারও আছে। লোহার তৈরি বন্ধ প্রবেশ দ্বারের মাথায় আরবি ও ইংরেজিতে লেখা আছে—'আলি ঘাই জেল।' অস্ত্র হাতে বেশ কয়েকজন রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ প্রবেশ তোরণের সামনে। সুদীপ্ত মৃদু বিস্মিত ভাবে বলল, 'আপনার গাইড এখানে কাজ করেন নাকি?'

তার কথার জবাবে বার্টন মৃদু হেসে এগোলেন তোরণের দিকে।

তোরণের কাছে পৌঁছতেই রক্ষীরা এগিয়ে এল তাদের কাছে। রক্ষীদের একজন মনে হয় বার্টনকে চিনতে পেরে মৃদু হাসল। কার্টন তাকে বললেন, সুপারেন্টেন্ডেন্টের সাথে দেখা করব। টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।'

এরপর কিছুক্ষণ সুদীপ্তদের সেখানেই অপেক্ষা করতে হল। একজন রক্ষী প্রথমে জেলের ভিতরে ঢুকে সুপারের অফিসে গিয়ে বার্টনের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে এল। এরপর একটা খাতায় তাদের নাম ধাম স্বাক্ষর ইত্যাদি লেখার পর ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি মিলল। তোরণের গায়ের একটা ছোট্ট গেট দিয়ে জেলের ভিতর প্রবেশ করল সুদীপ্তরা। একজন রক্ষী তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল জেলারের ঘরে। জেলার সাহেব একজন বিশালবপু আরব। যেমন লম্বা তেমন চওড়া চেহারা। সরকারি এমব্লেম লাগানো মাথার পাগড়িটাও সেই অনুপাতে বিশাল। ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন। সুদীপ্ত

আর হেরম্যানের দিকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে তিনি বার্টনকে বললেন, 'তাহলে আপনি রাব-আল-খালিতে সত্যিই যাচ্ছেন?'

বার্টন বললেন, 'হ্যাঁ যাচ্ছি। আমার এই সঙ্গী দুজনও জীব চর্চা করেন। এরাও যাচ্ছেন।'

সুদীপ্তরা বুঝতে পারল ডক্টর বার্টনের ইতিপূর্বে সাক্ষাৎ হয়েছে জেলার সাহেবের সাথে এবং অভিযানের ব্যাপারটা তিনি জানেন। জেলার সাহেব এরপর বার্টনের উদ্দেশ্যে হেসে বললেন, আপনার গাইডের সেলে গতরাতে গিয়েছিলাম। সে জানতে চাচ্ছিল আপনি কবে এসে তাকে নিয়ে যাবেন? কাগজপত্র আমি সব ঠিক করে রেখেছি। আশা করছি আপনি তাকে উপযুক্ত লোকের হাতে তুলে দেবেন। সে যেন আর এখানে ফিরে না আসে। এমনিতেই সাধারণ চোর-ডাকাত-খুনে কয়েদিদের চাপ। তার ওপর আবার এই লোকগুলোতে বাড়তি ঝামেলা হয়। তার ওপর আবার ওই লোকটা বিদেশি বলে ওর ওপর বাড়তি নজর রাখতে হয়। তার ওপর ওর জন্য রক্ষীরা ওদিকে টহল দিতে ভয় পায়।' ডক্টর বার্টন বললেন, 'আমি চেষ্টা করব সে যেন সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে। আমার সঙ্গীদের নিয়ে এসেছি তার সাথে সাক্ষাৎ করাবার জন্য।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জেলার মাঝে বললেন, 'চলুন তাহলে আগে তার কাছে যাই। তারপর ফিরে এসে কাগজপত্র সইসাবুদ করবেন।'

একজন রক্ষী জেলার সাহেবের ঘরের দেওয়াল থেকে বিশাল একটা চাবির গোছা খুলে নিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোবে জেলার। তাদের অনুসরণ করল সুদীপ্তরা।

লম্বা টানা বারান্দার গায়ে সার সার ঘর। তার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েদিরা উৎসুক চোখে তারা দেখছে সুদীপ্তদের। একটার পর একটা অলিন্দ অতিক্রম করে সুদীপ্তরা উপস্থিথ হলো বাড়িটার পিছনের অংশের একটা মেলে। সেখানের যারা বাসিন্দা তাদের আচরণ দেখেই সুদীপ্তরা বুঝতে পারল তারা কেউ স্বাভাবিক নয়। তাদের পোশাক অবিনস্ত, কেউ বা আবার উলঙ্গ। সেলে গরাদের আড়ালে কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ বা আবার বনবন করে ঘুরপাক খাচ্ছে। মানসিক ভাবে অসুস্থ বন্দিরা থাকে এ জায়গায়।

জেলার সাহেবের সঙ্গে তারা এসে দাঁড়াল সে জায়গার শেষ মাথায় একটা গরাদ ঘেরা কুঠুরির সামনে। কুঠুরির ভিতরটা প্রায় অন্ধকার পিছনের দেওয়ালের মাথার ওপরের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোট্ট জানলা দিয়ে সামান্য একটু আলো ঢুকছে ঘরে। সুদীপ্ত প্রথমে সে ঘরটার ভিতর তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেরে বার্টনের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি ইশারায় ঘরের কোণার দিকে খেয়াল করতে বললেন সুদীপ্তকে। হ্যাঁ, সেখানে দেওয়াল ঘেসে মাটিতে শুয়ে আছে একটা লোক। কিন্তু তার ভঙ্গি দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল হেরম্যান আর সুদীপ্ত। লোকটা আসন বা ব্যায়াম করছে নাকি? বুকের ওপর ভর করে শুয়ে লোকটা। কোমর থেকে পা-দুটো একসাথে পিছনের দিকে শূন্যে অবস্থান অনেকটা সলভাসনের মতো। তবে তার হাত দুটো দু-পাশে প্রসারিত হবার বদলে সামনে দু-পাশে এমন অর্ধবৃত্তাকারে রাখা যেন সে ওই অবস্থায় অদৃশ্য কোনো

বৃত্ত বা মোটা গাছের গুড়িকে জড়িয়ে ধরে আছে! লোকটার ঝাঁকড়া চুল ওয়ালা মাথাটা দেওয়ালের দিকে ফেরানো বলে তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না সুদীপ্তরা।

সুদীপ্ত আর হেরম্যান তাকে দেখতে পাওয়ার পর ডক্টর বার্টন চাপাস্বরে সুদীপ্তদের উদ্দেশে বললেন। ভালো করে দেখুন লোকটাকে। ওকে নিয়ে একবার ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড স্টোরি করে ছিল। বিশেষত ওর শুয়ে থাকার ভঙ্গিমাটা খেয়াল করুন। ওর সাথে কোনো প্রাণীর অবয়বের সাদৃশ্য দেখছেন। ওভাবেই ও ঘুমিয়ে থাকে।

সুদীপ্ত প্রথমে ধরেও যেন ধরতে পারল না ব্যাপারটা। ডক্টর বার্টন চাপা স্বরে বললেন, 'ও ভাবেই ও শুয়ে থাকে। ঠিক যেন একটা কাঁকড়া বিছে! ওর সামনের দিকে হাত দুটো ঠিক কাঁকড়া বিছের দাঁড়ার মতো প্রসারিত। কোমরের পিছনের দিকের জোড়া পা দুটো যেন বিছের লেজ। আর পায়ের পাতা দুটো এক সাথে এমনভাবে ঊর্ধ্বমুখে ওঠানো আছে যেন সেটা কাঁকড়া বিছার হুল। ওকে নিয়ে লেখাটার নাম ছিল 'স্করপিয়ন ম্যান।' ডক্টর বার্টনের কথা শুনে এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। সত্যিই লোকটা যেন 'বিছে মানুষ!'

রক্ষী এরপর চাবি বার করে গরাদের গায়ের তালাটা খুলল। চাবির গোছার ঝনঝন শব্দে সেই বিছে মানুষ বুকের ওপর ভর দিয়েই লাট্টুর মতো ঘুরে তাকাল দরজার দিকে। তার পায়ের অংশটা শূন্যের দিকে আরও উঁচু হয়ে গেল। যেন হুল বাগিয়ে দরজার দিকে ফিরল সে। এক মাথা অবিন্যস্ত চুল তার কপালে নেমে এসেছে, তার আড়াল থেকে সে তাকাল সুদীপ্তদের দিকে। তাকে দেখে কেমন যেন শিরশির করে উঠল সুদীপ্তর গা। লোকটা কি সত্যিই বিছে মানুষ?

দরজা খোলার পর সে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল সবাই। তাই দেখে সম্ভবত একটু ভয় পেয়েই সামনের দু-হাতে সর সর করে কিছুটা পিছু হবে ঘরের অন্ধকারতম কোণে চলে গেল লোকটা। ভালো করে আলো ঢোকেনা বলে কেমন একটা অদ্ভুত স্যাঁত স্যাঁতে পরিবেশ বিরাজ করছে ঘরটার ভিতর। বিছের বাসস্থান হিসাবে উপযুক্ত পরিবেশই বটে!

জেলার সাহেব লোকটার উদ্দেশ্যে বললেন, 'সুপ্রভাত মিস্টার টিম্বার। উঠে দাঁড়ান। এঁরা আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন।'

জেলার সাহেবের কথা শুনে লোকটা সুদীপ্তদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে। তার দৃষ্টি এসে থেমে গেল ডক্টর বার্টনের মুখের ওপর। তার ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে লোকটা উঠে দাঁড়াল। যদিও লোকটার গায়ের রঙ সম্ভবত এ দেশে থাকার কারণে রোদে পুরে তামাটে হয়ে গেছে তবু তার চুল ও গায়ের রঙ দেখে সুদীপ্তরা বুঝতে পারল এ লোকটা সম্ভবত ইওরোপীয়ান হবে। সারা দেহ তার উন্মুক্ত, শুধু কোমরের একটা বস্ত্র খণ্ড তার লজ্জা নিবারণ করছে।

সে বার্টনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমাকে মহান থুলুর কাছে নিয়ে যাবে? সে যে ডাকছে আমায়। কিন্তু এরা আমাকে কয়েদ করে রেখেছে। কিছুতেই বাইরে বেরোতে দেয় না।

ডক্টর বার্টন তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'এবার তোমাকে এরা বেরোতে দেবে।

তোমাকে আমি মহান থুলুর সেই নগরীর কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু তুমি সে জায়গা চিনতে পারবে তো?"

বার্টনের প্রশ্ন শুনে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিছে মানুষের চোখ দুটো। সে বলল ; হ্যাঁ, পারব, পারব। সেখানে ঘুমিয়ে আছে আমার ঈশ্বর। তাঁর আবাহন মন্ত্র আমি জানি। কিন্তু সেখানে যেতে হলে তোমাকেও কাঁকড়া বিছে হতে হবে। পারবে তো?'

বার্টন হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, পারব, অবশ্যই পারব।'

লোকটা বলল, 'তাহলে তুমি পবিত্র গন্থ নেক্রোনোমিনিকন'-এর নামে শপথ করও যে তুমিও প্রভুর কাছে নিজেকে আমার মতো সমর্পণ করবে?' বার্টন জবাব দিলেন, 'নেক্রোনোমিনিকাই'এর নামে শপথ করলাম।'

সুদীপ্ত আর হেরম্যান গীতা, বাইবেল, কোরান ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের নাম নিয়ে লোককে শপথ নিতে শুনেছে, কিন্তু 'সেক্রোনোসিনিকন'-এর নাম কখনও শোনেনি। কোন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ এটা?

টিম্বার নামের লোকটা বলল, 'চলো, এখনই রওনা হওয়া যাক। প্রভু থুলু সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তার ঘুম ভাঙাব আমি।' বার্টন বললেন, 'কিন্তু এখান থেকে বাইরে বেরোবার আগে কিছু কাজ করতে হবে তোমাকে। চুল দাড়ি কাটতে হবে, স্নান করতে হবে, পোশাক পরতে হবে। এ ভাবে তো আর বাইরে যাওয়া যাবে না। তাছাড়া আমার কিছু কাজ আছে। সে সব মিটতে বিকাল হয়ে যাবে। বিকালবেলা এসে তোমাকে নিয়ে যাব আমি।'

বিছে মানুষ যেন একটু বিমর্ষ হলো তার মুক্তি পেতে বিকাল হবে বলে। একটু চুপ করে থেকে সে জানতে চাইল, 'আচ্ছা', 'নিউ মুন' কবে? অর্থাৎ অমাবস্যা করে?

বার্টন একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন, 'আর দিন সাতেক পর।'

লোকটা বলল, 'সে রাতের আগে সেখানে পৌঁছান যাবে তো?'

কার্টন জবাব দিলেন, 'যদি তুমি সাহায্য করো যাওয়া যাবে।'

জেলার সাহেব এবার তাড়া দিয়ে বললেন, 'চলুন এবার অফিসে ফিরে কাগজপত্রর কাজ মিটিয়ে খেলা যাক। ওকে আমার লোকরা বাইরে বেরোবার জন্য তৈরি করে দেবে।'

তার কথা শুনে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সুদীপ্তরা জেলারকে অনুসরণ করল আবার তার ঘরে ফেরার জন্য। সেদিকে যেতে যেতে বার্টন জেলার সাহেবকে বললেন, 'আপনিতো দীর্ঘ দিন ধরে দেখলেন লোকটাকে, ওকে কি হিংস্র বলে মনে হয়েছে আপনার?'

জেলার সাহেব বললেন, 'যদিও সে দু-দুবার জেল থেকে পালিয়েছিল তবুও ওর কোনো হিংস্রতা চোখে পড়েনি আমার। বরং ও মানসিক রোগীদের থেকে শান্ত। সমস্যাটা হলো ওর ব্যবহার আর অদ্ভুত কথাবার্তায়। মাসের অর্ধেকটা সময় লোকটা নিশ্চিত ভাবেই জেলে কাটায়। কিন্তু অমাবস্যা যত এগিয়ে আসে তত তার মধ্যে মানসিক বৈকল্য শুরু হয়। কাঁকড়া বিছের মতোই বুকে হেঁটে উত্তেজিত ভাবে ঘরের মধ্যে পাক খায়। আবোল তাবোল বকতে থাকে। কখনও তাকে ছেড়ে দেবার জন্য মিনতি করতে থাকে। আর

তার এই আবোল-তাবোল কথা শুনে তাকে ভয় পায় আমার অশিক্ষিত রক্ষীরা। তার ওপর এক বদমাশ কয়েদি প্রচার করেছে যে স্টিম্বারকে নাকি সে তার কুটুরির ভিতর বিশাল এক ছায়া মূর্তির সাথে কথা বলতে দেখেছে। টিম্বার তাকে 'মহান থুলু' 'মহান আজি'ফ বলে সম্বোধন করেছিল! আজিফ শব্দর অর্থ 'শয়তান।' আর তারপর থেকেই রক্ষীরা ওর সেলে রাতে পাহারা দিতে চায় না। টিম্বার এখান থেকে গেলে আমার শান্তি হবে। জেলার সাহেবের ঘরে এসে বসল সুদীপ্তরা। টিম্বার নামের লোকটাকে মুক্ত করার জন্য বেশ কিছু কাগজে স্বাক্ষর করতে হল ডক্টর বার্টনকে। সেসব কাজ মিটলে তিনি জেলার সাহেবকে বললেন, 'আপনি টিম্বারকে তৈরি করে রাখুন। আমি আমার সঙ্গীদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

জেলখানা থেকে বেরিয়ে সুদীপ্তরা এরপর হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। সুদীপ্তরা এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। গাড়ি চলতে শুরু করার পর হেরম্যান এবার ডক্টর বার্টনকে বললেন, 'ওই বিছে মানুষের ব্যাপারটা আমাদের খুলে বলুন। ও তো মানসিক রোগী! ও আমাদের গাইডের কাজ করবে কি করে? লোকটার আসল পরিচয় কি?'

বার্টন বললেন, 'এ লোকটাকে প্রথমে বছর দশেক আগে আরব অভিযাত্রীদের একটা দল প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় উদ্ধার করে রাব-আল-খালির ওই প্রাচীন নগরীর কাছে। আপাদমস্তক কালো রঙ মেখে ওই বৃশ্চিকের মতো ভঙ্গিতে পড়ে ছিল সে। ও কোন দেশের লোক সে সম্বন্ধে কোনো কিছু জানা যায় না। যে কারণে ওর চেহারা দেখে ইউরোপীয় মনে হলেও পরিচয়পত্র না থাকার কারণে ইওরোপের কোনো দেশ ওকে নিতে চায়নি। এ দেশের সরকারের কাছে ওর কোনো নথি নেই। সম্ভবত অন্য কোনো দেশের দিক থেকে রাব-আল-খালিতে প্রবেশ করেছিল সে। তারপর থেকে লোকটা এ দেশেই আছে। এই দশ বছরের মধ্যে দু-দুবার পালিয়ে ছিল সে। একবার এখানকার এক মানসিক হাসপাতাল থেকে, আর একবার এই জেল থেকে। এবং এই দু-দুবারই তাকে প্রথম দু-বারের মতো উদ্ধার করা হয় মরুভূমির গভীর থেকে। মরুভূমির ভিতর অতটা পথ একলা কি ভাবে পাড়ি দিয়েছিল সেটা একটা বিস্ময়! শেষ দুবারের মধ্যে একবার তাকে উদ্ধার করে এক যাযাবর গোষ্ঠী, আর দ্বিতীয়বার সে ধরা পড়ে আরব সেনাদের হাতে। ঘটনা চক্রে পরের দু-দুবারও সে যেখানে ধরা পড়ে তার কাছাকাছি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছিল বলেই জানিয়েছিল উদ্ধারকারীরা। এমন হতে পারে যে আসলে তিন তিন বারই তাকে একই জায়গা থেকে ওকে উদ্ধার করা হয়। আর এটা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে লোকটা পাগল হলেও ওই জায়গাটা সে চেনে। আমার পরিকল্পনা হল আমরা ওই অঞ্চলে পৌঁছে যুক্ত করে দেব তাকে, তারপর তাকে অনুসরণ করব। দেখা যাক সে আমাদের সেই মৃত নগরীতে পৌঁছে দেয় কিনা? যেখানে আছে আমার প্রাগৈতিহাসিক দানব বিছের জীবাশ্ম অথবা জীবন্ত জীবাশ্ম বলতে পারেন এ ব্যাপারে লোকটাকে নিয়ে একটা ফাটকা খেলছি আমি। অভিযান শেষে তাকে আবার ফিরিয়ে এনে তুলে দেব এখানকার এক মিশনারি সংস্থার হাতে। লোকটাকে বাকি জীবনের ভরণপোষণের জন্য ইতিমধ্যেই ওই সংস্থার হাতে আমি অর্থ তুলে দিয়েছি। সুদীপ্ত জানতে

চাইল,' কিন্তু ওই লোকটা কিসের টানে বারবার ওই মৃতনগরীতে ছুটে যায়? কি আছে ওখানে?'

ডক্টর বার্টন হেসে বললেন, 'এবার আপনি আসল প্রশ্নটা করলেন। লোকটার নানা অসংলগ্ন কথাবার্তায় সে নগরীতে তার বারবার ছুটে যাবার পিছনে এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। যার কিছুটা আরবের বিভিন্ন মরু যাযাবর গোষ্ঠীও বিশ্বাস করে। এমন কী ইওরোপের কিছু শিক্ষিত মানুষও ব্যাপারটা নিয়ে চর্চা করেন।'

'সেটা কি ব্যাপার?' সুদীপ্ত প্রশ্ন করল।

বার্টন বললেন, 'অদ্ভুত এক তত্ত্ব, অদ্ভুত এক ব্যাপার। আচ্ছা, আপনারা 'আব্দুল আলহাড্রেজ' বলে কারো নাম শুনেছেন?'

সুদীপ্তরা আর হেরম্যান এক সাথে বলে উঠল—'না'।

ডক্টর বার্টন বললেন, 'বহু যুগ আগে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আলহাড্রেজ এক গ্রন্থ রচনা করেন 'কিতাব আল আজিফ' নামে। যার অর্থ হল 'মরুভূমির শয়তান!' আলহাড্রেজ ১০ বছর টানা অভিযান চালিয়েছিলেন আরব-ব্যাবিলন মিশর মরুভূমিতে। সে সময় তিনি আরব মরুভূমিতে এক প্রাচীন নগরীর সন্ধান পান। যে নগরীর প্রস্তর গাত্রে নানা রকম প্রাচীন লিপির সন্ধান পান তিনি এবং তা পাঠোদ্ধারে সক্ষম হন। সে লিপিলগুলোতে বলা ছিল 'আদিম ভয়ঙ্করের' উৎপত্তির ইতিহাস ও সেই প্রাচীন নগরীতে ঘুমিয়ে থাকা সেই আদিম ভয়ঙ্কর বা শয়তানের আবাহন বন্দনা বা তাকে জাগিয়ে তোলার মন্ত্র। এ সব নিয়েই তিনি রচনা করেন তাঁর গ্রন্থ 'কিতাব-আল-আজিফ। এই বইটা লেখার পরই পাগল হয়ে যান আলহাড্রেজ। যে কারণে পরবর্তীকালে তিনি পরিচিত হন 'পাগলা আরব' নামে। কেউ কেউ বলে সেই আদিম শয়তান ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বি 'থুলু'-র প্রভাবেই নাকি তিনি পাগল হন। তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন থুলুকে এবং তিনি তার সাক্ষাৎ পান। তিনি থুলুর চেহারার বর্ণনাও দিয়েছেন। তাঁর থলথলে চেহারা, নখর যুক্ত হাত-পা। মাথাটা গোলাকার, অক্টোপাসের মতো অসংখ্য শুড় বেরিয়েছে তার মুখ মণ্ডল থেকে। টকটকে লাল ভয়ঙ্কর তার চোখ আর পিঠে আছে বাদুড়ের মতো বিশাল দুটো ডানা, যা শয়তানের থাকে। আদিম বৃদ্ধ সেই শয়তানের অনুচর হল দানব বিছেরা। থুলু নিজেও দানব বিছের রূপ ধারণ করতে পারেন। থুলুর নারকীয় কর্মকাণ্ডের গা ছমছমে কর্মকাণ্ডও সেই বইতে ব্যক্ত করেন আলহাড্রেজ। পরবর্তীকালে লাভক্রাফট নামক এক ভদ্রলোক এ বিষয় নিয়ে ইংরেজিতে এক গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম 'থুলু মিথস'। সেখানে তিনি আলহাড্রেজ-এর লেখা গ্রন্থটিকে চিহ্নিত করেন 'নেপ্রোনোমনিকন পুঁথি' নামে। যে পুঁথিতে ছিল আদিম ভয়ঙ্কর শক্তির আবাহন মন্ত্র। জানেন তো ইউরোপের বহু মানুষ যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তেমনই শয়তানের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী। শুধু ইওরোপ কেন পৃথিবীর অন্যান্য বহু মানুষও শয়তানের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন। একটা গুজব আছে যে আলহাড্রেজের লেখা শুল পুঁথিটি নাকি গোপনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গোপন প্রোকষ্ঠে সংরক্ষিত আছে। তা কাউকে দেখতে দেওয়া হয় না। আর একটা গুজব হল, সে পুঁথি নাকি লুকিয়ে রাখা আছে ভ্যাটিকানের মাটির গভীরে। সে পুঁথিতে লেখা মন্ত্রোচ্চারণ করলেই নাকি

জেগে উঠবে শয়তান। সে জন্যই নাকি এই গোপনীয়তার অবলম্বন। কথায় বলে ভগবান আর শয়তানের শক্তিও নাকি সমান সমান। তাই কেউ কেউ শয়তানকে জাগিয়ে তুলে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শয়তানের অপার্থিব শক্তির অধিকারী হতে চায়। ওই টিম্বারও তেমনই একজন লোক। সে নাকি আদিম বৃদ্ধ শয়তান থুলুকে জাগাবার মন্ত্র জানে। ওই প্রাচীন নগরীতেই নাকি ঘুমিয়ে আছেন থুলু। সে জন্যই লোকটা বার বার ছুটে যেতে চায় সেখানে।'

ডক্টর বার্টনের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল সুদীপ্তরা। হেরম্যান বার্টনকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি ওই ঘুমন্ত শয়তানের ব্যাপারটা বিশ্বাস করেন?'

বার্টন হেসে জবাব দিলেন, 'আমি না করলেও পৃথিবীর অনেক মানুষই শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তবে ওই নগরীতে সেই ঘুমন্ত শয়তান থাক বা না থাক আমরা সে জায়গাতে পৌঁছতে পারলেই হলো।'

বার্টনের কথা শুনতে শুনতে এক সময় হোটেলে পৌঁছে গেল সুদীপ্তরা। তাদের সেখানে নামিয়ে দিয়ে বার্টন ফিরে চললেন সেই অদ্ভুত বন্দিকে মুক্ত করার জন্য।

পরদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের মালপত্র নিয়ে হোটেল ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ল সুদীপ্তরা। ইতিমধ্যে ডক্টর বার্টনও হাজির হয়ে গেছেন তাঁর ক্যারভান নিয়ে। চারটে জিপের মতো দেখতে গাড়ি। তবে তা একটু উঁচু ধরনের। বালির মধ্যে চলার উপযোগী বড় বড় চাকা। বার্টনের সাথে যে কুলিরা এসেছে তারা সকলেই দীর্ঘ দেহী আরব। কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা দীর্ঘ আলখাল্লার মতো পোশাক। মাথায় কাপড়ের আচ্ছাদন ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। তিনজন লোকের কাঁধে রাইফেলও আছে। তেমনই এক রাইফেলধারীর সাথে একটা গাড়িতে নানা মালপত্রের মধ্যে টিম্বারকেও বসে থাকতে দেখল সুদীপ্তরা। তার মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা হয়েছে, দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে খাঁকি পোশাকও পরানো হয়েছে ভদ্রলোকের মতো। তবে তার চোখের দৃষ্টিতে ঘোলাটে ভাব আছে। সুদীপ্তদের দেখে ডক্টর বার্টন এগিয়ে এসে প্রথমে তাদের করমর্দন করলেন, তারপর টিম্বারকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন, 'ওকে আমাদের সথে নেব না। আমাদের কথা বলার অসুবিধা হতে পারে। তাছাড়া ওর কুলিদের হেফাজতে থাকাই ভালো। বলা যায় না লোকটা আমাদের কাছ থেকেও পালাবার চেষ্টা করতে পারে। যার পাশে ও বসে আছে তার নাম আবদুল্লা। ও লোকটাই কুলিদের সর্দার।'

হেরম্যান মৃদু হেসে বললেন, 'আপনার এই আরব সঙ্গীরা আসলে কুলি নাকি রক্ষী বাহিনী?'

ডক্টর বার্টনও হেসে জবাব দিলেন, 'দুটোই বলতে পারেন। মরুভূমিতে মরু দস্যুদের

উৎপাত আছে। তাই সঙ্গে অস্ত্র রাখে ওরা।' এ কথা বলার পর একটু চাপা স্বরে তিনি বললেন, 'এদের চেহারা শক্তপোক্ত হলেও ভূত-প্রেত-শয়তান-এ সব ব্যাপার এরা বিশ্বাস করে। ভয়ও করে। এরা অনেকেই মরুভূমিতে বিদেশিদের নিয়ে যায় বলে ইংরেজি বোঝে। এদের সামনে কথাবার্তা একটু সামলে বলবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদীপ্তদের মালপত্র তুলে ফেলা হলো একটা গাড়িতে। তারপর সুদীপ্ত আর হেরম্যান গিয়ে ডক্টর বার্টনের সাথে উঠে বসল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর প্রথমটাতে। ক্যারাভান রচনা হলো রাব-আল-খালির উদ্দেশ্যে।

শহর ছেড়ে রাস্তা সোজা ঢুকে গেছে মরুভূমির ভিতর। সেই রাস্তাই ধরল সুদীপ্তরা। হেরম্যান, বার্টনকে প্রশ্ন করলেন, 'কাল রাতে কোথায় ছিল আপনার বিছে মানুষ? সে কি নতুন কিছু জানাল?'

বার্টন বললেন, 'হোটেলে আমার ঘরেই ছিল। না, সে তেমন কিছু বলেনি। শুধু জানলা ধরে দাঁড়িয়ে এই মরুভূমির দিকে তাকিয়ে একবার জানতে চাচ্ছিল যে আমরা কখন আজ যাত্রা শুরু করব, আর অমাবস্যার মধ্যে আমরা সে নগরীতে পৌঁছতে পারব কিনা? আমাদের হোটেলের ঘরটা বেশ বড়। তার জন্য আমার পাশেই একটা খাটের ব্যবস্থা করেছিলাম। রাত দশটা নাগাদ বাতি নিভিয়ে দুটো খাটে শুয়েও পড়েছিলাম আমরা। মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছিল আমার। প্রথমে তাকিয়ে দেখি লোকটা খাটে নেই। তারপর দেখি টিম্বার খাট থেকে নেমে বিছের মতো তার সেই ভঙ্গিতে মেঝেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি মাঝ রাতে আধো অন্ধকার ঘরে তাকে ও ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে আমারও একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গিয়ে আশ্রয় নিল তার জন্য নির্ধারিত খাটের নিচে। বাকি রাতটা লোকটা সেখানেই কাটিয়েছে।' হেরম্যান মন্তব্য করলেন, 'দেখা যাক আপনার এই টিম্বার আমাদের নির্দিষ্ট জায়গাতে পৌঁছে দিতে পারে কিনা?'

নিজেদের মধ্যে নানা কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল সুদীপ্তরা। ক্রমশ দূরে সড়ে যেতে লাগল পিছনের ছোট্ট মরু শহর। তাদের যাত্রাপথে এক এক সময় যে উটের কাফেলা বা তৈলবাহী ট্যাঙ্কার গাড়িগুলো চোখে পড়ছিল তারা এক সময় হারিয়ে গেল, আর তারপর এক সময় শেষ হয়ে গেল রাস্তার। সামনে শুধু ধু-ধু মরুভূমি, আর তার মধ্যে জেগে থাকা ছোট বড় বালির পাহাড়। ইতিমধ্যেই সূর্যকিরণে বাইরের বাতাস তেতে উঠতে শুরু করেছে। গাড়ির ড্যাশ-বোর্ডে একটা কম্পাস বসানো আছে। সেটার ওপর নির্ভর করেই এই দিকচিহ্নহীন মরু সমুদ্রে যাত্রা শুরু করল সুদীপ্তরা। কিছুটা এগোবার পরই মরুভূমির আসল রুক্ষতা, আসল পরিবেশ মালুম হতে লাগল তাদের। গাড়িটার চারপাশ ক্যাম্বিসের পর্দা দিয়ে ঢাকা, কিন্তু তার ফাঁক গলেই গরম হলকা এসে লাগলে লাগল তাদের গায়ে। যেন বাইরের পৃথিবীটা ফার্নেসে রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিমধ্যে সুদীপ্তরা মাথায়-নাকে-মুখে কাপড় জড়িয়ে নিয়েছে, চোখে রোদ চশমাও পরেছে, তবু তাদের চোখ জ্বলতে শুরু করল, প্রতিটা প্রশ্বাসের সাথে গরম বাতাস যেন ফুসফুসে গিয়ে ধাক্কা মারতে লাগল। জিভ ভারী হয়ে কথাবার্তা কমে আসতে লাগল সুদীপ্তদের।

ডক্টর বার্টন একবার শুকনো হেসে বললেন, 'আশা করি মরুভূমির এই পরিবেশ আমরা দু-তিন দিনের মধ্যে মানিয়ে নিতে পারব। ভাবতে পারেন লক্ষ কোটি বছর আগে এখানে সমুদ্র ছিল! এই প্রাণহীন মরুভূমিই ছিল জীব জগতের প্রথম আঁতুড় ঘর! সত্যি প্রকৃতি আর সময়ের কী বিচিত্র খেয়াল! হয়তো বা আরও নশো কোটি বছর পর এই মরুভূমিই ঢেকে যাবে বরফের চাদরে!'

—এ কথাগুলো বলার পর বার্টন আর কোনো কথা বললেন না। গাড়ির উইন্ড স্ক্রিন দিয়ে তিনি চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। শুধু আরব গাড়ি চালকের মধ্যেই কোনো ভাবান্তর চোখে পড়ল না। সেটা তার এ পথে চলার অভ্যাসগত কারণেই। সুদীপ্তর যেন মনে হলো যে, গাড়ি চালাতে চালাতে লোকটা মাঝে মাঝে গুনগুন করে গানও করছে! প্রচণ্ড গরম আর গাড়ির দুলুনির জন্যই মনে হয় একটা আচ্ছন্ন ভাব সুদীপ্তদের ঘিরে ধরল। তাদের চোখ বুজে আসতে লাগল ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে বালি পাহাড়ের ঢালগুলো পেরোবার সময় প্রবল ঝাঁকুনিতে যখন সুদীপ্তর চোখ খুলে যেতে লাগল তখন তার মনে হতে লাগল গাড়িটা যেন একই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন একই দৃশ্য দেখছে। সেই একই দিকচিহ্নহীন মরুভূমি আর বালির পাহাড়। সেখানে সময় যেন থমকে গেছে!

সময় কিন্তু এগিয়ে চলল। বেলা গড়িয়ে দুপুর হলো, তারপর বিকাল। সুদীপ্তর সেই আচ্ছন্ন ভাবটাও যেন ধীরে ধীরে কেটে গেল। এক সময় থেমে গেল ক্যারাভান।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সবাই। একটা বালি পাহাড়ের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তারা। কিছুটা তফাতে একটা নিচু খাতের মতো জায়গাও আছে। চারপাশটা দেখে নিয়ে ডক্টর বার্টন বললেন এখানেই তাঁবু ফেলব আমরা।

তাঁবু খাটানো শুরু হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। বিছে মানুষ টিম্বার গাড়িতেই বসে আছে। বার্টনের পিছন পিছন সুদীপ্তরা গিয়ে দাঁড়াল সেই গাড়িটার সামনে। দূরে একটা বালিয়াড়ির দিকে তাকিয়ে আছে টিম্বার। বার্টন তাকে জিজ্ঞেস করলেন ; কি কেমন লাগছে? আমরা ঠিক দিকে এগোচ্ছি তো?'

প্রশ্ন শুনে আবছা একটা হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে। সে জবাব দিল ভালো। কিন্তু অমাবস্যার আগে আমরা সেখানে পৌঁছতে পারব তো?'

বার্টন জবাব দিলেন, তুমি নিয়ে যেতে পারলে পারব।

টিম্বার সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—'পারব।'—এ কথা বলে সে মনোনিবেশ করল দূরের সেই বালিয়ারির দিকে।

বার্টন হেরম্যান সুদীপ্তর উদ্দেশ্যে বললেন, 'ও যেদিকে তাকিয়ে আছে সেটাই কিন্তু আমাদের যাত্রাপথ।'

এরপর তাঁবু খাঁটানো, মালপত্র গাড়ি থেকে নামাবার তদারকি করতে লাগল সুদীপ্তরা। রোদের তেজ কমে আসতে শুরু করেছে। মৃদু হাওয়াও বইতে শুরু করল এক সময়। মরুভূমিতে দিনের এই সময়টাই সবচেয়ে মনোরম হয়। ঠান্ডা বাতাসে সুদীপ্তদের দেহমন যেন জুড়িয়ে যেতে লাগল। শেষ বিকালে মরুভূমির বুকে সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে

পড়তে লাগল। লালে লাল হয়ে উঠতে লাগল চারদিক। রুক্ষ মরুভূমি যেন বদলে যেতে লাগল অবর্ণনীয় স্বর্গীয় সৌন্দর্যে! এক জায়গাতে এক সাথে দাঁড়িয়ে ছিল সুদীপ্তরা। হতবাক হয়ে তারা তাকিয়ে রইল সে দৃশ্যর দিকে। হেরম্যান এক সময় মন্তব্য করলেন, 'কী সুন্দর পৃথিবী!'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এটাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দর জায়গা। আমার মহান প্রভু থুলুর আবাসস্থল।'

চমকে উঠল সুদীপ্তরা। টিম্বার কখন যেন গাড়ি থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পাশে! কিন্তু এরপর আর সে কোনো কথা বলল না। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে অন্যদিকে দাঁড়াল।

সূর্য ডুবে গেল। আর সূর্য ডোবার সাথে সাথেই ঠান্ডার চাদর যেন মুড়ে ফেলতে লাগল চারপাশ। মরুভূমির নিয়মটাই এই। দিনে যত গরম, রাতে তত ঠান্ডা নেমে আসে। খাওয়া সেরে নিজেদের তাঁবুতে শুয়ে পড়ল সুদীপ্তরা। তার আগে বার্টন এসে বলে গেলেন যে টিম্বারকে একটা তাঁবুতে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁবুর সামনে সারারাত একজন রক্ষী মোতায়ন থাকবে। বাইরে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়েছে আরব কুলিরা। তাকে ঘিরে বসে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করার জন্য সমবেত সঙ্গীত শুরু করল তারা। সুদীপ্ত যে ভাষা বুঝতে না পারলেও এক অদ্ভুত মূর্চ্ছনা আছে তাতে। তাঁবুর বাইরে থেকে ভেসে আসা সেই সঙ্গীত শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল সুদীপ্ত।

পরদিন ভোরবেলা যখন সুদীপ্তরা তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল তখনও শুকতারা মুছে যায়নি। যত দ্রুত সম্ভব যাত্রা শুরু করার কথা যাতে গরম কম লাগে। কিন্তু তারা বাইরে আসতেই মুখোমুখি হয়ে গেল বার্টনের। বার্টন উত্তেজিতভাবে বললেন, 'টিম্বার তাঁবুতে নেই!'

হেরম্যান বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি যে বলেছিলেন রক্ষী থাকবে তার তাঁবুর সামনে?'

বার্টন বললেন, 'ছিল তো। সে তাকে তাঁবুর বাইরে বেরোতে দেখেনি। অথচ সে নেই!' এই বলে তিনি রক্ষী-কুলি সর্দার আবদুল্লাকে নিয়ে এগোলেন সেই তাঁবুটার দিকে। সুদীপ্তরা অনুসরণ করল তাদের।

তাঁবুর পর্দাটা একবার উঠিয়ে দেখা হলো। তার ভিতরটা সত্যিই শূন্য। যে লোকটা তাঁবু পাহারার দায়িত্ব ছিল সে এখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে সে হলফ করে বলল সে রাতে সে ঘুমায়নি আর টিম্বারকে বাইরে বেরোতেও দেখেনি। তাহলে কোথায় গেল লোকটা?

বার্টন চিন্তিতভাবে প্রথমে বললেন, 'এমন তো হবার কথা নয়!' তারপর তিনি আবদুল্লার উদ্দেশ্যে বললেন, 'চারটে গাড়ি নিয়ে চারদিকে যেতে হবে। হয়তো এখনও সে বেশি দূর যেতে পারেনি।'

আবদুল্লা নির্দেশ পালনের জন্য এগোতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় ছোট্ট তাঁবুটার পিছনে কিছুটা তফাতে বালি হঠাৎ নড়ে উঠল। তারপর বালির তলা থেকে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করল একটা শাখা, তারপর ধীরে ধীরে হাত-পা। সবাইকে অবাক করে বুকে হেঁটে বালি

থেকে বেড়িয়ে উঠে দাঁড়াল বার্টন। তারপর এগিয়ে এসে সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে বলল ; তাঁবুর ভিতর গরম লাগছিল তাই ঠান্ডা বালির নিচে ঘুমিয়ে ছিলাম।'

বার্টন বললেন ; তুমি তাঁবুর বাইরে বেরোলে কি ভাবে?'

সে জবাব দিল, 'বালির তলা দিয়েই বেরোলাম।'

তার তাঁবু থেকে অদৃশ্য হবার উপায়টা এবার বুঝতে পারল সুদীপ্তরা।

লোকটা এরপর বার্টনের উদ্দেশ্যে বলল, 'চলো চলো নইলে দেরি হয়ে যাবে। অমাবস্যার আগে আমাকে সেখানে পৌঁছতেই হবে।'

তার তাড়া দেওয়া দেখে হেসে ফেললেন বার্টন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁবু উঠিয়েই রচনা হব আমরা।'

সুদীপ্তরা এরপর ফিরতে শুরু করল নিজেদের তাঁবুর দিকে। সে দিকে হাঁটতে হাঁটতে আবদুল্লা বার্টনকে প্রশ্ন করল', এ লোকটা কি জেলে বন্দি ছিল?' বার্টন জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

আবদুল্লা বলল, 'এ লোকটা যে আমাদের সঙ্গী হবে তা আগে জানানো উচিত ছিল।'

বার্টন প্রশ্ন করলেন, 'কেন?'

আবদুল্লা জবাব দিল, 'ওকে চোখে না দেখলেও ওর কথা শহরের অনেক লোক শুনেছে। আমিও শুনেছি। আমার পরিচিত একজন লোক জেলখানায় চাকরি করে। সে আমাকে বলেছে ও নাকি আসলে মানুষ নয়, ও শয়তানের শাকরেদ।' ও সঙ্গে আসবে জানলে আসতাম না।' কথাটা শুনে বার্টন মুর্হূতের জন্য একবার সুদীপ্তদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবদুল্লাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, 'না, তেমন কোনো ব্যাপার নয়। ওর মাথায় একটু গণ্ডগোল আছে তাই মাঝে মাঝে একটু অদ্ভুত আচরণ করে। সামনে লোকটা নিরীহ। ওর সম্বন্ধে ওসব কথা ঠিক নয়। আবদুল্লা বার্টনের কথার কোনো জবাব না দিলেও তার মুখ দেখে বোঝা গেল যে, সে বার্টনের কথা শুনে ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সে অন্য পাশে চলে যাবার পর বার্টন হেরম্যানকে বললেন, 'আবদুল্লার অমন দানবের মতো চেহারা, কিন্তু এ সব ব্যাপারে ওর যথেষ্ট আতঙ্ক আছে।' তাঁবু তোলা হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। সুদীপ্তরা যখন যাত্রা শুরু করল এখন সবে সূর্য উঠতে শুরু করেছে। আলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে মরুভূমির বুকে। সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে চলল সুদীপ্তরা। আর তার সাথে সাথেই মাথার ওপরে সূর্যদেব ও স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন, তেতে উঠতে লাগল বালি, আগুনের হলকা ছড়াতে শুরু করল বাতাস। সুদীপ্তদের যাত্রাপথের পাশেই হঠাৎ একটা উটের কঙ্কাল চোখে পড়ল। সেটা দেখিয়ে বললেন, 'এই কঙ্কালটাই হয়তো একদিন ফসিলে পরিণত হবে। বালি ঝড়ের নিচে এক সময় চাপা পড়ে যাবে এই কঙ্কালটা। তারপর ধীরে ধীরে মাটির আরও নিচে চলে গিয়ে একদিন পরিণত হবে পাথরে। আমরা এখন এই পৃথিবীতে থাকব না, হয়তো বা মানুষ বলেই কোনো জীব থাকবে না সেই লক্ষ বছর পরে কিন্তু এই কঙ্কালটা রয়ে যাবে। জানেন আমি ক্যালিফোর্নিয়ার এক জায়গাতে তিরিশ কোটি বছর আগের বৃষ্টিপাতের ছবি দেখেছি। মানুষ তখন কোথায়? তার আবির্ভাবতো মাত্র বিশলক্ষ বছর

আগে। সেই তিরিশ কোটি বছর আগে সবে ডাইনোসরদের আবির্ভাব হয়েছে। সেই আদিম পৃথিবীতে ওই ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে কোনো একদিন হয়তো কিছু সময়ের জন্য প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টিপাতের ফলে কাদা মাটিতে আঁকা হয়ে ছিল বৃষ্টির ফোঁটার ছাপ। তারপর প্রকৃতির খেয়ালে আর বৃষ্টি হল না সেখানে। কাদা মাটি ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে পাথরে পরিণত হলো। পাথরের ক্যামেরাতে আঁকা হয়ে রইল সেই আদিম বৃষ্টিপাতের ছবি।'

যাত্রাপথে মাঝেমাঝেই বার্ধনের কাছ থেকে ফসিল সম্পর্কে নানা তথ্য শুনে চলল সুদীপ্তরা। এ বিষয় যে তার যথেষ্ট পণ্ডিত্ব আছে তার কথা শুনে বুঝে নিতে অসুবিধা হলো না সুদীপ্তদের। বার্টনের কথাই এদিন সুদীপ্তদের যাত্রাপথের একঘেয়েমি অনেকটা দূর করে দিল। গত দিনের মতোই বিকালবেলা এ দিনের মতো যাত্রা শেষ হল। মরুভূমির একটা বেশ গভীর খাতের পাশে গাড়ি থেকে নামার পর তাঁবু খাটাবার প্রস্তুতি শুরু হল।

কুলির দল তাঁবু খাটাচ্ছে আর খাতটার সামনে দাঁড়িয়ে বার্টন সেদিকে তাকিয়ে সুদীপ্ত আর হেরম্যানকে বোঝাচ্ছিলেন—'এই খাতটা এক সময় নিশ্চিত নদীখাত ছিল। কেমন গভীর আর দীর্ঘ দেখেছেন! খাতের দু-পাশের দেওয়ালগুলো যদি খোঁড়া যায় তবে স্তরে স্তরে বিভিন্ন প্রাণীর ফসিল মিলবে। এমন কি জলজ ডাইনোসরের ফসিলও মিলে যেতে পারে। বহু দানব জলচরের ফসিল উদ্ধার হয়েছে মরু অঞ্চল থেকে। আকারে তাদের কেউ কেউ তিমি মাছের চেয়েও বড় ছিল।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন বার্টন। বিছে মানুষ টিম্বার আসছে তাদের দিকে।

সামনে এসে দাঁড়াল টিম্বার। তার চোখের ঘোলাটে ভাবটা যেন অনেক কেটে গেছে। সুদীপ্তরা সেই মৃত নগরীর দিকে যত এগোচ্ছে তত যেন চনমনে হয়ে উঠছে সে। বার্টন তাকে কিছু বলার আগেই সে বলল, 'তোমাদের কারো কাছে একটা বোতল বা কৌটো হবে। ছোট কৌটো?'

বার্টন বললেন, 'আছে, কিন্তু তুমি তা দিয়ে কি করবে?'

প্রশ্ন শুনে টিম্বার ডান হাতটা তার খাকি পোশাকের বুকের ভিতর ঢুকিয়ে সেখান থেকে একটা জিনিস বার করে এনে সুদীপ্তদের দেখাবার জন্য তার হাতের তালুতে মেলে ধরল একটা কাঁকড়া বিছে! নড়ছে প্রাণীটা। লেজের পিছনে হুলটা ওপরে ওঠানো। মরু ভূমির এই কাঁকড়া বিছে স্যান্ড ভাইপারের মতোই ভয়ঙ্কর। এর এক দংশনেই শেষ হয়ে যায় আস্ত একটা মানুষ! আঁতকে উঠল সুদীপ্তরা। বার্টন বলে উঠলেন, 'এটা কে কোথা থেকে পেলে! ফেলে দাও, এখনই ফেলে দাও।' টিম্বার বলল, 'গাড়ির ভিতরে উঠেছিল। খুব সুন্দরপ্রাণী তাই না? ও আমাকে কিছু করবে না। ওকে পুষব আমি।' হেরম্যানও বললেন, 'ওকে ফেলে দাও তুমি। যে কোনো মুহূর্তে ও হুল বসিয়ে দেবে। তুমি বাঁচবে না।'

টিম্বার বলল, 'না, ও কিছু করবে না আমাকে। আমরা দু-জনের দেবতাই মহান থুলুর ভক্ত। ও তো আমার বুকেই ছিল এতক্ষণ? —এই বলে সে বিছেটাকে আবার বুকের

ভিতর ঢোকাতে যাচ্ছিল কিন্তু তা দেখে বার্টন বললেন, 'না, না, ওখানে নয়, আমি কৌটো নিয়ে আসছি।'

বার্টন ছুটে গিয়ে একটা ছোট কৌটো নিয়ে এলেন। টিম্বার প্রাণীটাকে কৌটোতে ভরে পকেটে রাখল। তারপর হেসে বলল ; ধন্যবাদ, আর একটা কথা, আমার জন্য তাঁবুর দরকার নেই, আমি বালির নিচেই থাকব। ভয় নেই পালাব না। নাহলে অমাবস্যার আগে পৌঁছতে পারব না সেখানে। কথাগুলো বলে চলে গেল টিম্বার।

হেরম্যান মন্তব্য করলেন, 'সত্যি লোকটা অদ্ভুত!'

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই রঙের খেলা শুরু হল বালিয়াড়িতে। আগের দিনের মতোই তন্ময় ভাবে প্রকৃতির সেই রঙের খেলা দেখল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। অন্ধকার নামার পর খাওয়া সেরে তাঁবুতে ঢুকল তারা। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'রাতটা একটু সাবধানে কাটিও। ভূত-প্রেত অবদেবতার অন্য নয়। ওই রকম একটা কাঁকড়া বিছে যদি তাঁবুতে ঢোকে তবে সর্বনাশ!' একটা ব্যাটারি লণ্ঠন জ্বেলে তাঁবুর আনাচে কানাচে ভালো করে একবার দেখে নিয়ে তারপর শুয়ে পড়ল সুদীপ্তরা।
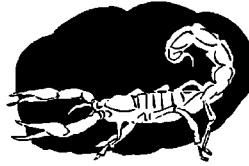
তৃতীয় দিনও আগের দিনের মতোই সূর্যোদয়ের মুহূর্তেই যাত্রা শুরু হল। বিছে মানুষ টিম্বার আগের রাতের মতোই ঘুমিয়ে ছিল বালির তলায়। এদিন অবশ্য তাকে ডাকতে বা খুঁজতে হয়নি। যাত্রা শুরুর আগে নিজেই সে বালি ছেড়ে উঠে এসেছিল। যাত্রা শুরুর সময় বার্টন বললেন ; সম্ভবত আজ বিকাল বা আগামীকাল ভোরেই যাত্রা শুরু করার পর সে জায়গার কাছাকাছি পৌঁছে যাব আমরা। কম্পাসে চোখ রেখে এগিয়ে চলল গাড়ি। এদিন যেন গরমটা আগের মতো অতটা গায়ে লাগছে বলে সুদীপ্তদের মনে হল না। অথচ বাইরের তাপমাত্রা দুপুরবেলা প্রায় পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আসলে এ দু দিনে পরিবেশের সঙ্গে বেশ খানিকটা মানিয়ে নিয়েছে তারা। দুপুর নাগাদ এক দীর্ঘ বালি খাতের মধ্যে পৌঁছে গেল তারা। তার মধ্যে দিয়েই চলতে শুরু করল গাড়ি। সে জায়গাটা দেখে বার্টন মন্তব্য করলেন, 'খাতটা যা চওড়া ও দীর্ঘ তাতে মনে হয় বিরাট কোনো নদী প্রবাহিত হত এখান থেকে। হয়তো বা সে নদী আমাজন, রাইন বা গঙ্গার থেকেও দীর্ঘ ছিল। তারপর প্রকৃতির পরিবর্তনের কারণে জল প্রবাহের উত্তম মুখ বন্ধ হয়ে প্রথমে হলো বদ্ধ জলা, তারপর হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত জলাও শুকিয়ে গেল একদিন। মরুভূমি হয়ে গেল জায়গাটা, শুধু লক্ষ কোটি বছরের চিহ্ন হিসাবে রয়ে গেল এই খাতটা।'

দু-পাশে বালির পাহাড়। গাড়ি কখনও উপরে উঠছে, আবার কখনও নীচে নামছে। এক সময় বালির আড়াল থেকে উঁকি মারতে লাগল ছোট-বড়, নানা আকৃতির প্রস্তর

খণ্ড। বার্টন বললেন, 'আমার মনে হয় সে জায়গার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, কারণ ও জায়গার এমনই বিবরণ শুনেছিলাম আমি, সেখান থেকে টিম্বারকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

তার কথা শেষ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। কি ব্যাপার? ড্রাইভার জানালো যে লুকিং গ্লাসে দেখছে যে পিছনের গাড়িটা হাত দেখিয়ে তাকে থামতে বলছে।

গাড়িটা থামার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনের গাড়িটা পাশে এসে দাঁড়াল। যে গাড়িতে টিম্বারকে সঙ্গে নিয়ে বসে আছে আবদুল্লা। বার্টন তার উদ্দেশ্যে জানতে চাইল, 'কি হল?'

সে কিছু উত্তর দেবার আগেই টিম্বার বলল, 'আর এগোবার দরকার নেই, আমরা পৌঁছে গেছি।'

'পৌঁছে গেছি?'

'হ্যাঁ, এটাই মহান থুলুর সাম্রাজ্যের প্রবেশ দ্বার। আমার প্রভুর রাজ্যে আপনাদের স্বাগত' বলে উঠল বিছে মানুষ টিম্বার। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সুদীপ্তরা। চওড়া খাতটা এখানে আরও বিস্তীর্ণ। নানা দিকে শিরা-উপশিরার মতো বিভক্তও হয়েছে সেখান থেকে। খাতের দু-পাশে কোথাও বালির পাহাড় আবার কোথাও কোথাও জেগে আছে বিরাট বিরাট পাথর। বার্টন চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'এ জায়গা যে ফসিলের যাদুঘর তা দেখেই অনুমান করতে পারছি। খাতের দেওয়ালগুলো একটু খুঁড়লেই তার গা থেকে বেরিয়ে আসবে বিভিন্ন জলজ প্রাণীর ফসিল। ইউরিপুটেরাসের ফসিল ও পাওয়া যেতে পারে।'

হেরম্যান হেসে বললেন, 'তবে আমরা কিন্তু এসেছি জ্যান্ত ইউরিপুটেরাসের খোঁজে।'

গাড়ি থেকে টিম্বার নামতেই তাকে ঘিরে দাঁড়াল সুদীপ্তরা। বার্টন তাকে বললেন, 'তুমি ঠিক চিনতে পারছে তো জায়গাটা?'

টিম্বার জবাব দিল, 'হ্যাঁ। আমি আগে এসেছি এখানে। এই সেই জায়গা। মহান থুলুর দর্শন এবার আমাকে পেতেই হবে, পেতেই হবে. . .।' কথাগুলো বলে ইশারায় সুদীপ্তদের তাকে অনুসরণ করতে বলে সে হাঁটতে শুরু করল বালি খাত বেয়ে। তার পিছন পিছন এগোন সুদীপ্তরা। বেশ কিছুটা এগোবার পর সে খাতের গায়ের একটা বেশ বড় পাথরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পাথরটার অর্ধেকটা বালিতে ঢাকা পড়ে আছে। সে দু-হাত দিয়ে সরাতে শুরু করল বালিগুলো। ধীরে ধীরে পাথরের গায়ে ফুটে উঠতে লাগল একটা ছবি। হেরম্যান আর সুদীপ্তও হাত লাগল তাকে সাহায্য শুরু করল তাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বালি সরে গিয়ে পাথরের গায়ে ফুটে উঠল একটা কাঁকড়া বিছের আবছা ছবি! আকারে অন্তত সেটা তিন ফুট হবে! কে ছবি একে রাখল এই পাথরের বুকে? বার্টন তার পোশাকের ভিতর থেকে একটা ব্রাশ বার করে পাথরটার গায়ে বোলাতে শুরু করলেন ছবিটাকে আরও ভালো করে ফুটিয়ে তোলার জন্য। কাজটা করতে করতেই তার মুখটা যেন বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। এরপর তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'এটা ছবি নয়! ছবি নয়!'

হেরম্যান বললেন, 'তবে কি ফসিল?'

বার্টন উল্লসিত ভাবে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফসিল। এও এক দানব কাঁকড়াবিছা টেরিগোটাসের ফসিল। ইউরিপুটেরাসের সময় কালেই এদের দেখা মিলত। এরাও আট-ন ফুট লম্বা হতো। লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে এ ফসিল আমি দেখেছি। এখানে পা রেখেই যে এমন কিছু দেখব আমি ভাবিনি। ফসিলটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে।' এই বলে তিনি তাকালেন টিম্বারের দিকে।

টিম্বারের মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছে। সে বলল, 'এগুলো আমার প্রভুর চিহ্ন। প্রভুর অনুচররা ঘুমিয়ে আছে পাথরের মধ্যে। আমার প্রভু যেদিন জেগে উঠবেন, সেদিন এরাও ঘুম ভেঙে পাথরের বুক থেকে বেরিয়ে নামবে। এর চেয়ে আরও অনেক বড় পনেরো হাত, বিশ হাত প্রাণীও ঘুমিয়ে আছে পাথরের গায়ে। তারা একটা দাঁড়ার চাপে একটা মানুষকে দু-টুকরো করে ফেলতে পারে। আমি দেখেছি তাদের . . .

বার্টন বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় দেখেছ তাদের?'

টিম্বার জবাব দিল, 'যে নগরীতে প্রভু ঘুমিয়ে আছেন সেখানে পাথরের দেওয়ালে ঘুমিয়ে আছে তারা। মহান থুলু জেগে উঠলে তারাও জেগে উঠবে। তাদের দিয়েই এ পৃথিবী শাসন করবেন থুলু। আর আমি হব তাঁর প্রধান ভৃত্য।'

হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, 'প্রভুর সব অনুচররা কি ঘুমিয়েই আছে? জীবন্ত কেউ নেই?'

হেরম্যানের কথা শুনে চমকে উঠে বার্টন তাকালো হেরম্যানের দিকে। তারপর প্রশ্ন করল, "তুমিও কি 'নেক্রোনসিকন', কিতাব আল আজিফ' পড়েছ?'

হেরম্যান বললেন, 'না, ও বইয়ের নাম শুনেছি, পড়িনি।'

বিছে মানুষ প্রশ্ন করল, 'তবে কেন, এ প্রশ্ন করলে?'

হেরম্যান বললেন, 'মরুভূমির যাযাবররা অনেকে এই গল্প বলে। কেউ কেউ নাকি চোখের সামনে সেই দানবকাঁকড়া বিছেকে বালির নিচে মানুষ টেনে নিয়ে যেতে দেখেছে বলে শুনেছি!'

কথাটা শুনে টিম্বারের ঠোঁটের কোণে আবারও কেমন যেন একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। তবে সে আর কোনো কথা বলল না হেরম্যানের উদ্দেশ্যে।

বার্টন এরপর টিম্বারকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আমাদের নিয়ে যাবে তো সে নগরীতে? যেখানে তোমার দেবতা ঘুমিয়ে আছেন?' সেই নগরী কত দূর?

একটু চুপ করে থেকে বিছে মানুষ বলল, 'পারব। এক রাত লাগবে সেখানে পৌঁছতে। কিন্তু তোমরা কি আমার মতো বুকে হাঁটতে পারবে?'

হেরম্যান বললেন ; হ্যাঁ পারব। কিন্তু পা থাকতে বুকে হাঁটব কেন?'

টিম্বার বলল, 'পায়েও হাঁটতে হবে, বুকেও হাঁটতে হবে। নইলে মহান থুলু যেখানে ঘুমিয়ে আছেন ঠিক সে জায়গাতে পৌঁছনো যাবে না। সেখানেও সবাই বুকে হাঁটে।'

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'সবাই মানে কারা?'

টিম্বার বলল, 'মহান থুলুর উপাসক বিছে মানুষরা। যারা তার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা তাঁর ঘুম ভাঙাতে পারবে না। কারণ, আমি জানি কিতাব আল আজিফ'

এ লেখা আছে যে একজন সাদা মানুষ ঘুম ভাঙাবে মহান থুলুর। কিন্তু তারা সাদা মানুষ নয়। 'আমি সেই সাদা মানুষ।'

এরপর সে যেন কেমন সন্দিগ্ধ ভাবে একবার হেরম্যান, আর একবার বার্টনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউ সেই সাদা মানুষ নয়তো? নইলে তোমরা আমাকে জেল থেকে মুক্ত করে এখানে আনলে কেন?'

বার্টন সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'না, না, আমাদের দু-জনের কেউ সেই সাদা মানুষ নই। 'কিতাব-আল-আজিফ' আমরা পড়িনি। তোমার মুখ থেকেই আমরা এই সাদা মানুষের ব্যাপারটা প্রথম শুনলাম। আমরা শুধু এখানে এসেছি পাথরের গায়ে আঁকা দানব কাঁকড়া বিছের খোঁজে।'

তার কথা শুনে বিছে মানুষ মনে হয় একটু আশ্বস্ত হলো। সে প্রথমে স্বগোতক্তি করল, 'হ্যাঁ, সে পুঁথি তোমাদের পড়ার কথা নয়।' তারপর বলল, 'কিন্তু সেই মৃত নগরীতে গিয়ে যদি তোমরা আর ফিরে না আসো? সাদা মানুষের ব্যাপারটা সেখানের লোকরাও জানে। তাই তারা পছন্দ করে না সাদা লোকদের। তাদের বিশ্বাস, সাদা মানুষদের প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে একদিন অবশেষে তাদের আহ্বানেই জেগে উঠবেন আদিম মহাবৃদ্ধ দেবতা মহান থুলু।'

সুদীপ্ত তার কথা শুনে সেগুলো তার অসংলগ্ন প্রলাপ কিনা বুঝতে পারল না। কিন্তু সে বলে উঠল, 'কিন্তু তুমিও তো সাদা চামড়ার মানুষ?'

বিছে মানুষ বলে উঠল, 'সে জন্যই তো আমি প্রথমবার এসে প্রবেশ করতে পারলাম না দেবতার উপসনা স্থলে। সেখানে পৌঁছবার জন্য কিছু উপকরণের প্রয়োজন ছিল আমার। যেখানে সেগুলো রাখা ছিল যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন সময় পেরিয়ে গেল। আমাকেও দেখে ফেলল ওরা। পালিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে হল আমাকে। আচ্ছা অমাবস্যাটা কবে?'

বার্টন জবাব দিলেন, 'আগামী পরশু। মাঝে আর দুই রাত বাকি।'

বিছে মানুষ বিড় বিড় করে বলল, 'তার মধ্যেই আমাকে পৌঁছতে হবে সেখানে। পৌঁছাতেই হবে . . .।

বার্টন সম্ভবত এরপর তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় দূর থেকে আবদুল্লার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'সাহেবরা জলদি এদিকে আসুন, জলদি।'

নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে! আবদুল্লার ডাক শুনে বালি খাতের মধ্যে দিয়ে সুদীপ্তরা সঙ্গে সঙ্গে এগোল সেদিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আবার ফিরে এলো গাড়িগুলোর কাছে সেখানে আবদুল্লা আমাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সে জায়গায়। আবদুল্লা একটু উত্তেজিত ভাবে বেশ দূরের একটা বালি পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখুন!'

সুদীপ্তরা তাকাল সেদিকে। একটা কালো রেখা যেন দেখা যাচ্ছে সেখানে। রেখাটা নড়ছে।'

হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, 'কি ওটা?'

আবদুল্লা বলল, 'একটা কাফেলা! একদল লোক! এদিকেই আসছে!'

বার্টন বললেন, 'ওরা কারা?'

আবদুল্লা জবাব দিল, 'হয় মরু যাযাবর, নয় মরুদস্যু। এ জায়গার একটু বদনাম আছে। তাই অন্য লোক এদিকে আসে না।'

সুদীপ্তর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়েছিল বিছে মানুষ টিম্বার। সে যেন সে দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে নিজের মনেই বলে উঠল, 'তারা কি তবে এর মধ্যেই খবর পেয়ে গেল যে সাদা মানুষ পা রেখেছে মহান থুলুর রাজত্বে? আমরা তো ওদিকেই যাব।'

কথাটা অন্য কারো কানে না গেলেও সুদীপ্তর কানে যেতেই সে ফিরে তাকাল বিম্বারের দিকে। স্পষ্ট উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে।

বার্টন, আবদুল্লাকে প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের কি করণীয়?'

আবদুল্লা জবাব দিল, 'আমাদেরও বন্দুক আছে। ওরা যদি দস্যু হয় তবে লড়াই দেব। তাছাড়া অন্য কিছু করার নেই। আর যাযাবররাও অনেক সময় এসে এটা দাও—ওটা দাও' বলে দাবি করে। বিশেষত জল আর শুকনো খাবার চায় ওরা। সেটাও এক ধরনের ডাকাতি। তেমন হলেও বাঁধা দিতে হবে। আমরা এখন যেখানে এসেছি সেখানে জল সোনার চেয়েও দামি।'

এ কথা বলার পর একটু থেমে আবদুল্লা বলল, 'অবশ্য আর একটা কাজ করা যেতে পারে। গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া যেতে পারে।'

কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই বিছে মানুষ বলে উঠল, 'তোমরা গেলে যাও। আমি এখানেই লুকিয়ে থাকব। ওরা যেদিক থেকে আসছে সেদিকেই যেতে হবে আমাকে। অন্য কোথাও চলে গেলে আমি হয়তো ঠিক সময় সে জায়গায় পৌঁছতে পারব না।'

তার কথা শোনা মাত্রই বার্টন বলে উঠলেন, 'না, আমরা এখানেই থাকব। দেখা যাক ওরা কারা? তারপর যা হবার তা হবে।'

সেই কালো রেখাটা ক্রমশ চওড়া হয়ে এগিয়ে আসছে। এক সময় বোঝা গেল সত্যিই সেটা একটা উঠের কাফেলা। বালি পাহাড়ের আড়াল থেকে বেড়িয়ে খাত বেয়ে সুদীপ্তদের দিকে এগিয়ে থামতে লাগল মরুভূমির আগন্তুকরা।

আবদুল্লার নির্দেশে প্রথমে পাশাপাশি সারা বেঁধে দাঁড় করানো হল চারটে গাড়িকে। প্রতিটা গাড়ির বনেটে উঠে দাঁড়াল একজন করে রাইফেলধারী কুলি। আর জনা চারেক রাইফেল হাতে আশ্রয় নিল খাতের গায়ে বড়বড় পাথরের আড়ালে। যাতে তেমন কিছু হলে তারা আড়াল থেকে গুলি চালাতে পারে। আর বাকি লোকজন সমেত সুদীপ্তরা খাতের একটা প্রশস্ত অংশে দাঁড়িয়ে লোকগুলোর আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। এক সময় সুদীপ্তদের বেশ কাছাকাছি চলে এল দলটা। গোটা পনেরো উট। তার পিঠে সওয়ারি আর নানা লটবহর। কাফেলাটা কাছাকাছি আসতেই আবদুল্লা বলল, 'যাযাবরই মনে হচ্ছে। সঙ্গে জেনেনা আছে দেখছি! তবুও সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।'

সুদীপ্তও খেয়াল করল সত্যিই কয়েকটা উঠের পিঠে মহিলা আর বাচ্চাকাচ্চা আছে!

তবুও আবদুল্লার সতর্ক থাকার কথা শুনে সুদীপ্ত একবার নিজেদের অবস্থা বোঝার

জন্য চারপাশে লোকজনদের দিকে তাকাল। আবদুল্লা কাঁধ থেকে তার রাইফেল হাতে নিয়েছে। সুদীপ্তদের অনেকেরই হাত তাদের কোমরবন্ধনিতে গোঁজা বাঁকানো ছুরির বাঁটে। ঠিক সেই সময় সে আর একটা জিনিস খেয়াল করল। বিছে মানুষ টিম্বার তাদের সঙ্গে নেই। কোথায় যেন সে উবে গেছে! সুদীপ্ত ব্যাপারটা বলতে যাচ্ছিল হেরম্যানকে কিন্তু তার আগেই হুড়মুড় করে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল দলটা। উটের পিঠে বসে থাকা লোকগুলোর মাথায় পাগড়ি, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে পরনে লম্বা ঝুলের পোশাক। মরুভূমির প্রখর তাপ থেকে বাঁচার জন্য প্রায় প্রত্যেকের মুখেই কাপড় জড়ানো। তবে তাদের পোশাক আশাক সবই নোংরা বিবর্ণ। কয়েকটা উটের পিঠ থেকে আবার পশু চর্মের তাঁবু বা চামড়ার জলের থলি ঝুলছে। সুদীপ্তরা যেমন লোকগুলোকে দেখে অবাক হয়েছে তেমনই উটের পিঠে বসে থাকা লোকগুলোর চোখগুলো দেখে মনে হচ্ছে তারাও বেশ অবাক হয়েছে সুদীপ্তদের দেখে। বার্টন আবদুল্লাকে বললেন, 'তোমাকেই দোভাষীর কাজ করতে হবে। কারণ! আমরা ওদের ভাষা বুঝব না।'

সুদীপ্তদের একদম সামনে যে উটটা এসে দাঁড়িয়েছে তাতে মাত্র একজন লোক বসে। সে তার মুখের কাপড়টা উন্মোচন করল। লোকটা বৃদ্ধ। রোদে পোড়া মুখে অসংখ্য বলি রেখা। ধুলো মাথা সাদা দাড়ি। সম্ভবত এ লোকটাই কাফেলার দলপতি। বিস্মিত ভাবে সে দেখতে লাগল সুদীপ্তদের। আবদুল্লা তাকে প্রশ্ন করল, 'তোমরা কারা?'

লোকটা জবাব দিল, 'আমরা মরু যাযাবর।' তারপর পালটা প্রশ্ন করল, 'তোমরা কারা?'

আবদুল্লা জবাব দিল, 'আমরা শহর থেকে আসছি। সাহেবদের এ জায়গা দেখাতে এসেছি।'

জবাব শুনে মনে হয় আশ্বস্ত হল লোকটা। উটটার হাঁটু মুড়িয়ে সে মাটিতে বসাল। তারপর উটের পিঠ থেকে নেমে সুদীপ্তদের সামনে এসে দাঁড়াল। কাফেলার অন্য উটগুলো কিন্তু একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

হেরম্যান আবদুল্লাকে বললেন, 'ওরা কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে জানার চেষ্টা করো। এ তল্লাটের খবর পাওয়া যেতে পারে এদের থেকে?' আবদুল্লা যাযাবর সর্দারকে প্রশ্ন করল, 'তোমরা কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাচ্ছ?'

প্রশ্ন শুনে সর্দার লোকটা বলল, 'ওই পশ্চিম থেকে আসছি, পুবে যাব। এ তল্লাট ছেড়ে যাচ্ছি আমরা।'

'ছেড়ে যাচ্ছ কেন?'

বৃদ্ধ যাযাবর সর্দার জবাব দিল, 'বিছে মানুষরা আবার বেড়িয়ে পড়েছে! মানুষ ধরতে বেড়িয়ে পড়েছে। তাই পালাচ্ছি আমরা। ওরা মানুষ টেনে নিয়ে যায়।'

হেরম্যান আবদুল্লার মাধ্যমে জানতে চাইলেন ; ওরা মানুষ টেনে নিয়ে যায় কি ভাবে?'

লোকটা বলল, 'ওরা বালির নীচে থাকে। ধরো তুমি বালির ওপর দাঁড়িয়ে আছো। হঠাৎ বালি সরে যাবে। ওরা দাঁড়া দিয়ে চেপে ধরবে তোমার দুটো পা। তারপর তোমাকে

টেনে নিয়ে যাবে বালির নীচে।'

সুদীপ্তরা বেশ আশ্চর্য হল লোকটার কথা শুনে। যারা বালির নীচে মানুষ টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারা তবে কারা? সেই দানব কাঁকড়া বিছে নাকি দাঁড়া অলা মানুষ? কিন্তু মানুষের দাঁড়া থাকবে কি ভাবে?'

আবদুল্লার মাধ্যমে যাযাবর সর্দারের কাছ থেকে ব্যাপারটা বুঝে নিতে যাচ্ছিলেন হেরম্যান। ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল। যাযাবর সর্দারের দৃষ্টি দিয়ে পড়ল কিছুটা তফাতে মাটির ওপর। সর সর করে বালি সরে যাচ্ছে সেখান থেকে, আর তারপরই সেখান থেকে উঁকি মারল টিম্বারের মাথা। সুদীপ্ত বুঝতে পারল যে যাযাবরদের আসতে দেখে তাদের পরিচয় বুঝতে না পেরে টিম্বার লুকিয়ে পড়েছিল বালির নীচে। কিন্তু তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেই যাযাবর বৃদ্ধ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, 'বিছে মানুষ! বিছে মানুষ বলে। তারপর এক লাফে উটের পিঠে উঠে উটটাকে দাঁড় করিয়ে প্রচণ্ড আতঙ্কে তাকে ছোটাতে শুরু করল সুদীপ্তদের পাশ দিয়ে। অন্য উটগুলোও অনুসরণ করল তাকে। আবদুল্লা-সুদীপ্ত-হেরম্যানরা অনেক ডাকাডাকি করেও আর ফেরাতে পারল না তাদের। আতঙ্কিত যাযাবররা বালির ঝড় তুলে কিছুক্ষণের মধ্যে মরুভূমিতে হারিয়ে গেল।

হেরম্যান বললেন, 'তাহলে কি বিছে মানুষদের ব্যাপারটা কী সত্যি? টিম্বারকে দেখে নইলে এত ভয় পেল কেন ওরা?'

টিম্বার বালি ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়াল সুদীপ্তদের সামনে। তারপর জানতে চাইল, 'যাযাবরের কি বলে গেল?'

বার্টন তাকে জানালেন সে কথা।

হেরম্যান টিম্বারকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা বিছে মানুষদের কাঁকড়ার মতো দাঁড়া থাকে?'

টিম্বার এ প্রশ্নর কোনো জবাব দিল না। শুধু বলল, 'অন্ধকার নামলেই ওদিকে রওনা হব।'

বার্টন বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে।'

টিম্বার এরপর হাঁটতে শুরু করল অন্য দিকে। সুদীপ্ত খেয়াল করল সবাই যেন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বেলা পড়ে আসছে। সুদীপ্তরা বড় একটা বালির ঢিপির আড়ালে বসে খাওয়া সাড়তে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে এসে হাজির হল আবদুল্লা। সে বার্টনের উদ্দেশ্যে একটু ইতস্তত করে বলল, 'একটা সমস্যা হয়েছে সাহেব। কুলি আর ড্রাইভাররা আর এগোতে চাচ্ছে না।'

'এগোতে চাচ্ছে না কেন? সবাইকেই তো আগাম পুরো টাকা দেওয়া হয়েছে।' —বলে উঠলেন বার্টন।

আবদুল্লা বলল, 'ব্যাপারটা টাকা পয়সার নয়। টাকা ওরা ফিরিয়ে দিতে রাজি, কিন্তু

কিছুতেই ওরা এক-পা এগোবে না ওদিকে। যাযাবর সর্দারের কথা ওরা শুনেছে। তার ওপর আপনারা যাকে সঙ্গে এনেছেন তাকে দেখে যাযাবরদের পালানোর ব্যাপারটা দেখেছে। এ দুটো ব্যাপার আমার সঙ্গীদের মনে প্রচণ্ড আতঙ্কর সৃষ্টি করেছে। তাদের অনুমান আমাদের ওই সঙ্গীও বিছে মানুষ অথবা প্রেতাত্মা। সে আমাদের নিয়ে গেলে আমরা কেউ আর ফিরব না।'

তার কথা শুনে বার্টন বললেন, 'তেমন হলে আমরা ক-জনই ও পথে রওনা হব। জোর করে কুলিদের সেদিকে নিয়ে গেলে লাভের থেকে বেশি ক্ষতি হতে পারে। একটা গাড়ি নিয়ে নিজেরাই চালাব।

আবদুল্লা বলল, তবে আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গী হব। কারণ, আমি কথা দিয়েছিলাম আপনাদের সাথে থাকব বলে।' কথাগুলো বলে আবদুল্লা চলে গেল অন্য দিকে। আর এরপরই সেখানে হাজির হলো বিছে মানুষ।

বার্টনকে টিম্বার বলল, 'সেই রঙটা দাও।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'কিসের রঙ?'

বার্টন বললেন, 'ও সঙ্গে কিছুটা কালো রঙ আনতে বলেছিল সেটাই চাচ্ছে।'

বার্চন এরপর টিম্বারকে নিয়ে এগোলেন জিনিসটা তাকে দেবার জন্য। রঙের খেলা শুরু হয়ে গেছে মরুভূমির বুকে। সবকিছু ভুলে সুদীপ্ত তাকিয়ে দেখতে লাগল অপূর্ব সুন্দর সেই দৃশ্য।

রঙের খেলা শেষ হয়ে মরুভূমিতে অন্ধকার নামতে শুরু করল। অন্ধকারের চাদরে মুড়ে গেল মরুভূমি। একটা গাড়িতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া হল। চাঁদ উঠল এক সময়। নখের কতো সরু চাঁদ। আর দু-দিন বাদেই যে অমাবস্যা, সেই চাঁদ ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সামনে হাজির হলো টিম্বার। এতক্ষণ যেন সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছিল। তাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল সুদীপ্তরা। সব পোশাক সে খুলে ফেলেছে। পরনে শুধু লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরো কাপড়া পরা। মুখে, সারা দেহে এমন কি কাপড়ের টুকরোটাতেও সে কালো রঙ মাখিয়ে নিয়েছে। তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গাড়িতে ওঠার আগে সে সুদীপ্তর দিকে তার সেই বিছের কৌটোটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এটা তুমি তোমার কাছে এখন রাখো। আমার তো পকেট নেই। চাইলে দিয়ে দেবে।' সুদীপ্ত একটু ইতস্তত করে কৌটোর মুখটা ভালো করে বন্ধ করা আছে নাকি তা দেখে নিয়ে সেটা পকেটে পুরলো।

বিছে মানুষ টিম্বার উঠে বসল ড্রাইভিং সিটের পাশে। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলেন ডক্টর বার্টন। পিছনে সুদীপ্ত হেরম্যান আর আবদুল্লা। গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করলেন বার্টন।

গাড়ির কাছাকাছি তাদের বিদায় জানাবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছিল কুলি ও ড্রাইভারের দল। তারা যেন একযোগে মাথা নিচু করে কী বলতে শুরু করল। সুদীপ্ত তাই দেখে আবদুল্লাকে প্রশ্ন করল, 'ওরা কি বলছে?'

আবদুল্লা বলল, 'ওরা ওপর অলার কাছে প্রার্থনা করছে যাতে আমরা নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারি সে জন্য।'

গাড়ির হেড লাইট জ্বলে উঠল। যাত্রা শুরুর সময় বিছে মানুষ টিম্বার বলল, 'আমি যে ভাবে গাড়ি চালাতে বলব সে ভাবেই যেন গাড়ি চলে। নইলে বিপদ হবে।'

বার্টন বললেন, 'হ্যাঁ, সে ভাবেই গাড়ি চলবে। চিন্তা নেই।

আবছা আলোতে বালি খাতের মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি। খাতের দু-পাশে বালির প্রাচীর। তার গায়ে মাঝে মাঝে উঁকি মারছে ছোট-বড় পাথর খণ্ড। আকাশের বুকে যে চাঁদ জেগে আছে তার আলো পৃথিবীর বুকে প্রায় আসছে না বলা চলে। গাড়ির হেডলাইটই চলার পথে ভরসা। চওড়া খাটটার গা বেয়ে বেরিয়েছে আরও নানা খাত। সেগুলো বেশ সঙ্কীর্ণ। মাত্র ফুট পনেরো-কুড়ি চওড়া সেগুলো। ঘণ্টা তিনেক চলার পর টিম্বারের নির্দেশে তেমনই একটা খাতে প্রবেশ করল সুদীপ্তদের গাড়ি। খাতটা যেন ক্রমশ ঢালু হয়ে এগিয়েছে সামনের দিকে। অজস্র শাখা-প্রশাখা তার। মাকড়সার জালের মতো তার এঁকে বেঁকে চলে গেছে নানা দিকে। বড় খাতটা দিয়ে ঘণ্টা তিনেক চলার পর বিছা মানুষ একটা সংকীর্ণ খাতের মুখে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। সেখানে খাতের গায়ে জেগে আছে একটা পাথর। সুদীপ্তরাও নেমে পড়ল তার সাথে। বিছে মানুষ বলল পাথরটার গায়ে গাড়ির আলো ফেলো। আলো ফেলা হলো। টিম্বার সে পাথরের গা থেকে বালি ঝাড়তেই তার গায়ে ফুটে উঠল একটা কাঁকড়াবিছের ছবি। টিম্বার সেটা দেখে আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'রাস্তা চিনতে ভুল হয়নি আমার। এবার এই মরু খাতটা ধরতে হবে।'

সেই মতো আবার গাড়িতে উঠে পথ চলা শুরু হলো সেই সংকীর্ণ খাত ধরে। বিছে মানুষের নির্দেশ মতোই সে খাতের গলি ঘুঁচি বেয়ে বিভিন্ন বাঁক নিয়ে সুদীপ্তরা এগিয়ে চলল। চলতে চলতে হেরম্যান এক সময় সুদীপ্তকে চাপাস্বরে বললেন, 'আমরা ক্রমশ মরুভূমির সাধারণ ভূমিস্তর ছেড়ে নীচের দিকে এগোচ্ছি। দেখছ বালি খাতের দু-পাশের দেওয়ালের উচ্চতা ধীরে ধীরে কেমন বেড়ে চলেছে!'

চলার পথে আরও বার কয়েক সুদীপ্তদের গাড়ি থামাতে হলো বিছে মানুষ টিম্বারের কথামতো। কখনও একলা সে গাড়ি থেকে নেমে আবার কখনও বা সুদীপ্তদের সঙ্গী করে খাতের গায়ে পাথরের গায়ে আঁকা চিহ্ন দেখে গন্তব্য নির্ধারণ করল। সে সব পাথরের গায়ে বিছের ছবি আঁকা। সুদীপ্তরা তাদের যাত্রা শুরু করেছিল চাঁদ ওঠার পর সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। পাঁচ ঘণ্টা পর রাত বারোটা নাগাদ টিম্বারের নির্দেশে এক জায়গাতে থামল সুদীপ্তরা। সে জায়গার বেশ কিছুটা আগে থেকেই খাতের এক পাশের গা থেকে উঁকি দিতে শুরু করেছে পাথুরে দেওয়াল। সেই দেওয়াল প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু। ভূমিস্তর থেকে এতটাই নীচে নেমে এসেছে সুদীপ্তরা।

গাড়ি থেকে নামল সকলে। বিছে মানুষ বলল, 'এবার মহান থুলুর নগরীতে পা রাখতে চলেছি আমরা। গাড়ি আর যাবে না। আমি যে ভাব চলব সে ভাবেই তোমরা অনুসরণ করবে আমাকে।'

আবদুল্লা বলল, 'গাড়ি আর যাবে না কেন? রাস্তা তো রয়েছে সামনে?'

তার কথা শুনে আবছা হাসল বিছে মানুষ টিম্বার। সে বলল, 'একটা ছোট কাপড় থাকলে দাও।'

হেরম্যান সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে রুমাল বার করে এগিয়ে দিলেন তার দিকে। টিম্বার একটা খুব ছোট্ট পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে তার একপ্রান্তে বাঁধল পাথরটা। গাড়ির হেড লাইট জ্বালানোই আছে। তার আলোতে সামনের রাস্তার বেশ কিছুটা অংশ আলোকিত। টিম্বার পাথরের টুকরো বাঁধা সেই রুমালটা ছুড়ে দিল কিছুটা তফাতে রাস্তার ঠিক মাঝখানে। প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না তারপরই দেখা গেল রুমালটা আস্তে আস্তে যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে! সুদীপ্ত বলে উঠল—'চোরাবালি!'

বিছে মানুষ টিম্বার বলল, 'হ্যাঁ, চোরাবালি। মহান থুলুর মৃত নগরী ঘিরে রেখেছে এই অদৃশ্য মৃত্যু ফাঁদ। এই নগরীর সন্ধানে এসে কত মানুষ যে এর নিচে হারিয়ে গেছে তার হিসাব নেই। আমি যে ভাবে পা ফেলবে সে ভাবেই চলবে।'

টিম্বারকে অনুসরণ শুরু করল তারা। পাথরের দেওয়ালের পা ঘেসে টিম্বার সাবধানে পা ফেলে হাঁটছে। কখনও থমকে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করছে, তারপর আবার হাঁটছে। মাঝে মাঝে বাঁকও নিচ্ছে সে। ক্রমশ সংকীর্ণ খাতটার গোলোক ধাঁধায় প্রবেশ করতে লাগল তারা। পাথরের দেওয়ালগুলোর গায়ে জেগে আছে অসংখ্য ছোট-বড় গর্ত। তার ভিতর জমাট বাঁধা অন্ধকার। রাত বেড়ে চলল ক্রমশ, তার সাথে এগিয়ে চলল সুদীপ্তরা সেই মৃত নগরীর দিকে। চলার যেন বিরাম নেই। সুদীপ্তর এক এক সময় মনে হতে লাগল এই অন্ধকার মরুখাতে যেন সে এমন ভাবেই যুগ যুগ ধরে হেঁটে চলেছে। শেষ রাতে অবশেষে বিছে মানুষ থামল। বার্টনকে সে বলল, 'আলো জ্বালাও।'

একটা টর্চ জ্বালালেন বার্টন। টিম্বার সেই টর্চটা হাতে নিয়ে আলো ফেলল পাথরের দেওয়ালের গায়ে। বেশ বড়বড় গর্ত কিছুটা তফাতে তফাতে চলে গেছে দেওয়ালের গা বেয়ে। সুদীপ্তদের দেখে মনে হল যে গর্তগুলো প্রাচীন হলেও যেন প্রাকৃতিক নয়। মানুষের হাতে গড়া গোল নিটোল গর্ত। হেরম্যান তা দেখে প্রশ্ন করলেন, 'এগুলো কিসের গর্ত?'

টিম্বার জবাব দিল, 'ওগুলো বিছে মানুষদের যাওয়া আসার পথ।'

টর্চটা নিয়ে একটার পর একটা গর্তর গায়ের বালি ঝেড়ে সেগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল টিম্বার। মাঝে মাঝেই দেওয়ালের গায়ে ফুটে উঠছে বিছের ছবি। এক সময় একটা গর্তের পাশের দেওয়ালের গায়ে বালি ঝাড়তেই বেড়িয়ে এল দুটো বিছের ছবি। দু-পাশের দুটো বিছে যেন তাদের দেহের পিছনের অংশ ওপর দিকে তুলে ধরে ঘিরে রেখেছে গর্তটাকে। সেটা দেখার পর টিম্বার সুদীপ্তদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এ পথেই আমি মহান থুলুর আবাসস্থলে পৌছে ছিলাম, আবার এ পথেই পালিয়েছিলাম।

আমি প্রবেশ করব এ পথে। তোমরা কি যাবে? এখানে একবার তোমরা ঢুকলে আর নাও ফিরে আসতে পারো। যদি আমি মহান থুলুর প্রধান সেবক না হতে পারি তবে বিছে মানুষরা হত্যা করবে তোমাদের। বিশেষত সাদা মানুষদের উৎসর্গ করবে মহান দেবতা থুলুর উদ্দেশ্যে।' কথাগুলো শুনে একটু থমকে গেল সুদীপ্তরা। বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা। মৌনতা ভঙ্গ করে এক সময় হেরম্যান বললেন, 'মৃত্যু তো যে কোনো সময় নেমে আসতে পারে জীবনে। এত দূর যখন এসেছি তখন শেষ না দেখে ফিরব না। যার সন্ধানে আমরা এসেছি তাকে দেখার পর যদি মৃত্যুও হয় তবে তেমন আফশোস থাকবে না।'

বিছে মানুষ এরপর প্রশ্ন করল, 'এ পথে যেতে হলে কিন্তু আমার মতো বিছে মানুষ হতে হবে? পারবে তো?'

বার্টন বললেন, 'অর্থাৎ, বুকে হাঁটতে হবে তো? পারব।'

আধো অন্ধকারে আবছা একটা হাসি যেন ফুটে উঠল বিছে মানুষ টিম্বারের মুখে। সে বলে উঠল, 'আচ্ছা চলো তবে। হে পৃথিবীর অধীশ্বর মহান থুলু, তোমার ঘুম ভাঙাবার জন্য, পৃথিবীতে তোমার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার সেবক প্রবেশ করছে তোমার আবাসে। তুমি আমাদের রক্ষা করো।'—এই বলে সে প্রবেশ করল সেই গর্তর মধ্যে। একে একে তাকে অনুসরণ করল অন্যরা। ঠিক যে সময় সূর্যদয়ের প্রত্যাশাতে মরুভূমির আকাশে শুকতারা ফুটে উঠল ঠিক সে সময় সেই সুড়ঙ্গর অন্ধকারে প্রবেশ করল সুদীপ্তরা।

সুড়ঙ্গর ভিতরটা কী ঠান্ডা। মাটি থেকে ছাদের উচ্চতা খুব বেশি হলে চার ফুট হবে। যেন এক ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীতে প্রবেশ করেছে সবাই। হেঁটে চলার কোনো উপায়ই নেই। দেওয়াল, ছাদগুলো এবড়ো খেবড়ো হলেও মেঝেটা মসৃণ। নইলে বুক ছিঁড়ে যেত সবার। বিছে মানুষ টিম্বারকে অনুসরণ করে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল সুদীপ্তরা। তবে টিম্বারের মতো হাত আর বুকে ভর দিয়ে অত দ্রুত চলতে পারা সম্ভব নয় অন্যদের পক্ষে। কিছুটা করে এগিয়ে টিম্বারকে তাই মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে সুদীপ্তদের জন্য। প্রধান সুড়ঙ্গ থেকে আরও নানা সুড়ঙ্গ বেড়িয়েছে নানা দিকে। ছোট অথবা একই আকারের সুড়ঙ্গ। সুদীপ্তদের সকলের কাছেই টর্চ আছে। চলতে চলতে মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালাতে বলছে টিম্বার। টর্চের আলোতে সুড়ঙ্গগুলোর প্রবেশ মুখের গায়ের দেওয়ালে ফুটে উঠছে কাঁকড়া বিছের ছবি। তা দেখে কোন পথে যেতে হবে তা নির্ধারণ করছে টিম্বার। একটানা বুকে হেঁটে দীর্ঘক্ষণ চলা যায় না। তাই মাঝে মাঝে উঠে বসে জিরিয়ে নিতে হচ্ছে সুদীপ্তদের। তারপর আবার চলা। এভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটতে লাগল ভূগর্ভস্থ সেই সুড়ঙ্গ পথে। বাইরে সূর্য অনেক আগেই উঠে মাঝে আকাশে যাত্রা শুরু করেছে। সে আগুন বৃষ্টি করছে মরুভূমির বুকে। অথচ সুড়ঙ্গর ভিতরে কী ঠান্ডা! অন্ধকার। সত্যিই যেন মৃত পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে তারা।

শুধু চলা, আর মাঝে মাঝে বিশ্রাম। মাঝে মাঝে দেওয়ালের গায়ে আঁকা ছবি দেখে নতুন সুড়ঙ্গে বিছে মানুষের পিছন পিছন প্রবেশ করেছে সুদীপ্তরা। হেরম্যান এক সময়

বিছে মানুষকে প্রশ্ন করলেন, 'সুড়ঙ্গগুলোর মুখের পাশে সবই তো একই রকম কাঁকড়া বিছের ছবি! তবে তুমি রাস্তা চিনছ কি ভাবে?'

টিম্বার জবাব দিল, 'চিনছি ওদের হুল দেখে। ছবিগুলো একই মনে হলেও আসলে একই নয়। লেজের পিছনের উঁচিয়ে ধরা হুলটা আঙুলের মতো পথ নির্দেশ করছে, রাস্তা দেখাচ্ছে। হুল যদি খাড়া ওপরের দিকে থাকে তবে সে সুড়ঙ্গ ওপরে উঠে গেছে, পিছনে ফেরানো থাকলে সুড়ঙ্গর শেষ প্রান্তে রাস্তা বন্ধ, নীচের দিকে থাকলে মাটির আরও গভীরে নেমেছে সুড়ঙ্গ, আর সুড়ঙ্গর মুখের দিকে তর্জনীর মতো থাকলে সেটাই আমাদের পথ।'

কতক্ষণ তারা চলছে তার হিসাব ছিল না সুদীপ্তর। এক সময় ঘড়ির দিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। পাঁচটা বাজে! অর্থাৎ সারাটা দিন সুড়ঙ্গর মধ্যেই কেটে গেছে তাদের! বাইরের মরুভূমিতে এতক্ষণে নিশ্চই বিদায়ী সূর্যের রঙের খেলা শুরু হয়েছে! এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সুড়ঙ্গ বেয়ে একটা ছোট খাটো ঘরের মতো জায়গায় প্রবেশ করল তারা। অনেকক্ষণ পরে সেখানে ঢুকে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ আরাম বোধ করল সকলে। বুকে হেঁটে আর বসে সারা দিন কেটেছে। দাঁড়াবার সুযোগ তারা পায়নি। উঠে দাঁড়িয়ে সুদীপ্তরা আড়মোড় ভাঙার পর বিছে মানুষ বলল, 'আলো জ্বালাও। এখানেই সেবার জিনিসগুলো লুকিয়ে রেখে গেছিলাম।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এক সাথে চারটে টর্চের আলো ছড়িয়ে পড়ল জায়গাটাতে। বেশ বড় ঘরের মতো জায়গাটা। পাথুরে দেওয়াল, পাথুরে ছাদ। সে ছাদ অন্তত পনেরো ফুট উঁচু হবে। মাথার ওপর ছাদের ঠিক নীচেই চার দেওয়ালে চারটে বেশ বড় গর্ত আছে। সম্ভবত ও পথে ওপর থেকে ঘরে প্রবেশ করা যায়। বার্টনের টর্চের আলো ঘুরতে ঘুরতে এক সময় থমকে দাঁড়াল এক পাশের দেওয়ালের গায়ে। সেখানে খোদিত আছে বিশাল এক কাঁকড়া বিছের মূর্তি। তার আকার অন্তত আট ফুট হবে। সেটা দেখে বার্টন এগিয়ে গেলেন সেখানে। তারপর সেটা পরীক্ষা করে উল্লসিত ভাবে চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে এ যে খুনে বৃশ্চিক ইউরিপুটেরাসের সামিল! এটা ছবি নয়! এর সন্ধানেই তো এসেছি আমি!' এরপর তিনি আনন্দে প্রায় নাচতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে বিছে মানুষ বলে উঠল, 'চুপ চুপ। এর চেয়েও অনেক বড় আকারের ও জিনিস এখানে আপনি দেখবেন। আমরা এখন নগরীর একদম ভিতরে প্রবেশ করেছি। শব্দ শুনে বিছে মানুষরা এখনই ছুটে আসবে। আমরা কেউ প্রাণে বাঁচব না। একদম চুপ।

কথাটা শুনে বার্টন থেমে গেলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি বিস্মিত ভাবে হাত বোলাতে লাগলেন দেওয়াল গাত্রের সেই ফসিলের ওপর। ঘরের মতো জায়গাটার মেঝেতে ছড়িয়ে আছে পুরু বালির রাশি। টর্চের আলোতে তার একটা কোণের বালির সরাতে শুরু করল টিম্বার। কিছুক্ষণের মধ্যেই বালির নীচ থেকে বেড়িয়ে এল অদ্ভুত কয়েকটা জিনিস। কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো খাঁজকাটা ধারালো বেশ বড় দুটো ধতব দাঁড়া আর একটা কাঁকড়া বিছের হুলের মতো তীক্ষ্ণ বেশ বড় ধাতব হুল! হেরম্যান জিনিসগুলো ভালো করে

দেখার জন্য পিঠের কিট ব্যাগ থেকে একটা ইলেকট্রিক লণ্ঠন বার করে সেটা জ্বাললেন। বিছে মানুষ টিম্বার প্রথমে দু-পায়ের পাতা একসাথে করে সেই ধাতব হুলটার মধ্যে পায়ের পাতা দুটো ঢুকিয়ে নিল। তারপর গ্লাভসের মতো দু-হাতে ধাতব দাঁড়া দুটো পড়ে শুয়ে পড়ে দেহের পিছনের অংশটা ওপর দিকে তুলে ধরল। কালো রঙ মাথা বিছে মানুষের দেহ, দু-হাতে বিরাট দাঁড়া, হুলটা পিছনের দিকে এমন ভাবে তুলে ধরল সে, যেন সে সত্যি একটা কাঁকড়া বিছে! সুদীপ্তরা তাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে তাঁর ধাতব হুল সমেত দেহের পিছনের অংশ অর্থাৎ কোমড় থেকে পা পর্যন্ত অংশটাকে পিছনের দিকে শূন্যে তুলে রাখল। বহুক্ষণ পর আবার যেন কেমন অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে। কিন্তু এরপর আবার সবকিছু তার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল। পা-টা নামিয়ে হাতের দাঁড়া দিয়ে জোড়া পা এর পাতা থেকে তীক্ষ্ণ ধারালো হুলটা খুলে ফেলল সে। তবে হাতের দাঁড়া দুটো সে খুলল না। ডক্টর বার্টন তখনও আচ্ছন্ন হয়ে আছেন দেওয়ালের গায়ে সেই ফসিলটার প্রতি। বিছে মানুষ টিম্বার তার উদ্দেশে বলল, 'বার্টন এবার আমার কথা শুনুন।'

বার্টন ফিরে তাকালেন বিছে মানুষের দিকে।

বিছে মানুষ বলল, 'কালই তো অমাবস্যার রাত তাই না?'

বার্টন জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

বিছে মানুষ বলল, 'এ দুটো রাত এখানেই লুকিয়ে থাকতে হবে তোমাদের। আজকের রাত আর কালকের দিন রাত। ঘড়ি দেখে নিশ্চয়ই তোমরা দিন রাতের হিসাব বুঝতে পারবে। আজ রাতে অবশ্য আমি তোমাদের সাথেই থাকব, কিন্তু কাল রাতে থাকবে না। পরশু ভোরের মধ্যে যদি আমি না ফিরি তবে বুঝবে মৃত্যু হয়েছে আমার। যে পথে এসেছ সে পথেই তোমরা ফিরে যাবে তবে। সুড়ঙ্গর মাটিতে আমাদের বুকে হাঁটার চিহ্ন আছে ফিরতে তোমাদের অসুবিধা হবে না।'

হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের ফেলে কোথায় যাবে তুমি?'

বিছে মানুষ একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, 'এখানে যে বিছে মানুষ আছে তাদের মাঝে। তাদের কাছ থেকে মহান থুলুর সেবকের আসন ছিনিয়ে নিতে হবে আমাকে। যদি আমি আমার কতৃত্ব এখানে প্রতিষ্ঠা করতে পারি তবে তোমাদের মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হবে।

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'কি ভাবে তোমার অধিকার এখানে প্রতিষ্ঠা করবে তুমি?'

বিছে মানুষ টিম্বার এ প্রশ্নর কোনো উত্তর দিল না। শুধু তার হাতে পরা দাঁড়া দুটো দিয়ে পরস্পরের সাথে ঠোকা দিল। দুটো ধাতব দাঁড়ার সংঘর্ষে মৃদু ঝনঝন শব্দ উঠল।

বিছে মানুষ টিম্বার এরপর বলল, 'তোমরা এখানে থাকো। আমি এবার একটু বাইরে যাব। কাছেই একটা ফোকোর আছে। সেখান দিয়ে নীচে তাকালে মহান থুলুর উপাসনাস্থল দেখা যায়। আমি দেখে আসি বিছে মানুষরা সেখানে কি করছে?'

হেরম্যান বললেন, 'আমরা যাব তোমার সঙ্গে?'

টিম্বার বলল, 'এতোজন নয়। বিছে মানুষরা দেখে ফেলতে পারে আমাদের। যাযাবর

সর্দারতো বলছিল তারা শিকার ধরতে বেরিয়েছে বাইরে।

হয়তো সে দলটা এখনও ফেরেনি। তাদের মুখোমুখি হয়ে যেতে পারি আমরা। এক সাথে এতগুলো মানুষ এখন লুকাতে পারব না। এ পথেই ফিরবে তারা। তবে একজন আমার সাথে যেতে পারো। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে আবার ফিরে আসব।'

সুদীপ্ত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'তবে আমি তোমার সাথে যাব।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার বুকে হেঁটে সে ঘরের বাইরে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল বিছে মানুষ টিম্বার আর সুদীপ্ত। টিম্বারের হাতে দাঁড়া দুটো পরা। এক হাতে সে হুলটাকে ধরে রেখে কখনও অন্য হাতে ভর দিয়ে অদ্ভুত কৌশলে বুকে হেঁটে চলেছে। সে হাতের ধাতব দাঁড়ার সাথে মেঝের ঠোকায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। তাকে অনুসরণ করছে সুদীপ্ত। বেশ কিছুটা চলার পর হঠাৎই একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল তারা। ধাতব ঝনঝন শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল টিম্বার। কাছে পিঠে হঠাৎই যেন শুরু হল তীব্র ধাতব ঝনঝনানি। বিছে মানুষ টিম্বার বলে উঠল ; এ হল বিছে মানুষদের দাঁড়ার শব্দ! লুকিয়ে পড়ো।' এই বলে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যেন অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল সে। টর্চ জ্বালাতে ভরসা হল না সুদীপ্তর। কোথায় লুকাবে সে? সেই ঝনঝন শব্দ যেন চারদিক থেকে ছুটে আসছে। পিছন ফিরে সুদীপ্ত দ্রুত বুকে হেঁটে এগোতে লাগল সেই ঘরের দিকে যেখানে হেরম্যান আছেন। সুড়ঙ্গ দিয়ে ঘরের মুখে পৌঁছে গেল সুদীপ্ত। কিন্তু ঘরে ঢোকা হল না তার। ঘরের মতো যে জায়গাটাতে হেরম্যানের বাতিটা এখনও জ্বলছে সেই আলোতে সুদীপ্ত দেখতে পেল ঘরের মতো জায়গাটারা মাথার ওপরের ফোকর গলে নিচে লাফিয়ে নামছে একের পর এক প্রায় উলঙ্গ কালো কালো মানুষ! তাদের হাতে কাঁকড়া বিছের মতো ভয়ঙ্কর ধাতব দাঁড়া। তারা ঘিরে ধরেছে হেরম্যান, বার্টন আর আবদুল্লাকে। বিছে মানুষ!

সুদীপ্ত এরপর দেখল তারা একটা দড়ি বার করে বন্দি করার চেষ্টা করছে তাদের তিনজনকে! সুদীপ্ত বুঝতে পারল ঘরে ঢুকলে সেও সঙ্গে সঙ্গে বন্দি হবে বিছে মানুষদের হাতে। এখন আর হেরম্যানদের মুক্ত করার বা কারোরই বাঁচার পথ খোলা থাকবে না। ঝনঝন শব্দ উঠছে বিছে মানুষদের দাঁড়া থেকে। বীভৎস সেই শব্দ। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে হিংস্রতা। মুহূর্তর মধ্যে নিজের কর্তব্য স্থির করে নিল সুদীপ্ত। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগল সে। অন্ধকার দেওয়াল হাতড়ে একটা সুড়ঙ্গর মুখ দেখতে পেয়ে তার মধ্যে সুদীপ্ত আত্মগোপন করল। সেখান থেকেই সে শুনতে পেল ঘরের মতো সে জায়গা থেকে বড়িয়ে দাঁড়ার ঝনঝন শব্দ করতে করতে সুড়ঙ্গ পথ ধরে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে বিছে মানুষদের দল। এক সময় সুড়ঙ্গ পথে সে শব্দ ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল।
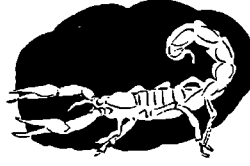
বিছে মানুষরা যে অমন আচম্বিতে হানা দেবে হেরম্যানরা তা অনুমান করতে পারেননি। দেওয়ালের গায়ে ফসিলটা দেখে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন জীবাশ্মবিদ বার্টন। সেই দেওয়ালের সামনে তিনি হেরম্যানকে ডেকে নিয়ে দানব বিছেটার সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলেন তাকে। ঠিক তখনই মাথার ওপরের চারদিকের দেওয়ালের গর্ত থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে এল তারা। কালো কালো সব মানুষ, পরনে কৌপিনের মতো নামমাত্র পোশাক। তাদের দুই হাতে ধারালো ধাতব দাঁড়া। আবদুল্লা তার কাঁধের রাইফেল খুলে নিয়ে প্রতিরোধের একটা চেষ্টা করতে যাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু একজন বিছে মানুষ তার দাঁড়া দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল তার মাথায়। সে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। বিছে মানুষরা তাদের ভয়ঙ্কর দাঁড়া উঁচিয়ে ঘিরে ধরেছে হেরম্যানদের। প্রতিমুহূর্তেই একজন করে বিছে মানুষ লাফিয়ে নামছে ঘরের মতো জায়গাটাতে। ঝনঝন-ঝমঝম শব্দ হচ্ছে তাদের দাঁড়ার। হেরম্যান বুঝতে পারলেন এদের বাঁধা দেবার চেষ্টা করলে বিছে মানুষরা তাদের হিংস্র দাঁড়াগুলো দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে সবাইকে। তাই আত্মসমর্পণ করাই ভালো। পরে যা হবার তাই হবে। হেরম্যান বার্টনকে বললেন, এখন বাঁধা দেবেন না, ওরা যা করতে চাচ্ছে করতে দিন।' হেরম্যানদের দিক থেকে আর বাঁধা আসছে না দেখে বিছে মানুষরা বুঝতে পারল বন্দিরা বশ্যতা স্বীকার করেছে। তারা হেরম্যান আর বার্টনকে শুয়ে পড়তে ইঙ্গিত করল। আবদুল্লা তো আগেই পড়ে ছিল মাটিতে। হেরম্যান আর বার্টন নির্দেশ পালন করলেন তাদের। তারা শুয়ে পড়ার পর তাদের তিনজনের গলাতেই ঘাসের দড়ির ফাঁস পড়িয়ে দেওয়া হলো। তারপর বুকে হেঁটে সে জায়গা ছেড়ে হেরম্যানদের নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে এগোল বিছে মানুষরা।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ। হেরম্যানদের আগে পিছে চলেছে বিছে বাহিনী। অন্তত জনা কুড়ি লোক হবে তারা। পাথরের গায়ে তাদের দাঁড়ার ঘর্ষণে ঝমঝম শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দে মুখরিত অন্ধকার সুড়ঙ্গ। বিছের দল তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা জানা নেই হেরম্যানদের। বন্দিদের নিয়ে একটার পর একটা সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে চলেছে তারা। কখনও সুড়ঙ্গ বেয়ে ওপরে উঠছে আবার কখনও নীচে নামছে। হেরম্যানরা একটু কেউ দম নেবার জন্য কয়েক মুহূর্ত থামলেই টান পড়ছে গলার ফাঁসে। দম বন্ধ হয়ে নামছে আরও। আবার বুকে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছেন হেরম্যানরা। বেশ কিছুক্ষণ হেরম্যানদের নিয়ে চলার পর প্রথমে একটা ক্ষীণ আলো দেখা গেল। মশাল জ্বলছে একটা জায়গায়। মশালের আলো।

বেশ বড় একটা ঘরের মতো জায়গা সেখানে। একটা গুহাও বলা যেতে পারে সে

জায়গাকে। তার দেওয়ালের গায়েই মশালটা গোঁজা। ঘর বা গুহার মতো সে জায়গা মাটির নীচে হলেও সুড়ঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন। ঘরের মুখের সামনে হাত দশেক চওড়া অর্ধচন্দ্রাকৃতির গর্ত বা পরিখার মতো কাটা আছে। সেখানে এসে থামল বিছে মানুষরা। সুড়ঙ্গর মধ্যে একটা লম্বা কাঠের পাটাতন রাখা আছে। কয়েকটা বিছে মানুষ সেই পাটাতনটা পেতে ফেলল গুহাটার প্রবেশ মুখের গর্তর ওপর। তারপর দলটার কয়েকজন পাটাতনটার ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে হেরম্যানদেরও বুকে হাঁটিয়ে প্রবেশ করল সেই গুহা মতো জায়গাটাতে। বিছে মানুষদের বাকি দলটা বুকে ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে রইল গর্তটার অন্য পাশে সুড়ঙ্গর মধ্যেই। জায়গাটাতে প্রবেশ করার পরই উঠে বসলেন হেরম্যানরা। না বসে কোনো উপায় ছিলনা। এমনভাবে তাদের টেনে আনা হয়েছে যে পাথরের সাথে বুকের ঘমটানিতে জামা ছিড়ে বুকের ছাল উঠে রক্ত বেরোচ্ছে সবার। হাতের তালুরও ছাল উঠে গেছে। ও ভাবে শুয়ে থাকা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। তারা উঠে বসাতে কিন্তু বিছে মানুষরা বাধা দিল না। তবে বিছের ভঙ্গিতে থাকা অবস্থাতেই তারা হেরম্যানদের গলার দড়িগুলো ধরে রাখল, আর কয়েকজন তাদের দাঁড়া বাগিয়ে রইল তাদের দিকে। মশালের আলোতে হেরম্যান ভালো করে দেখলেন লোকগুলোকে। তাদের গায়ের রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় ছোট ছোট ঘন কুঞ্চিত চুল, ভাবলেশহীন শীতল চোখ সরীসৃপদের মতো। তারা বুকে হেঁটে চলাফেরা করে বলে হাত আর কাঁধের পেশি খুব সুগঠিত। হেরম্যানের মনে হলো আরবদের সাথে আফ্রিকানদের সংমিশ্রণেই হয়তো বা এই মানবগোষ্ঠীর উৎপত্তি।

সবাই নিশ্চুপ। বিছে মানুষরা কোনো শব্দ করছে না। যেন তারা কারো আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য তাদের প্রতীক্ষার অবসান হলো। হেরম্যান দাঁড়ার ঝনঝন শব্দ পেলেন। সুড়ঙ্গর বিছে মানুষদের ভিড় টেনে কে যেন আসছে! বিছেমানুষরা দু-পাশে সরে জায়গা করে দিচ্ছে তাকে আসার জন্য। অবশেষে আবির্ভূত হল সে। দু-হাতে ভর দিয়ে বুকে হেঁটে এত দ্রুত সে গর্তের ওপর পাটাতনটা পেরিয়ে হেরম্যানদের সামনে হাজির হলো যে অবাক হয়ে গেল তারা। এত দ্রুত কেউ বুকে হাঁটতে পারে!

দানবের মতো বুকে হাঁটা একটা লোক। গায়ের রঙ আবলুশ কাঠের মতো কালো। তার দু-হাতে বিশাল দুটো হিংস্র দাঁড়া। সেই ধারালো কাঁকড়া দাঁড়ার এক আঘাতেই মুণ্ডু ছিটকে যেতে পারে যে কোনো মানুষের। তার জোড়া পায়ের পাতায় একটা হুল পরানো আছে কাঁকড়া বিছের মতো। হুলটা মনে হয় সোনার। মশালের আলোতে হলদে ঝিলিক দিচ্ছে সেটা। কাঁকড়া বিছের ভঙ্গিতেই হুল সমেত পা দুটোকে পিছন দিকে তুলে ধরে সে তাকিয়ে আছে হেরম্যানদের দিকে। তার চোখদুটো অস্বাভাবিক রকম লাল আর হিংস্র। তার দিকে তাকিয়ে হেরম্যানের একটা কথাই মনে হল—খুনে ইউরেপুটেরাস!' দানব কাঁকড়া বিছে। সম্ভবতও লোকটাই সর্দার কাঁকড়া বিছে!

সর্দার বিছে হেরম্যানদের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দুর্বোধ কর্কশ ভাষায় তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে কী যেন বলল। প্রত্যুত্তরে তারা দাঁড়া বাজিয়ে ঝমঝম

শব্দে তুলল। বার কয়েক কথা বলল সর্দার বিছে। আর প্রতিবারই শব্দ তুলল অন্যরা। যেন তারা ওভাবে সম্মতি জানাচ্ছে সর্দারের কথায়। সর্দার বিছে তার নির্দেশ দেবার পর শেষ একবার বন্দিদের দেখে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বুকে হেঁটে মরমর করে সেই কাঠের পাটাতন পেরিয়ে ওপাশে সুড়ঙ্গর মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে চলে যাবার পর বিছে মানুষরা হেরম্যানদের গলার দড়ি খুলে নিল। তারপর সে জায়গা ছেড়ে বুকে হেঁটে কাঠের পাটাতনটা অতিক্রম করে ও-পাশে পৌঁছে পাটাতনটা সরিয়ে ফেলল গর্তর ওপর থেকে। এ কাজ শেষ করে বিছে মানুষদের পুরো দলটাই দাঁড়ার ঝমঝম শব্দে করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল সুড়ঙ্গর মধ্যে। সেখানে রয়ে গেলেন শুধু হেরম্যান বার্টন আর আবদুল্লা।

হেরম্যানদের ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগল। হেরম্যান ভাবতে লাগলেন—'সুদীপ্ত এখন কোথায়?'

বেশ কিছু সময় কেটে যাবার পর মৌনতা ভঙ্গ করে বার্টন বললেন, 'এরা আমাদের নিয়ে কি করবে?'

হেরম্যান বললেন, 'ঠিক জানি না। তবে নিশ্চয় কিছু উদ্দেশ্য আছে। ঠিক এখনই কিছু করবে বলে মনে হয় না। এখন খুন করার হলে ধরা পড়ার মুহূর্তেই খুন করত।'

বার্টন বললেন সর্দার বিছেটা আমাদের দুজনকেই বিশেষভাবে দেখছিল। টিম্বার বলেছিল যে সাদা মানুষকে ওরা একদম পছন্দ করে না। তবে শেষ পর্যন্ত ওরা আমাদের খুনই করবে। একটাই আপশোস আমার রয়ে গেল। এতবড় আবিষ্কারের খবরটা পৃথিবীবাসীকে জানানো হলো না। আমি নিশ্চিত যে ওটা ইউরেপুটেরাসের ফসিল।'

এ কথা বলার পর বার্টন বললেন সুদীপ্ত আর টিম্বারও কি বন্দি হয়েছে বলে মনে হয়?'

হেরম্যান বললেন, 'আমার ধারণা বিছে মানুষরা এখনও তাদের খোঁজ হয়তো পায়নি। তাহলে তাদের বন্দিশালায় আনা হতো যদি না তাদের পরিণতি আমাদের চেয়েও খারাপ হয়ে থাকে।'

আবদুল্লা বলল, 'এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। সামনের গর্তটা কোনোভাবে পেরোতে পারলেইতো সুড়ঙ্গে ঢুকে যাওয়া যাবে।'

হেরম্যান বললেন, 'কিন্তু অত চওড়া গর্ততো লাফ দিয়ে পেরোনো যাবে না। আর গর্তটা কত গভীর তা কে জানে। গর্তটা পেরাবার সময় অন্ধকারে কিছু ঠাহর করতে পারলাম না। নিশ্চয়ই খুব গভীর হবে। নইলে ওই গর্তের ভরসায় ওরা আমাদের ছেড়ে রেখে যেত না।' আবদুল্লা বলল, 'তবুও একবার পরীক্ষা করা থাক গর্তটা। কোনো ভাবে একজন গর্তটা কোনো কৌশলে পেরোতে পারলেই পাটাতন ফেলে অন্য দু-জনকে পার করাতে পারবে।'

বিছে মানুষরা যে গর্তটার ওপাশে সুড়ঙ্গর মধ্যে কাছাকাছি নেই তা নিশ্চিত হবার পর গর্তটা পরীক্ষা করার জন্য উঠে দাঁড়াল তারা তিনজন। আবদুল্লা দেওয়া;লর গা থেকে মশালটা খুলে নিয়ে এগোল সামনের গর্তর দিকে। তার সামনে এসে দাঁড়াল

সবাই। আব ধুল্লা আলো ফেলল সেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি পরিখার মধ্যে। পরিখাটা বেশি গভীর নয়। তার গভীরতা সম্ভবত হাত পাঁচেক হবে। বার্টন তা দেখে বললেন, 'আরে এ জায়গাটাতো নীচে নেমে অবাই পেরিয়ে যেতে পারব। কিন্তু তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন পরিখার কালো মাটিতে একটা কম্পন শুরু হলো। সেদিকে তাকিয়ে আতঙ্কে হিম হয়ে গেল সবার শরীর। কালো মাটি নয় কালো কালো বিরাট বিরাট কাঁকড়া বিছে পরিপূর্ণ সেই গর্তটা। সংখ্যায় তারা এত যে মাটি দেখা যাচ্ছে না। মশালের আলোতে চঞ্চল হয়ে উঠেছে তারা। দু-একটা বিছে আবার দেওয়াল বেয়ে ওপরে ওঠারও চেষ্টা করছে। কেউ যদি নীচে ওদের মাঝে পড়ে যায় তবে তার যে কী অবস্থা হবে তা ভাবলে দেহের রক্ত জমে যাবে। হেরম্যানরা তাড়াতাড়ি সরে এলেন সে জায়গা থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ তারা কেউই কোনো কথা বললেন না। হেরম্যান এক সময় বললেন, 'আমার কাছে একটা রিভলবার আছে। যদি দেখি সত্যিই মৃত্যু নেমে আসছে তবে বাঁচার একটা শেষ চেষ্টা করব। আপাতত পালাবার পথ বন্ধ। দেখি যদি সুদীপ্ত বা টিম্বার কোনোভাবে আমাদের মুক্ত করতে পারে?'

মশালটা আগের মতোই দেওয়ালের গায়ে গুঁজে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলেন তারা তিনজন। মশালের আলো নিবু নিবু হয়ে আসছে। হঠাৎ বার্টন বললেন, 'ওই দেখুন একটা কাঁকড়া বিছে-গর্ত থেকে ওপরে উঠে এসেছে!'

তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আবদুল্লা এক লাফে উঠে পা দিয়ে পিষে দিল তাকে।

বার্টন ভয়ার্ত ভাবে বললেন, 'কিন্তু ওরা যদি এক সাথে ঝাঁকে ঝাঁকে ওপরে উঠে আসে তখন?'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মশালটা দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। অন্ধকারের সাথে সাথে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। অন্ধকার ঘরে অন্যর হাত-পা নড়ার মৃদু খসখস শব্দ হলেও চমকে উঠতে লাগল সবাই। পিঠের কিট ব্যাগটা বন্দি হবার সময় ফেলে আসতে হলেও টর্চটা রয়ে গেছিল বার্টনের পকেটে। মৃদু শব্দ হলেও তিনি টর্চ জ্বালিয়ে দেখতে লাগলেন বিছের দল গর্ত থেকে ওপরে উঠে আসছে কিনা? দেওয়ালে হেলান দিয়ে হেরম্যান ভাবতে লাগলেন সুদীপ্তর কথা। সে এখন কোথায়? অন্ধকারে সুড়ঙ্গে সে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে হেরম্যানকে? নাকি সেও বন্দি হয়ে আছে?'

হেরম্যান যখন সুদীপ্তর কথা ভাবছিলেন তখন সুদীপ্তও সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গে বসে ভাবছিল হেরম্যানের কথা। হেরম্যানকে কোথায় টেনে নিয়ে গেল বিছে মানুষরা? তারা কি তাকে মেরে ফেলল? কথাটা ভাবতেই প্রবল যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল সুদীপ্তর হৃৎপিণ্ড। পরক্ষণেই তার মনে হলো না, এ হতে পারে না। পাহাড়-জঙ্গল মরুভূমি সমুদ্রে ক্রিপটিড বা অদ্ভুত প্রাণীর সন্ধানে কত অভিযানে তারা একসাথে সামিল হয়েছে! কত বিপদকে এক সাথে অতিক্রম করেছে তারা, কতবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছে তারা! 'না এ হতে পারে না।' —মনে মনে বলে উঠল সুদীপ্ত। সুদীপ্ত হিসাব করে দেখল যে বিছে মানুষরা হেরম্যানকে ধরে নিয়ে যাবার পর ঘণ্টাখানেক সময় কেটে গেছে। নিস্তব্ধ অন্ধকার সুড়ঙ্গ কোথাও কোনো শব্দ নেই। সুদীপ্ত মনে মনে ভেবে নিল তার এখন একটা কাজ। এই

সুড়ঙ্গ নগরীতে যে ভাবেই হোক হেরম্যানকে খুঁজে বার করা। যদি খারাপ কিছু হবার হয় তাহলে যেন এক সঙ্গেই হয়। যে পথে তারা এই সুড়ঙ্গ নগরীতে ঢুকেছে সে পথের ধুলোতে তাদের বুকে হেঁটে আমার চিহ্ন দেখে হয়তো সুদীপ্ত বাইরে বেরোতে পারে। ব্যাপারটা কঠিন হলেও অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু সুদীপ্ত হেরম্যানকে এই মৃত নগরীতে ফেলে রেখে কিছুতেই বাইরে পালাবে না। তার চেয়ে মৃত্যু নেমে আসাও শ্রেয়।

সুদীপ্ত কান খাড়া করে একবার শোনার চেষ্টা করল অন্ধকার সুড়ঙ্গে কোথাও কোনো শব্দ হচ্ছে কিনা, তারপর যে সেই ছোট্ট সুড়ঙ্গ থেকে নেমে এল মূল সুড়ঙ্গ পথে। অন্ধকারে সন্তর্পণে বুকে হেঁটে সে প্রথমে পৌঁছল সেই ঘরের মতো জায়গার সামনে। যে জায়গা থেকে হেরম্যানকে ধরে নিয়ে গেছে বিছে মানুষরা। ইলেকট্রিক ল্যাম্পটা কাত হয়ে পড়ে আছে একপাশে। তখন মৃদু আলো ছড়াচ্ছে বাতিটা হেরম্যান, সুদীপ্ত, বার্টনের ব্যাগ ইত্যাদিও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ঘরের মধ্যে। জায়গাটাতে ঢুকে ব্যাগ হাতড়ে দুটো জিনিস সংগ্রহ করল সুদীপ্ত। জলের বোতল আর একটা পেনসিল টর্চ। সুদীপ্তর ঘড়ির কাঁটায় মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। সে জায়গা ছেড়ে এরপর সে আবার সুড়ঙ্গর ভিতরে বেরিয়ে বিছে মানুষরা যে দিকে বন্দিদের ধরে নিয়ে গেছে সেদিকে এগোল। সুড়ঙ্গর মেঝের ধুলো বালিতে স্পষ্ট আঁকা হয়ে আছে বুক ঘষটে চলার দাগ, হাতের ছাপ। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালিয়ে সেগুলো দেখে চলতে লাগল সে। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর এক জায়গাতে সুড়ঙ্গর চারদিকে চারটে রাস্তা বেরিয়েছে। সেখানে চারটে সুড়ঙ্গতেই মাটির ওপর আসা-যাওয়ার চিহ্ন স্পষ্ট। সে জায়গায় পৌঁছে সুদীপ্ত ঠিক বুঝতে পারল না যে কোনো দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হেরম্যানদের। আন্দাজে একটা পথ ধরল সে তারপর এ সুড়ঙ্গ ও সুড়ঙ্গ বেয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল হেরম্যানদের। সুড়ঙ্গর গোলকধাঁধার মধ্যে সুদীপ্ত হারিয়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে সুড়ঙ্গর মেঝেতে উঠে বসে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম, তারপর আবার বুকে হেঁটে চলা। সুদীপ্তর এক সময় মনে হতে লাগল সেও যেন কোনো এক বিছে মানুষ। এটাই তার আস্তানা। আজন্ম এই ভাবেই সে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই সুড়ঙ্গ নগরীতে। ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে . . .। সুদীপ্তর এক সময় রিস্ট ওয়াচের মৃদু রিনিরিনি শব্দ শুনে সুদীপ্ত বুঝতে পারল যে ভোর ছ'টা বাজে। অর্থাৎ হেরম্যানের সন্ধানে সারা রাত সুড়ঙ্গর মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে সে। বাইরের পৃথিবীতে নিশ্চয়ই এতক্ষণে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ সুড়ঙ্গর ভিতরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। একটা চার মাথার মোড়ে এসে থামল সুদীপ্ত। টর্চ জ্বালিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে প্রথমে সে বেশ উৎফুল্ল হল। বিছে মানুষদের অজস্র চিহ্ন সেখানে মাটিতে আঁকা আছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে হতাশায় ভেঙে পড়ল। আরে ওটাইতো সে জায়গা, যেখান থেকে সে যাত্রা শুরু করেছিল! অর্থাৎ সারা রাত ঘুরে আবার সে একই জায়গায় ফিরে এসেছে! ক্লান্ত বিধ্বস্ত সুদীপ্ত সে জায়গাতেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল। ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজে এল সুদীপ্তর।

ক্লান্ত-অবসন্ন-সুদীপ্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখছিল হেরম্যানের সাথে কখনও সে চলেছে তুষারধবল পর্বত মালায় তুষার মানব বা ইয়েতির খোঁজে, কখনও বা তারা অভিযান চালাচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার গভীর অরণ্যে সোনার কমোডো ড্রাগনের সন্ধানে, আবার কখনও স্কুবা ডুবুরির পোশাক পরে ঝাঁপ দিচ্ছে দানব অক্টোপাসের খোঁজে সমুদ্র তলে। স্বপ্নের মধ্যে ইতিপূর্বে তাদের অভিযানগুলো যেন ছায়াছবির মতো ভেসে উঠতে লাগল। অবশেষে এক সময় ঘুম ভাঙল তার। চারপাশে অন্ধকার। প্রথমে সে বুঝে উঠতে পারল না সে কোথায় আছে। হেরম্যানকে সে ডাকতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই তার মনে পড়ে গেল সব কথা। মৃত নারীর সুড়ঙ্গে ঘুরপাক খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছিল যে ঘড়ি দেখল সুদীপ্ত। প্রায় একটানা পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে। ঘুমাবার কারণেই সুদীপ্তর মনে হলো ক্লান্তিটা তার অনেকখানিই যেন কেটে গেছে। ঘুমন্ত অবস্থায় দেখা স্বপ্নগুলোর রেশ তখনও কাটেনি। সেই স্বপ্নগুলো যেন একটা উদ্দীপনা জাগাল সুদীপ্তর মনে। পাহাড়-জঙ্গল-সমুদ্রে অনেক অভিযান চালিয়েছে সুদীপ্ত আর হেরম্যান। সে সব অভিযানে অনেক সময় মৃত্যু তাদের পায়ে পায়ে ঘুরেছে। সিংহর থাবা। কমোডো ড্রাগনের হিংস্রদাঁত, অসভ্য উপজাতিদের বিষ মাখানো তির অথবা নর-পশুদের তীক্ষ্ণছোরা বা রাইফেলের বুলেট শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুই তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। বারবার তারা মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে বেঁচে ফিরেছে। তারপর আবার সামিল হয়েছে নতুন অভিযানে, নতুন প্রাণীর সন্ধানে। তাহলে এখনই বা সে এত হতাশ হবে কেন? তাকে শেষ চেষ্টা করতে হবে হেরম্যানকে খোঁজার জন্য।

কিন্তু কোন পথে যাবে সে? ঠিক পথ ধরতে না পারলে তো আগের মতোই গোলোক ধাঁধায় ঘুরে মরতে হবে তাকে। বোতল থেকে কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে সে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে লাগল কোন পথে গেলে পাওয়া যেতে পারে হেরম্যানের খোঁজ?

ভাবতে ভাবতে এক সময় তার মনে হলো বিছে মানুষ টিম্বারের কথা। সে এখন কোথায়? সেও কি ধরা পড়ে গেছে বিছে মানুষদের হাতে। টিম্বার এই সুড়ঙ্গ নগরীর রাস্তা চিনত। সে থাকলে নিশ্চয় হেরম্যান কোন পথে গেছেন, কোথায় আছেন তা খুঁজে পাওয়া যেত। টিম্বারের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার একটা ব্যাপার ঝিলিক দিয়ে উঠল তার মনে। টিম্বার তো রাস্তা চিনছিল দেওয়ালে আঁকা বিছের হুল দেখে। ওই চিহ্ন দেখেও তো রাস্তা চেনা যেতে পারে! ব্যাপারটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে টর্চের আলো ফেলতে লাগল সুড়ঙ্গর মুখগুলোর দেওয়ালে। সব দেওয়ালেই বিছের ছবি আঁকা। তাদের হুলগুলো বিভিন্ন ভঙ্গিতে রয়েছে। ভালো করে সেগুলো লক্ষ করার

পর সুদীপ্ত দেখল একটা বিছের হুল যেন তর্জনীর মতো সুড়ঙ্গর ভিতরটা নির্দেশ করছে। সুদীপ্ত ঢুকে পড়ল সেই সুড়ঙ্গে, তারপর বুকে হেঁটে বা হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শুরু করল সে। মাঝে মাঝে যেখানে নানা দিকে সুড়ঙ্গ বেড়িয়েছে সেখানে থামা। তারপর আবার দেওয়ালের হুলের চিহ্ন দেখে নতুন সুড়ঙ্গে প্রবেশ করা এই ভাবে চলতে লাগল সে। বাইরের পৃথিবীর সূর্যদেবও তখন মধ্যগগন অতিক্রম করে অন্যদিকে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করেছে। এক সময় সুদীপ্তর মনে হলো সুড়ঙ্গ যেন ঢালু হয়ে ক্রমশ নীচের দিকে নামছে আর তার সাথে সাথে সুড়ঙ্গর পরিবেশ যেন আরও স্যাঁতস্যাঁতে, আরও ঠান্ডা মনে হচ্ছে। সেই সুড়ঙ্গ ধরে নীচে নামতে নামতে এক সময় সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেল। সুদীপ্ত দেখতে পেল তার সামনে বিরাট বড় একটা ছিদ্র। তার পাশে দেওয়ালের গায়ে আঁকা বিছের হুল যেন সেই ফোঁকরের ভিতরটা নির্দেশ করছে। ফোঁকরের সামনে উপস্থিত হয়ে সুদীপ্ত আলো ফেলল ভিতরে। বিরাট বড় একটা ঘরের মতো জায়গা। সে টর্চের আলো ফেলল ঘরের চারপাশে। ঘরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে লম্বা একটা পাথরের বেদি। আকারে সেটা অন্তত বারো ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া হবে। চারপাশের দেওয়ালগুলো ধুলোর চাদরে ঢাকা থাকলেও তারা আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে বিরাট বিরাট কাঁকড়া বিছের অস্পষ্ট মূর্তি। আকারে তারা এক একটা বারো-চোদ্দো ফুট হবে। সেগুলো পাথর খোদিত মূর্তি নাকি সেই খুনে ইউরিপুটেরাসের ফসিল তা জানা নেই সুদীপ্তর। বার্টন থাকলে নিশ্চয়ই বলতে পারতেন। কী বিরাট বিরাট দাঁড়া তাদের! চারপাশে এতো গা ছমছমে পরিবেশ সুদীপ্ত সারা সুড়ঙ্গ ঘুরেও কোথাও পায়নি। চারপাশে টর্চের আলো ফেলতে লাগল সে। সুদীপ্ত যে ফোঁকর গলে ঘরের ভিতর ঢুকেছে তার ঠিক উল্ট দিকের দেওয়ালের একই রকম একটা ফোকর। সুদীপ্ত অনুমান করল সেটা সম্ভবত বাইরে বেরোবার রাস্তা। সুদীপ্তর টর্চের আলো ঘুরতে ঘুরতে এক সময় স্থির হয়ে গেল মাথার ওপর পৌঁছে। বেদিটা যেখানে রয়েছে ঠিক তার ওপরেই ছাদের মাঝখানে বিরাট এক গহ্বর! সুদীপ্ত নীচ থেকে টর্চের আলো ফেলল মাথার ওপরের সেই গহ্বরে। দেখে মনে হলো সেটা যেন একটা চিমনির মতো সোজা ওপর দিকে উঠে গেছে। টর্চের আলো তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। সুদীপ্ত সেটা ভালো করে দেখার জন্য ঘরের মাঝখানে এগোতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় মাথার ওপরের গহ্বর থেকে একটা অস্পষ্ট খচমচ শব্দ শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ্তর মনে হলো মাথার ওপরের গহ্বর থেকে বিছে মানুষরা ঘরের মধ্যে নেমে আসবে না তো? হ্যাঁ, একটা স্পষ্ট খচমচ শব্দে শোনা যাচ্ছে মাথার ওপরের গহ্বর থেকে! শব্দটা যেন ওপর থেকে ধীরে ধীরে নীচে নেমে নামছে! ভয় পেয়ে গেল সুদীপ্ত। সে আর কাল বিলম্ব না করে ছুটল যে গহ্বর দিয়ে সে ভিতরে ঢুকে ছিল তার উলটোদিকের গহ্বরের দিকে। সে যখন সেই গহ্বর দিয়ে বাইরে বেরোল ঠিক তখনই তার মনে হলো ওপর থেকে ভারী কোনো একটা জিনিস যেন খসে পড়ল ঘরের ভিতর!

সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে সুদীপ্ত দেখতে পেল সামনে একটা সুড়ঙ্গ। সে সুড়ঙ্গ দিয়ে আবার বুকে হাঁটতে শুরু করল সে। এ সুড়ঙ্গ আবার ওপর দিকে উঠে গেছে। সুদীপ্ত

বুঝতে পারল নীচে থেকে সে ওপরে উঠছে। এগোতে লাগল সে। সময়ও এগিয়ে চলল তার সাথে। এক সময় ওপরে ওঠা শেষ হলো তার। আবার সমতল সুড়ঙ্গ। নানা গলি ঘুঁজি। বাঁকগুলো যেখানে নানা ভাগে বিভক্ত সেখানে সুদীপ্ত আবার দেওয়ালের গায়ে আঁকা বিছের হুলের চিহ্ন দেখে পথ নির্ধারণ করতে লাগল। এক সময় তার কানে আসতে লাগল অতি ক্ষীণ অদ্ভুত নানা রকম শব্দ! মানুষের চিৎকার, ধাতব ঝনঝনানি এমন নানা শব্দ। সুদীপ্ত বুঝতে পারল সে সম্ভবত বিছে মানুষদের বাসস্থানের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে! খুব সাবধানে সে এগোতে লাগল দেওয়াল চিহ্ন অনুসরণ করে। হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে সে একটা ক্ষীণ আলোর সন্ধান পেল। বাঁকে ফিরতেই সে দেখতে পেল কিছুটা তফাতে সুড়ঙ্গর দেওয়ালে একটা মশাল গোঁজা। এই প্রথম সুড়ঙ্গর মধ্যে সে আলো দেখল। অন্তত একশো হাত লম্বা একটা সুড়ঙ্গ। বেশ কয়েকটা উপ সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে তার গা বেয়ে। তার ভিতরে কেউ আছে কিনা সুদীপ্তর জানা নেই তবে সামনের সুড়ঙ্গটা ফাঁকা। বেশ কিছুটা এগিয়ে সেটা আবার বাঁক নিয়েছে। তবে এ সুড়ঙ্গর ছাদটা বেশ উঁচু। মাথা একটু ঝুঁকিয়ে দাঁড়ানো যায় সুড়ঙ্গর মধ্যে। তবে সে কিন্তু উঠে দাঁড়াল না। তাতে হঠাৎ কেউ বসে গেলে চোখে পড়ার সম্ভাবনা। তাই সে বুকে হেঁটেই এগোতে থাকল দেওয়ালের গা ঘেঁসে। আসে পাশে যে উপ সুড়ঙ্গগুলো বেড়িয়ে গেছে তার ভিতর খেলা করছে জমাট বাঁধা অন্ধকার। সুদীপ্ত সে জায়গাগুলো সন্তর্পণে অতিক্রম করতে লাগল। সুদীপ্ত তখন মশালের আলোতে আলোকিত সুড়ঙ্গ প্রায় অতিক্রম করে উলটো দিকের বাঁকের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ঠিক তখনই পিছনে অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনে সে ফিরে তাকাল।

সুদীপ্ত দেখতে পেল একজন বিছে মানুষ আবির্ভূত হয়েছে সুড়ঙ্গে। সম্ভবত দেওয়ালের গায়ের কোনো পথ বেয়ে এই সুড়ঙ্গে নেমেছে সে। সুদীপ্ত আর তার মধ্যে হাত পঁচিশের ব্যবধান। বুকে হেঁটেই সুড়ঙ্গে নেমেছে লোকটা। মাটিতে এক হাতে ভর দিয়ে বুকটাকে মাটির ওপরে উঁচিয়ে সে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে দেখছে সুদীপ্তকে। সে যেন ওখানে সুদীপ্তর উপস্থিতি আশা করেনি। লোকটা তার অন্য হাত দিয়ে অদ্ভুত কৌশলে মাথার ওপর ধরে রেখেছে একটা মুখ বন্ধ মাটির বড় হাঁড়ি। সুদীপ্তর সাথে কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি বিনিময়ের পরই সেই বিছে মানুষের চোখের দৃষ্টি কেমন যেন হিংস্র হয়ে উঠল। লোকটার হাতে দাঁড়া পড়া। সে যদি চিৎকার করে অন্য লোক ডাকে অথবা সুদীপ্তকে আক্রমণ করে তবে তার দাঁড়ার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সুদীপ্তর দেহ। সুদীপ্ত বুকে হেঁটে ছুটে পারবে না বিছে মানুষের সাথে। লোকটা সম্ভবত তার মাথার পাত্রটা মাটিতে নামিয়ে সুদীপ্তকে ধাওয়া করতে যাচ্ছিল কিন্তু সুদীপ্ত আর কোনো উপায় না দেখে পাশে পড়ে থাকা একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে সজোরে দূরে ছুড়ে মারল লোকটার মাথা লক্ষ করে। পাথরটা লোকটার মাথায় না লেগে লাগল গিয়ে তার মাথার হাড়িটাতে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের আঘাতে চুরমার হয়ে গেল মেঠে হাড়িটা। একটা আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। সুদীপ্ত দেখতে পেল ভাঙা হাড়ি থেকে রাশিরাশি কাঁকড়াবিছে ছড়িয়ে পড়েছে লোকটার দেহে। বাইরে বেরিয়েই সম্ভবত একসাথেই বেশ কয়েকটা কাঁকড়া

বিছে একসাথে হুল বসিয়ে দিল তার দেহে। আবার একটা শুধু অস্পষ্ট আর্তনাদ করল সেই বিছে মানুষ। পরপর মৃত্যু যন্ত্রণায় তার দেহটা সুড়ঙ্গর মেঝেতে মোচড় দিতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল তার দেহ। কী ভয়ঙ্কর মৃত্যু! পুরো ঘটনাটা ঘটতে সম্ভবত পনেরো সেকেন্ডে সময় লাগল। সুদীপ্ত একটা জিনিস বুঝতে পারল ঘটনাটা দেখে যে বিছে মানুষরাও বিছের বিষের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এরপর হঠাৎ সুদীপ্ত শুনতে পেল বিছে মানুষদের দাঁড়ার শব্দ। সম্ভবত মৃত মানুষটার চিৎকার শুনে তার সঙ্গীরা ছুটে আসছে। সুদীপ্ত আর সেখানে দাঁড়াল না, বাঁক ফিরে সে প্রবেশ করল নতুন সুড়ঙ্গে। অন্ধকারে সেই সুড়ঙ্গ হাতড়ে এগিয়ে চলল সে।

টর্চ জ্বালাতে ভরসা হচ্ছে না সুদীপ্তর। কারণ, আসে পাশে নানা শব্দ শোনা যাচ্ছে। সুদীপ্ত অন্ধকার হাতড়ে এগোতে লাগল। সময়ও এগোতে লাগল তার সাথে। বাইরের পৃথিবীতে সূর্য ডুবে রাত নামল। অমাবস্যার রাত। নিশ্চিন্ত অন্ধকারে ঢেকে গেল মরুভূমি। সুড়ঙ্গর ভিতরও জমাট বাঁধা অন্ধকার। কোনোদিকে সুদীপ্ত এগোচ্ছে তা সে জানেনা। তবে নানা অদ্ভুত শব্দ কানে আসছে তার। অনেকের কলরব, ধাতব ঝনঝনাদি এ সব শব্দ! প্রতি মুহূর্তে তার মনে হতে লাগল যে এই বুঝি তার সামনে উপস্থিত হলো বিছে মানুষের দল। তাদের উপস্থিতির শব্দ ক্রমশ বাড়ছে। চোখে না দেখা গেলেও সম্ভবত খুব কাছেই আছে তারা। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরে একটা আলোক রেখা দেখতে পেল সে। সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেছে বাঁক ঘুরে। সামনে একটা দেওয়াল তার গায়ে বেশ বড় একটা গর্ত। আলো আসছে তার ভিতর থেকেই। নানা রকম শব্দও ভেসে আসছে। বিশেষত বিছে মানুষদের দাঁড়ার ঝনঝনানির শব্দ। বিছে মানুষরা নিশ্চয়ই আছে ওখানে। হেরম্যানও কি ওখানে আছেন? সুদীপ্ত সাহস করে এগিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিল সেই গহ্বরে। তার চোখে ফুটে উঠল ওপাশে এক অদ্ভুত দৃশ্য—

ফোকোরের ওপাশে বিশাল একটা হল ঘরের মতো জায়গা। মাথার বেশ উঁচুতে ছাদ। দেওয়ালের গায়ে সার সার মশাল জ্বলছে। তার আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছু। দেওয়ালের গা গুলোতে খোদিত আছে দাঁড়াঅলা বিছে মূর্তি। অসংখ্য গহ্বরও আছে দেওয়ালে। সম্ভবত বিভিন্ন জায়গা থেকে সুড়ঙ্গ এসে মিশেছে সেখানে। সুদীপ্ত যে গহ্বরের মুখে রয়েছে তার কয়েক হাত নিচেই ঘরটার মেঝে সে ইচ্ছে করলেই লাফিয়ে ঘরটার মধ্যে নামতে পারে। ঘরটার ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটু বাঁধানো কুয়োর মতো গহ্বর। তার বেশ কিছুটা তফাতে পাথুরে মেঝেতে সার বেঁধে বিছের ভঙ্গিতে শুয়ে আছে বিছে মানুষরা। সংখ্যায় তারা প্রায় জনা পঞ্চাশ হবে। সবার হাতেই কাঁকড়া বিছের দাঁড়া পড়া। মাঝে মাঝে নড়লে চড়লে শব্দ হচ্ছে তাতে। কালো শরীরের দাঁড়া পড়া লোকগুলোকে সত্যিই যেন বিছে বলে মনে হচ্ছে! ভালো করে দেখার পর হেরম্যানদেরও দেখতে পেল সুদীপ্ত। ঘরের এক কোণে একসাথে দড়ি বাঁধা অবস্থায় বসে আছেন হেরম্যান। আর বার্টন তাদের কিছুটা তফাতে একই অবস্থায় আবদুল্লা। এটাই কি তবে খুলুর উপাসনাস্থল? যার কথা বলেছিল বিছে মানুষ টিম্বার। তবে টিম্বারকে সে ঘরে দেখতে পেল না সুদীপ্ত। বিছে মানুষরা খুব বেশি নড়াচড়া করছে না। সুদীপ্তর

মনে হলো তারা যেন কোনো কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করছে। কিসের প্রতীক্ষা?'

ঘরের ভিতরে ভালো করে দেখার পর সুদীপ্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারল না তার ঠিক কি করা উচিত? ভিতরে লাফিয়ে নামলে সে নিশ্চই ধরা পড়ে যাবে বিছে মানুষদের হাতে। তার কাছে কোনো অস্ত্রও নেই। সে যদি আবদুল্লার রাইফেলটাও কুড়িয়ে আনত তবে একবার একটা শেষ চেষ্টা করা যেত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে সে চেয়ে রইল ঘরের ভিতর।.মিনিটের পর মিনিট সময় কাটতে লাগল।

ঘরের ভিতরে তাকিয়েছিল সুদীপ্ত। হঠাৎ যেন তার মনে হলো বিছে মানুষরা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দু-হাতে ভর দিয়ে বুকটাকে মাটি থেকে একটু ওপরে তুলে ধরে তারা তাকাচ্ছে ঘরের ডানপাশের একটা দেওয়ালের দিকে। সেখানে বেশ বড় একটা ছিদ্র আছে। কয়েক মুহূর্তর মধ্যেই সেই ছিদ্র গলে ঠিক বিছের মতোই ঘরের মধ্যে বুকে হেঁটে নামল মিশ কালো একটা লোক। তার দুই হাতে বিশাল ভয়ঙ্কর ধাতব দাঁড়া, জোড়া পায়ে রয়েছে কাস্তের মতো বাঁকানো ধারালো হুল। তার এক আঘাতে কোনো লোকের মুণ্ডু নেমে যাবে। কুয়োটার কাছাকাছি পৌঁছে সেই লোকটা ঘুরে দাঁড়াল বিছে মানুষদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বিছে মানুষরা স্থির হয়ে গেল প্রথমে। তারপর তাদের হাতের দাঁড়া একসাথে মাটিতে বুকে ঝনঝন শব্দ তুলে যেন সম্ভাষণ জানাল লোকটাকে। সুদীপ্ত অনুমান করলই দানবের মতো লোকটাই সম্ভবত বিছে মানুষদের দলপতি। সর্দার কাঁকড়া বিছে!

সর্দার বিছে এরপর দুর্বোধ্য ভাষায়, কর্কশ স্বরে কি যেন বলতে লাগল তার সঙ্গীদের উদ্দেশে, আর মাঝে মাঝে তাকাতে লাগল পিছনের কুয়োটার দিকে। বেশ অনেকক্ষণ কথা বলার শেষে সে একটা দাঁড়া ঠুকল মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে বিছে মানুষদের পাগুলো হুলের মতো পিছনে উঠে গেল। আর তারপরই শুরু হল এক অদ্ভুত নৃত্য। বুকে ভর দিয়ে শুয়ে হুল সমেত দেহের পিছনের অংশকে ছন্দবদ্ধ ভাবে নাচাতে শুরু করল তারা। আর দু-হাতের দাঁড়া ঠুকতে লাগল মেঝেতে। ঝমঝম শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল বিশাল হল ঘরের মতো জায়গাটা। বেশ কিছুক্ষণ সে নাচ চলার পর দলপতির নির্দেশেই সে নাচ থামল। বিছের মতো হুলগুলোকে পিছনে উঁচিয়ে ধরে স্থির হয়ে গেল বিছে মানুষরা, সর্দার বিছে এবার একবার বুকে হেঁটে চক্কর কাটল ফাঁকা জায়গাটাতে। তারপর বুকে শুয়ে বিছারা যেমন লড়াইয়ের আগে দু-হাতে গ্লাভস ঠোকে ঠিক সে ভাবে দাঁড়া দুটো ঠুকে কি যেন বলতে লাগল সমবেত বিছে মানুষদের প্রতি। প্রতিবার দাঁড়া ঠোকার পর সর্দার বিছে কয়েক মুহূর্ত থামছে। প্রত্যুত্তরে যেন বিছে মানুষরা বুকে শুয়ে মাথা নীচু করে হুলটা একপাশে নাড়াচ্ছে। যেন সর্দার বিছে কোনো কিছুর জন্য তাদের আহ্বান

করছে আর বিছে মানুষরা সসম্মানে প্রস্তাব করছে তার আহ্বান। মশালের আলোতে সুদীপ্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সর্দার বিছের মুখটা। সেই হিংস্র মুখটাতে ধীরে ধীরে যেন বীভৎস হাসি ফুটে উঠছে।

হঠাৎ একটা ঝুপ করে শব্দ হলো ঘরের মধ্যে। একপাশের দেওয়াল গলে ঘরের মধ্যে একই ভাবে লাফিয়ে নেমেছে একটা লোক। বিছে মানুষ। তারও হাতে দাঁড়া। জোড়া পায়ে বাঁধা ধারালো হুল। তাকে দেখেই সর্দার বিছের হুলটা পিছনে খাড়া হয়ে গেল আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। কর্কশ ভাষায় সে চিৎকার করে নবাগত বিছে মানুষের উদ্দেশ্যে কী যেন বলল। তার প্রত্যুত্তরে নবাগতও কী যেন চিৎকার করে বলল। তারপর এগিয়ে এসে হুল তুলে সর্দার বিছের কিছুটা তফাতে তার মুখোমুখি দাঁড়াল।

সুদীপ্ত এবার মশালের আলোতে চিনতে পারল তাকে। আরে এ যে বিছে মানুষ টিম্বার!

সর্দার বিছের মুখোমুখি হয়ে টিম্বার একবার পাশ ফিরে কী যেন বলল। তাই শুনে স্পষ্ট বিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠল বিছে মানুষদের চোখে। সর্দার বিছে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু একটা টিম্বারের উদ্দেশ্যে বলে দু-হাতে দাঁড়া ঠুকল। ঝমঝম শব্দ উঠল। টিম্বারও একই কাজ করল। সেও ঝমঝম শব্দে তাল ঠুকল। দু-জনের লড়াই হবে নাকি?

সুদীপ্তর অনুমানই সত্যি হলো কিছুক্ষণের মধ্যে। টিম্বার আর সর্দার বিছের তাল ঠোকাঠুকি দেখে পিছনে সড়ে দাঁড়াল বিছে মানুষদের দল। লড়াইয়ের ময়দান হিসাবে বেশ একটা প্রশস্ত জায়গা সৃষ্টি হলো সেই কুয়োটার সামনে। কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর ঝমঝম শব্দে দাঁড়া বাজিয়ে বুকে হেঁটে টিম্বার আর সর্দার বিছে ধেয়ে এলো পুরস্কারের দিকে দু-জনেই দাঁড়া চালাল পরস্পরকে লক্ষ করে। দুই দাঁড়ার সংঘাতে আগুনের ফুলকি উঠল। শুরু হলো এক ভয়ঙ্কর লড়াই।

দু-জনেই দুজনকে কখনও দাঁড়া দিয়ে আবার কখনও পায়ে বাঁধা ধারালো হুল দিয়ে আঘাত হানার চেষ্টা করতে লাগল। কখনও ঘরের দেওয়ালের একপাশে কখনও দেওয়ালের অন্যপাশে ঘুরে ঘুরে চলতে লাগল লড়াই। দাঁড়ার হুলের বীভৎস ধাতব শব্দে কেঁপে উঠতে লাগল ঘর। হঠাৎ একবার বিছে মানুষ টিম্বারের পায়ে বাঁধা ফলাটা ছুঁয়ে গেল সর্দার বিছের কাঁধের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠল সে জায়গা। ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠল সে। আর তারপরই যুদ্ধর কৌশল বদলাল সর্দার বিছে। এক হাতে ভর দিয়ে সে তার লম্বা দেহটাকে লাট্টুর মতো ঘোরাতে লাগল। তার পায়ে বাঁধা কাস্তের মতো হুলটা পাখার ব্লেডের মতো সব কিছুকে কেটে ফেলার জন্য চারপাশে ঘুরতে লাগল। এ ভাবে সে এগোল টিম্বারের দিকে। টিম্বারের লড়াইয়ের এ কৌশল জানা নেই সম্ভবত। সে এবার পিছু হটতে লাগল সুদীপ্ত যে দিকের দেওয়ালের দিকে রয়েছে সেদিকে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যে সর্দার বিছের জোড়া পায়ে বাঁধা ধারালো ফলার আঘাত থেকে নিজে বাঁচতে পারল না। কোমড়ের নিচে ছোবল দিল সর্দার বিছের হুল। কিছুটা তফাতে ছিটকে পড়ল সে। রক্তে ভিজে যেতে থাকল ঘরের মেঝে।

বিছে মানুষ টিম্বার উঠবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। এবার জয়ের আনন্দ ফুটে

উঠল সর্দার বিছের মুখে। সুদীপ্ত যেখানে রয়েছে সেই ফোকরের কাছাকাছি কিছুটা পিছু হটে চলে এল সে। কারণটা বুঝতে অসুবিধা হল না সুদীপ্তর। সর্দার বিছে এবার প্রবল বেগে ধেয়ে গিয়ে দাগ দিয়ে শেষ আঘাত হানবে বিছে মানুষ টিম্বারের ওপর। আর কিছু মুহূর্তর মধ্যেই লড়াই শেষ হয়ে যাবে। ফোকর দিয়ে কয়েক হাত নিচেই বিছে সর্দারের কুচকুচে কালো পিঠটা দেখতে পাচ্ছে সুদীপ্ত। বন্দুকটা যদি থাকত সে এখনই থামিয়ে দিতে পারত শয়তানটাকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই সুদীপ্তর মনে পড়ে গেল অন্য একটা অস্ত্রর কথা। পকেট হতাড়ে টিম্বারের কৌটটা বার করে সেটা কয়েকবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে কৌটর মুখ খুলে ভিতরের জিনিসটা ছুড়ে দিল সর্দার বিছের পিঠে।

সর্দার বিছে আক্রমণের জন্য টিম্বারের দিকে ছুটল ঠিকই কিন্তু তার কাছাকাছি পৌঁছতে পারল না। হঠাৎই যে বীভৎস চিৎকার করে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। মরু বিছে তার মারণ হুল বসিয়ে দিয়েছে সর্দার বিছের ঘাড়ে। ঠিক এই অবস্থাতেই বিছে মানুষ টিম্বার কোনোক্রমে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ার উলটো পিঠ দিয়ে আঘাত হানল সর্দার বিছের মাথায়। কিছুটা গড়িয়ে সর্দার বিছের দেহটা স্থির হয়ে গেল।

হতভম্ব বিছে মানুষরা তাকিয়ে আছে টিম্বারের দিকে। বিছে মানুষ টিম্বার ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বাঁধানো কুয়োটা ধরে উঠে দাঁড়াল। তারপর কী যেন বলল বিছে মানুষদের লক্ষ করে। বিছে মানুষরা এবার ঝমঝম শব্দে দাঁড়া বাজাতে লাগল টিম্বারের উদ্দেশ্যে। না, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে নয়। যেন তারা দাঁড়া বাজিয়ে অভিবাদন জানাতে লাগল টিম্বারকে। সুদীপ্ত এবার লাফিয়ে নেমে পড়ল ঘরটার মধ্যে। তাকে দেখে কয়েকজন বিছে মানুষ এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল কিন্তু টিম্বার হাসতে বলল তাদের। টিম্বার এরপর সুদীপ্তর উদ্দেশ্যে বলল—'আর ভয় নেই, বিছে মানুষদের দলপতি এখন আমি। ওরা আমার নির্দেশ এখন পালন করবে।' কথাটা শোনার সাথে সাথে সুদীপ্ত ছুটে গিয়ে মুক্ত করে ফেলল হেরম্যান, বার্টন আর আবদুল্লাকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল তারা। পুরো ব্যাপারটাতে সবাই মিশ্রিত, হতচকিত। তারা চেয়ে রইল বিছে মানুষ টিম্বারের দিকে। টিম্বার এবার এক দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করল বিছে মানুষদের উদ্দেশ্যে। বিছে মানুষরা শুনতে লাগল তার কথা। আর মাঝে মাঝে তালি বুজাবার মতো ঝমঝম শব্দে তাদের দাঁড়া বাজাতে লাগল। এক সময় কথা শেষ হলো টিম্বারের। তখনও রক্ত ঝরছে টিম্বারের কোমর থেকে। বাইরের রক্তটা মুছল সে। রক্ত মোছার সাথে সাথে কালো রঙ উঠে গিয়ে টিম্বারের দেহের সাদা চামড়া ফুটে উঠল। সে সেটা দেখাল সমবেত বিছে মানুষদের। আরে এ যে এক সাদা মানুষ! সাদা মানুষেরই তো ঘুম ভাঙাবার কথা বিছে মানুষদের দেবতা মহান থুলুর। আরও বিশ্রিত হয়ে গেল বিছে মানুষরা। তাহলে কি সত্যিই সাদা মানুষ ঘুম ভাঙাতে এসছে মহান থুলুর?

টিম্বার একজন বিছে মানুষকে শুধু কাছে ডেকে নিল। আর অন্য বিছে মানুষদের উদ্দেশ্যে কী যেন নির্দেশ দিল দাঁড়া বাজিয়ে। সারবদ্ধ হলো বিছে মানুষরা। তারপর সম্মিলিত ভাবে দাঁড়া বাজিয়ে একটা ফোকর গলে সে ঘর ছেড়ে বাইরে বেড়িয়ে যেতে লাগল। এক সময় ফাঁকা হয়ে গেল ঘর। সে ঘরে রইল শুধু সুদীপ্তরা, টিম্বার, একজন

বিছে মানুষ আর কিছুটা তফাতে পড়ে থাকা বিছে সর্দারের মরদেহ। মৃত নগরীর বিছে মানুষটার সাথে কিছুক্ষণ দুর্বোধ্য ভাষায় কথোপকথন চালাল টিম্বার। তারপর হেরম্যান আর বার্টনের উদ্দেশ্যে বলল, 'এ লোকটা বলছে যে তোমাদের দু-জনকে আজ এখানে আনা হয়েছিল সর্দার নির্বাচনের পর দেবতাকে উৎসর্গ করার জন্য। মৃত সর্দার বিছে মানুষ অন্যদের আহ্বান জানাচ্ছিল তাকে পরাস্ত করে অন্য কেউ দলপতি হয় কিনা তা দেখার জন্য। প্রতিবছরই সে দলপতি নির্বাচিত হয়েছে। অন্য কেউ তার আহ্বান গ্রহণ করতে, তার সাথে লড়াই করতে সাহস পায়নি। আর আবদুল্লাকে হত্যা করা হতো তার গায়ে বিছের পাত্র ঢেলে দিয়ে।' কথাটা শুনেই সুদীপ্তর মনে পড়ে গেল সুড়ঙ্গর সেই লোকটার কথা। হয়তো সে আবদুল্লার জন্যই সেই বিছের ভাণ্ড আনছিল। রক্তপাত হলেও টিম্বারের আঘাত তেমন গুরুতর নয়। কাপড় বেঁধে দেওয়া হল ক্ষতস্থানে। একটু সামলে ওঠার পর বিছে মানুষ টিম্বার বলল, 'এবার আমরা অন্য জায়গায় যাব। এই বিছে মানুষ আমাদের সেখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।' হেরম্যান জানতে চাইলেন, 'কোথায় যাব আমরা?'

বিছে মানুষ টিম্বার বলল, 'মরুভূমির আদি বৃদ্ধ শয়তান মহান থুলুর কবরে। আজতো অমাবস্যা। তাকে জাগাবার দিন।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘর ছেড়ে সুড়ঙ্গ বেয়ে বুকে হেঁটে তারা এগোল মহান থুলুর কবরে পৌঁছবার জন্য।

চলতে চলতে হেরম্যান টিম্বারকে প্রশ্ন করল, 'তুমি অন্য বিছে মানুষদের কোথায় পাঠালে?'

টিম্বার জবাব দিল, 'মহান থুলুর ঘুম ভাঙালে প্রলয় হবে। তাই তাদের আমি না বলা পর্যন্ত মৃত নগরীর বাইরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছি। এই সুড়ঙ্গর বাইরে যাবার জন্য রওনা হয়েছে তারা। আমি বলেছি আমার নির্দেশ না পেলে যেন তারা সুড়ঙ্গনাগরীতে না ফিরে আসে? পথ ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমেছে নিচের দিকে। নানা সুড়ঙ্গ, উপসুড়ঙ্গ বেয়ে এক সময় তারা পৌঁছে গেল সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে। আরে এই তো সেই ঠান্ডা ঘরটা। যেখানে আগে এসেছিল সুদীপ্ত। এখানেই তাহলে ঘুমিয়ে আছেন থুলু। টর্চের আলো জ্বলে উঠল। সুদীপ্তদের সঙ্গী বিছে মানুষ আঙুল তুলে দেখাল ঘরের মাঝখানে বেদিটার দিকে। ওটা তবে বেদি নয় থুলুর কবর! যেখানে ঘুমিয়ে আছেন থুলু। সুদীপ্তদের সঙ্গী বিছে মানুষটা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল সেই কবরের দিকে। উপাসনা ঘর থেকে আসার সময় হেরম্যান একটা মশাল এনে ছিলেন সেটা এবার জ্বালিয়ে ফেলা হল। মশালের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠল ঘর। দেওয়ালের গায়ে ফুটে উঠল বীভৎস দানব কাঁকড়াবিছের মূর্তিগুলো!

আস্তে আস্তে কবরটার একপাশে গিয়ে দাঁড়াল সবাই। ধুলো ঝাড়া শুরু হলো সেই পাথরের কফিনের গা থেকে। সবাই প্রস্তুত হল কফিনের ঢাকনাটা সরাবার জন্য। হঠাৎ বিছে মানুষ টিম্বার বলে উঠল, 'হে ঈশ্বর তুমি আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি শয়তানকে ধ্বংস করে পৃথিবীকে তার আতঙ্ক থেকে মুক্ত করতে পারি।'

তার কথা শুনে চমকে উঠল সুদীপ্তরা। তারা আরাধ্য শয়তানকে ধ্বংস করার কথা বলছে কেন টিম্বার?'

হেরম্যান বলে উঠলেন, 'কি বলছ তুমি?'

স্মিত হেসে বিছে মানুষ টিম্বার বলল, 'ঠিকই বলছি। এই শয়তানকে ধ্বংস করাই আমার ব্রত। আমি বিছে মানুষও নই, টিম্বারও নই। আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী এক মানুষ ফাদার প্যাট্রিক। এ জায়গায় পৌঁছবার জন্য আমি বছরের পর বছর বিছে মানুষ সেজে ছিলাম। চার্চ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল শয়তানকে ধ্বংস করার। যে চার্চে রক্ষিত আছে উন্মাদ আরব আব্দুল হালহাড্রেজের লেখা শয়তানকে জাগাবার পুঁথি। একই সাথে এই অশুভ শক্তিকে কি ভাবে ধ্বংস করা যায় তার মন্ত্রও লেখা আছে তাতে। সে পুঁথি পড়েছি আমি।'

তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল সবাই।

ফাদার প্যাট্রিক এরপর বললেন, 'তবে এবার শয়তানের কফিন খোলা হোক।'

সবাই মিলে ঠেলতে শুরু করল ওপরের ঢাকনাটা। সরে যেতে লাগল সেটা। কিন্তু সেটা বেশ কিছুটা ফাঁকা হতেই তার ভিতর থেকে প্রথমে যা আত্মপ্রকাশ করল তাতে কফিনের গা থেকে ছিটকে সরে এল সবাই। বিশাল একটা দাঁড়া!

তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল তার পুরো শরীরটা। বিশাল একটা কাঁকড়া বিছে। আকারে অন্তত দশ ফুট হবে। প্রাগৈতিহাসিক খুনে ইউরেপুটেরাস দানব কাঁকড়া বিছে!

হেরম্যান আর সুদীপ্ত যেন বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে। এও কী সম্ভব? কী বিশাল কাঁকড়া দাঁড়া তার! ও দাঁড়া যে কোনো মানুষকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে! আর তার হুলটাও গেঁথে ফেলতে পারে যে কোনো মানুষকে! দুটো দাঁড়ায় টোকা দিল প্রাণীটা। তারপর কফিন থেকে নেমে তার বিশাল হুলটাকে উঁচিয়ে ধরে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল সুদীপ্তদের দিকে। পিছু হটতে লাগল সবাই। কিন্তু সেই সঙ্গে আসা বিছে মানুষটা অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল হয়তো তার বিশ্বাস বশেই। সে বিছের ভঙ্গিতে মাটিতে শুয়ে পড়ল শয়তান দেবতাকে প্রণাম জানাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রাণীটা দেবতা নয়, সে খুনে ইউরেপুটেরাস। তার রক্তে বহমান প্রাগৈতিহাসিক জিঘাংসা। সে তার ভয়ঙ্কর দাঁড়া সরল আলিঙ্গনে মাটি থেকে খুলে নিল লোকটাকে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল লোকটা। সম্বিত ফিরে পেলেন হেরম্যান। তিনি জ্বলন্ত মশালটা ছুড়ে মারলেন বীভৎস প্রাণীটাকে লক্ষ করে। সেটা আছড়ে পড়ল তার পিঠে। ভয় পেলেও প্রাণীটা কিন্তু লোকটাকে ছাড়ল না। তাকে দাঁড়াবন্দি অবস্থাতেই সরসর করে দেওয়াল বেয়ে উঠে হারিয়ে গেল মাথার ওপরের খাড়া সুড়ঙ্গে।

পুরো ঘটনাটা দেখে ধাতস্থ হতে কিছুটা সময় লাগল সুদীপ্তদের। ডক্টর বার্টন এক সময় বললেন, 'ও এখন আর সম্ভবত ফিরবে বলে মনে হয় না। আগুনকে সবাই ভয় পায়। সুদীপ্তরা এবার আবার এগিয়ে গিয়ে সাবধানে উঁকি দিল কফিনের ভিতরে। না সেখানে কিছু নেই। শুধু তার নীচে দিয়ে আরও একটা গহ্বর নেমে গেছে নীচের দিকে। সেটাই হয়তো ইউরেপুটেরাসের আসল ডেরা। কফিন শূন্য দেখে ফাদার প্যাট্রিক একটু বিনয় ভাবে

বললেন, 'হয়তো শয়তান হিসাবে নেক্রোনসিকনে আলহাড্রেক এর কথাই বলেছিল। যদি এই দানব বিছে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে তবে সত্যিই তো কোনো প্রাণী বাঁচবে না। ইটরিপুটেরাসই হয়তো থুলু। কিছুউক্ষণের মধ্যেই সে ঘর ছেড়ে সুড়ঙ্গ নগরীর বাইরে বেরোবার জন্য রওনা হন সুদীপ্তরা। পরদিন শেষ বিকালে আলোর মুখ দেখল তারা।

রঙের খেলা শুরু হয়েছে আকাশে। মৃত নগরীর সুড়ঙ্গ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে সুদীপ্তরা। এখন তাদের মনে হচ্ছে সেটা যেন দুঃস্বপ্ন ছিল। কিন্তু তারা যেটা দেখল সেটাও কি নিছক দুঃস্বপ্ন? সেই খুনে দানব কাঁকড়া বিছে ইউরেপুটেরাস?'

হেরম্যান এক সময় প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত করে বসলেন ডক্টর বার্টনকে—'যা দেখলাম তা কি সত্যি? ন-কোটি বছর পরেও কি ভাবে বেঁচে আছে ইউরেপুটেরাস?'

একটু ভেবে নিয়ে ডক্টর বার্টন জবাব দিলেন, 'সম্ভবত যেমন ভাবে বেঁচে আছে সাগরতলের সিলিকান্থ মাছ বা বরফাবৃত অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদ জিনগোবাইলোবা। কোটি কোটি বছরে পৃথিবীর ভূ-প্রকৃতির নানা পরিবর্তন হলেও তাদের বাসস্থানের পরিবেশের কোনো পরিবর্তন হয়নি বলেই তারা বেঁচে আছে। মাটির নিচের ঘরটা কেমন ঠান্ডা দেখেছিলেন! হয়তো ওই ভূগর্ভস্থ জায়গার পরিবেশেরও কোনো পরিবর্তন হয়নি কোটি কোটি বছর ধরে। ওই রকম ঠান্ডা স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশই তো ওদের বেঁচে থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা।'

কথাগুলো বলে বার্টন বললেন, 'দুর্ভাগ্য আপনি প্রাণীটাকে পৃথিবীর কাছে হাজির করতে পারলেন না। তবে আমি বড় ইউরেপুটেরাসের ফসিল সংগ্রহ করতে না পারলেও খাতের দেওয়ালে সে ফসিলটা পেয়েছি সেটা নিয়ে যাব। ওটাও কম বড় নয়।'

হেরম্যান বললেন, 'আমার তেমন আক্ষেপ নেই। প্রমাণ দেওয়াটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার নয়। পাথরের ক্যামেরায় যেমন আপনার ইউরেপুটের ছবি আঁকা হয়ে আছে তেমন মামার মনের ক্যামেরায় আঁকা হয়ে রইল জ্যান্ত ইউরেপুটেরাসের ছবি। আমি মানলাম রূপকথা বা গল্পকথা এই প্রাণী, এই ক্রিপ্টিড মিথ্যা নয়। সে আছে, সে আছে. . .

সুদীপ্ত সমর্থন জানাল তার কথায়।

মাঝরাতে সেই খাতের ভিতর গাড়ির কাছে ফিরে এল সুদীপ্তরা। বার্টন বললেন আজ রাতটা এখানেই কাটানো যাব। বাইরে বেশ ঠান্ডা। গাড়িতে একটাই তাঁবু ছিল। সেটা খাটানো হল মাটিতে। সুদীপ্তরা সব মিলিয়ে পাঁচজন। আবদুল্লা বলল সে গাড়িতেই শোবে। কিন্তু তাঁবুর ভিতর তিনজন লোকের শোবার জায়গা। আর একজন কোথায় শোবে? হেরম্যান সমস্যাটা উত্থাপন করতেই ফাদার প্যাট্রিক বললেন, 'চিন্তা নেই। আমি বাইরেই থাকব।'

সুদীপ্ত বলল, 'কোথায়?'

প্যাট্রিক বললেন, 'কেন এই বালির নীচে। অনেকদিনের অভ্যাসতো ও ভাবে ঘুমানোর। অভ্যাস বদলাতে কিছুদিন সময় লগাবে।'—এই বলে সুদীপ্তদের চোখের সামনেই শুয়ে পড়ে বিছের মতো সর সর করে বালির নীচে ঢুকে গেল বিছে মানুষ টিম্বার বা ঈশ্বরের অনুচর ফাদার প্যাট্রিক।

চাঁদের বাজনা

চাদের এঞ্জামেনা হ্যাবিউট মিউজিয়ামে ঘুরে বেড়াচ্ছিল প্রফেসর জুয়ান আর দীপাঞ্জন। আফ্রিকার প্রাচীন লোকসংস্কৃতির নানা উপকরণ দিয়ে সাজানো এই সংগ্রহশালা। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পোশাক, অলংকার, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি রাখা আছে এখানে। গ্যালারিগুলো দেখতে দেখতে এক সময় তারা প্রবেশ করল একটা ঘরে। নানা ধরনের ঢাক রাখা আছে সেখানে। অদ্ভুত ধরনের সব ঢাক। কোনো ঢাক দেখতে বিরাট ডুগডুগির মতো। কোনোটা দেখতে চোঙাকৃতি, কোনোটা রণভেরীর মতো, কোনোটা আবার ঠিক যেন মাটিতে শোয়ানো বিরাট একটা গাছের গুঁড়ি।

সাকুল্যে জনা কুড়ি টুরিস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে মিউজিয়ামে, বিভিন্ন দেশের মানুষ সব। তাদের গলায় ঝোলানো ফোটো আইডেন্টিটি কার্ড দেখে দীপাঞ্জনরা বুঝতে পারছে ওরাও তাদেরই মতো ইউনেস্কোর প্রোগ্রামেই এখানে এসেছে। নচেৎ মধ্য আফ্রিকার এই ছোট্ট, গরিব দেশটাতে পর্যটকরা খুব বেশি আসে না। তবে এক সময় ইউরোপীয়রা খুব আসত এ দেশে। না, ভ্রমণের জন্য নয়, মানুষ ধরার জন্য। চাদের মানুষদের তারা ধরে নিয়ে যেত দাস বাজারে। ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করার জন্য। দাস বাজারে একটা বড়ো সংখ্যক মানুষের জোগান দিত এই চাদই। তবে এসব দেড়-দুশো বছর আগের কথা। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত শেষ এ-দেশ শাসন করেছিল ফরাসিরা। তারপর চাদ স্বাধীন হয়। এখন এ-এক স্বাধীন দেশ—'রিপাবলিক অব চাদ'। তবে দেশটা স্বাধীন হলেও ঊষর ভূমি, খরাপ্রবণ প্রাকৃতিক পরিবেশ, গৃহযুদ্ধ, সামরিক অভ্যুত্থান ইত্যাদি নানা প্রতিকূলতার কারণে এ-দেশ তেমনভাবে এখনও গড়ে উঠতে পারেনি। এমনকি পৃথিবীর হাতে গোনা যে-কটি দেশে রেলপথ নেই এ-দেশ তাদের মধ্যে একটি, দেশের ৯ শতাংশ রাস্তা মাত্র পাকা। একটিমাত্র বন্দর, তাও সেটা আবার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ক্যামেরুনের অধীনে। তারা সেটা ব্যবহার করতে দেয় চাদকে। রাজধানী এঞ্জামেনা থেকেও তার দূরত্ব প্রায় দু-হাজার কিলোমিটার। কাজেই পর্যটকরা এ-দেশে কেন আসেন তা সহজেই অনুমেয়। তবে হ্যাঁ, এঞ্জামেনাতে এয়ারপোর্ট অবশ্য একটা আছে, যেখানে দু-দিন আগে এসে নেমেছে দীপাঞ্জনরা।

সেই বাদ্যযন্ত্রের ঘরটাতে সবাই এসে দাঁড়াবার পর কৃষ্ণাঙ্গ গাইড ছেলেটা জনতাকে বলল, 'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন ধরনের ঢাক রাখা আছে। এই বিরাট আফ্রিকা মহাদেশের মিশরের মমি আপনারা বহু দেশের মিউজিয়ামে দেখতে পাবেন, হয়তো দেখতে পাবেন আফ্রিকার সিংহ-র মাউন্ট করা দেহ, বা দুর্লভ 'অ্যান্টিলোপ ওরিক্স'-এর শিং। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি এখানে আফ্রিকার প্রাচীন লোকসংস্কৃতির স্মারক হিসাবে যে ঢাকগুলো রাখা আছে পৃথিবীর অন্য দু-তিনটে মিউজিয়াম ছাড়া এ-সব ঢাক দেখতে পাবেন

না। কারণ এই সব ঢাক কথা বলে!'

একটা গুঞ্জন উঠল উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে। 'কথা বলে!'

একজন দর্শক বলে উঠল 'এগুলো কি তালে সেই টকিং ড্রাম অফ আফ্রিকা? আমি একটা বইতে পড়েছি এর কথা!'

গাইড ছেলেটা বলল, 'ঠিক তাই। এগুলো হল আফ্রিকার কথা বলা ঢাক। আফ্রিকার প্রাচীন সংস্কৃতির অঙ্গ। ভাষাকে শব্দে রূপান্তরিত করে এই সব ঢাকের মাধ্যমে দূর থেকে দূরে খবর ছড়িয়ে দেওয়া হত। একদম নিখুঁত খবর, পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ। ইউরোপীয় পর্যটক যখন আমাদের মহাদেশে আসতে শুরু করে তখন একটা ব্যাপারে তারা খুব আশ্চর্য বোধ করত। লিভিংস্টোনসহ বহু পর্যটকের বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে তারা যখন শ্বাপদসংকুল, বা পর্বত মরু অঞ্চলের প্রত্যন্ত কোনো গ্রামে উপস্থিত হতেন তখন তারা দেখতেন সেই গ্রামের মানুষরা আগেই তাদের আগমনবার্তা জেনে তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বসে আছে। কখনও সে অভ্যর্থনা হত মধুর কখনও-বা রক্তক্ষয়ী। তারা বিস্মিত হতেন, কীভাবে আফ্রিকার আদিম জনজাতিরা পেয়ে যেত তাদের আগমন বার্তা? এটা কি অলৌকিক কোনো ব্যাপার? শুধু খবরই নয়, তাদের বিস্তৃত বিবরণ। অভিযাত্রীদের লোক সংখ্যা, অস্ত্র সংখ্যা, এমনকি মাথার চুল বা চোখের মণির রঙের মতো খুঁটিনাটি বিবরণও। আসলে এই ঢাকের বাদ্যিই তাদের যাত্রাপথের খবর পৌঁছে দিত তাদের অগ্রবর্তী গন্তব্যে। এমনকি সাহারা মরুভূমির একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তেও রিলে সিস্টেমে খবর আদান-প্রদান করা হত এই ঢাকের মাধ্যমে। ২৫ সেকেন্ডে ৮ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এই ঢাকের সুরেলা তরঙ্গ। এই ঢাক আফ্রিকা মহাদেশের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ষোড়শ শতক থেকেই ইউরোপীয়রা হানা দিতে শুরু করে আমাদের এই মহাদেশে কখনও তারা আসে ধর্মপ্রচারের জন্য, কখনও সোনা বা হিরের খনির সন্ধানে, কখনও বা ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্য। এই ঢাকের বাদ্যির মাধ্যমেই তাদের উপস্থিতি জানতে পারত আফ্রিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষরা। এবং সেই মতো নিজেদের নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করত। একটা ছোট্ট গল্প বলি আপনাদের। সপ্তদশ শতকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্পেন, পোর্তুগাল, ইটালির মতো দেশগুলো প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ সংগ্রহের লোভে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আক্রমণ ও দখল করতে শুরু করে, এই চাদ, ক্যামেরুন, গ্যাবন, দক্ষিণ আফ্রিকা, কিনিয়া নাইজার, তোগো, সুদান, ইথিওপিয়ার ওপর নেমে আসে শ্বেতাঙ্গদের বর্বর আক্রমণ। ১৮৯৬ সালে আবিসিনিয়া অর্থাৎ বর্তমান ইথিওপিয়া দখলের জন্য আক্রমণ করে ইতালীয় সেনা দল। কিন্তু এই যুদ্ধে তিরধনুক-কুঠার-বর্শা ইত্যাদি সাবেক অস্ত্র শোভিত আফ্রিকার কালো মানুষদের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজয় ঘটে তথাকথিত সভ্য বন্দুকধারী শ্বেতাঙ্গ ইটালিয়ানদের। কারণ আবিসিনিয়ার রাজা মেনালিক সে-দেশে ইতালীয়রা পৌঁছোবার অনেক আগেই এই কথাবলা ঢাকের মাধ্যমে ইতালীয় সেনা শক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পেয়ে তাদের প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি নিয়ে ছিলেন। আফ্রিকাতে বহু ভাষাগোষ্ঠীর বাস। মাসাই, জুলু, বান্টু, হাউমা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা। তারা সবাই এ-ঢাকের ভাষা বুঝলেও ইউরোপীয়রা তা বুঝত না। এক সময়

ফরাসি শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ হয়েছিল আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ। যাতে এই বিভিন্ন দেশগুলো একত্রে ফরাসি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করতে পারে তাই তাদের মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছিল ফরাসি সরকার। আর তার সাথে সাথে খবর আদান-প্রদান বন্ধ করতে নিষিদ্ধ করেছিল এই ঢাক। কেউ এই ঢাক বাজালে তার ফাঁসি হত। তবে আফ্রিকার বিভিন্ন গৃহযুদ্ধেও এই ঢাক ব্যবহৃত হয়েছে।

লোকটা কথা শেষ করার পর একজন দর্শনার্থী জিজ্ঞেস করল 'এ ঢাকগুলো কীভাবে কাজ করে?'

প্রশ্ন শুনে গাইড একটা ঢাকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে ঢাকটা দেখতে অনেকটা ডুগডুগির মতো। তবে আকারে অনেকটা বড়ো। দীপাঞ্জনের সেটাকে দেখে অনেকটা কলকাতার ফুচকাঅলাদের বাখারির তৈরি স্ট্যান্ডের মতো লাগল। কাঠের কাঠামো পেটটা সরু, দু-পাশটা চওড়া, সেখানে চামড়ার আচ্ছাদন। সেই চামড়ার আচ্ছাদন থেকে চামড়ার ফিতা টান করে বাঁধা তার ঘর পেটের কাছে। আকারে ফুচকাঅলাদের স্ট্যান্ডের মতোই ফুট চারেক হবে। তার পাশেই ঢাকটা বাজাবার জন্য দুটো কাঠের লাঠি রাখা আছে। তার মাথাটা বাঁকানো। ঠিক যেন দেখতে গলফ খেলার স্টিক।

গাইড বলল, 'এই যে ঢাকটা দেকছেন, এ ঢাক যখন বাজানো হয় তখন বাদকের সহকারীরা এর পেটে ফিতাগুলোকে টান করে ধরে বিভিন্ন শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করার জন্য। আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর মূল ভাষাগুলো সাধারণত সুরেলা। এই ঢাকের শব্দও সাধারণত সুরেলা হয়। আফ্রিকা মহাদেশের মূল ভাষা ২৬টি। ৮টি ভাষায় ২টি ছন্দ আছে। উঁচু এবং নীচু। ৬টি ভাষায় ৪টি ছন্দ। উঁচু, খুব উঁচু, মাঝারি এবং নীচু। বাকি ১২টি ভাষায় তিন রকম ছন্দ। উঁচু, মাঝারি ও নীচু। এই ঢাকগুলো বাজাবার সময় ছন্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছন্দের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীও এই ঢাকের কথা বুঝতে পারে। চারপাশের এই যে বিভিন্ন ঢাক দেখতে পারছেন এগুলো বিভিন্ন উপজাতির। মাসাই, পিগমি, তুতমি, হুটু, হাউমা, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর। কিন্তু এদের ধ্বনি, কথা অন্য উপজাতি বুঝতে পারে।'

তার কথা শোনার পর একজন লোক জানতে চাইল, 'এ ঢাকের ব্যবহার কি এখনও আছে? না উঠে গেছে?'

দীপাঞ্জন তাকাল তার দিকে। লোকটার চোখে সোনার পারকোল, পরনে ট্যুইট স্যুট, সাদা চামড়া, খাড়া নাক, লাল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক।

গাইড ছেলেটা জবাব দিল, 'না না, এখনও ঢাকের ব্যবহার পরোপুরি উঠে যায়নি। যদিও এটা ই-মেল, ইন্টারনেট, কম্পিউটারের যুগ তবুও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এখনও এমন প্রত্যন্ত অঞ্চল আছে যেখানে খরচ পোষাবে না বলে কোম্পানিরা এ-সবের ব্যবস্থা করেনি। যেমন সাহারা মরুভূমি সহ আমাদের দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, যেখানে আধুনিক স্যাটেলাইট ব্যবস্থা তো দূর অস্ত, এমনকী ডাকঘর পর্যন্ত নেই সেখানে। সরকারি বিভিন্ন খবর, যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আগাম পূর্বাভাস, জনহিতকর সরকারি প্রকল্পসহ নানা খবর এই ঢাকের মাধ্যমেই দেশের নানা প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়। তাছাড়া আরও একদল লোক এই ঢাক ব্যবহার করে খবর আদান-প্রদানের জন্য।'

'তারা কারা?' জানতে চাইল অন্য এক দর্শনার্থী।

গাইড ছেলেটা যেন শেষ কথাটা মুখ ফসকে বলেছিল। প্রশ্নটা শুনে একটু ইতস্ততভাবে বলল, 'আসলে এদেশে বহুবছর ধরে নানা গোষ্ঠীসংঘর্ষ, ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছে। বেশ কিছু টেররিস্ট গোষ্ঠী আছে যারা এই ঢাক ব্যবহার করে। এ-বিষয় নিয়ে আপনারা আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না।'

প্রফেসর জুয়ান বললেন, 'তার মানে, এখনও এ ঢাক বাজানোর লোক আছে! এখনও এ-ঢাক তৈরি হয়!'

গাইড ছেলেটা বলল, 'হ্যাঁ, হয়। লেক চাদের ধারে কয়েকটা উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম আছে। সেখানে এ-ঢাক বানানো হয়। হ্যাঁ, বংশপরম্পরা কিছু মানুষ আজও এ ঢাক বাজাতে পারে। এই যেমন আমি। দাঁড়ান, আমি আপনাদের একটা ঢাক একটু বাজিয়ে দেখাই। এই বলে সে পা ঢাকা দুটো ড্রাম স্টিক বা ঢাকের কাঠি তুলে নিয়ে তার বাঁকানো দিকটা দিয়ে ঢাকটা বাজাতে শুরু করল। প্রথমে ধীর লয়ে আওয়াজ উঠল-ঢিপঢিপ, ঠ্যাপঠ্যাপ, তারপর সেটা বদলে গেল দ্রিমি দ্রিমি শব্দে। বিভিন্ন লয়ে বাজাতে লাগল সেই ছন্দবদ্ধ শব্দ। তারপর সেই শব্দ পরিণত হল এক সুরেলা, ছন্দবদ্ধ ধ্বনিতে। কখনও থেমে থেমে, কখনও বা ছন্দবদ্ধভাবে বেশ খানিকক্ষণ ধরে ছেলেটা বাজাল সেই ঢাক। তারপর বাজনা থামিয়ে ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে হেসে মন্তব্যের প্রত্যাশায় তাকাল উপস্থিত জনতার দিকে। সবাই হাততালি দিল তার বাজনা শুনে। দীপাঞ্জন ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী কথা বললে এই ঢাক বাজিয়ে?' সে হেসে বলল, আমি বললাম, 'একদল মানুষ এসেছে আমাদের দেশে। তাদের মধ্যে সাদা চামড়া, কালো চামড়া, পীত চামড়া নানা ধরনের মানুষ আছে। কলের পাখির পেটে চেপে এসেছে তারা। তাদের কাছে আগুন ছোড়া লাঠি অর্থাৎ বন্দুক নেই। তারা আমাদের ধরতে বা মারতে আসেনি। এরা সব ভালো মানুষ। বন্ধু মানুষ। সরকারি অতিথি তারা। তাদের কেউ যদি তোমাদের কাছে যায়, তাকে তোমরা সাহায্য কোরো।'

দীপাঞ্জন বলল, 'বাবা, এত কথা! তোমার এই ঢাকের শব্দ কতদূর পৌঁছল?'

গাইড ছেলেটা প্রথমে হেসে বলল, 'কথা বলা ঢাকের বৈশিষ্ট্যই হল বিস্তৃতভাবে কথা বলা। আর শব্দটা কতদূর পৌঁছল এই বলে সে ঘরের বিরাট বড়ো জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কানখাড়া করে কী যেন শোনার চেষ্টা করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার মুখে আবছা একটা হাসি ফুটে উঠল। দীপাঞ্জনকে ইশারায় জানলার সামনে ডেকে সে বলল, 'বাইরে থেকে কোনো নতুন শব্দ শুনতে পাচ্ছেন? ভালো করে শোনার চেষ্টা করুন।'

শোনার চেষ্টা করল দীপাঞ্জন। শহরের নানা শব্দ ছাপিয়েও অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে অস্পষ্ট একটা শব্দ। ঢাকের শব্দ। দীপাঞ্জন সন্দেহ নিরসনের জন্য গাইড ছেলেটাকে বলল, 'ওটাও কি ঢাকের শব্দ?'

সে বলল, 'হ্যাঁ, শহরের বাইরে গ্রামটার দূরত্ব এখান থেকে পাঁচ মাইলেরও বেশি। ওরা এই ঢাকের বাজনা শুনে খবরটা ছড়িয়ে দিচ্ছে। শব্দহীন নির্জন মরুভূমি বা অরণ্য প্রদেশে আট-দশ মাইল দূরেও এই ঢাকের শব্দ পৌঁছয়।'

'ওকে, জেন্টলমেন। আপনারা প্রয়োজনবোধে আর একবার মিউজিয়ামটা ঘুরে দেখতে পারেন।' দর্শকদের দিকে তাকিয়ে একথা বলে তার কাজ শেষ করল ছেলেটা।

এটাই মিউজিয়ামের শেষ ঘর ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেল। রয়ে গেল শুধু চারজন। প্রফেসর জুয়ান, দীপাঞ্জন, সেই সোনার চশমা পরা লোক আর গাইড ছেলেটা। জুয়ান বাদ্যযন্ত্রগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে দীপাঞ্জনকে বললেন, 'ইউরোপীয়রা তাদের সাদা চামড়ার গর্বে আফ্রিকানদের অসভ্য-বর্বর বলত। কিন্তু তুমি একবার ভাবো টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের আগে তারা তাদের নিজস্ব কৌশলে কী অদ্ভুতভাবে বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা করেছিল। এও তো বিজ্ঞান! শব্দ বিজ্ঞানের ওপর যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে এ কাজ সম্ভব নয়।'

ঠিক এই সময় তাদের কানে এল পারকোল লাগানো সেই লোকটা গাইড ছেলেটার উদ্দেশে বলল, 'যে গ্রামে এই ঢাক তৈরি হয় সব গ্রাম তুমি চেনো?'

গাইড ছেলেটা হেসে বলল, 'চিনব না কেন? ওরকম একটা গ্রামেইতো আমার জন্ম।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে তুমি সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?'

ছেলেটা এবার একটু বিস্মিতভাবে জানতে চাইল, 'ওখানে গিয়ে আপনি কী করবেন?'

লোকটা বলল, 'আমার নাম শ্যাঁপেলিও। জাতে ফরাসি। গতকালই আমি এ দেশে এসেছি। ফ্র্যান্সে আমার একটা বাদ্যযন্ত্রের মিউজিয়াম আছে। বিভিন্ন দেশের দুষ্প্রাপ্য বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করি আমি। যেমন আমাজনীয়দের রনডেডর বাঁশি, প্রাচীন তুর্কি বীণ, দ্বিতীয় ঝাঝর, ভারতীয়দের মাপের বাঁশি, ওলন্দাজদের নৌ-ভেরি, এমন নানা বাদ্যযন্ত্র আমার সংগ্রহেতে আছে। যা নেই তা হল এই কথা বলা ঢাক। এটা সংগ্রহ করতেই আমি এদেশে এসেছি।' গাইড ছেলেটা একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তা নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। আমার তো আর এখন এ মিউজিয়ামে কোনো কাজ নেই। ইউনিস্কোর টিমটা এসেছিল তাই আমার ডাক পড়েছিল। এখানে টুরিস্ট তেমন আসে না। সারা বছর এ জায়গা ফাঁকাই থাকে। তবে আপনার সাথে কি আরও লোকজন আছে? আসলে সেখানে পৌঁছবার জন্য মারি নদীর অববাহিকা ধরে তৃণভূমির মধ্যে দিয়ে প্রায় দুদিনের পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে। এবং সেই পথের অধিকাংশটাই পায়ে হেঁটে। রাস্তাটা সোজা, কিন্তু ঘাসবনে সিংহ আছে, চিতা আছে, হায়না আছে, আর আছে প্রচুর সংখ্যায় হাতি। কাজেই দলে ভারী থাকলে বিপদের সম্ভব কম, বন্যজন্তুরা চট করে কাছে ঘেষে না। তা, কী ঢাক কিনতে চান? ডোঙ্গো? লুনা? গ্যানগ্যান?'

শ্যাঁপেলিও শুনে বললেন, 'না, আমার সঙ্গে কেউ নেই। আমি যা খুঁজছি তা শুধু এখানে আর মেনেগালে মেলে।' ফুলানি ট্যামেট্যাম 'ফুলানি ট্যামট্যাম!' মৃদু চমকে উঠে কথাটা

একবার উচ্চারণ করল ছেলেটা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ সে ঢাকের সন্ধান আমার জানা আছে ঠিক এই মুহূর্তে দীপাঞ্জনকে অবাক করে জুয়ান তাদের উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'আমরা আপনাদের সঙ্গী হলে আপত্তি আছে?' তার কথা শুনে শ্যাঁপেলিয়ও আর গাইড ছেলেটা দুজনেই অবাক হয়ে তাকাল দীপাঞ্জনের দিকে। শ্যাঁপেলিয়ার বললেন, 'আপনারা প্রফেসর স্মিত হেসে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমার নাম প্রফেসর জুয়ান। স্পেনের ক্যানারি ইউনিভার্সিটিতে মেমো-অ্যামিরিকান সভ্যতার ইতিহাস পড়াই। এখানে ইউনেস্কোর এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলাম। আর এ আমার ভ্রমণপিপাসু ভারতীয় বন্ধু—'শেন।'

দীপাঞ্জনের খাঁটি বাঙালি পদবি 'সেন'। জুয়ানের জিভে 'শেন' উচ্চারণ হয়।

দীপাঞ্জনও এগিয়ে এল। শ্যাঁপেলিও তাদের দুজনের সাথে করমর্দন করার পর জুয়ান এবার বললেন, 'আপনাদের দু-জনের কথা কিছুটা অবাঞ্ছিতদের মতোই শুনছিলাম। তবে এগিয়ে না এসে আর থাকতে পারলাম না। আমার এখানকার কাজ শেষ। এ দেশে সম্ভবত আর আসা হবে না। মনে মনে ভাবছিলাম 'লেক চাদ'টা যদি দেখা যেত। আফ্রিকার 'লেক ট্যাঙ্গানিকা' বহু পর্যটকই দেখেন, কিন্তু চাদ হ্রদ দেখা হয় না। তাছাড়া, আমি প্রাচীন জনজাতির সংস্কৃতির ব্যাপারে আগ্রহী। আপনারা যদি আমাদের সঙ্গী করেন তাহলে উভয়পক্ষের সুবিধা। খরচের ব্যাপারটাও আধাআধি করা যাবে।'

ভদ্রলোক প্রস্তাবটা শুনে মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, 'আমার কোনো আপত্তি নেই।' তারপর গাইড ছেলেটার উদ্দেশে বললেন, 'তোমার কী নাম? কখন, কীভাবে যাত্রা শুরু করা যেতে পারে?'

ছেলেটা বলল, 'আমার নাম, এমি কুস্যি।' তারপর সে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাবার জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। একটা তাঁবু, একটা বন্দুক, আরও কিছু জিনিস হাত ভাড়া নিতে হবে। কিছু জিনিস কিনতেও হবে। তবে সবই কাছাকাছি পাওয়া যায়। হাজার দুই ফ্রাঙ্ক পেলে আমি সব ব্যবস্থা করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেড়িয়ে পড়তে পারব। আশাকরি তাহলে কাল সন্ধ্যার আগেই চাদ হ্রদে পৌঁছে যাব।'

তার কথা শুনে পকেট থেকে পার্টস বার করলেন শ্যাঁপলিয়র।

এমি ছেলেটা সত্যিই করিৎকর্মা। দীপাঞ্জনরা মিউজিয়াম থেকে নিজেদের হোটেলে ফিরে আসার একঘণ্টার মধ্যেই সে সব বন্দোবস্ত করে চালকসমেত একটা গাড়িতে শ্যাঁপলিয়কে তার ডেরা থেকে তুলে নিয়ে হাজির হল তাদের দরজায়। তারপর তারা বেড়িয়ে পড়ল চাদ হ্রদের খোঁজে।

ছোট্ট শহর এঞ্জামেনা অতিক্রম করতে তাদের বেশি সময় লাগল না। শহরের পর পথের পাশে মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো গ্রাম। পাতায় ছাওয়া কুটির। মুরগি, গোরু চড়ে বেড়াচ্ছে আশেপাশে। মানুষগুলো সব ছোটোখাটো চেহারার। মাসাইদের মতো লম্বা নয়। আফ্রিকান বলতেই তো সাধারণত চোখে ভেসে ওঠে বর্শা হাতে দীর্ঘদহী মাসাইয়ের ছবি। এদের পুরুষদের পরনে আলখাল্লা, মেয়েদের পরনে রঙচঙে পোশাক, মাথায় রঙিন কাপড়ের ফেট্টি। এমি বলল, 'এরা হলো সারা জনগোষ্ঠীর লোক। ধর্মে মুসলমান। এ দেশে তিন ধর্ম

প্রচলিত হয়। ইসলাম, খ্রিস্টান আর সনাতন লৌকিক ধর্ম। জনশ্রুতি অনুসারে চাদের প্রাচীনতম অধিবাসীরা বসবাস করত চাদ হ্রদের অববাহিকার উত্তর-পূর্ব কোণে। সেখানে রাজা কানেম-বরনু এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। তার রাজ্যের নামও হয় কানেম-বরনু। খুব দুর্ধর্ষ ছিল তারা। কানেম-বরনুর লোকেরা এই নিরীহ সারা জনগোষ্ঠীর লোকেদের ধরে নিয়ে দাসবাজারে বিক্রি করত। এ লোকগুলো ছোটোখাট দেখতে হলেও প্রচণ্ড পরিশ্রমী। যে কারণে ইউরোপীয়নদের তুলোর খেতে এদের খুব কদর ছিল।' এমির একথা শুনে দীপাঞ্জনের মনে পড়ে গেল বিখ্যাত উপন্যাস 'আঙ্কেল টমস্ কেবিন'-এর কথা।

বেশ কিছুপথ চলার পর একটা গ্রাম দেখিয়ে এমি বলল এটা হল সেই গ্রাম, যারা ঢাকের শব্দের প্রত্যুত্তর জানিয়ে ছিল। শ্যাঁপেলিও দীপাঞ্জনের বলল, 'জানেন এই কথা বলা ঢাকগুলো যেমন অদ্ভুত দেখতে তেমনই অদ্ভুত তাদের নাম। সেনেগালে এ ঢাকের নাম 'টামা'। নাইজার, বেনিন, চাদে যে ঢাক বাজে তার নাম 'গ্যানগ্যান' আর 'লুনা'। সেন্ট্রাল ঘানায় আর-এক ধরনের ঢাক আছে তাকে বলে 'ডোনডো'। আবার ফাঁপা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে লম্বা যে ঢাক বানানো হয় তার নাম 'ট্যামট্যাম'। এই ঢাক মাসাইল্যান্ডে বেশি ব্যবহৃত হলেও আফ্রিকা মহাদেশের সর্বত্রই এর ব্যবহার আছে।'

এমি তার কথা শুনে প্রশংসাসূচকভাবে বলল, 'বাঃ আপনি এ ব্যাপারে বেশ পড়াশোনা করে এসেছেন দেখছি।'

তারপর সে বলল, 'আমরা এবার এঞ্জামেনা-চাদ ন্যাশানাল হাইওয়ে ধরব।'

দীপাঞ্জন সামনে তাকিয়ে দেখল, সামনে কিছুটা তফাতে পিচ রাস্তা শেষ হয়েছে। তারপর মাটির রাস্তা সামনের দিকে এগিয়েছে। সে এমিকে বলল, 'সামনে কোথায় হাইওয়ে? এ তো মাটির রাস্তা! তুমি মজা করছ?'

এমি উত্তর দিল, 'না, মজা করছি না। আমাদের দেশের এক শতাংশ রাস্তাও পাকা নয়। এই মাটির রাস্তাটাই ন্যাশানাল হাইওয়ে। তাও এই রাস্তাটা একসময় হাতি চলাচলের ফলে হয়েছিল। আমাদের দেশের নিরানব্বই শতাংশ রাস্তাই মাটির।'

রাস্তার একপাশে ঘাসের বন, অন্যদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর। মাঝে মাঝে দু-একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এমি জানাল ওই গাছগুলোর নাম 'আকাকিয়া'। চাদে এ গাছ দেখা যায়। কখনও বা ঝোপজঙ্গলের ফাঁক দিয়ে মাঝেমাঝে একটা রুপোলি রেখা চিকচিক করছে। ওটা সারি নদী। ওরই সমান্তরাল রাস্তা ধরে এগোচ্ছে দীপাঞ্জনদের গাড়ি।

আরও বেশ কিছুটা এগোবার পর এবারও একটা গ্রাম চোখে পড়ল। এমি বলল, 'এটাই এ পথের শেষ গ্রাম।'

কিন্তু এ গ্রামে দাঁড়িয়ে পড়তে হল দীপাঞ্জনদের। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে একদল নারী-পুরুষ। এমি বলল, এদের 'টোলট্যাক্স' দিতে হবে। নজরানা। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এই ব্যবস্থা।'

তার কথা শুনে শ্যাঁপেলিও তার পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু, এমি বলল, 'না, না, ওসব কিছু নয়, অন্য ব্যবস্থা আছে। এমি বেশ কয়েকটা কার্ডবোর্ডের বাক্স গাড়িতে তুলেছিল। তার একটা খুলে সে বার করল কয়েকটা সস্তা দামের টিনের আয়না, পুঁতির মালা,

রঙিন রুমাল, প্লাস্টিক আর কাঠের তৈরি ছোটো ছোটো কয়েকটা খেলনা। সেগুলো দেখে জনতার মধ্যে থেকে একজন লোক এগিয়ে এল তার দিকে। লোকটার পরনে একটা মাথা শুদ্ধ চিতাবাঘের চামড়া। চিতার মাথাটা দন্তবিকশিত করে জেগে আছে তার কাঁধের কাছে। লোকটার গলায় রংবেরঙের নানা পাথরের হার। এমি হাত থেকে সে জিনিসগুলো তুলে নিয়ে তার এক সঙ্গীর হাতে দিল। তারপর কোমর থেকে সুতলিবাঁধা এক গোছা চুলের মতো জিনিস বার করে দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলে সেটা বেঁধে দিল এমির বাঁ-হাতের কবজিতে।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করার পর এমি বলল, 'দেশটা খুব গরিব। সামান্য জিনিস পেলেই খুশি হয় এরা। ওই সামান্য জিনিসের জন্য আপনার হয়ে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে কোনো খবর পৌঁছে দিতে পারে। একসময় ইউরোপীয়রা তামাকের বদলে হিরা সংগ্রহ করত আফ্রিকার গ্রামে। আমি দু-বাক্স টুকিটাকি এ ধরনের জিনিস এনেছি। প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে। চিতার চামড়া পরা লোকটা হল গ্রামের ওঝা। ও মন্ত্র পড়ল যাতে আমরা বিপদ থেকে রক্ষা পাই। আমার হাতেও সিংহের লোম বেঁধে দিল যাতে ভূতপ্রেত কোনো ক্ষতি না করে।'

তার কথা শুনে শ্যাঁপেলিয়র বললেন 'হ্যাঁ, তামাকের বিনিময় হিরা সংগ্রহের ব্যাপারটা শুনেছি। আমার পূর্বপুরুষরাও করে ছিলেন। বিশেষত মধ্য আফ্রিকা থেকে এ ভাবে হিরা সংগ্রহ করা হত।'

প্রফেসর জুয়ান এবার হঠাৎ তার উদ্দেশে বললেন, 'মঁশিয়ে শ্যাঁপলিও, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করবেন না, আপনার পেশাটা কী? ওই মিউজিয়াম চালানো?'

শ্যাঁপলিও হেসে বললেন, 'ওই মিউজিয়ামটা আসলে শখের ব্যাপার। লোকজন জিনিসগুলো দেখে তাতে তৃপ্তি পাই আমি। সেখানে আয়ের চেয়ে খরচ অনেক বেশি। আমি আসলে বংশপরম্পরায় হিরা ব্যবসায়ী। জেম মার্চেন্ট।

তার কথা শুনে দীপাঞ্জনরা বুঝতে পারল, সারা পৃথিবী ঘুরে এত পয়সা খরচ করে শ্যাঁপলিও কীভাবে বাদ্যযন্ত্রগুলো সংগ্রহ করেন। আসলে ভদ্রলোক খুব ধনী।

আরও ঘণ্টা খানেক পথ চলার পর দিগন্তবিস্তৃত এক সবুজ প্রান্তরে এসে থেমে গেল গাড়িটা। সোজা পথ এখানে এসে থেমেছে। এমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে বলল, গাড়ি আর যাবে না। এবার হাঁটা পথ।

যতদূর চোখ যায় শুধু তৃণভূমি। সারা নদীকে পশ্চিমে রেখে রেখে উঁচু-নীচু ঢাল বেয়ে দিগন্তবিস্তৃত ঘাসের প্রান্তর চাদ হ্রদে গিয়ে উত্তরে মিশেছে। আর পূর্বে এর প্রান্তসীমা সাহারা মরুভূমি। সারা নদীর পশ্চিমে আর একটা নদীও সারা-র সমান্তরাল চলছে। তার নাম 'লোগোন'। সারা এবং লোগোন, এই দুই নদীই চাদ হ্রদে গিয়ে মিশেছে। গাড়ির থেকে

জিনিসপত্র নামিয়ে সেগুলো ভাগাভাগি করে নেওয়া হল বহন করার জন্য। তারপর সারা নদীকে বাঁ পাশে রেখে তার পাড় বরাবর সিকি মাইল তফাতে হাঁটা শুরু করল সবাই। সবার আগে এমি বন্দুক হাতে। সে শুধু একবার সবাইকে সতর্ক করে বলল, 'উঁচু ঘাসের জঙ্গল দেখলে একটু সতর্ক থাকবেন। ওখানে চিতা-লেপার্ড লুকিয়ে থাকে।'

সূর্যের তেজ এখনও থাকলেও নদীর দিক থেকে বাতাস এসে আন্দোলিত করছে ঘাসবন। তাই চলতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছিল না দীপাঞ্জনদের। যাত্রাপথের প্রথমে তারা দেখতে পেল এক দল অ্যান্টিলোপ। আর তারপরই অনেক দূর থেকে দেখতে পেল সবুজ জমিতে ধূসর পাথরের স্তূপ। এক দঙ্গল হাতি। সংখ্যায় প্রায় তিরিশ-চল্লিশটা হবে। মাইলখানেক দূর থেকে তাদের অনুচ্চ পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছে। এমি বলল, 'এ দেশে আর কিনিয়াতে হাতির সংখ্যা খুব বাড়ছে। সরকারি উদ্যোগে হাতি নিধনও করা হচ্ছে এ সব দেশে। আন্তর্জাতিক পশুপ্রেমীরা এ-নিয়ে বেশ শোরগোলও তুলছে। তবে সরকারের হাতি নিধনের পিছনে আরও একটা কারণ আছে। এখানে বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীরাও হাতি মারে চোরা শিকারিদের মাধ্যমে। হাতির দাঁত জঙ্গিদের অর্থের জোগান দেয়। যা দিয়ে তারা অস্ত্রশস্ত্র কিনে সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। হাতির দাঁতগুলো যাতে তাদের দখলে না যায় সেটাও সরকারি উদ্যোগে হাতি নিধনের একটা কারণ।'

এগিয়ে চলল দীপাঞ্জনরা। সূর্যও মাথার ওপরে চলতে লাগল তাদের সাথে। তাদের চোখে পড়তে লাগল, নানা ধরনের হরিণ, অ্যান্টিলোপ। দলে দলে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এই গেজিং-ফিল্ড বা চারণভূমিতে। এমি বলল, 'হরিণ আর অ্যান্টিলোপের মধ্যে মূল পার্থক্য হল, অ্যান্টিলোপের শিং-এ কোনো শাখাপ্রশাখা থাকে না, এবং তাদের শিং দুটো পরস্পর সমান্তরালে থাকে।'

বিকাল হল এক সময়। তাদের যাত্রাপথে হঠাৎ দেখা গেল মাটির মধ্যে ভাতের থালার মতো গর্ত। হাতির পায়ের দাগ। বিরাট একটা দল কিছু আগে সামনের দিকে এগিয়েছে। কাজেই তাদের থেকে তফাতে চলার জন্য নদীর দিকে বেশ কিছুটা সরে হাঁটতে লাগল তারা। আর তাদের এই যাত্রাপথ পরিবর্তনই একটা বিরল দৃশ্য দেখার সুযোগ করে দিল কিছুক্ষণের মধ্যেই। জুয়ান হঠাৎ নদীর দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'আরে ওই দেখো!'

সবাই তাকাল সে দিকে। সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। তার লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে নদীর জলে। আর শেষ বিকালের আলোতে সারি নদীর পাড়ে জলক্রীড়ায় মেতে উঠেছে একপাল জলহস্তী! জলে দাপাদাপি করছে, আকাশের দিকে জল ছেটাচ্ছে বিশালাকার প্রাণীগুলো। অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য! জুয়ান, দীপাঞ্জন, শ্যাঁপলিও সবাই ছবি তুলল সে দৃশ্যর।

এরপর আবার চলা। সূর্য ডুববার কিছু আগে তারা বেশ উঁচু একটা টিলা মতো জায়গাতে পৌঁছে গেল। হয়তো একসময় এখানে বিরাট কোনো প্রস্তরখণ্ড ছিল। এখন তা ঘাসের চাদরের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। টিলার মাথায় তাঁবু ফেলার জন্য স্থান নির্বাচন করা হল। তাঁবু ফেলা হল সেখানে। অন্ধকার নামল কিছুক্ষণের মধ্যে। খাওয়া সেরে দীপাঞ্জনরা তাঁবুর ভিতর গল্প গুজব শুরু করল। রাতও বেড়ে চলল। একসময় এমির ডাকে তাঁবুর বাইরে

বেরিয়ে এল তারা। চাঁদের আলোতে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সারি নদী চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়। এমি আঙুল তুলে টিলার নীচের দিকটা দেখালো। দলে দলে হরিণ, অ্যান্টিলোপ, এমনকি কয়েকটা হাতিও চলেছে রাতের অন্ধকারে সারি নদীতে জলপানের জন্য। ছায়ামূর্তি সব। শুধু অন্ধকারে তাদের চোখগুলো জ্বলছে। দীপাঞ্জনরা নীচে তাকিয়ে দেখতে লাগল সেই অদ্ভুত দৃশ্য! নানা ধরনের অবয়ব। সে মিছিল যেন শেষ হচ্ছে না! হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কোনো একটা প্রাণীর আর্তনাদ ভেসে উঠল নদীর দিক থেকে! এমি বলল, 'গ্যাজেলের ডাক। একধরনের তৃণভোজী। হরিণের নিকট আত্মীয়। সম্ভবত কুমির টেনে নিল তাকে। এখানকার সব নদীতে, চাদ হ্রদেও প্রচুর কুমির আছে।'

আর এরপরই শোনা গেল নদীর পাড় থেকে 'হ্যা হ্যা শব্দে কাদের যেন হাসি। এমি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কুমিরের বদলে হায়না হতে পারে। ওটা হায়নার ডাক।' এরপর সে বলল, 'চলুন, এবার শুয়ে পড়তে হবে। কাল খুব ভোরে যাত্রা শুরু করব আমরা।'

দীপাঞ্জনরা তাঁবুতে ঢুকতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় মেঘের ডাকের মতো আর একটা গুরু গুরু শব্দ কানে এল তাদের। না, আকাশে তো কোনো মেঘ নেই। এমি কান খাড়া করল সঙ্গে সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বলল, 'ঢাকের শব্দ। কথা বলা ঢাকের শব্দ! আমাদের যাত্রাপথের খবর জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে দূরবর্তী গ্রামকে। আমরা না দেখলেও তারা আমাদের দেখেছে। সম্ভবত এই সাভানা প্রান্তর বা নদীতীরের কোনো যাযাবর গোষ্ঠী।'

জুয়ান জানতে চাইলেন, 'ঠিক কী বলছে ওরা?'

এমি ভালো করে শব্দটা শোনার পর বলল, 'ঢাক বলছে, চারজন মানুষ সারি নদীর পাড় বরাবর চাদ হ্রদের দিকে যাচ্ছে। দুজন সাদা, একজন কালো, আর-একজন সাদা কালোর মাঝামাঝি রঙের। তবে তারা শিকারি নয়। একজনের হাতে শুধু 'আগুন ছোড়া লাঠি' অর্থাৎ বন্দুক আছে। সম্ভবত তারা সরকারি লোক হতে পারে। তবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সতর্ক থাকা প্রয়োজন . . .।'

দীপাঞ্জনরা তাঁবুকে ঢুকে এরপর শুয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরেও যেন সে শুনতে থাকল মেঘ গর্জনের মতো সেই ঢাকের শব্দ! রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছিল। হাড়ে যেন কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিল সবার। তাঁবুর ভিতর গুটিসুটি মেরে শুয়ে রইল সবাই। তবে রাতটা নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। পরদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই আবার সারি নদীর পাড় ধরে যাত্রা শুরু হল। বেলা এগোবার সাথে সাথেই প্রচণ্ড গরম শুরু হল। গরমে হাঁসফাঁস করতে লাগল দীপাঞ্জন। জুয়ান আর শ্যাঁপেলিওর অবস্থা আরও করুণ। সারা দেহ ঘামে ভিজে উঠল তাদের। আর এরই মাঝে এক শ্বাপদের দর্শন পেল তারা। তৃণভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে যে দু-একটা গাছ আছে তারই একটাতে বসে ছিল একটা চিতা। সূর্যের আলোতে ঝলসাচ্ছে তার সোনালি দেহ। তবে সেই চিত্রক মহারাজ তাদের কিছু বলল না। অবজ্ঞার ভঙ্গিতে এই দো-পেয়ে জীবগুলোর প্রতি শুধু একবার তাকাল, তারপর সম্ভবত কোনো শিকারের আশায় তাকিয়ে রইল তৃণভূমির দিকে। দীপাঞ্জনরা কিছুটা তফাত দিয়ে পেরিয়ে গেল সে জায়গা।

তবে এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আরও কয়েকজনকে তারা দেখতে পেল। চিতা নয়

মানুষ। জনা পনেরো মানুষের একটা দল তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য এগিয়ে এল। সাভানার যাযাবর গোষ্ঠী তারা। কয়েক জনের পিঠে বিরাট হাতির দাঁত ঝুলছে। হাতির দাঁত বিক্রি করতে চায় তারা। এমি তাদের জানিয়ে দিল যে ব্যাপারটাতে তারা আগ্রহী নয়। তার সঙ্গীরা সরকারি লোক, সরকারের অতিথি, বিশেষ কাজে তারা চাদ হ্রদে যাচ্ছে। সরকারি লোক শুনে ভয় পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে হাতির দাঁত সমেত হাওয়া হয়ে গেল।

তারা চলে যাবার পর এমি হেসে বলল, 'এক একটা দাঁতের দাম মাত্র একশো ডলার চাইছিল ওরা। ইউরোপের বাজারে এর দাম তিরিশ হাজার ডলার হবে। বহু নিরীহ পর্যটক এ দাঁত কিনে ঠকেছে। শহরে এ দাঁত নিয়ে গেলেই পুলিশ ধরবে আপনাকে। দাঁত তো বাজেয়াপ্ত হবেই, সঙ্গে মোটা অঙ্কের জরিমানা। আর তা না দিতে পারলে নিশ্চিত জেল।'

দীপাঞ্জন বলল, 'এ লোকগুলোর কাছেও কি ঢাকের বাদ্যির মাধ্যমে আমাদের আগমন বার্তা পৌঁছেছে? নইলে কোথা থেকে উদয় হল এরা?'

এমি জবাব দিল, 'সম্ভবত তাই'। তারপর সে বলল, 'কাল মাঝরাতেও ঢাক বেজেছে। আমরা যে দিকে যাচ্ছি সেই উত্তর দিক থেকে আসছিল শব্দ। কারা যেন ঢাক বাজিয়ে জানতে চাইছিল আমাদের অবস্থান, চাদের দিকে আমরা কতটা এগিয়েছি। প্রশ্নর জবাবে যেন একটা ঢাক জানান দিল যে তারা আমাদের তখনও দেখেননি। প্রথম ঢাকের শব্দের ধ্বনি শুনে মনে হল যে তারা খুব কৌতূহলী আমাদের ব্যাপারে।'

যতটা সম্ভব দ্রুত পা চালাতে লাগল সকলে। মাঝে হয়তো মিনিট দশেকের জন্য বিশ্রাম, তারপর আবার চলা। নদীর পাড়ের জঙ্গল এক সময় ঘন হয়ে উঠতে শুরু করল। এমি বলল, 'আমরা যে চাদের কাছাকাছি পৌঁছচ্ছি এটা তার প্রমাণ।'

বেলা বারোটা নাগাদ উঁচু একটা টিলার ওপর উঠে এল তারা। এমি উত্তর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই দেখুন।'

দিগন্তে নীল আকাশ যেখানে মাটির সাথে মিশেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা রুপোলি রেখা। চাদ হ্রদ। সেই রেখাকে আবৃত করে একটা কালো রেখাও আছে। চাদের তীরবর্তী জঙ্গল। এমি বলল, 'আশা করি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই ওখানে পৌঁছে যাব।'

টিলা থেকে নেমে দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে লাগল সবাই। ক্রমশ সেই রুপোলি ফিতার মতো রেখা চওড়া হতে লাগল। কাছে এগিয়ে আসতে লাগল চাদ। তারপর সত্যিই এক সময় তারা পৌঁছে গেল তাদের মোহানায়। দীপাঞ্জনদের দু-দিনে পথ চলার সঙ্গী সারি নদী সবাইকে বিদায় জানিয়ে এখানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল চাদ হ্রদে।

হ্রদ নয়, যেন সমুদ্র। তার এপার ওপার দেখা যাচ্ছে না। সভ্যতার উষা লগ্নে এই চাদ হ্রদকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার পত্তন হয়েছিল। এমি বলল এ-হ্রদের ব্যাপ্তি প্রায় ষোলো হাজার বর্গকিলোমিটার। চাদ-ক্যামেরুন-নাইজেরিয়া এবং নাইজার, এই চারটে দেশের আন্তর্জাতিক সীমানা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে হ্রদটাকে। দীপাঞ্জনরা বেশ কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল সেই সমুদ্র সমান হ্রদের দিকে। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ঘাসে ছাওয়া ঢালু জমি নেমে গেছে হ্রদের দিকে। দীপাঞ্জন বলল, 'আপনারা একটু দাঁড়ান নীচে নেমে একটা ছবি তুলে আনি। এমি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না এখানে নয়,

অন্য জায়গাতে তুলবেন, ওই দেখুন।'

ঢালু জমিটা হ্রদের পাড়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে কাদা মাটিতে লম্বা লম্বা কালো কালো অনেক দাগ জেগে আছে। ভালো করে দেখার পর দীপাঞ্জন বুঝতে পারল ওগুলো আসলে কুমির। কাদা মাটিতে গা ঢুবিয়ে রয়েছে তারা। তাদের পিঠের কাঁটাগুলো শুধু জেগে আছে কালো রেখার মতো। মোহানাটা থিক থিক করছে কুমিরে। এমি বলল, 'আপনাদের একটা মজার জিনিস দেখাই!' এই বলে সে কাঁধ থেকে রাইফেল খুলে শূন্যে একটা ফাঁকা আওয়াজ করল। সেই শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। আর তার সাথে সাথেই নড়ে উঠল হ্রদের পাড়টা। তারা সঞ্চারণশীল হয়ে উঠল। বন্দুকের আওয়াজে ভীত হয়ে দ্রুত বুকে হেঁটে শয়ে শয়ে কুমির ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল নদীর জলে। এক ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্য। এ কয়েকটা মানুষ তো কোন ছার, একপাল হাতি ওখানে গেলেও আর ফিরবে না। এমি জানাল হরিণ-অ্যান্টিলোপরা যত সংখ্যক লেপার্ড-চিতা-সিংহের পেটে যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি মারা পড়ে জল খেতে এসে কুমিরের শিকার হয়ে।

মোহানার দিক থেকে তেরছাভাবে একটু উত্তর-পশ্চিমে এরপর হাঁটা লাগালো তারা। ঘাসবন এখানে অনেক বড়ো। অন্য গাছপালাও আছে। আরও ঘণ্টাখানেক চলার পর হঠাৎ যেন জঙ্গল ফিকে হয়ে এল। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল একটা উন্মুক্ত জায়গা। কিছু অস্পষ্ট কুটির। এমি বলে উঠল, 'উংগোয়ার।' অর্থাৎ 'গ্রাম'। 'আমরা এসে গেছি!'

বেশ বড়ো বড়ো কয়েকটা গাছের ছাওয়ায় গ্রামটা। ধানের গোলার মতো দেখতে পাতায় ছাওয়া কুটির। বুক সমান উঁচু কাঠের গুঁড়ি আর ক্যাকটাসের বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা গ্রাম। সেই বেষ্টনীর গায়ে লম্বা লম্বা খুঁটির মাথায় বসানো আছে নানা বন্যজন্তুর খুলি। দীপাঞ্জন জানতে চাইল, 'তুমি কি এ গ্রামেরই বাসিন্দা?'

এমি জবাব দিল, 'আমার গ্রাম চাদের তীরে হলেও আরও অনেক দূরে। আমার আর কেউ নেই সেখানে। দশ বছর আগে পনেরো বছর আগে এক মিশনারির সাথে আমি শহরে চলে যাই। জাতিদাঙ্গায় আমার পরিবারের সবাই মারা গেছিল। আমি জাতিতে কানুরি। আর এরা ফুলানি। কানুরি, ফুলানি, মোব্বার, হাউমা, বুদুমা এমন ছাব্বিশটা বিভিন্ন উপজাতি বাস করে চাদ হ্রদের ধারে। নিজেদের মধ্যে খুব একটা সুসম্পর্ক রাখে না এরা। প্রায়শই দাঙ্গা হয়। তখন এই আপাত নিরীহ মানুষগুলোই খুব হিংস্র হয়ে ওঠে। তবে এই ফুলানিরা মোটামুটি বন্ধুবৎসল। কিছু ফুলানি গ্রাম খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও এরা এখনও লৌকিক ধর্ম পালন করে। সাদা চামড়ার লোকদের প্রতি এদের সম্ভ্রমও আছে, ঘৃণাও আছে।' কথা বলতে বলতে গ্রামটার দিকে এগোল তারা। কিছুটা তফাত থেকে তারা দেখতে পেল গ্রামের প্রবেশ তোরণে গ্রামবাসীরা সমবেত হয়েছে তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। এমি

বলল, 'এরাও সম্ভবত ঢাকের বাজনার মাধ্যমে আমাদের আগমন বার্তা পেয়েছে।'

প্রায় একশোজন মানুষের একটা দঙ্গল অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। দীপাঞ্জনরা তাদের সামনে উপস্থিত হল। সিংহচর্ম পরিহিত একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সবার প্রথমে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বর্শাধারী কয়েকজন লোক। তাদের পিছনে আরও কিছু পুরুষ, সব শেষে মহিলা ও শিশুরা। তাদের কারও কোলে বাচ্চাও আছে। সবার চোখে উৎসুক দৃষ্টি। একটা বর্শার ওপর ভর দিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল, তার মাথায় গোজা শিং-অলা একটা হরিণের ধবধবে সাদা খুলি। এমি সেই বৃদ্ধকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'এরা এ-দেশে সরকারি অতিথি হয়ে এসেছেন। গ্রাম দেখতে এসেছেন, কিছু কেনাকাটা করবেন।'

তার কথা শুনে বুড়োটা প্রথমে তার ছানিপড়া চোখে ভুরু কুঁচকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করল দীপাঞ্জনদের। বিশেষত প্রফেসার জুয়ান আর শ্যাঁপলিওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল লোকটা। তারপর মনে হয় আশ্বস্ত হল সে। ফোকলা দাঁতে এমির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'বেশ ভালো কথা। তবে তোমাকে যেন আমার চেনা লাগছে।'

এমি জবাব দিল, 'বেশ কয়েক বছর আগে একবার ট্যুরিস্ট নিয়ে এ পথে যাচ্ছিলাম, তখন একবার দেখা হয়েছিল তোমার সাথে।

বুড়োটা জবাব দিল, 'তা হবে। অনেক কাল এই চাদের দেশে কাটালাম। এখন আর সব কিছু মনে থাকে না। বুড়োটার সাথে এমির এ-সব কথাই অবশ্য হল দেশীয় ভাষায়।

বিরাট বড়ো, শাখাপ্রশাখা অলা একটা হরিণের শিং শোভিত প্রবেশতোরণ অতিক্রম করে গ্রামে পা রাখল সবাই। এগোতে এগোতে এমি বলল, 'আমি আপনাদের পরিচিত সরকারি অতিথি হিসাবে দিয়েছি'। 'সরকার' শব্দটা এরা ভয় পায়। বুড়ো লোকটার নাম 'তিকাকা', ও-এ গ্রামের মোড়ল। তবে আসল লোক কিন্তু ওর এই সাঙ্গোপাঙ্গারা। তারাই সব সিদ্ধান্ত নেয়, আর বিদেশি বা সরকারি লোকরা এলে তাদের সামনে বুড়ো মোড়লদের খাড়া করে দেয়।'

গ্রামের ঠিক মাঝখানে উপস্থিত হল তারা। সেখানে এক বিরাট গাছতলায় বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানেই মোড়ল তিকাকার ঘর, আর তার পাশেই গ্রামের অতিথি নিবাস—পাতায় ছাওয়া একটা আধো অন্ধকার ঘর। তিকাকার নির্দেশে সে ঘরে জিনিসপত্র রাখা হল। এমি তার জিনিসপত্রর মধ্যে থেকে বেশি কিছু মোটা সুতোর রঙিন চাদর বার করে জুয়ান-দীপাঞ্জন-শ্যাঁপেলিওর হাতে দিল। মোড়ল বুড়োকে নজরানা দিতে হবে। তার সেই ঘর থেকে বেরোনোর সাথে সাথেই গাছতলায় একজন ঢাক বাজাতে শুরু করল। ফাঁপা গাছের গুঁড়ির তৈরি কথাবলা ঢাক। এমি বলল, 'গ্রামে অতিথি আসার খবর জানান দিচ্ছে এরা।'

বাইরে এসে গাছতলায় একটা উঁচু বেদির মতো জায়গায় তিকাকা-র আমন্ত্রণে তারা বসল। চাদরগুলো তার হাতে তুলে দিতেই হাসি ফুটে উঠল তিকাকার বলিরেখাময় মুখে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার সঙ্গীদের চোখ। তিকাকা আর তার সঙ্গীদের সাথে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা শুরু হল এমির। দীপাঞ্জনরা নীরব দর্শক। সূর্য ঢলতে শুরু করল। পাতার কুটির থেকে বেরিয়ে গ্রামের সবাই গাছের সামনে ফাঁকা জায়গাতে সমবেত হল। এরপর হঠাৎই একটা

শিঙা বেজে উঠল। তা শুনে যে-যার জায়গা ছেড়ে সার বেঁধে আকাশের দিকে তাকিয়ে একসাথে কী যেন বলতে শুরু করল সবাই। এমি বলল, 'ওরা অপদেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাচ্ছে। রাত আসছে, যাতে তারা গ্রামে হানা না দেয় সে জন্যই এই প্রার্থনা। আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝুপ করে অন্ধকার নামল। গ্রামের ঠিক মাঝখানে গাছের নীচে ফাঁকা জায়গাতে একটা বড়ো অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হল। এমির সাথে গ্রামের লোকদের কথা শেষ হলে জুয়ান তার কাছে জানতে চাইলেন, 'কী কথা হল?'

শ্যাঁপলিও জিজ্ঞেস করলেন, 'ঢাকের ব্যাপারে ওরা কী বলল?'

এমি বলিল, 'উভয় তরফ থেকেই গ্রাম আর শহরের খবরের আদান-প্রদান হল। কাল সকালে ওরা ঢাক দেখাবে বলছে।'

শ্যাঁপলিও বললেন, 'ফুলানি ট্যাম ট্যাম?'

এমি কী যেন ভেবে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কী দেখায় দেখি? সে ঢাক তো এ গ্রামে থাকার কথা।'

দীপাঞ্জনদের রাতে খাবার ব্যবস্থা হলো ঝলসানো হরিণের মাংস আর রুটি দিয়ে। খাওয়া সেরে সেদিনের মতো শুয়ে পড়ল সকলে।

সারাদিন এতটা পথ আসতে অনেক পরিশ্রম হয়েছে। শেষবার কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্যাঁপেলিও নাক ডাকতে লাগলেন। প্রফেসরও ঘুমিয়ে পড়লেন। এমি মাঝে মাঝে নড়ছে। সে শুয়েছে দীপাঞ্জনের পাশে। দীপাঞ্জনের ঘুম আসছে না। তাদের আনা ছোট্ট একটা ব্যাটারির আলো জ্বলছে ঘরের কোণে। সারা গ্রাম ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু গ্রামের বাইরে থেকে অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে নানা জন্তু-জানোয়ারের ডাক। শুয়ে শুয়ে সে-সব শব্দ শুনতে লাগল দীপাঞ্জন। আর তার পরই সে-শব্দ ছাপিয়ে সে শুনতে পেল অনেক দূর থেকে আসা দ্রিমিদ্রিমি ঢাকের বাজনা। কান খাড়া করে সে বুঝতে পারল বিভিন্ন ছন্দে, বিভিন্ন লয়ে বাজছে সে-ঢাক। তার একবার মনে হল যে এমিকে জাগিয়ে ঢাক কী বলছে তা জানে। কিন্তু পরিশ্রান্ত এমির ঘুম ভাঙানো সে সীমাচীন মনে করল না। বেশ কয়েকটা কাগজ কার্ডবোর্ডের বাক্স সহ অধিকাংশ মাল সে একাই বয়ে এনেছে। রাইফেলটার ওজনও কম নয়। একাই ঢাকের বাজনা শুনতে লাগল দীপাঞ্জন। কিন্তু এরপর হঠাৎই সে-বাজনা ছাপিয়ে গ্রামের ভিতর থেকে বা বাইরে খুব কাছাকাছি জায়গা থেকে বেজে উঠতে লাগল আর-একটা ঢাক! নীচু খাদের হলেও বেশ তীক্ষ্ণ শব্দ। এত রাতে এ-গ্রামের লোক কী খবর পাঠাচ্ছে! কোথাও কী তবে কিছু ঘটেছে? ব্যাপারটা দীপাঞ্জনের বোধগম্য হচ্ছে না। শব্দটা বেশ সুরেলা হচ্ছে মাঝে মাঝে। অনেকটা নাকিসুরে কথা বলার মতন! আর এর পরই ঘুম জড়ানো চোখে হঠাৎ উঠে বসল এমি। অস্পষ্ট স্বরে সে বলে উঠল,—'ফুলানি ট্যাম ট্যাম! ফুল্যানি ট্যাম ট্যাম!' তারপর যেন আতঙ্কে একটা দুর্বোধ্য চিৎকার করে উঠল। তার সেই চিৎকারে জুয়ান আর দীপাঞ্জন উঠে বসল। ঘরের আধো অন্ধকারেও তারা বুঝতে পারল এমির চোখে মুখে আতঙ্কর স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে। দীপাঞ্জন তাকে ধরে ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করল, 'এমি তোমার কী হয়েছে?'

এমি আবার অস্পষ্টভাবে বলল, 'ফুল্যানি ট্যাম ট্যাম!' ঠিক তখনই সেই ঢাকের বাজনা

থেমে গেল। এমিও যেন তার চেতনা ফিরে পেল। পাশে রাখা বোতলটা নিয়ে ঢকঢক করে জল খেয়ে বলল, 'ক্ষমা করবেন, মনে হয় কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। শুয়ে পড়ুন সবাই।'

পরদিন মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙল সবার। প্রাতঃরাশ সেরে তৈরি হয়ে যখন তারা বাইরে বেরোল তখন গাছতলায় সেই চত্বরে বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়েছে বিভিন্ন রকম ঢাক নিয়ে। আজ বেশ রঙচঙে পোশাকে তারা। গলায় পাথরের মালা, মাথায় পালকের সাজ। সম্ভবত খদ্দেরদের প্রলুব্ধ করার জন্যই অমন সাজ তাদের। তাদের মধ্যমণি দীপাঞ্জনদের দেওয়া লাল শাল গায়ে তিকাকা। ফোকলা দাঁতে হেসে সে অভিবাদন জানাল দীপাঞ্জনদের। তারপর অতিথিদের উদ্দেশে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল। তার মমার্থ এমির মাধ্যমে অনূদিত হল। এ-গ্রামের মতো ঢাক নাকি আফ্রিকার কোথাও আর পাওয়া যায় না। সরকারি লোকেরাই শুধু তাদের থেকে কেনে তা নয়, ক্যামেরন, লিবিয়া, নাইজেরিয়া থেকেও লোকে তাদের ঢাক কিনেছে। দামও খুব সস্তা। 'বাতুরি' অর্থাৎ 'কত্তা'রা যদি ঢাক কেনেন তবে গ্রামের লোকেরা নিখরচায় এঞ্জামেনা পর্যন্ত সে-ঢাক পৌঁছে দিয়ে আসবে।

তিকাকা-র ইশারায় এরপর এক-এক করে ঢাকগুলো বাজতে শুরু করল বাতুরিদের ঢাকের গুণ দেখাবার জন্য। নানা ছন্দ, নানা খাদে, অজানা ভাষায় কথা বলতে লাগল তারা, বাজনা শুধু এমি বোঝে। সে মন্তব্য করল, ঢাকগুলো সত্যিই ভালো। এরা মিথ্যে বলেনি।'

শ্যাঁপেলিও তার কথা শুনে বললেন, 'আমি যে ঢাকের খোঁজে এসেছি তার ছবি আমি দেখেছি। সে-ঢাক এখানে দেখছি না। এসব ঢাকই আমি মিউজিয়ামের জন্য নেব। কিন্তু সবার আগে সে-ঢাক চাই। ব্যাপারটা ওদের বলো।'

এমি, তিকাকা-র উদ্দেশ্যে বলল, 'এ-সব ঢাকই আমরা কিনব একটা শর্তে।

'সব ধরনের ঢাক নেবে!'—এতটা আশা করেনি তারা। তিকাকা জিজ্ঞেস করল, 'কী শর্ত?'

এমি জবাব দিল, 'একটা ফুলানি ট্যাম ট্যাম দিতে হবে আমাদের। যা দাম লাগে দেব।'

ফুলানি ট্যাম ট্যাম!—একথাটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সব ঢাকের বাজনা এক সাথে থেমে গেল। তিকাকা সহ তার অনুচররা বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দীপাঞ্জনদের দিকে। তিকাকা এরপর গম্ভীরভাবে বলল, 'ও-ঢাক নেই। ও-ঢাক আমরা আর বানাই না। সরকারি নিষেধ আছে।'

এমি বলল, 'তা জানি। কিন্তু আমিও তো চাদের তীরের মানুষ। আমি জানি তোমাদের কাছে একটা ওই ট্যাম ট্যাম আছে।'

বৃদ্ধ এবার জবাব দিল, 'হ্যাঁ তা একটা ছিল। আমার আগে যে মোড়ল ছিল সেই তুয়াতুয়া বানিয়ে ছিল সেটা। অনেক কাল আগের ঘটনা সেটা। সে সময় জাতি দাঙ্গা চলছিল। ঢাকটা বানাবার পরই তুয়াতুয়া যুদ্ধে মারা যায়। ঢাকটাও হারিয়ে যায়।

এমি তার কথা শুনে বলে উঠল, 'কিন্তু কাল রাতেও ওর বাজনা শুনেছি আমি। ও-শব্দ আমি চিনি। খুব কাছেই বাজছিল, তার মানে ওটা এখানেই আছে। বলছি তো ওর জন্য আমরা ভালো পয়সা দেব।'

এমির কথা শুনে তিকাকা-র মুখ দেখে মনে হল সে যেন এবার ধরা পড়ে গেছে। বাধ্য

হয়ে সে এবার বলল, 'হ্যাঁ, ওটা আছে একজনের কাছে। তবে ঠিক আমাদের কাছে নয়।'

'কার আছে? তার খোঁজ দাও। আমরা কথা বলব তার সাথে। খোঁজ না দিলে আমরা অন্য গ্রামে চললাম। যেখানে ও-ঢাক পাওয়া যাবে, সেখান থেকেই ও-ঢাক আর অন্য ঢাক নেব।' তিকাকাকে কথাটা বলে দীপাঞ্জনদের কথাগুলো তর্জমা করল এমি।

এমির স্পষ্ট উক্তি শুনে এবার যেন সমস্যায় পড়ে গেল তিকাকা আর তার লোকজন। শেষে কী এত বড়ো ক্রেতারা হাতছাড়া হয়ে যাবে। নিজেদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ শলাপরামর্শ করল তারা। তারপর তিকাকা যেন একটু ভয় ভয়ে বলল, "ওটা আছে জুজু কুরির কাছে। আসলে ওকে আমরা বেশি ঘাটাই না। ও-রাতে কুরি হয়ে যায়। জিনিসটা ওকে আমরা ভয়ে দিয়ে দিয়েছি। ও-গ্রামের বাইরে হ্রদের দিকে একটা কুঁড়েতে একলা থাকে। তোমাদের সাথে দু-জন লোক দিচ্ছি। তারা তোমাদের ওর কাছে নিয়ে যাচ্ছে। দেখো ও-জিনিসটা বিক্রি করতে রাজি কিনা? সাদা চামড়ার লোকদের সবাই খাতির করে। তার ওপর আবার সরকারের অতিথি। তাই দিলে দিতেও পারে। তবে একটাই অনুরোধ সে যাই করুক, এ-গ্রাম থেকে ঢাকা কিনো তোমরা। এবার শুখা মরসুম খুব খারাপ গেছে। শস্য ফলাতে পারিনি। এক-একটা ঢাকের জন্য তিনশো ফ্রাঙ্ক দিলেই হবে।'

এমি বলল, 'তোমাদের ব্যাপারটা আমরা অবশ্যই ভাবব।'

দীপাঞ্জনরা আবার নিজেদের কুটিরে ফিরে এল দরকারি কিছু জিনিস নেবার জন্য। এমি বলল, 'কিছু নয়, সবই সঙ্গে নেব। এ-দেশে একটা প্রবাদ আছে, যাত্রা শুরুর পর তুমি আর কোনো দিন আগের জায়গাতে ফিরে না আসতে পারো। এটাই এখানকার নিয়ম। তেমন হলে আমরা এখানে না ফিরে অন্য গ্রামের পথে ঢাকের খোঁজে রওনা দেব। তাছাড়া আমাদের অবর্তমানে ওরা কৌতূহলী হয়ে আমাদের জিনিস ঘাঁটুক সেটাও কাম্য নয়।' এ-পথে গাইডের নির্দেশ মানা খুব জরুরি। অগত্যা সব জিনিস নিয়ে আবার কুটিরের বাইরে এল সবাই। গাছের নীচে বর্শা হাতে দু-জন পথপ্রদর্শক তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। দীপাঞ্জনরা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সাথে গ্রাম ছেড়ে রওনা হল জুজু কুরির ডেরার উদ্দেশ্যে।

যেতে যেতে এমি বলল, 'জুজু' শব্দের অর্থ জাদুকর। গ্রামের মানুষরা সবাই তাকে ভয় করে।'

বাংলা ভাষায় 'জুজু' বলে ভীতিকর একটা শব্দ আছে। দীপাঞ্জনের মনে হল, 'কে জানে কোনোভাবে আফ্রিকা থেকেই হয়তো এই ভয়সূচক শব্দ সুদূর ভারতবর্ষে পৌঁছেছিল।'

জুয়ান বললেন, 'আর 'কুরি' শব্দের মানে?'

'হায়না'-কে এখানে 'কুরি' বলে। এসব গ্রামীণ ওঝা জাদুকররা মানুষকে ভয় দেখানোর

জন্য নিজেদের সম্বন্ধে নানাকথা প্রচার করে। কেউ নাকি রাতে সিংহ হয়ে যায়। কেউ-বা চিতা অথবা হায়না। আফ্রিকার গ্রামীণ মানুষরা খুব সরল হয়। তারা ভূত-প্রেত-মন্ত্র-তন্ত্র, এ ধরনের নানা অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাসী।'—জবাব দিল এমি।

প্রফেসার জুয়ান দীপাঞ্জনকে বললেন, 'শেন, সত্যিই মহাদেশ বড়ো বিচিত্র, কত ধর্ম, কত লৌকিক আচার, কত ভাষা এ-মহাদেশে। মানবজাতির উন্মেষ যেখানে হয়েছিল তার মধ্যে এ-মহাদেশ অন্যতম। ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেও এরা লোহা গলানোর ব্যবহার জানত। ২০০০ প্রাচীন জনগোষ্ঠী বাস করে এ-মহাদেশে তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে। ৬টি ইউরোপীয় ভাষা ছাড়া ৭৫০টি আদিবাসী ভাষা আছে। শুধু কঙ্গোতেই ৭৫টি ভাষায় কথা বলে মানুষ। আবার দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা কথা বলে ষোড়শ শতাব্দীর কথ্য ওলন্দাজ ভাষায়। সারা পৃথিবীর অন্য কোথাও এমনকি ওলন্দাজদের দেখেও সে-ভাষায় কেউ কথা বলে না, অথচ আফ্রিকায় ভাষাটা টিকে আছে। চাদের অন্যতম সরকারি ভাষাই তো ফরাসি। কোথায় চাদ আর কোথায় ফ্রান্স। আসলে এরা প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতির প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল। এই যে ওঝা, গুনিন, জাদুকরদের ব্যাপারটা এদেরকে এরা শুধু ভয়ে মান্য করে তা নয়, এ-লোকগুলোও আফ্রিকানদের প্রাচীন সংস্কৃতির অঙ্গ, তাই এ-কারণেও তাদের মান্য করে লোকেরা।'

গ্রাম ছেড়ে সবাই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল চাদ হ্রদের দিকে। সবার আগে আগে চলছে সেই বর্শাধারী দুজন। জঙ্গলের দিকে সতর্ক দৃষ্টি। কোনো কথা বলছে না তারা। চোখে মুখে কেমন যেন অসন্তোষের ভাব। যেন নিতান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে তিকাকা-র নির্দেশে আসতে হয়েছে তাদের। চলতে চলতে হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গাতে অদ্ভুত একটা চিহ্ন দেখে এমি দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে ঘাসহীন শক্ত খটখটে মাটি। তার ওপর স্পষ্ট জেগে আছে গাড়ির চাকার দাগ! সে সময় হয়তো ভেজা নরম মাটিতে চাকার দাগ গেঁথেছিল। মাটি শুকিয়ে দাগগুলো এখন ছাঁচের মতো আঁকা হয়ে গেছে।

জুয়ান বিস্মিতভাবে বললেন, 'এখানে গাড়ি আসে?'

এমি লোকগুলোকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করায় একজন বলল, 'বর্ষার পর মাস তিনেক আগে মিলিটারি এসেছিল এখানে। সে ছাপ রয়ে গেছে। আমরা আর কিছু জানি না এ-ব্যাপারে।'

এমি বলল, 'জঙ্গি কার্যকলাপ দমনের জন্য আর্মি মাঝে মাঝে এই সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে টহল দেয়। তাই হয়তো এসেছিল আর এর কিছুক্ষণ পরই এগোতে এগোতে নদীর পাড়ের কাছাকাছি তারা দেখতে পেল জাদুকর কুরির কুঁড়োটা।'

দীপাঞ্জনরা ঘরটার সামনে উপস্থিত হল।

কুঁড়ে না বলে ঘরটাকে তাঁবু বলাই ভালো। কুমিরের চামড়ার আচ্ছাদন দিয়ে বানানো ঘরটা। বিভিন্ন পশুপাখির খুলি, হাড়গোড়, চামড়া ইত্যাদি তার গায়ে ঝুলিয়ে কুটিরের বহিঃসজ্জা করা হয়েছে। দীপাঞ্জনরা দেখতে পেল সেই অদ্ভুত ঘরটার প্রবেশপথের ঠিক বাইরে শিকলে বাঁধা আছে ছোটোখাটো একটা হায়নার বাচ্চা। এমি তার রাইফেল শ্যাঁপেলিওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা আপনার হাতে রাখুন। বন্দুকধারী সাহেবকে

এখনও এখানে লোকে ভয় পায়। ঘরটার দিকে আর একটু এগোতেই হায়নার বাচ্চাটা কুকুরের মতো গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যা, হ্যা, করে ডেকে উঠল আর সেই ডাক শুনেই হয়তো গৃহকর্তা বাইরে বেরিয়ে এলেন। মাঝবয়সি লোক, চোখ দুটো ভাঁটার মতো লাল। পরনে হায়নার চামড়ার আচ্ছাদন। হায়নার চামড়াশুদ্ধ দাঁত বার করা মাথাটা হেলমেটের মতো লোকটার মাথায় বসানো আছে গলায় অগুনতি পাথরের মালা। কবজিতে বাঁধা আছে সিংহের লোম।

লোকটা সতর্ক চোখে ভালো করে দেখল আগন্তুকদের। একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সে হলদেটে দাঁত বের করে হেসে বলল, 'আমি জানতাম তোমরা এখানে আসবে।'

'কী ভাবে জানলে?' প্রশ্ন করল এমি।

জাদুকর কুরি জবাব দিল, 'আমি সব জানতে পারি। পরশু রাতে আমি তো তোমাদের পিছন পিছনই আসছিলাম। হায়নার বেশে। ডাক শোনোনি? পেট ভরা ছিল বলে কাউকে ধরিনি।'

এমি তার কথা তর্জমা করল। এ পথে আসার সময় হায়নার ডাক শোনা স্বাভাবিক। শ্যাঁপেলিও কথাটা শুনে এমির মাধ্যমে লোকটাকে বন্দুক নাচিয়ে বলল, 'কাছে আসেনি ভালো করেছ। আমার বন্দুকের টিপ সাংঘাতিক। তোমার ভবলীলা সাঙ্গ হত।' মুখের ওপর এ-কথা শুনে একটু থমকে গেল জাদুকর। সম্ভবত সে বুঝল এ লোকগুলোকে ভয় পাওয়ানো যাবে না।

এমি এবার তাকে বলল, 'এরা হল সরকারি অতিথি। সরকারি লোকই বলতে পারো। এরা একটা জিনিস কিনতে এসেছে।'

জাদুকর এবার হেসে বলল, 'হ্যাঁ আমি জিনিস বেচি বটে। সিংহের কেশর, লেজের লোম, হায়নার দাঁত, হিপোর তেল, কুমিরের চামড়া, নানা অদ্ভুত জিনিস। ওসব সঙ্গে থাকলে ভূতপ্রেত কাছে ঘেঁষে না। রোগব্যাধিও হয় না। অনেক সাদা চামড়াও এসব কিনে নিয়ে যায়। তোমাদের কী লাগবে বলো?'

এমি বলল, 'ওসব নয়। আমরা ঢাক কিনতে এসেছি।'

'ঢাক! সে তো গ্রাম পাওয়া যায়। আমার কাছে কেন?'

এমি বলল, 'না সে-ঢাক নয়। আমরা 'ফুলানি ট্যাম ট্যাম' কিনতে এসেছি। কাল রাতে যেটা তুমি বাজাচ্ছিলে?'

'ফুলানি ট্যাম ট্যাম!' কথাটা শুনেই জাদুকরের মুখটা যেন বদলে গেল। তিকাকা-র মতোই সে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে।

এমি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা বলছ না কেন?'

জাদুকর এবার গম্ভীরভাবে বলল, 'ও ঢাক আমি বেচব না। ওটা আমার কাজে লাগে। ফুলানি ট্যাম ট্যাম চেনো তোমরা?

এমি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ চিনি। ঢাকটা বেচলে ভালো দাম পাবে। তাছাড়া শহরের খবর কিছুদিনের মধ্যেই ও-ঢাক নিষিদ্ধ করতে চলেছে সরকার। তখন সরকারি লোক এসে

জিনিসটা বাজেয়াপ্ত করবে। তার চেয়ে এ বেলা বেচে দাও। ভালো দাম পাবে। দু-পক্ষেরই লাভ এতে।'

এমির কথা শুনে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল লোকটা। তারপর বলল, 'পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে হবে পারবে?'

এমি ব্যাপারটা জানাল শ্যাঁপেলিওকে। লোকটা অনেক টাকা চাইছে। গ্রামে একটা ঢাকের দাম তিনশ ফ্রাঙ্ক। আর এ-ঢাকের দাম পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক! কিন্তু শ্যাঁপেলিও শুনে বললেন, 'জিনিসটা খাঁটি হলে দরটা সমস্যা নয়।'

এমি জাদুকরকে বলল, 'জিনিসটা আগে দেখাও তুমি। পছন্দ হলে অবশ্যই নেব।'

জাদুকর কুরি এবার ঘরের ভিতর ঢুকল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢোলকটা বাইরে আনল গলায় ঝুলিয়ে, তার হাতে দুটো কাঠি। দীপাঞ্জনরা ঘিরে দাঁড়াল জাদুকরকে। ছোট্ট একটা ঢাক। একটা কাঠের বাটির ওপর চামড়ার আচ্ছাদন। খুব বেশি হলে তার ব্যাস সাত ইঞ্চি হবে। জাদুকরকে গলায় ঢোলকটা ঝোলানো অবস্থাতেই তার চামড়ার ওপর একবার হাত বুলাল এমি। কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠল তার চোখে। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে যেন বলল, 'হ্যাঁ, এ ঢাকের দাম অনেক বেশি হওয়াই উচিত। খাঁটি জিনিস কোনো সন্দেহ নেই।'

জাদুকর এরপর জিনিসটার গুণাগুণ দেখাবার জন্যই মনে হয় বাজাতে শুরু করল ঢাকটা। মুহূর্তের মধ্যে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। ট্যামট্যাম, ট্যামট্যাম!' এইটুকু ঢাক থেকে বিরাট ঢাকের মতো এত জোরালো শব্দ ছড়িয়ে পড়তে পারে তা ধারণা ছিল না দীপাঞ্জনদের। অবাক হয়ে গেল তারা। কিন্তু এরপরই অন্যদের চমকে দিয়ে এমি জাদুকরের হাত দুটো চেপে ধরে বলল, 'বাজনাটা বন্ধ করো, বন্ধ করো।'

বাজনা থেমে গেল। এমির চোখমুখ কেমন যেন অদ্ভুত আতঙ্কগ্রস্ত লাগছে। শ্যাঁপেলিও জিজ্ঞেস করলেন, 'এমি তোমার কী হল?'

এমি বলল, 'আসলে এ-বাজনার তরঙ্গটা আমি কেন জানি না সহ্য করতে পারি না। কানে লাগে'।

জুয়ান হেসে বললেন, 'হ্যাঁ এমন অনেকের হয়। এই আমারই যেমন কাঠের ওপর করাত চালাবার ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দে কেমন একটা অস্বস্তি হয়। শব্দ মানুষের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।'

ট্যামট্যাম নিয়ে দর কষাকষি একটা হল। শেষ পর্যন্ত চার হাজার ফ্রাঙ্ক দাম ধার্য হল। শ্যাঁপেলিও কড়কড়ে চার হাজার ফ্রাঙ্ক কুরির হাতে দিল। কুরি শ্যাঁপেলিওর গলায় ঝুলিয়ে দিল ঢোলকটা। গর্বের হাসি ফুটে উঠল শ্যাঁপেলিওর ঠোঁটে।

জাদুকর বলল, 'আর মাত্র পাঁচশো ফ্রাঙ্ক দিলে আমি আপনাদের একটা অদ্ভুত জিনিস দিতে পারি। কাছেই জঙ্গলে সেটা রাখা আছে। জঙ্গলে তো এখন ঢুকতেই হবে আমাদের। ট্যামট্যামটা নিয়ে তো অনেক দূর পাড়ি দেবেন আপনারা। ট্যামট্যামের চামড়াটা খুব যত্নে রাখতে হয়। এক ধরনের বিশেষ গাছের পাতা দিয়ে জিনিসটা মুড়ে দেবো আমি। নইলে চামড়া নষ্ট হবে।

তার কথা শুনে শ্যাঁপেলিও জানতে চাইলেন, 'আর একটা জিনিস কী? কোনো নিষিদ্ধ জিনিস নয় তো?'

জাদুকর হেসে বলল, 'না নিষিদ্ধ নয় তবে ও জিনিসও আপনারা পাবেন না। ওকে বলে 'উগো', ক্যামেরুনের শিঙা। কাঠের তৈরি যে-শিঙা থেকে অবিকল সিংহর ডাক বেরোয়। ক্যামেরুনের শিকারিরা উগো বাজিয়ে সিংহকে ফাঁদে ফেলে সিংহ শিকার করে?'

ব্যাপারটা শুনে দীপাঞ্জন একটু উৎসাহিত হয়ে বলল, 'এ-জিনিসটা স্যুভেনির হিসাবে আমি নিতে পারি।'

শ্যাঁপেলিও হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আপনার জন্য ওটায় হাত বাড়াব না।'

ট্যামট্যামটা নিয়ে এরপর জাদুকর কুটির থেকে তার সাথে জঙ্গলের দিকে পা বাড়াল দীপাঞ্জনরা। ঠিক যে পথে তারা এসেছিল ঠিক সে পথে নয়, একটু অন্যদিকে হ্রদের পাড়ের সমান্তরাল জঙ্গলের দিকে। গ্রাম থেকে যে লোক দু-জন এসেছিল তাদের মধ্যে এবার একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'আমরা যে পথে এসেছিলাম সে পথেই যাব। পাতা দিয়ে ঢাক বেঁধে দিতে আমরাও জানি।

জাদুকর তাদের ধমকে বলে উঠল, 'আমি যে পাতা দিয়ে বাঁধব তা তোমরা চেনো না। জিনিসটা বিক্রি করলাম ঠিকই, কিন্তু এটা নষ্ট হোক তা আমি চাই না।'

অগত্যা তাকেই আবার অনুসরণ করল সবাই। যেতে যেতে দীপাঞ্জনরা লক্ষ করল, এখানেও মাটির মধ্যে গাড়ির চাকার দাগ জেগে আছে। তার মধ্যে বেশ কিছু দাগ যেন টাটকা মনে হল তাদের।

গর্বিত ভাবে গলায় ঢাকটা ঝুলিয়ে চলছেন শ্যাঁপেলিও। তার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। বনের ভিতর কিছুটা এগোবার পর জুয়ান এক সময় এমির কাছে জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, এই ফুলানি ট্যাম ট্যাম নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে তুমি কী বলছিলে?'

এমি বলল, 'এ ঢাক বানানো অনেক দিন আগেই সরকার নিষিদ্ধ করেছে। কিছু দিনের মধ্যে নাকি কাছে রাখাও নিষিদ্ধ করবে বলে শুনছি।'

'কেন?' জানতে চাইলেন জুয়ান।

চামড়াটার জন্য। আসলে কথা বলা ঢাক নানা দুর্লভ প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরি। ওসব প্রাণী শিকার নিষিদ্ধ।

দীপাঞ্জন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, 'ফুলানি ট্যামট্যামের চামড়ার কীসের?' কিন্তু তার আগেই জাদুকর কুরি বলল, 'ওই গাছের ফোঁড়কেই শিঙাটা আছে।'

জঙ্গলের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে একটা বড়ো গাছ। তার নীচে হাজির হল সবাই। জাদুকর কুরি সত্যিই তার ফোকর থেকে একটা শিঙা বার করল। কালো রঙের কাঠের শিঙা। সে এরপর সেটায় ফুঁ দিতেই অবিকল সিংহর গর্জনের মতো শব্দ নির্গত হল। বারকয়েক সে-সেটা বাজাবার পর দীপাঞ্জন সেটা হাতে নিল শিঙাটা নিজে বাজিয়ে পরখ করার জন্য। ঠিক সেই সময় তাদের সঙ্গে দাঁড়ানো একজন গ্রামবাসী ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল—'বিনভিগান রুয়া!'

'বিনভিগান রুয়া!' অর্থাৎ 'মেশিনগান!' এমি লোকটার কথাটা শুনে একথা বলার সঙ্গে

সঙ্গে সবাই চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল চারপাশের জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে বৃত্তাকার ব্যূহ রচনা করে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে একদল ছোটোছেলে মানুষ। তাদের খালি পা, পরনে হাফপ্যান্টে, আধছেঁড়া পোশাক। আর সেই কালো ছোটো ছোটো মানুষগুলোর বুকে ঝুলছে কার্তুজের বেল্ট! হাতে ধরা সাব-মেশিনগান!

'কারা ওরা? পিগমি নাকি?', জুয়ান বলে উঠলেন। চাপা হাসি ফুটে উঠেছে জাদুকর কুরির ঠোঁটে। এমির মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে চাপা স্বরে বলল, 'না পিগমি নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর আফ্রিকার কুখ্যাত চাইল্ড আর্মি' টেররিস্ট গ্রুপ! ওরা সত্যিই বাচ্চা ছেলে।'

বৃত্তটা ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে। হ্যাঁ, সত্যিই ছোটো ছোটো ছেলে। একটা ছেলে তো এত ছোটো যে কার্তুজের বেল্ট তার পায়ে লুটোচ্ছে, আট-নয় বছর বয়স হবে হয়তো! তাকে দেখে বিস্মিত শ্যাঁপেলিও হেসে ফেলে বললেন, 'এগুলো কি খেলনা বন্দুক?'

এমি ফিসফিস করে বলল, 'হাসবেন না। খেলনা নয় আসল মেশিনগান। এরা খুব নিষ্ঠুর। রোবোট হয়ে গেছে।'

এমির কথা যে কতদূর সত্যি মুহূর্তের মধ্যে তা প্রমাণ হয়ে গেল। তাদের কাছে আসতে দেখে গ্রাম থেকে আসা লোক দুটো হঠাৎই পালাবার জন্য ছুটতে শুরু করল। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা বছর দশেকের বাচ্চা ছেলে তাদের দিকে ঘুরে র‍্যাটর‍্যাট শব্দে মেশিনগান চালিয়ে দিল। কিছুটা এগিয়েই গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোক দুটো। যে গুলি চালাল তার কোনো ভাবান্তর হল না। গুলি চালাবার পর সে অন্যদের স্বার্থে আবার এগিয়ে আসতে লাগল। শ্যাঁপেলিয়রের হাসি উধাও হয়ে গেছে।

ছেলেগুলো এসে দীপাঞ্জনদের বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের বয়স আট-নয় থেকে খুব বেশি হলে বারো-তেরো হবে। পরনে ধুলামলিন বেশ। কারও কারও দেহে অপুষ্টির স্পষ্ট ছাপ। মাথায় ছোটো ছোটো করে ছাঁটা চুল। তাদের শরীর শৈশব-কৈশোরের সব চিহ্ন থাকলেও তাদের মুখে আশ্চর্য্য কাঠিন্য জেগে আছে। ঠোঁটে আবছা হাসিরও রেশ নেই। চোখের দৃষ্টি অপলক, মৃত্যুশীতল কেমন যেন মরা মাছের মতো! যে ছেলেটা মেশিনগান চালিয়েছিল, তার অস্ত্র থেকে তখনও মৃদু ধোঁয়া উঠছে। কিছুটা তফাতে পড়ে আছে সেই হতভাগ্য লোক দুটোর মৃতদেহ। তাদের কালো অঙ্গ লাল হয়ে উঠেছে রক্তে।

প্রফেসর জুয়ান চাপা স্বরে দীপাঞ্জনকে বলল, 'এদের কথা আমি বইতে পড়েছি।'

এমি বলল, 'বাঁচতে হলে ওদের কোনো ব্যাপারে বাধা দেবেন না।'

গ্রামের লোক দুটোর যা পরিণতি হল, তাতে বাধা দেবার কোনো প্রশ্ন নেই। একটা ছেলে প্রথমে এগিয়ে এসে শ্যাঁপেলিওর হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল। অন্যরা কুরি বাদ

দিয়ে সবার কোমরে হাত দিয়ে দেখে নিল সেখানে কোনো অস্ত্র লুকানো আছে কিনা? এরপর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল দু-জন প্রাপ্তবয়স্ক লোক। তাদের পরনে জংলাছাপ সামরিক পোশাক। তাদের হাতেও মেশিনগান, কোমরে রিভলবার, কার্তুজের বেল্ট। তারা এগিয়ে এসে দীপাঞ্জনদের দিকে দৃষ্টিপাত করে জাদুকর কুরির সাথে কী কথাবার্তা বলল দুর্বোধ্য ভাষায়। একমাত্র কুরির মুখেই হাসি, বোঝা যাচ্ছে এরা কুরির পূর্ব পরিচিত। তাদের সাথে কথা শেষ হলে কুরি এগিয়ে এসে শ্যাঁপলিওরের গলা থেকে ঢোলকটা খুলে নিল। দীপাঞ্জনের হাত থেকে নিয়ে নিল শিঙাটা।

বয়স্ক লোক দুটো এবার কী একটা নির্দেশ দিল ছোটো ছেলেগুলোকে। তারপর তারা এগোল জঙ্গলের একদিকে। তাদের নির্দেশ পেয়ে ছেলেগুলো দীপাঞ্জনদের ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে চলল অগ্রবর্তী লোক দুটো যেদিকে গেল সেদিকে। তাই দেখে হাসতে লাগল জাদুকর কুরি। সত্যিই সে কুরি বা হায়নার মতো ধূর্ত। সেই শিঙা ফুঁকে সংকেত করে এদের হাতে তুলে দিল তাদের। শ্যাঁপেলিও একবার শুধু থমকে দাঁড়িয়ে বলতে গেলেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

তার কথা শোনা মাত্র একটা বছর দশেকের ছেলে লাফিয়ে উঠে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে শ্যাঁপেলিওর কপালে এমন আঘাত করল যে ঝরঝর করে রক্ত বেরোতে শুরু হল। রুমালে কপাল চেপে হাঁটতে লাগলেন তিনি।

বাচ্চা ছেলেগুলো দীপাঞ্জনদের ব্যাগপত্র সহ তাড়িয়ে আনল জঙ্গলের গায়ে একটা ফাঁকা জায়গাতে। সে-জায়গা হ্রদের পাড়ের কাছে। দীপাঞ্জনরা এবারও বেশ অবাক হল। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোটোখাটো একটা ট্রাক। তার মাথায় ক্যাম্বিসের আচ্ছাদন। ইতিমধ্যে সামরিক পোশাক পরা লোক দুটো চালকের আসনের কাছে উঠে বসেছে। মালপত্র সমেত দীপাঞ্জনদের ট্রাকে ওঠানো হল। জনা পনেরো ছেলের মধ্যে চার পাঁচজন ছেলেও অস্ত্র হাতে ঢুকল দীপাঞ্জনদের সাথে সেই ক্যাম্বিসের আচ্ছাদনের নীচে। আর বাদবাকিরা বিভিন্ন কৌশলে ঝুলে পড়ল গাড়ির বনেট, ফুটবোর্ড সহ গাড়ির বিভিন্ন অংশের গায়ে। গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট হল। চাদ হ্রদের পাড় ঘেঁষে জঙ্গলের গা বেয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সাথে ট্রাকটা চলতে শুরু করল অজানার উদ্দেশ্যে।

ঘন্টাখানেক চলার পর গাড়ি অবশেষে থামল। বন্দুকের কুঁদোর ঘা দিয়ে দীপাঞ্জনদের গাড়ি থেকে নামিয়ে সার বেঁধে দাঁড় করানো হল। তারপর অনেকটা মার্চপাস্টের ঢঙে দীপাঞ্জনদের নিয়ে সেই আর্মি এগোলো হ্রদসংলগ্ন জঙ্গলের ভিতর। বেশিদূর অবশ্য তাদের যেতে হল না। কিছুটা এগিয়েই তারা দেখতে পেল বেশ কয়েকটা ছিঁরিছাঁদ-হীন পাথুরে ঘর। তাদের মাথায় ত্রিপল অথবা টিনের ছাদ। কালো পাথর বাঁধানো একটা ছোটো চত্বরও সেখানে আছে। সেখানে আরও জনা কুড়ি অস্ত্রধারী ছোটো ছেলে আর কিছু পূর্ণবয়স্ক লোকজনও আছে। তবে গাছপালার আড়ালে থাকায় বাইরে থেকে ও জায়গাটা চট করে বোঝা যায় না। দীপাঞ্জনদের হাজির করা হল সেই পাথুরে চত্বরে কাঠের চেয়ারে বসে থাকা একটা লোকের সামনে। মাঝবয়সি লোক। গায়ের রং আবলুশ কাঠের মতো কালো। পুরোদস্তুর সামরিক পোশাক। মাথার টুপিতে আঁকা আছে একটা সিংহের ছবি।

কোমরের দু-পাশে রিভলবার। কোলে শোয়ানো আছে মেশিনগান। পায়ের কাছে রাখা আছে একটা রকেট লঞ্চার। দীপাঞ্জন খেয়াল করল, লোকটার চারপাশে সামরিক পোশাক পরে অন্য যে সব লোক দাঁড়িয়ে আছে তাদের টুপিতেও সিংহর এমব্রস আঁকা। মধ্যাহ্নের সূর্য কিরণে ঝলমল করছে তাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো। চেয়ারে বসা লোকটা ভালোভাবে নিরীক্ষণ করল দীপাঞ্জনদের। তারপর এমিকে লক্ষ করে দুর্বোধ্যভাষায় কী যেন বলতে শুরু করল। লোকটার বলার ঢং অনেকটা বক্তৃতা দেবার মতো। দীর্ঘক্ষণ ধরে সে বক্তৃতা করল দীপাঞ্জনদের উদ্দেশে। তারপর আবার খুদে সেনার দল তাদের ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল একটা টিনের চালঅলা পাথুরে ঘরের দিকে। সে-ঘরে দীপাঞ্জনদের তাদের মালপত্র সমেত ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল তারা। প্রচণ্ড গরম ঘরটাতে। তবে সুবিধা একটা আছে। দুটো বেশ বড়ো কপাটহীন লোহার গরাদঅলা জানলা এ-ঘরে। বাইরের অনেকটাই প্রায় দেখা যাচ্ছে জানলা দিয়ে। এ-ঘরটা সম্ভবত কয়েদ ঘর। একটা বছর দশেকের ছেলে গলায় মেশিনগান ঝুলিয়ে একটা জানলার বাইরে কিছুটা তফাতে পাথুরে ইটের পাঁজাতে পা ঝুলিয়ে বসল। সম্ভবত সে এই ঘরটার পাহারাদার।

ঘরের এক কোণে একটা জলের পাত্র আছে। সেখান থেকে জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হল সবাই। দীপাঞ্জন বলল, 'ভাগ্য ভালো ওরা আমাদের হাত-পা বাঁধেনি।'

এমি বলল, 'বাঁধেনি কারণ, এখান থেকে আমাদের পালানো যে অসম্ভব সেটা ওরা জানে। মেশিনগানের গুলি আমাদের চেয়ে অনেক দ্রুতগামী। এবং মৃত্যুও।'

জুয়ান এরপর প্রশ্ন করলেন, 'চেয়ারে বসা লোকটা আমাদের উদ্দেশে কী বলল বলো? আমাদের এখানে ধরে আনা হল কেন?'

এমি বলল, 'হ্যাঁ আসল ব্যাপারটা এবার বলছি। লোকটা নিজের পরিচয় দিল 'জেনারেল বরনু' বলে। লোকটা দাবি করছে ও চাদের প্রাচীন রাজা কানেস বরনুর উত্তরাধিকারী বলে। বরনু চাদের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নিজের শাসন ও-দেশে কায়েম করতে চায়। সে জন্য চাইল্ড আর্মিদের নিয়ে বিদ্রোহী বাহিনী বা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী খুলেছে সে। তার ধারণা, কয়েক বছরের মধ্যেই সে তার কাজে সফল হবে, এ দেশের নাম হবে 'করিম বানু'। কয়েকটা বিদেশি রাষ্ট্র নাকি তাকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করছে। ওরা আমাদের ধরে এনেছে বিশেষ কারণে। ওরা শুনেছে আপনারা সরকারি লোক বা সরকারি অতিথি। কিছু দিন আগে সরকার একটা আর্মি অপারেশন চালায় এখানে। তাতে ওদের দু-জন নেতাগোছের লোক ধরা পড়েছে। আমাদের মুক্তির বিনিময়ে সে দু-জন লোকের মুক্তি দাবি করবে বরনু। সে আমাদের বলল যে পালাবার চেষ্টা না করলে আমাদের কোনো ভয় নেই। সাত দিনের সময়সীমা তারা সরকারকে বেঁধে দেবে। অবশ্য এর মধ্যে সরকার কিছু না করলে সে আমাদের নিয়ে অন্য ভাবনা ভাববে।'

'অন্য ভাবনা মানে?' জানতে চাইলেন শ্যাঁপেলিও।

'জেনারেল বরনুর কথার ঢং দেখে মনে হল, অন্য ভাবনা মানে, মেশিনগানের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেবে।' জবাব দিল এমি। তারপর সে বলল, 'আমার ধারণা পরশু

রাতে কথা বলা ঢাকের মাধ্যমে এরাই আমাদের খোঁজ নিচ্ছিল। কাল রাতেও নিয়েছে। ফুলানি ট্যামট্যাম বাজিয়ে আমাদের উপস্থিতির খবর কাল রাতে জাদুকর এদের জানিয়ে দিয়েছিল। এভাবে না হলেও অন্য কোনোভাবে হলেও বরনু আমাদের ধরতই।'

জানলার বাইরে বসা ছেলেটা ভাবলেশহীন মুখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ঘরের ভিতর দিকে। শ্যাঁপেলিও বললেন, 'কিন্তু এই নিষ্ঠুর ছেলেগুলোকে এরা জোগাড় করল কোথা থেকে?'

এমি বলল, 'এরা জন্মগতভাবে কেউ নিষ্ঠুর ছিল না। দেশটাতো খুব গরিব। গরিব পরিবারের সন্তান এরা। হয়তো এদের কেউ কেউ জাতিদাঙ্গা, গোষ্ঠীদাঙ্গায় বাবা মা পরিবারকে হারিয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এদের সংগ্রহ করে আনা হয়, তারপর মগজ ধোলাই করে, সামরিক ট্রেনিং দিয়ে এদের যন্ত্রমানবে পরিণত করা হয়। দলপতির নির্দেশে এরা মুহূর্তের মধ্যে কাউকে মারতে পারে আবার নিজেরাও মরতে পারে।'

জুয়ান বললেন, 'আমি পড়েছি এই চাইল্ড আর্মির কথা। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, যেমন লিবিয়া, সুদান, আলজেরিয়া, নাইজার, ক্যামেরুন, চাদ-সহ বিভিন্ন দেশের টেররিস্ট গ্রুপ এই চাইল্ড আর্মি ব্যবহার করে। এশিয়ার মধ্য প্রাচ্যের কয়েকটা দেশেও এই চাইল্ড আর্মি ব্যবহার করা হয়। ভাবতে অবাক লাগে, আমরা নাকি সভ্য পৃথিবীর মানুষ। নইলে যে-সব শিশুদের হাতে এখন কলম থাকার কথা তাদের হাতে কেউ কারবাইন রাইফেল তুলে দেয়? বইয়ের বদলে বিস্ফোরক দেয়? কোনো যুক্তিতেই ব্যাপারটাকে সমর্থন করা যায় না। মৃত্যুর আগেই একবার এদের খুন করা হয়। খুন করা হয় এদের শৈশব-কৈশোরকে।'

'চাইল্ড আর্মি' বানানোর ক্ষেত্রে সুবিধা কী?' জানতে চাইলেন শ্যাঁপেলিও।

এমি বলল, 'প্রথমত, বাচ্চাদের খাওয়া পরার চাহিদা খুব কম। তাদের নিয়ন্ত্রণ করা বা ভুল বোঝানো সহজ। দ্বিতীয়ত, এদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, বাচ্চা দেখলে লোকে কম সন্দেহ করে। সহজেই এদের দিয়ে আত্মঘাতী হামলা চালানো যায়। এরা হাসতে হাসতে বুকে বিস্ফোরক বেঁধে যে-কোনো জায়গাতে ঢুকে যেতে পারে। মানববোমা হতে পারে।'

শ্যাঁপেলিও আবার প্রশ্ন করলেন, 'যুদ্ধের সময় কী হয় এদের?'

এমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'সে-সময় জঙ্গিরা এদেরই আগে ফ্রন্ট লাইনে এগিয়ে দেয়। বাচ্চাগুলো গুলি চালালে রাষ্ট্রও তখন বাধ্য হয় নিজেদের কর্তব্য পালন করতে। এরা কেউই সাধারণত বেশিদিন বাঁচে না।'

প্রফেসর জুয়ান বললেন, 'ইউনেস্কো, ইউনিসেফ খুব চেষ্টা চালাচ্ছে এই চাইল্ড আর্মি ব্যাপারটা বন্ধ করার জন্য। কিন্তু যতদিন না মানুষের শুভবুদ্ধি উদয় হবে ততদিন ব্যাপারটা সম্ভব হচ্ছে না।'

সময় এগিয়ে চলল। বিকাল হল এক সময়। যে-ছেলেটা জানলার সামনে পাহারায় ছিল সে অন্য দুটো ছেলেকে পাহারায় বসিয়ে এগোল পাথর বাঁধানো চত্বরটার দিকে। সেখানে জড়ো হয়েছে বেশ কিছু বাচ্চা ছেলে আর জেনারেল বরনু-সহ বেশ কিছু লোক। দীপাঞ্জনরা যে-গাড়িতে এসেছে সেটাও হাজির হয়েছে সেখানে। জানলার সামনে সারা

দিন বসে থাকা ছেলেটা এবার অন্য ছেলেদের নিয়ে মার্চপাস্ট শুরু করল। যাদের মার্চপাস্ট করানো হচ্ছে সামরিক ভাষায় সম্ভবত তারা 'রংরুট'। অর্থাৎ নতুন যোগ দিয়েছে বাহিনীতে, তাদের কাঁধে কোনো অস্ত্র নেই। মার্চপাস্ট যখন শেষ হল তখন কিছু দূরে চাদের বুকে সূর্য ডুবতে শুরু করেছে। দীপাঞ্জনরা দেখল সেই গাড়িটাতে উঠে পড়ল জেনারেল বরনু-সহ তার অন্য লোকেরা। দীপাঞ্জনদের চাইল্ড আর্মির হেফাজতে রেখে কিছুক্ষণের মধ্যেই গোপন কোনো ডেরার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল গাড়িটা।

মার্চপাস্ট শেষ করিয়ে আবার দীপাঞ্জনদের ঘরের জানলার কাছে ফিরে এল সেই ছেলেটা নিজের জায়গাতে অন্য দু-জন ছেলেকে সরিয়ে গিয়ে বসল। মেশিনগানটাকে গিটারের মতো গলায় ঝুলিয়ে সে তাকিয়ে রইল চাদ হ্রদের সূর্যাস্তের দিকে। সে-জায়গা থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে হ্রদটা দেখা যাচ্ছে। দীপাঞ্জনরা ঘরের ভিতর থেকেও দেখতে পাচ্ছে চাদ হ্রদ। চাদের জলে সূর্য ডুবল এক সময়। দু-চারটে মশাল জ্বলে উঠল চত্বরে। একজন একটা মশাল এনে রাখল জানলার বাইরে সেই পাহারাদার ছেলেটার সামনে। কিছুক্ষণ পর দুজন ছেলে কাঁধে করে দুটো ঝুড়ি নিয়ে এল। ঘরের দরজার শিকল খোলা হল উদ্যত মেশিনগানের কঠোর নজরদারিতে। বন্দিদের খাবার দেবার পর আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আধ পোড়ারুটি আর চর্বি যুক্ত ঝলসানো মাংস। সারাদিন দীপাঞ্জনদের খাওয়া হয়নি। শরীর শক্ত রাখতে হবে। তাই তারা সেই পোড়া রুটি আর আঁশটে গন্ধযুক্ত মাংসই কোনো রকমে গলাধঃকরণ করতে লাগল। জানলা দিয়ে তারা দেখল বাইরে বসা সেই বাচ্চা ছেলেটা পরম তৃপ্তিতে খাবারগুলো খাচ্ছে। এই প্রথম তার মুখের কাঠিন্য সরে গিতেয় যেন একটা খুশির ঝিলিক ফুটে উঠেছে। যেন সে পোড়া রুটি নয়, কোনো বাদশাহি খানা খাচ্ছে!

এমি বলল, 'ছেলেটা কেমন খাচ্ছে দেখুন। আসলে এই খাবারের মূল্যই ওদের কাছে অনেক দামি। এ-দেশে বহু শিশু স্রেফ না খেতে পেয়ে মারা যায়। সামান্য এই খাবারটুকু এখানে পাওয়া যাবে বলে অনেক বাবা মা জঙ্গিদের হাতে বাচ্চাদের তুলে দেয়, না খেতে পেয়ে মরার চেয়ে মিলিটারির গুলি খেয়ে মরার আগে অন্তত খেয়ে মরুক ছেলেটা। এই তাদের ভাবনা থাকে। আর যে মাংসটা আমরা খাচ্ছি তা কীসের জানেন। জলহস্তীর।'

কথাটা শোনার পর শ্যাঁপেলিও আর একটু হলেই বমি করে ফেলছিলেন।

ঘরের ভিতর বাইরে খাওয়ার পাট সাঙ্গ হল একসময়। খাওয়া শেষ হবার পর বাইরে বসা ছেলেটা দুর্বোধ্য ভাষায় কী একটা হাঁক দিল। মিনিট খানেকের মধ্যেই চাইল্ড আর্মির ছেলেরা এসে তার সামনে দাঁড়াল। ছেলেটা তাদের কী সব নির্দেশ দিল, তারপর আবার বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে পড়ল তারা। সম্ভবত ছেলেটা অন্যদের রাতের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল।

চাঁদ উঠে গেছে। মশালের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। দীপাঞ্জন দেখতে পেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে চত্বরটার বিভিন্ন জায়গাতে টহল দিতে শুরু করেছে সেই শিশুসৈনিকরা।

'লেফট রাইট লেফট্।' দীপাঞ্জনের যখন পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল তখন চত্বরে মার্চপাস্ট শুরু হয়ে গেছে। রং-রুট দের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে জানলার পাশে যে ছেলেটা বসে থাকে সেই ছেলেটা। জনাদশেক নতুন ছেলে। আর তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্রধারী চাইল্ড আর্মি। ছেলেগুলোর প্রতি কড়ানজর তাদের।

এমি বলল, 'এ-সব দলে যারা যোগ দেয় তারা আর কোনো দিন পালাতে পারে না। হয়তো কোনো গ্রাম থেকে এদের তুলে আনা হয়েছে, অথবা সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে এদের বাবা-মা-রাই জঙ্গিদের হাতে তুলে দিয়েছে নিজের ছেলেকে। কিছু দিনের মধ্যেই এই শিশুরা পরিণত হবে নৃশংস খনিতে।'

জুয়ান বললেন 'যে-ছেলেটা মার্চপাস্ট করাচ্ছে, আমাদের পাহারা দেয়, ওই এই চাইল্ড আর্মির নেতা বলে মনে হচ্ছে। কাল থেকে দেখছি ওর নেতৃত্বেই চলছে অন্য বাচ্চাগুলো।'

জানলার গরাদ ধরে দীপাঞ্জনরা দেখতে লাগল চাইল্ড আর্মির প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষক ছেলেটা এখন তার বদলে জানলা বাইরে বসিয়ে রেখে গেছে অন্য একজনকে। এ ছেলেটাই গুলি চালিয়েছিল সেই গ্রামবাসী দুটোকে।

মার্চপাস্ট চলল বেশ অনেকক্ষণ ধরে। তারপর শুরু হল গুলি চালানোর শিক্ষা। কাঠের তৈরি একটা মনুষ্যমূর্তি এনে রাখা হল চত্বরের এক অংশের দেয়ালের গায়ে। রং-রুটদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল অস্ত্র। দক্ষ চাইল্ড আর্মির বাচ্চারা নতুন ছেলেদের হাতে ধরে শেখাতে লাগল টার্গেট লক্ষ্য করে গুলি চালানোর কৌশল। মেশিনগানের 'র‍্যাট্ র‍্যাট্' শব্দ আর রাইফেলের 'দুমদুম' শব্দে কেঁপে উঠতে লাগল চারপাশ।

তখনও আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ চলছে, এমন সময় গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে চত্বরের সব শব্দ থেমে গেল। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল চাইল্ড আর্মি। সেই গাড়িটা ঢুকল চত্বরে। তার থেকে নামল জেনারেল বরনু সহ আরও কয়েকজন লোক। চাইল্ড আর্মি তাদের সামরিক কায়দাতে স্যালুট দেবার পর বরনু প্রশিক্ষক ছেলেটার সাথে কী সব কথাবার্তা বললেন। এর পর রংরুটদের মধ্যে থেকে একটা বাচ্চা ছেলেকে হাজির করানো হল বরনুর সামনে। বরনু বাচ্চাটার পিঠ চাপড়ে তার সাথেও কী সব কথা বলল। বাচ্চাটার হাতে একটা সাবমেশিনগান ধরিয়ে তার চোখ বেঁধে দেওয়া হল। আর এর পরই এক নৃশংস কুনাট পরিবেশিত হল। গাড়ির ভিতর থেকে চোখ, হাত-পা বাঁধা একটা লোককে নামিয়ে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল চোখ বাঁধা ছেলেটার রাইফেলের নলের কয়েক হাত তফাতে। ব্যাপারটা কী হচ্ছে বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নিল সবাই। চত্বর ছাপিয়ে জেনারেল বরনুর গলার শব্দ শোনা

গেল—'ফায়ার!' পর মুহূর্তেই গুলির শব্দ হল। উল্লাসে চিৎকার করে উঠল জানলার পাশে যে এখন বসে আছে সেই ছেলেটা। চোখ বাঁধা যে ছেলেটা গুলি চালাল সে চোখ খুলে সামনে কী দেখতে পাবে তা কল্পনা করে কেঁপে উঠল দীপাঞ্জন। চোখ বাঁধা অবস্থায় নিজের অজান্তে বাচ্চা ছেলেটাকে খুনের তালিম দিল জেনারেল বরনু! লোকটা মানুষ না পশু! এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দীপাঞ্জনদের ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল। ঘরে ঢুকল জেনারেল বরনু, আর তার ক-জন লোক। তাদের একজনের হাতে একটা ক্যামেরা। জেনারেল বরনু বলল, 'আশাকরি আমার অতিথিশালাতে আপনারা ভালোই আছেন?'

এই ঘৃণ্য লোকটার কথার জবাব দেবার রুচি কারও হল না। চুপ করে রইল সবাই।

বরনু এরপর বলল, 'আপনাদের ছবি তোলা হবে। আপনারা যে আমার অতিথি এ-ছবি তার প্রমাণস্বরূপ সরকারের কাছে পাঠানো হবে।'

বরনুর কথা এমি তর্জমা করার পর জুয়ান বললেন, 'আমি ছবি তুলতে দেব না। আমার জীবনের বিনিময়ে কোনো খুনি মুক্তি পাক তা আমি চাই না।'

কথাটা শুনে বরনু বলল, 'সে ক্ষেত্রে আপনার মৃতদেহের ছবি তুলে পাঠানো হবে। একদিক থেকে সেটা ভালো হবে। অন্যদের আপনার মতো পরিণতি হতে পারে ভেবে দ্রুত আমাদের দাবি মানবে সরকার।'

ব্যাপারটা অন্যদিকে মোড় নিতে পারে। বরনুর সঙ্গীদের আগ্নেয়াস্ত্র তাগ করা জুয়ান সহ দীপাঞ্জনদের দিকে। বরনুর নির্দেশে যে-কোনো মুহূর্তে গুলি চালাতে পারে এই হিংস্র লোকগুলো। ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুভব করে দীপাঞ্জন জুয়ানকে বলল, 'প্লিজ মাথা ঠান্ডা করুন। এদের সাথে ঝগড়া করে লাভ নেই, বরং কৌশলে মুক্তির উপায় খুঁজতে হবে। এরা এখন যা করছে করতে দিন।' দীপাঞ্জনের কথা শুনে জুয়ান আর কিছু বললেন না। দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে একে একে ছবি তোলা হল তাদের চারজনের। ছবি তোলা শেষ হলে বরনু দাঁত বার করে বলল, 'কালকের মধ্যেই আশা করা যায় যে এ-ছবিগুলো এঞ্জাসেনাতে পৌঁছে যাবে। তারপর দেখি কী হয়? সরকার একান্তই যদি শেষ পর্যন্ত আমার লোক দু-জনকে ছাড়তে রাজি না হয় সেক্ষেত্রে আর কী করব? তখন রং-রুটদের টার্গেট হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেব আপনাদের।'

তার কথা শুনে শ্যাঁপেলিও বলে উঠলেন—'শয়তান।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বরনু। আবার বাইরে থেকে শিকল উঠল সে-ঘরে। দীপাঞ্জনরা দেখতে পেল এর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গীদের নিয়ে গাড়িতে উঠে সে জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সেই বরনু।

জুয়ান বললেন, 'লোকটা কী ধূর্ত দেখ। নিজে এখানে থাকে না। এখানে যদি পুলিশ বা আর্মি হানা দেয় তবে বাচ্চাগুলো মরবে অথচ আসল শয়তানটা দিব্যি বেঁচে যাবে।'

এমি বলল, 'হয়তো এমন আরও ঘাঁটি আছে শয়তানটার। সেখানে আরও চাইল্ড আর্মি আছে। এ-জায়গাগুলোর মতো সেগুলোও খনি তৈরির কারখানা।'

বরনু জায়গাটা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর দীপাঞ্জন আর এমি এসে দাঁড়াল জানলার

ধারে। চত্বর থেকে মৃতদেহটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ট্রেনিং দেওয়া শেষ করার পর সেই ছেলেটা আবার জানলার বাইরে নিজের জায়গাতে এসে বসেছে। মেশিনগানটা কোলের ওপর শুইয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটছে সে। দীপাঞ্জনরা জানলার সামনে এসে দাঁড়াতেই সতর্ক চোখে সে তাকাল তাদের দিকে। বিশেষত দীপাঞ্জনকে সে ভালো করে দেখতে লাগল। হয়তো সেটা তার গায়ের রঙের জন্যই। এমির মতো কালো মানুষ বা জুয়ান, শ্যাঁপেলিওর মতো মানুষ এর আগে দেখেছে বাচ্চা ছেলেটা। কিন্তু দীপাঞ্জন মতো সাদা কালোর মাঝামাঝি কোনো লোককে সম্ভবত এর আগে দেখেনি। দীপাঞ্জনের এ-অনুমান সম্ভবত সত্যি, কারণ হঠাৎ সে এমিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের সঙ্গের এ-লোকটা কোন্ দেশের?'

এমি জবাব দিল, 'ইন্ডিয়া-র'।

ছেলেটা এরপর আবার জানতে চাইল, 'সে দেশটা কোথায়? চাদ হ্রদের ও পাড়ে?'

এমি উত্তর দিল, 'আরও অনেক দূরের দেশ।' তারপর এমি সুযোগ বুঝে তাকে প্রশ্ন করল। তোমার নাম কী?'

ছেলেটা গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'লেফটানেন্ট টোটা'।

এ-বয়সি অন্য কোনো ছেলে নিজেকে লেফটানেন্ট বললে হয়তো হেসে ফেলত দীপাঞ্জন। কিন্তু এদের কাজকর্ম নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে সে, তাই হাসি এল না। সে এমিকে বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করো কীভাবে সে এখানে এল?'

এমি তাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কথাটা। কিন্তু তারপরই ছেলেটা জানলার দিকে মেশিনগানের নল উঁচিয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিল সে আর কথা বলতে রাজি নয়। এরপর মুখ ফিরিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে হ্রদের দিকে তাকিয়ে রইল।

জানলার কাছ থেকে সরে এসে ঘরের মাঝখানে বসল দীপাঞ্জনরা, শ্যাঁপেলিও বললেন, 'তার মানে আমাদের ভাগ্য এখন নির্ভর করছে সরকারি সিদ্ধান্তর ওপর। এ নরককুণ্ড থেকে মুক্তি পাব কিনা কে জানে!'

জুয়ান বললেন, 'এদের কার্যকলাপ তো নিজের চোখেই দেখছেন। এমি আমরা প্রাণের বিনিময় ওই টেররিস্টদের মুক্তি চাই না। ওরা জেল থেকে বেরিয়ে আবার কত শিশুকে খুনি বানাবে কে জানে? ছোটো ছোটো শিশুদের যারা এমন খুনি বানাচ্ছে তাদের মতো ঘৃণ্য জীব আর কেউ হতে পারে না। স্বয়ং শয়তানও এদের মনে হয় ক্ষমা করবে না!' বেশ উত্তেজিতভাবে কথাগুলো বললেন তিনি।

শ্যাঁপেলিও তার কথা শুনে বললেন, 'আমি আপনার কথার বিরোধিতা করছি না, কিন্তু এখান থেকে মুক্তির অন্য উপায় খোঁজারও চেষ্টা করা উচিত। অন্তত একটা চেষ্টা . . .'।

এমি বলল, 'জেনারেল বরনু আর তার বয়স্ক অনুচররা তো চাইল্ড আর্মির হাতে আমাদের ছেড়ে রেখে চলে যায়। বাইরে ওই যে বাচ্চাটা পাহারা দিচ্ছে ওর নাম লেফটোনেন্ট টোটা। ওর তত্ত্বাবধানেই আমরা থাকি। কোনোভাবে যদি এই চাইল্ড আর্মিকে বশ করা যেত!'

শ্যাঁপেলিও শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, এই ছেলেটাকে যদি কোনোভাবে হাত করা যায় তবে হয়তো পালানো সম্ভব।'

একথা বলে কী যেন একটা ভেবে তিনি বললেন, 'আমি একবার চেষ্টা করে দেখব?'

দীপাঞ্জন জিজ্ঞেস করল 'কী ভাবে?'

শ্যাঁপেলিও তার ব্যাগটা খুলে কাগজ জড়ানো বেশ বড়ো একটা প্যাকেট বের করলেন। তিনি প্যাকেটটা খুলতেই চমকে গেল সবাই এত টাকা!

তিনি বললেন, 'এখানে দু-লক্ষ ফ্রাঙ্ক আছে। পৃথিবীতে ছেলে বা বৃদ্ধ এমন লোক নেই যে টাকায় বশ হয় না। দেখা যাক!'

এই বলে তিনি টাকার বান্ডিলগুলো নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাই দেখে দীপাঞ্জন আর এমিও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, শ্যাঁপেলিও জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সেই ঝকঝকে নতুন কারেন্সি নোটগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। বাচ্চা ছেলেটা এক সময় ফিরে তাকাল। অত টাকা দেখে প্রাথমিকভাবে বিস্ময় ফুটে উঠল তার মুখে। শ্যাঁপেলিওর সাথে তার চোখাচোখি হতেই তিনি একটা বান্ডিল নেড়ে হাসলেন বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে। ছেলেটা স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শ্যাঁপেলিওর হাতে ধরা টাকার বান্ডিলগুলোর দিকে। এরপর ধীরে ধীরে তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠতে লাগল। তাহলে কী শ্যাঁপেলিওর পরিকল্পনা সত্যি হতে চলেছে? বশ মানতে চলেছে বাচ্চা ছেলেটা?

ছেলেটার হাসি ক্রমশ চওড়া হতে শুরু করেছে টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে, শ্যাঁপেলিও এমিকে বলল, ওকে বলো ও-যদি আমাদের মুক্তি দেয় তবে এই সব টাকা ওর। ওকে তাহলে আর এসব খুন খারাপি করতে হবে না। ও-রাজার মতো দিন কাটাবে কিন্তু তার আগেই লেফটানেন্ট টোটা এমির উদ্দেশে হেসে উঠে বলল, 'তোমার সঙ্গী এই সাদা চামড়াকে বলে দাও ও-সব টাকা দেখিয়ে কোনো কাজ হবে না। আমরা টাকা চাই না, স্বাধীনতা চাই। এই সাদা চামড়ার লোকগুলো দীর্ঘদিন আমাদের শাসন করেছে, শোষণ করেছে। এ-দেশে এখন কালো চামড়ার সরকার আছে ঠিকই, কিন্তু তার পিছনে আসলে আছে সাদা চামড়ার লোকরাই। জেনারেল বরনু এ দেশে প্রকৃত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবে। আমরা তার সৈনিক, টাকার বশ আমরা হব না।'—এই বলে সে-তার মেশিনগানের নলটা তাগ করল জানলার দিকে। যেন শ্যাঁপেলিও আর একটা কথা বললেই সে গুলি চালাবে। জানলার কাছ থেকে তারা তিনজনই সঙ্গে সঙ্গে সরে এল। মাটিতে বসে টাকাগুলো ব্যাগে ভরে শ্যাঁপেলিও বললেন, 'এইটুকু ছোটো বাচ্চাদের কেমন মগজ ধোলাই করা হয়েছে দেখেছ! তবে আমি শেষ আর একটা চেষ্টা করব। স্বয়ং শয়তানেরও সে ফাঁদে পা দেওয়া উচিত।'

'সেটা কী ফাঁদ?' এমি প্রশ্ন করল। কিন্তু শ্যাঁপেলিও কোনো জবাব দিলেন না।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হল এক সময়। শ্যাঁপেলিও টোটাকে টাকা দেখাবার পরই যেন আরও সতর্ক হয়ে গেছে চাইল্ড আর্মির নেতা লেফটানেন্ট টোটা। সে অনুমান করেছে পালাবার ফিকির খুঁজছে বন্দিরা। তাই সে মেশিনগানের নলটা জানলার দিকেই ঘুরিয়ে

রেখেছে। সে যে উঁচু জায়গাটাতে বসে আছে সেখান থেকে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। দীপাঞ্জন খেয়াল করছে বাচ্চাটা মাঝে মাঝেই সতর্কভাবে দেখার চেষ্টা করছে ঘরের মেঝেতে বসে থাকা দীপাঞ্জনদের কার্যকলাপ। বিকাল হতেই সকালের রং-রুটরা হাজির হল মার্চপাস্টের জায়গাতে। তাদের সাথে চাইল্ড আর্মির প্রহরীরা। বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের জন্যই সম্ভবত লেফটানেন্ট নিজের জায়গা ছেড়ে এবেলা নড়ল না। একজন চাইল্ড সোলজারকে ডেকে সে তাকে নতুন ছেলেদের তালিমের নির্দেশ দিল। ছেলেটা ফিরে গিয়ে মার্চ পাস্ট শুরু করল।

এরপর সন্ধ্যা নামল। আগের দিনের মতোই ক-টা মশাল জ্বলল। দিনের শেষে দীপাঞ্জনদের খাবার দিয়ে গেল দুজন। সেই একই খাবার। পোড়া রুটি আর ঝলসানো হিপোর মাংস। দীপাঞ্জনরা তো খেল, বাইরে বসে লেফটানেন্টও তাই খেলেন। খাওয়া শেষ করে আগের দিনের মতোই চাইল্ড আর্মিকে ডেকে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন লেফটানেন্ট। মশাল নিভিয়ে দেওয়া হল এরপর। আরও একটা দিন কেটে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দীপাঞ্জনরা শুয়ে পড়ল।

শুলেও কিছুতেই ঘুমাতে পারছিল না দীপাঞ্জন। বারবার তার খালি মনে পড়ছিল দেশের কথা। কোথায় কলকাতা আর কোথায় এই আফ্রিকায়। চাদ হ্রদের ধারে চাইল্ড আর্মির এই বন্দি শিবির। এক-এক সময় তার মনে হচ্ছে যে এই পুরো ব্যাপারটাই নিছকই হয়তো একটা দুঃস্বপ্ন। এর আগে মেক্সিকো আর রোমে বেড়াতে গিয়েও বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল সে আর প্রফেসর জুয়ান। কিন্তু সে-বিপদ ছিল অন্যরকম। বেশ কয়েক ঘণ্টা শুয়ে শুয়ে ছটফট করার পর জল তেষ্টা পেল দীপাঞ্জনের। মাটি থেকে উঠে ঘরের কোণা থেকে জল খেয়ে সে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। চাঁদ উঠেছে। বেশ বড়ো গোল চাঁদ। গাছপালার ফাঁক দিয়ে হ্রদটা দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোতে চিকচিক করছে হ্রদটা। জানলার ওপাশে ছেলেটা একলা বসে তাকিয়ে আছে মাথার ওপর চাঁদের দিকে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। কেমন যেন অবসন্ন দেখাচ্ছে তাকে। দীপাঞ্জনের এই প্রথম তাকে দেখে মনে হল ছেলেটার মুখের কাঠিন্যের আবরণ যেন সরে গেছে। বিষণ্ণ ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখে। বাচ্চা ছেলেটা চাঁদের দিকে তাকিয়ে হয়তো ভাবছে তার হারিয়ে যাওয়া বাপ মার কথা, প্রিয়জনদের কথা। জেহাদের কথা, বিদ্রোহের কথা, তার কোলে শোয়ানো মেশিনগানের কথা এই মুহূর্তে হয়তো ভুলে গেছে সে। হয়তো তার চোখে ভেসে উঠছে চাদ হ্রদের ধারে কোনো শান্ত কুটিরের ছবি। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ছেলেটা ফিরে তাকাল জানলার দিকে। দীপাঞ্জনকে দেখে সে সম্ভবত আবছা হাসল। দীপাঞ্জনও হাসল। ছেলেটা এরপর হাতের ইশারাতে তাকে বলল—'যাও ঘুমিয়ে পড়ো।'

ভোর হল। ঘুম থেকে উঠে দীপাঞ্জন দেখল জানালার বাইরে লেফটানেন্ট টোটা নেই। তার থেকেও একটা ছোটো ছেলেকে সে তার জায়গাতে পাহারায় বসিয়ে রেখে গেছে। ছেলেটা এতই ছোটো যে তার হাতের রাইফেলটা যদি মাটিতে খাড়া করে তার পাশে তাকে দাঁড় করানো যায় তবে রাইফেলের নল বোধ হয় তার মাথা ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু কী হিম শীতল বাচ্চাটার চোখের দৃষ্টি! মুখে শিশুসুলভ কোনো ছাপ নেই তার। রক্তজমাট কাঠিন্য তার মুখে। রাইফেলের নলটা জানলার দিকে তাক করে ট্রিগারে আঙুল রেখে রোবটের মতো সে বসে আছে।

পাথুরে চত্বরটাতে ভিড় জমিয়েছে রং-রুট আর চাইল্ড আর্মিরা। লেফটানেন্ট টোটা সেখানে নেই। হয়তো কোথাও সে বিশ্রাম নিচ্ছে। সারা রাত ঘরটা সে পাহারা দিয়েছে।

গতদিনের মতোই মার্চপাস্ট শুরু হল, তারপর টার্গেট প্র্যাকটিস। মেশিনগান আর রাইফেলের মুহুর্মুহু শব্দে শব্দে জায়গাটা কেঁপে উঠতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলি চলার পর সেই গাড়িটা প্রবেশ করল চত্বরে। গাড়ি থেকে নামল জেনারেল বরনু আর তার সঙ্গীরা। এবং তাদের সাথে জাদুকর কুরি! তার হাতে শিকল বাঁধা হায়নার বাচ্চাটা। জাদুকর কুরি! তার গলায় ঝুলছে ফুলানি ট্যামট্যামটা। সবাই স্যালুট জানাল জেনারেলকে। টোটা এরপর কোথা থেকে যেন উপস্থিত হল সেখানে। জেনারেল বরনু তার পাশে দাঁড়ানো জাদুকর কুরিকে দেখিয়ে কী যেন বলতে লাগল টোটা আর চাইল্ড আর্মিকে। এত দূর থেকে অবশ্য তাদের কথা শোনা যাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ কথা চলার পর বরনু জাদুকরকে দীপাঞ্জনদের ঘরটা দেখিয়ে আঙুল তুলে দেখিয়ে কী সব বলল, তারপর কয়েদখানার দিকে না এসে তার অনুচরদের নিয়ে গাড়ির দিকে এগোল। তাকে দেখে মনে হল সে ভীষণ ব্যস্ত। তবে জাদুকর কিন্তু চাইল্ড আর্মিদের সাথেই দাঁড়িয়ে রইল। জেনারেলের গাড়ি চলে যাবার পর কুরি চাইল্ড আর্মির উদ্দেশে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কী সব বলল। জমায়েতটা ভেঙে গেল। জাদুকরকে নিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হল একটা ছেলে। লেফটানেন্ট টোটা চত্বর ছেড়ে এবার এসে বসল কয়েদখানার বাইরে তার নিজের জায়গাতে যে বাচ্চাটাকে সে বসিয়ে রেখেছিল তার পাশে। দীপাঞ্জনের সাথে তার চোখাচোখি হল। দীপাঞ্জন হাসলেও সে হাসল না। গম্ভীর তার মুখ।

সূর্য এখন সময় মধ্যগগনে পৌঁছল। বাইরে প্রচণ্ড রোদ। চত্বরটা মোটামুটি ফাঁকা হয়ে গেছে। দু-একজন চাইল্ড সোলজার শুধু ইতিউতি বন্দুক কাঁধে ঘুরছে। আর শুধু জানলার বাইরে বসে আছে টোটা আর সেই বাচ্চা ছেলেটা। জুয়ান বললেন, 'আমাদের ওপর নজরদারি মনে হয় বাড়ল, একজনের বদলে দুজন হল। আবার শয়তান জাদুকরটাও

এখানে হাজির হল কে জানে। হয়তো আমাদের ওপর নজর রাখার জন্য।'

দীপাঞ্জন আক্ষেপের সুরে বলল, 'ইস, কোনোভাবে যদি এই বাচ্চাগুলোকে বোঝানো যেত! কিন্তু এরা তো টাকাতেও বশ হয় না!'

তার কথা শুনে শ্যাঁপলিও বললেন, 'টাকাতে হয়নি ঠিকই তবে আমি এবার শেষ চেষ্টা করব। দেখি কিছু হয় কি না? এতে কোনো সরকারি সেনাদলও নিজের দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে।'

'সেটা কী?' জানতে চাইলেন জুয়ান।

মঁসিয়ে শ্যাঁপেলিও একবার জানলার বাইরে তাকালেন। না, জানলার বাইরে ওই দু-জন ছাড়া আর কেউ নেই। শ্যাঁপেলিও এরপর তার ডান পা থেকে তার হাই হিল বুটটা খুলে ফেললেন। জুতোটা উলটিয়ে ধরে তার হিলটা ধরে টান মারতেই সেটা একটু বাইরে বেরিয়ে এল। দেশলাই বাক্সর মতো একটা ফোকড়, তার মধ্যে ছোট্ট পলিথিনের প্যাকেটে কী যেন রয়েছে। শ্যাঁপেলিও সেই প্যাকেটটা নিয়ে তার ভিতরের জিনিসগুলো ঢাললেন তার তালুতে। বাইরে থেকে আসা সূর্যের আলোতে যেন ঝলসে উঠল শ্যাঁপেলিওর হাত। চোখ ধাঁধিয়ে গেল দীপাঞ্জনদের। দ্যুতি ছড়াচ্ছে শ্যাঁপলিওর হাত! হীরক দ্যুতি!

বিস্মিত কণ্ঠে জুয়ান বলে উঠলেন, 'হিরা!'

শ্যাঁপেলিও মৃদু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, দুর্মূল্য হিরা। জানেন তো আমি হীরক ব্যবসায়ী। এগুলো এত দামি যে আমি এদেরকে কোনোদিন কাছ ছাড়া করি না। এগুলোর বিনিময় আপনি পৃথিবীর যে-কোনো শহরের সবচেয়ে দামি বাড়ি কিনতে পারেন, অনায়াসে কিনতে পারেন গোটাকতক এরোপ্লেন বা একটা জাহাজ, বানাতে পারেন সর্বাধুনিক হাসপাতাল বা কয়েকটা স্কুল। পৃথিবীতে এক দেশের টাকা অন্য দেশে চলে না, কিন্তু হিরা পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জিনিস। আমি এগুলোর বিনিময়ে আমাদের মুক্তি কিনব।' এই বলে তিনি মুঠো ভরতি হিরে নিয়ে জানলার সামনে দাঁড়ালেন। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল দীপাঞ্জন আর এমি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাদের দিকে তাকাল লেফটানেন্ট টোটা আর তার সঙ্গী ছেলেটা। সূর্যের আলো এবার সরাসরি শ্যাঁপেলিওর হাতে এসে পড়েছে। আয়নার কাচে সূর্য প্রতিফলিত হলে যেমন হয়, তেমনই অগুনন্তি সূর্য যেন প্রতিফলিত হচ্ছে শ্যাঁপেলিওর হাত থেকে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ছেলে দুটো।

কয়েক মুহূর্ত শ্যাঁপেলিওর হাতের দিকে তাকিয়ে থাকার পর লেফটানেন্ট টোটো লাফিয়ে নামল সেই উঁচু জায়গাটা থেকে তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে এসে জানলার সামনে দাঁড়াল।

এরপর সে বিস্মিতভাবে জানতে চাইল এগুলো কী! কাচ না অন্য কিছু?

এমি বলল, 'কাচ নয় হিরা। সত্যিকারের হিরা।'

'হিরা! এ তো খুব দামি জিনিস জেনারেলের আঙুলে আছে আমি দেখেছি। যাদের কাছে হিরা থাকে তারা নাকি খুব বড়োলোক হয়।' এই বলে অপলক দৃষ্টিতে সে চেয়ে

রইল শ্যাঁপেলিওর হাতের দিকে।

ওষুধ একটু ধরতে শুরু করেছে বুঝতে পেরে এমি বলল, 'এই হিরাগুলো আমরা তোমাদের দিতে পারি যদি তুমি আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করো। এই হিরাগুলো পেলে তোমরা এত বড়োলোক হয়ে যাবে যে আর তোমাদের পোড়া রুটি খেতে হবে না। বিরাট বিরাট বাড়ি-গাড়ি হবে তোমাদের। কোনো দুঃখ কষ্ট আর থাকবে না। শুধু আমাদের পালাবার ব্যবস্থা করো তুমি। তাহলেই সব দেব।'

'তুমি সত্যি বলছ?' জানতে চাইল ছেলেটা।

এমি বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি বলছি। শুধু তুমি আমাদের পালাবার ব্যবস্থা করো।'

এমির কথা শেষ হলে শ্যাঁপেলিও একটা হিরা আঙুলে তুলে সেটা বাড়িয়ে দিলেন টোটার দিকে। সূর্যকিরণে ঝলমল করে উঠল সেটা। টোটা হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিয়ে সূর্যের আলোতে সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। আর তার সাথে বলতে লাগল, 'তাহলে আর পোড়ারুটি খেতে হবে না? গাড়ি হবে, বাড়ি হবে?'

এমি বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে। এমনকি মানুষ নিয়ে যে 'কলের পাখি' আকাশে ওড়ে তেমন পাখিও কিনতে পারবে তুমি। তা চেপে ঘুরে বেড়াতে পারবে সব জায়গাতে।'

হিরাটা দেখতে দেখতে আর এমির কথা শুনতে শুনতে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল টোটার চোখমুখ। আর তার সাথে সাথে মুক্তির আশায় দীপাঞ্জন আর শ্যাঁপেলিওর মুখও উজ্জ্বল হতে শুরু করল। এমি ছেলেটার উদ্দেশ্যে বলে যেতে লাগল, 'যদি আমাদের মুক্ত করো, তবে সব তোমাদের, সব তোমাদের, আর কোনো কষ্ট থাকবে না, দুঃখ থাকবে না . . .।' কিন্তু এরপর হঠাৎই যেন লেফটানেন্ট টোটার মুখের উজ্জ্বলতা উধাও হয়ে গেল। ফিরে এল চোয়ালের কাঠিন্য। হিরাটা জানলার ফাঁক গলিয়ে শ্যাঁপেলিওর হাতে দিয়ে সে বলল, 'আমাদের লোভ দেখিও না। আমরা জেনারেল বরনুর সৈনিক। জেনারেল দেশটাকে আবার স্বাধীন করবে। এখন এ-দেশে আর কোনো গরিব থাকবে না। আমাদের কোনো দুঃখ থাকবে না, কষ্ট থাকবে না . . .।'

তার কথার প্রত্যুত্তরে এমি যেন তাকে কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ছেলেটা কাঁধ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র খুলে নিয়ে জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে তার নলটা এমির বুকে চেপে ধরে বলল, 'চুপ করো নইলে গুলি চালাব।'

অগত্যা জানলার পাশ থেকে সরে এল সবাই। জেনারেল টোটা আবার নিজের জায়গাতে ফিরে গেল তারপর নিস্পৃহ ভাবে তাকিয়ে রইল চত্বরের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আবার উঠে দাঁড়াল সে। তারপর সঙ্গী ছেলেটার উদ্দেশ্যে কিছু বলে উধাও হয়ে গেল দীপাঞ্জনের চোখের আড়ালে। ছোট্ট ছেলেটা টোটা চলে যাবার পর চত্বরের দিকে পিঠ দিয়ে তার অস্ত্রটা সোজা জানলার দিকে তাক করে বসল।

মেঝেতে বসে থাকা শাঁপেলিও হতাশভাবে বললেন, 'আমার এই শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হল। এখন ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'

জুয়ান বললেন, 'আমি জানতাম এটাই ঘটবে। এই সব বাচ্চাদের এমনভাবে মগজধোলাই করা হয়েছে যে, টাকা হিরা-জহরত কিছু দিয়েই এদের বশ করা যাবে

না। জেহাদ, বিপ্লব, স্বাধীনতা—এই সব ভাবনা এদের রক্তের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বয়সের শিশুদের মন কাদার তালের মতো নরম থাকে। তাদের যে ছাঁচে ফেলবেন সে ছাঁচই আঁকা হয়ে যাবে মনের মধ্যে।'

দীপাঞ্জন বলল, 'আশাকরি আরও চারপাঁচ দিন বেঁচে থাকার জন্য সময় পাব। দেখা যাক কী হয়।'

হঠাৎ এমি জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন এদিকে কে আসছে!'

দীপাঞ্জনরা তাকিয়ে দেখল চত্বরের দিক থেকে একটালোক এগিয়ে আসছে এই বন্দিশালার দিকে। ভালো করে তাকে দেখে চিনতে পারা গেল। চেনা গেল তার গলায় ঝোলানো ফুলানি ট্যামট্যামটা দেখে। শয়তান জাদুকর কুরি। তার পরনে তখন পুরোদস্তুর সামরিক পোশাক। জংলা ছাপ জামাপ্যান্ট, পায়ে বুট কোমরে রিভলবার, কাঁধে রকেট লঞ্চার। শুধু ট্যামট্যামটা কাছ ছাড়া করতে তার হয়তো মন চায়নি, সেটা সে এখনও গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে। শিঙাটা কোমরে গোঁজা জুয়ান বললেন, 'দেখো মনে হচ্ছে শয়তানটা পাকাপাকিভাবে বরনুর দলে যোগ দিল আজ। আবার এমনও হতে পারে যে ওর ডেরায় পুলিশ আর্মি হানা দিতে পারে এই আশঙ্কা থেকেই এখানে পালিয়ে এসেছে। পুলিশ আমাদের খোঁজ করতে গ্রামে এলে গ্রামবাসীরা নিশ্চয় তাদের জানাবে যে আমরা কুরির ডেরার উদ্দেশ্যেই গ্রাম ছেড়ে নিখোঁজ হয়েছি। কিন্তু ও আবার এদিকে আসছে কেন?'

শ্যাঁপেলিও বললেন, 'হয়তো টোটা হিরার খবরটা ওকে গিয়ে জানিয়েছে। হিরা নিতে আসছে সে।'

দেখতে দেখতে জাদুকর কুরি এসে উপস্থিত হল জানলার সামনে। গরাদ ধরে ভিতরে উঁকি দিয়ে হেসে বলল, 'কেমন আছো তোমরা? আমাকে এ পোশাকে চিনতে পারছ তো?'

এমি ক্ষিপ্ত হয়ে জবাব দিল, 'তোমাদের মতো হায়নাকে চিনতে অসুবিধা হয় না। তা তুমি এখানে এলে কেন?'

শয়তান জাদুকর কুরি ঠিক হায়নার মতোই 'হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, 'যে লোক দুটোকে বাচ্চাগুলো গুলি চালিয়েছিল তার একটা আরও কিছুক্ষণ বেঁচে ছিল তারপর। গ্রামের লোকেরা তার খোঁজ পায়। মরার আগে সে ব্যাপারটা গ্রামের লোকদের বলে। ক্ষিপ্ত হয়ে তারা আমার কুঁড়েটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। তবে তাতে আমার দুঃখ নেই। জেনারেল বরনু আর কিছুদিনের মধ্যেই সারা দেশ দখল করবে। তারপর সে এঞ্জামেলা চলে যাবে। তখন আমি এ তল্লাটের মালিক হব। হায়না দিয়ে খাওয়াব ওই গ্রামের লোকগুলোকে।'

এরপর সে বলল, 'ওই টোটা বলে বাচ্চা ছেলেটার বদলে আমিই আজ থেকে লেফটানেন্ট। জেনারেল বরনু আমাকে এ জায়গায় দায়িত্ব দিয়েছে। আমি এখন 'লেফটানেট কুরি।' আমার কথায় এখন থেকে এখানে সবকিছু চলবে। লেফটানেন্ট হিসাবে আমাকে তোমাদের পছন্দ হয়েছে তো?' এই বলে আবার সে শয়তানের হাসি হাসল।

কেউ তার কোনো কথার জবাব দিল না। দীপাঞ্জন মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ, জেনারেল বরন্নুর সহচর তো তোমার মতো হায়নাই হবে!' দীপাঞ্জনের অবস্থা এখন ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো। হায়নাটা তার কথার উত্তর পেল না ঠিকই, কিন্তু তাদের দুর্দশা উপভোগ করে শ্যাঁপেলিওর উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করে বলল, 'তুমিতো আবার ভালো হায়না মারতে পারো বলছিলে? কিন্তু এ জীবনে আর তোমার হায়না শিকার হল না, আর এই ফুলানি ট্যামট্যাম পাওয়াও হল না-তবে দুঃখে পেও না, আমি তোমাকে এর বাজনা শোনাচ্ছি।'—এই বলে সে জামার ভিতর থেকে কাঠি বার করে ঘা দিল সেই ঢাকে।

তীব্র ট্যামট্যাম শব্দে বাজতে শুরু করল সেই ঢাক। কয়েকবার ঢাকে কাঠি পড়ার পরই এমির মুখটা কেমন যেন রক্তবর্ণ ধারণ করল! সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'বাজনা বন্ধ করো, বন্ধ করো।'

কিন্তু জাদুকর কুরি হাসতে হাসতে বাজিয়ে চলল তার ঢাক। সেই শব্দে চত্বরে এ-পাশ ও-পাশ থেকে ছুটে আসতে লাগল চাইল্ড আর্মিরা। চাইল্ড আর্মির সোলজাররা মনে হয় তাদের বাহিনীর কোনো লোককে এমন ভুঁড়ি নাচিয়ে ঢাক বাজাতে দেখেনি। তাদের কঠিন চোয়ালের আড়াল থেকে আবছা হাসি উঁকি দিতে লাগল। আর এমি উঠে দাঁড়িয়ে দু-কানে আঙুল দিয়ে ছটফট করতে করতে বলতে লাগল, 'দোহাই তোমার! বাজনা থামাও। দরকার হলে আমাকে গুলি করে মারো কিন্তু বাজনা থামাও।'

জাদুকর তখন ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করেছে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল আসে পাশে উপস্থিত হওয়া বাচ্চাগুলোর ওপর। এমির অনুনয়ের জন্য নয়। হয়তো শয়তানটার হঠাৎ মনে হল বাচ্চা ছেলেগুলোর সামনে তার নেচে নেচে ঢাক বাজানো ঠিক হচ্ছে না। একজন ওঝা বা জাদুকর হিসাবে তার এই ব্যাপারটা স্বাভাবিক। কিন্তু সামরিক বাহিনীর লেফটানেন্ট হিসাবে এটা শোভনীয় নয়। বাচ্চাগুলো হাসছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বাজনা থামিয়ে দিল। তারপর কঠিন স্বরে দীপাঞ্জনদের উদ্দেশ্যে বলল, 'তোমাদের ভাগ্য এখন বলতে পারো আমার হাতে। পালাবার চেষ্টা করলে, বা কোনো বেচাল দেখলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারব।' —এই বলে সে চত্বরের দিকে যাবার জন্য পা বাড়াল।

কিন্তু কয়েক পা হেঁটেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল। যে বাচ্চাটা জানলার বাইরে পাহারায় বসে ছিল তার উদ্দেশ্যে কুরি বলল, 'তুমি আমাকে দেখেও বসে আছো কেন? স্যালুট দিচ্ছ না কেন? আমি আজ থেকে লেফটানেন্ট। সৈনিকরা লেফটানেন্টকে স্যালুট করে।'

ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমরা তো লেফটানেন্ট টোটাকে স্যালুট করি না। তুমি যে লেফটানেন্ট আমার জানা ছিল না। আমি সকাল থেকে এখানেই বসে আছি।'

'জানা ছিল না? নাকি আমাকে তুমি মানতে চাইছ না?'—চিৎকার করে উঠল জাদুকর কুরি। ঢোলকটা তার দেহের সাথে দুলে উঠল। আর তাই দেখেই সম্ভবত হেসে ফেলল বাচ্চাটা।

এ-ব্যাপারটা আর সহ্য করতে পারল না হায়নাটা। এতটুকু বাচ্চা তাকে মানছে না! কুরির কোমরে একটা চাবুক প্যাঁচানো ছিল। সেটা মুহূর্তের মধ্যে খুলে নিয়ে সে সেটা

চালিয়ে দিল বাচ্চাটার ওপর। চাবুকের আঘাতটা গিয়ে পড়ল বাচ্চাটার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছিটকে পড়ল বেশ কয়েক হাত তফাতে। তার ছোট্ট কালো মুখে ফুটে উঠল লম্বা লম্বি রক্তের রেখা। চাবুকের লিকলিকে, হিলহিলে সাপের লেজের মতো প্রান্তটা তার মুখের ওপর কেটে বসে গেছে। মাটিতে পড়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে গোঙাতে লাগল বাচ্চাটা। স্তম্ভিত হয়ে গেল এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকা চাইল্ড আর্মির বাচ্চাগুলো। হাসি মিলিয়ে গেল তাদের ঠোঁটের কোণ থেকে। হয়তো চাইল্ড আর্মির এই বাচ্চাটা ইতিমধ্যেই অনেক মানুষ খুন করেছে, হয়তো-বা ভবিষ্যতে এই ছেলেটাই গুলি চালিয়ে মারবে দীপাঞ্জনদের, তবু সে শিশু। এ-ব্যাপারটা দেখে শিউরে উঠল দীপাঞ্জনরাও। ঠিক এই সময় বাইরে উপস্থিত হল টোটা। কুরি আর বাচ্চাটার মাঝখানে সে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে শয়তান হায়নাটা বলে উঠল, 'তোমার সঙ্গীদের সবাইকে বলে দাও আমি এখন লেফটানেন্ট। এখন থেকে আমার হুকুম মতোই এখানে সব কিছু চলবে। কোনো কিছু বেচাল দেখলে এর মতোই চাবুক চলবে অন্যদের ওপরও।' এই বলে শয়তানটা সে-জায়গা ছেড়ে অন্য দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে চলে যাবার পরে টোটা বাচ্চাটাকে মাটি থেকে উঠিয়ে আবার তার আগের জায়গাতে বসাল। রক্ত ঝরছে তার মুখ দিয়ে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে বাচ্চাটা। টোটা পকেট থেকে একফালি ন্যাকড়া বার করে বাচ্চাটার মুখের রক্ত মুছিয়ে দিতে লাগল।

প্রফেসর জুয়ান দীপাঞ্জনকে বলল, 'শেন, আমাদের 'মেডিক্যাল কিটে' কাটা-ছেঁড়ার জন্য একটা 'অয়েনমেন্ট' আছে না? একবার দিয়ে দেখতে পারো, যদি নেয়? বাচ্চাটার রক্ত বন্ধ হতে পারে ওতে।'

জুয়ানের কথা শুনে দীপাঞ্জন মলমটা বের করে এমিকে নিয়ে জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। এমি তারপর তাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'এই শুনছ? এই ওষুধটা ওর মুখে লাগাও। আরাম পাবে।'

টোটা তাকালো জানলার দিকে। মলমের টিউবটা দেখাল দীপাঞ্জন। প্রথমে একটু ইতস্তত করলেও শেষপর্যন্ত কাছে এসে টিউবটা নিল। তারপর বাচ্চাটার কাছে ফিরে গিয়ে টিউব থেকে সবটুকু মলম বের করে নিয়ে রং মাখানোর মতো পুরো মলমটাই লেপে দিল তার সঙ্গীর মুখে।

'থ্যাঙ্ক ইউ।' দীপাঞ্জনের উদ্দেশ্যে বলা টোটার মুখ থেকে এই প্রথম কোনো ইংরেজি শব্দ শুনল দীপাঞ্জনরা।

নিস্তব্ধ দুপুর। বিকাল হব হব করছে। বাইরে কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শুধু বাচ্চাটার গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। চাবুকের প্রচণ্ড মার তার মুখে এসে পড়েছে। যন্ত্রণা তো হবেই। মেঝের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন শ্যাঁপেলিও। হতাশা আর ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। জুয়ানও মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখ বোজা তার। তবে দীপাঞ্জন আর এমি জেগে আছে। একসময় দীপাঞ্জন উঠে বসে বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে। জল খেয়ে পেট ভরিয়ে নিই।'

তার কথা শুনে এমি বলল, 'আমার যে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা আছে তার মধ্যে অনেক কিছু জিনিসপত্রের সাথে বিস্কুটের একটা প্যাকেট আছে। ওটা নিয়ে তুমি খেতে পারো।'

সত্যিই খিদেতে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবার জোগাড় তার। দীপাঞ্জন উঠে গেল ঘরের কোণায়। যেখানে রাখা আছে বেশ বড়ো একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স। সারাটা পথ এমি বাক্সটা পিঠে নিয়ে এসেছে। এ বাক্সটা এমির ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

বাক্সটা খুলল দীপাঞ্জন। একটা বিস্কুটের প্যাকেট তার ভিতরে রাখা থাকলেও আসলে বাক্সটা সস্তা দামের ছোটোছোটো খেলনায় ভরতি। মোটরগাড়ি, দমদেওয়া পুতুল, প্লাস্টিকের বল, টিনের পিস্তল, আরও নানা ধরনের খেলনা!

জিনিসগুলো দেখে দীপাঞ্জন বিস্মিতভাবে জানতে চাইল, 'এত খেলনা কী করতে এনেছিলে তুমি?'

এমি জবাব দিল, 'ইচ্ছা ছিল, যদি ভালোয় ভালোয় সব কাজ মিটে যায় তবে তোমাদের নিয়ে আমার গ্রাম ঘুরে আসব। গ্রামের বাচ্চারা এই সামান্য জিনিসে কত খুশি হয় তা ধারণা করতে পারবে না। গ্রামে যদি না-ও যাওয়া যেত তবে কাউকে দিয়ে এগুলো পাঠাতে পারতাম সেখানে। একটু দূরে হলেও চাদ হ্রদের তীরেই তো আমার গ্রাম।'

বিস্কুট খেতে খেতেই বাক্সটা থেকে একটা একটা খেলনা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল দীপাঞ্জন। এত কষ্টের মধ্যেও খেলনাগুলো দেখে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যেতে লাগল তার। এই যে দম দেওয়া গাড়ি, হাত-পা নাড়া পুতুল, এসব নিয়ে সে নিজেও কত খেলেছে ছোটোবেলায়। এ-জিনিসগুলো এক-একটা সে-বয়সে দীপাঞ্জনের নিজের প্রাণের থেকেও দামি ছিল! তখন তো আর ভিডিও গেম, কম্পিউটার গেম ঘরে ঘরে পৌঁছোয়নি। সামান্য একটা কাচের গুলিকেও সে বয়সে হিরার চেয়ে দামি মনে হত। কাঠের তৈরি সামান্য গুলি-ভাণ্ডার বিনিময়ে অর্ধেক পৃথিবী বিক্রি করে দেওয়া যেত কারও কাছে!

জিনিসগুলো দেখতে দেখতেই দীপাঞ্জনের হঠাৎ মনে হল, বাইরেটা যেন অদ্ভুত

নিশ্চুপ হয়ে গেছে। থেমে গেছে বাচ্চাটার কান্না। কী হল ব্যাপারটা?

দীপাঞ্জন জানলার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল টোটা আর বাচ্চাটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তারা অমন তাকিয়ে আছে কেন? দীপাঞ্জন এরপরই বুঝতে পারল ব্যাপারটা। আসলে তাদের দৃষ্টি তার হাতে ধরা ছোট্ট লাল টুকটুকে মোটর গাড়িটার ওপর নিবদ্ধ।

দীপাঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল জানলার কাছে। হাতের মোটরগাড়িটা দেখিয়ে সে চাবুকখাওয়া ছেলেটাকে ইশারায় বলল, 'তুমি এটা নেবে?'

বাচ্চাটা একবার তাকাল খেলনাটার দিকে, আর একবার তাকাল টোটার মুখের দিকে। তাদের দুজনের মধ্যে চাপা স্বরে কী কথাবার্তা হল তারপর বাচ্চা ছেলেটা উঁচু জায়গা থেকে নেমে এসে দীপাঞ্জনের হাত থেকে খেলনাটা নিয়ে আবার নিজের জায়গাতে ফিরে সেটা টোটার হাতে দিল। দুজনে বেশ কিছুক্ষণ সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর সেটা নিয়ে মাটিতে উঁবু হয়ে বসল বাচ্চাটা। গাড়িটাকে সে দম দিয়ে ছেড়ে দিতেই গাড়িটা পাথুরে মাটিতে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল। বিস্মিতভাবে খেলনাটার দিকে তাকিয়ে রইল দুজন। তাদের দুজনের পিঠের আগ্নেয়াস্ত্রের নলগুলো আকাশের দিকে মুখ করা। সেগুলো অবশ্য খেলনা নয়, সত্যিকারের অস্ত্র!

আর এরপরই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে শুরু করল। তাদের দুজনকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে চত্বরের এদিক ওদিক থেকে প্রথমে একজন, তারপর একজন, এভাবে চাইল্ড সোলজাররা এসে ভিড় জমাতে লাগল সেখানে। এক সময় পুরো বাহিনিটাই প্রায় হাজির হল সেখানে। সবার মুখেই বিস্ময়, সবাই নেড়েচেড়ে দেখতে চায় দম দেওয়া গাড়িটা। ইতিমধ্যে জুয়ান, শ্যাঁপেলিও আর এমিও এসে দাঁড়িয়েছে দীপাঞ্জনের পাশে। তারাও অবাক ব্যাপারটা দেখে।

হঠাৎ লেফটানেন্ট টোটা দীপাঞ্জনের উদ্দেশ্যে বলল, 'এই একটাই আছে আর নেই।' এমি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, আছে। আর একটা দিচ্ছি। এমির বাক্স থেকে বেরোল একটা ট্রেনগাড়ি। বৃত্তাকার প্লাস্টিকের লাইনের ওপর সেটা ঘোরে। এমি জানলার গরাদের ফাঁক গলিয়ে সেটা টোটার হাতে দিয়ে তার কার্যপদ্ধতি তাকে বুঝিয়ে দিল।

জানলার বাইরে মাটিতে সেই বৃত্তাকার রেললাইন পাতা হল। তার চারপাশে উবু হয়ে বসল চাইল্ড আর্মি। লাইনের ওপর দিয়ে খেলনা রেলগাড়িটা চলতে শুরু করতেই আনন্দে তালি দিয়ে উঠল চাইল্ড আর্মি। তাদের মুখের কাঠিন্য হঠাৎই যেন খসে পড়েছে! কে বলবে এরা মানুষ খুন করে! ওইতো যে ছেলেটা সবচেয়ে বেশি তালি দিল, সেইতো নিস্পৃহভাবে গুলি চালিয়ে ছিল গ্রামবাসী দুজনকে! দীপাঞ্জনদের মনে হতে লাগল তাদের পিঠে ঝোলানো মেশিনগান, রাইফেল, রকেট লঞ্চার গুলোই বরং খেলনার! বেলা শেষের রোদ এসেছে তাদের মুখে। সেই আলোতে আনন্দে উদ্ভাসিত তাদের মুখগুলো। সহজ সরল গ্রাম্য বালকদের সাথে এ মুহূর্তে তাদের কোনো প্রভেদ নেই। বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকা রেলগাড়িটার দিকে তাকিয়ে কেউ কেউ নানারকম শব্দও করতে লাগল তারা। আর এসব করতে করতেই চাইল্ড আর্মি নিজেদের মধ্যে কী সব কথা বলতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর লেফটানেন্ট টোটা, চাবুকের দগদগে ক্ষত মুখে নেওয়া বাচ্চাটা, এবং আরও কয়েকজন জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

টোটা জানতে চাইল, 'তোমাদের ওই বাক্সটা কী জাদু বাক্স? ও থেকে খেলনা বেরোয়?'

এমি জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ওটাকে জাদুবাক্সই বলতে পারো। হাত দিলেই খেলনা বেরোয়।'

আর একটা ছেলে বলল, 'কই বার করো তো দেখি?'

এমি এবার অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল, জাদুকরদের মতো হাত-টাত নেড়ে অদ্ভুত ভাষায় কী-সব বলে বাক্সর ভিতর হাত ঢুকিয়ে একটা বল বার করে সেটা তুলে দিল সেই ছেলেটার হাতে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল বাচ্চাগুলো। হাত দিয়ে তারা বলটা টিপেটিপে দেখতে লাগল।

একজন মন্তব্য করল, 'জাদুবল!'

এমি বাক্সটা তুলে আনল জানলার কাছে, ছেলেগুলোর উদ্দেশ্যে বলল, 'দেখো, এর মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে।'

জানলার গরাদ ধরে ঝুঁকে বাক্সর ভিতরটা দেখতে লাগল বাচ্চাগুলো। এত অদ্ভুত খেলনা বাক্সর ভিতর! তাদের আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। লেফটানেন্ট টোটা এবার দীপাঞ্জনদের সবাইকে হঠাৎ অবাক করে দিয়ে বলল, 'আমরা যদি তোমাদের ছেড়ে দেই তবে ওই বাক্সটা আমাদের দিয়ে দেবে?'

কথাটা শুনে চমকে উঠল দীপাঞ্জনরা। সামান্য ক-টা খেলনার বিনিময়ে এরা তাদের মুক্তি দেবে বলছে! বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে এমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ দেব। বাক্সটা দিয়ে দেব।'

'সত্যি দেবে?' বিস্ফারিত চোখে বলল একজন।

'হ্যাঁ, সত্যি সত্যি দেব।' জবাব দিল এমি।

কিন্তু এই সময় হঠাৎ একটা ছেলে বলল, 'লেফটানেন্ট, কিন্তু এগুলো নিয়ে তো আমরা খেলতে পারব না। এগুলো জেনারেল কেড়ে নেবে। এখানে তো খেলা নিষিদ্ধ। মনে নেই, জেনারেল বলে যারা খেলে, তারা জেহাদি-বিপ্লবী হতে পারে না।'

মুহূর্তের মধ্যেই একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল বাচ্চাগুলোর মধ্যে। কালো হয়ে গেল খুদে লেফটানেন্টের মুখ।

তাদের কথোপকথন তর্জমা করে দিতেই জুয়ান বললেন, 'ওদের বলো, ওরা আমাদের সাথে পালাতে পারে। আমরা ওদের এঞ্জামেনা নিয়ে যাব। সেখানে ওরা আরও অনেক খেলনা পাবে। খাবার পাবে। সেখানে ওদের কেউ মারবে না। কারও ইচ্ছা হলে সেখান থেকে ওরা গ্রামেও ফিরতে পারবে।'

এমি কথাটা তাদের বলতেই আবার একটা গুঞ্জন শুরু হল বাচ্চাগুলোর মধ্যে। তাদের বলল, 'সত্যিই সেখানে আরও খেলনা আছে?' আর একজন বলল, 'সত্যিই বাড়ি ফিরতে পারব?'

এমি বলল, 'সব সত্যি, সব সত্যি।'

ঠিক এই সময় চাইল্ড আর্মির একজন এসে খবর দিল, নতুন লেফটানেন্ট কুরি ঘুম থেকে উঠেছে।

টোটা দীপাঞ্জনদের উদ্দেশ্যে বলল, 'রাতে আমরা আসছি, এখন আর থাকা যাবে না। মার্চপাস্ট হবে।'

যে খেলনাগুলো তারা নিয়েছিল সেগুলো তারা ফেরত দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটল চত্বরের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হাজির হল জাদুকর কুরি। তার হাতে চেনে বাঁধা হায়নার বাচ্চাটা। মার্চপাস্ট শুরু হল এরপর। দীপাঞ্জনরা জানলা দিয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগল। ছেলেগুলোর আজ ও কাজে যেন তেমন মন নেই। গলার জোরও তেমন শোনা যাচ্ছে না। লাইন ভাঙার জন্য কুরি একটা বাচ্চা ছেলের পিঠে চাবুক চালাল, আর একজনকে চড় কষাল।

অবশেষে মার্চপাস্ট শেষ হল একসময়। শয়তান জাদুকরটা ছেলেগুলোর প্রতি আরও কিছুটা হম্বিতম্বি করে নিজের ঘরে চলে গেল। চাঁদের বুকে সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার নামল। দীপাঞ্জনরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল লেফটানেন্ট টোটার জন্য। রোজকার মতো এদিনও মশাল জ্বলল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নিভেও গেল। আকাশে চাঁদ উঠল। শুনশান চত্বর। কেউ কোথাও নেই। এদিন তাদের খাবারও দিতে এল না কেউ। শ্যাঁপেলিও একসময় বললেন, 'ওরা আমাদের সাথে মজা করেনি তো। যারা হিরে ফিরিয়ে দিল তারা সামান্য খেলনার বিনিময়ে আমাদের মুক্তি দিতে রাজি এ-ব্যাপারটা আমার এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তার কথায় কেউ কোনো মন্তব্য করল না। আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলছে সবাই। এ-যেন এক অন্তহীন প্রতীক্ষা। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে কোথা থেকে যেন হায়নার হাসি শোনা গেল! হয়তো এটা জাদুকরের পোষ্যটা। তবে হায়নার ওই ডাকটা রাত্রির রহস্যময়তা যেন আরও বাড়িয়ে দিল। অন্ধকারে ঘরে বসে মুক্তির প্রতীক্ষা করতে লাগল তারা চারজন।

এক সময় দরজার বাইরে শিকল খোলার শব্দ হল। টোটা আর কয়েকজন ঘরে ঢুকল, হ্যাঁ তারা এসেছে!

টোটা বলল, 'নতুন লেফটানেন্ট জেগে ছিল তাই আসতে দেরি হল। রং-রুটরা আটকে ছিল একটা ঘরে। তাদেরও বের করে আনতে হল। খুব ভয় পাচ্ছে ওরা।'

এরপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শেষবারের মতো সে জানতে চাইল, 'তোমাদের সঙ্গে গেলে আমরা খেলনা পাবো তো? পেট ভরে খেতে পাব তো? মিলিটারি আমাদের মারবে না তো?'

জুয়ান তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'নিশ্চয় পাবে। আর কেউ তোমাদের মারবে না।'

জুয়ানের ভাষা পড়তে না পারলেও আর সস্নেহ স্পর্শে তিনি কী বলতে চাইছেন তা বুঝতে অসুবিধা হল না বাচ্চাটার। এমি এরপর জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ পথে পালাব আমরা?'

টোটো জবাব দিল, 'হ্রদের ধার বরাবর জঙ্গল দিয়ে। তোমরা যেদিক থেকে এসেছ সেদিকেই। ওপথে একটা সিম্বা ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছুদিন ধরে। ক-দিন আগে আমাদের একটা ছেলেকে সে তুলেও নিয়ে গেছে। কিন্তু সে পথ ধরা ছাড়া আমাদের পথ নেই। উলটো দিকে গেলে জেনারেল আমাদের ধরে ফেলবে। সে দিকেই তার ঘাঁটি।

এরপর সে বলল, 'সামনের চত্বরটা খুব সাবধানে পেরোতে হবে। জাদুকর কুরি জেগে গেলে মুশকিল। হয়, তখন সে আমাদের পিছু নেবে, নয়তো ঢাক বাজিয়ে খবরটা জেনারেলের কাছে পৌঁছে দেবে। তারা আবার তখন আমাদের পিছু নেবে।'

সে কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বাচ্চা বলে উঠল, 'ও লোকটাকে নিয়ে এত ভাবার দরকার কী। আমি এখনই ওর ঘরের দিকে যাচ্ছি। ও তো ঘুমাচ্ছে। এখনই ওর বুকে জানলা দিয়ে রাইফেলটা খালি করে দিয়ে আসছি, ব্যাস ঝামেলা শেষ।' এমি তার কথা তর্জমা করে দিতেই জুয়ান বললেন, 'না, এটা করা যাবে না। ওদের বলো এসব খুনের ভাবনা ছাড়তে হবে একান্ত প্রয়োজন না হলে কেউ যেন গুলি না চালায়।'

এমি ব্যাপারটা জানিয়ে দিল তাদের। তারা শুনে একটি বিমর্ষ হলেও ব্যাপারটা মেনে নিল।

দীপাঞ্জন হঠাৎ এই সময় খেয়াল করল যে বাচ্চাটা গুলি চালাবার কথা বলল, 'তার ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে জাদুকর কুরির সেই ক্যামেরুনের শিঙাটা উঁকি দিচ্ছে। এটাকে যে আগ্নেয়াস্ত্র বলে ভাবছিল এতক্ষণ। এমির মাধ্যমে সে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, 'জাদুকরের শিঙা তুমি কোথায় পেলে?'

ছেলেটা জবাব দিল, 'মার্চপাস্টের সময় লোকটা ভুল করে এটা মাঠে ফেলে রেখে গেছিল, আমি কুড়িয়ে নিয়েছি। তোমার এটা পছন্দ। তবে নাও। এই বলে সে শিঙটা বের করে গুঁজে দিল দীপাঞ্জনের হাতে।

এত উত্তেজনার মধ্যেও শ্যাপেলিও হেসে বললেন, 'ফুলানি ট্যামট্যামটা পাওয়া না গেলেও এই শিঙাটা অন্তত তুমি পেলে। টোটা এবার বলল, 'আর দেরি করা যাবে না, এবার বেরোতে হবে।'

দীপাঞ্জন নিজের কোমরে গুঁজে নিল শিঙাটা। তৈরি তারা হয়েই ছিল। খুব সামান্য জিনিস আর খেলনার বাক্সটা শুধু সঙ্গে নেওয়া হয়েছে।

ঘর থেকে বেরোল সবাই। টোটার বাকি সঙ্গীরা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। চাইল্ড আর্মির উনিশ জন, আর বারো জন রং-রুটটা। দেখেই বোঝা গেল নতুন ছেলেগুলো খুব ভীতসন্ত্রস্ত। আট-দশ বছরের ছেলে সব। টোটা জানাল মাত্র ক-দিন আগেই হ্রদের উত্তরদিকের এক গ্রাম থেকে তাদের ধরে আনা হয়েছে।

চাঁদের আলোতে শুনশান পাথুরে চত্বরটা দাঁড়িয়ে আছে। পাথুরে দেয়াল আর টিনের চালঅলা একটা ঘর দেখিয়ে টোটা বলল, 'নতুন লেফটানেন্ট ওখানেই ঘুমাচ্ছে। ওই ঘরটার সামনে দিয়ে বুকে হেঁটে যেতে হবে কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে। ঘরটার সামনে হায়নার বাচ্চাটা চেনে বাঁধা আছে। দূর থেকে তার জ্বলন্ত চোখ দুটো আগুনের ফুলকির মতো দেখাচ্ছে। নিঃশব্দে চত্বরের দিকে এগোল সবাই। এক সময় তারা পৌঁছে গেল ঘরটার কাছাকাছি। ঘরটা পেরিয়ে একটু এগোতেই হ্রদের পাড়ের জঙ্গলের মুখে পৌঁছে যাওয়া যাবে। হ্রদটা দেখা যাচ্ছে। চাদের জলে ধরা পড়ছে চাঁদের প্রতিবিম্ব। ঝিলমিল করছে হ্রদের জল। এই অবস্থার মধ্যেও তা দেখে দীপাঞ্জনের মনে হল প্রকৃতি কী আশ্চর্য সুন্দর!

দাঁড়িয়ে পড়ল টোটা। বয়সে বাচ্চা হলেও এবার তার সামরিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেল। লেফটানেন্ট টোটা বলল, 'একসাথে নয়, তিনটে দলে ভাগ হয়ে বুকে হেঁটে ঘরের সামনেটা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে এগোতে হবে। পিছনের দলের জন্য কেউ থামবে না। তাতে তেমন কিছু হলে এক সাথে সবাই ধরা পড়বে না। প্রতিটা দলে ভাগ হয়ে থাকবে দীপাঞ্জনদের, চাইল্ড আর্মির আর রং-রুট ছেলেগুলো।' চাইল্ড আর্মি থেকে তিনজন অভিজ্ঞ ছেলেকেও তিনটে দলের নেতৃত্ব দেবার জন্য নির্বাচন করল সে। ঠিক হল প্রথম দলে যাবেন শ্যাঁপেলিও, দ্বিতীয় দলে জুয়ান, তৃতীয় দলে এমি আর দীপাঞ্জন।

দীপাঞ্জন টোটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোন্ দলে?'

সে জবাব দিল, 'তিন দলের কোনোটাতেই নয়। আমি পিছন থেকে সামনের তিনটে দলকে 'কভার' করব। অর্থাৎ পিছন থেকে কোনো আক্রমণ হলে সেটা ঠেকাব। সবাই বেরোবার পর আমি এ-জায়গা ছাড়ব। সেনাদলের নিরাপত্তার দায়িত্ব তো লেফট্যানেন্টকেই নিতে হবে।' লেফটানেন্টসূচক গম্ভীরভাবেই সে কথাগুলো বলল।

দীপাঞ্জন বলল, 'তুমি একলা নয়, আমিও সব শেষে থাকব তোমার সাথে।'

প্রথম দলটা এগোতে শুরু করল সামনের দিকে। কয়েক-পা হেঁটে মাটিতে শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে এগোল সবাই। সেই ঘরটার মাত্র পনেরো ফুট তফাত দিয়ে বুকে হেঁটে ঘরটা পেরোচ্ছে তারা। জাদুকর শয়তানটা কোনোভাবে জেগে উঠলেই বিপত্তি। হায়নার বাচ্চাটা বিস্মিতভাবে তাকিয়ে তাদের দেখছে। দীপাঞ্জনরাও তাকিয়ে আছে দলটার দিকে। বুকের মধ্যে উত্তেজনায় হাতুড়ি পেটার শব্দ হচ্ছে। তবে শেষপর্যন্ত জায়গাটা তারা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেল। তারা শ্যাঁপেলিওকে নিয়ে অদৃশ্য হলো জঙ্গলের ভিতরে।

দ্বিতীয় দলে রয়েছেন জুয়ান। তিনি এগোবার আগে একবার তাকালেন দীপাঞ্জনের দিকে। দীপাঞ্জন তাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'আপনি এগোন আমার কোনো বিপদ হবে না।'

চাইল্ড-আর্মির সাথে বুকে হেঁটে এগোতে শুরু করলেন। দ্বিতীয় দলটাও নিশ্চিন্তে পেরিয়ে গেল জায়গাটা। জুয়ানও তারপর হারিয়ে গেলেন জঙ্গলের আড়ালে। প্রতি দলের

বুকে হেঁটে জায়গাতে পেরোতে, জঙ্গলে ঢুকতে মিনিট দশেক সময় লাগছে চাইল্ড-আর্মি মিলিটারি ট্রেনিং এর কারণে বুকে হাঁটায় পারদর্শী হলেও রং-রুট বাচ্চারা এ ব্যাপারে খুব শ্লথ। অবশেষে যাত্রা শুরু করল তৃতীয় দল। দাঁড়িয়ে শুধু লেফট্যানেন্ট টোটা আর দীপাঞ্জন।

তৃতীয় দলে এমি আছে। বুকে হেঁটে তারাও পেরোতে লাগল ঘরের সামনেটা। ঘরটা যখন প্রায় পেরিয়ে এসেছে ঠিক তখনই একটা ঘটনাটা ঘটল। কৌতূহলী হায়নার বাচ্চাটা এতক্ষণ চুপচাপ দেখে যাচ্ছিল তার সামনে দিকে ঝুঁকে হেঁটে যাচ্ছে দোপেয়ে জীবগুলো। হয়তো তা দেখে শেষ পর্যন্ত হাসি চাপতে না পেরে হ্যাঁ, হ্যাঁ করে হেসে উঠল। আর তাতেই ভয় পেয়ে গেল বছর আটেকের এর রং-রুট। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল সে। সেটা মুহূর্তের মধ্যে সংক্রামিত হল অন্য বাচ্চাদের মধ্যে। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল জঙ্গলের দিকে। আর তাতেই যা হবার তাই হলো। ঘরটার ভিতর থেকে শোনা গেল জাদুকর কুরির চিৎকার, 'পালাচ্ছে! পালাচ্ছে!'

টোটা বলল, 'আর সময় নষ্ট নয়। আমাদেরও পালাতে হবে।' বুকে হেঁটে নয়। জাদুকরের ঘরের সামনে দিয়েই তির বেগে ছুটতে শুরু করল বাইরে যাবার জন্য। সেই ঘরের পাশ দিয়ে যখন তারা যাচ্ছে তখন সশব্দে খুলে গেল সেই ঘরের দরজা। মুহূর্তের জন্য একবার চোখাচোখি হলো তার সাথে দীপাঞ্জনের। হায়নার বাচ্চাটার থেকেও কদর্য হিংস্র জাদুকরের মুখ। আক্রোশে সে দুর্বোধ ভাষায় হিংস্র চিৎকার করে উঠল পলায়নমান দীপাঞ্জনদের দেখে জঙ্গলের দিকে তৃতীয় দলটা অদৃশ্য হলেও একজন তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দীপাঞ্জন ছুটতে ছুটতে তার অবয়ব দেখে বুঝতে পারল সে এমি। সে অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। চত্বর ছেড়ে তার তখন জঙ্গলে ঢোকার বাঁকের মুখে এমির কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছে। ঠিক তখনই পেছনে সাব মেশিনগানের 'র‍্যাট র‍্যাট' শব্দ শোনা গেল। এক ঝাঁক গুলি প্রথমে দীপাঞ্জনের মাথার ওপর দিয়ে 'সাঁই সাঁই' শব্দে হাওয়া কেটে বেরিয়ে গেল। আর তার পরমুহূর্তেই টোটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। জাদুকর কুরির ছোড়া গুলি লেগেছে তার গায়ে। অস্পষ্টভাবে টোটা একবার শুধু বলে উঠল, 'পালাও, তোমরা পালাও।'

এমি ছুটে এসে কাঁধে তুলে নিল টোটার ছোট্ট দেহটাকে। আরও এক ঝাঁক গুলি বেরিয়ে গেল তাদের পাশ দিয়ে টোটাকে কোনোরকমে নিয়ে তারা ঢুকে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে।

অজানা, অচেনা জঙ্গল। মাঝে মাঝে বড়ো গাছ থাকলেও ঝোপঝাড়ই বেশি। দীপাঞ্জনদের সাথে পথ দেখাবার মতো চাইল্ড আর্মির কেউ নেই। টোটা অচৈতন্য। রক্ত ধরছে তার দেহ থেকে। অগ্রবর্তী তিনটে দল কোন্ পথ ধরল তারা বুঝতে পারল না। তবুও সেই ঝোপঝাড় ঠেলে এগোবার চেষ্টা করতে লাগল তারা। হঠাৎ গুলির আওয়াজ থেমে বেজে উঠল 'ফুলানি ট্যামট্যাম।' ঢাক বাজাচ্ছে কুরি। শব্দটা শুনে কেঁপে উঠল এমি। যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল তার মুখে। দীপাঞ্জন বলল, 'ঢাক কী বলছে?' যন্ত্রণাক্লিষ্ট কণ্ঠে এমি বলল, 'ও বলছে ওরা পালাচ্ছে! ওরা পালাচ্ছে!' তবে যত কষ্টই হোক আমি

থামব না। প্রচণ্ড যন্ত্রণা উপেক্ষা করেও যেন চলতে লাগল সে। কিন্তু কিছুটা এগিয়ে তাদের থামতে হলো অন্য একটা শব্দে। যে দিকে তারা এগোচ্ছে সেদিক থেকেই এল শব্দটা। একটা গর্জন। এমি বলল, 'সিম্ব! সিংহ।'

সিংহটা বার কয়েক ডাকার পর ঢাকের বাজনাটা হঠাৎ থেমে গেল।

এমি কিছুটা আশ্বস্ত হল তাতে। সে এরপর বলল, 'তবে সিংহটা বেশ কাছাকাছিই আছে। এদিকেই আসছে। আর সামনে এগোনো যাবে না।

দীপাঞ্জন বলল, 'তবে কোন্ দিকে যাবে। পিছনে গেলে তো জেনারেল বা জাদুকরের খপ্পরে পড়তে হবে।'

আবার সিংহটার গলা শোনা গেল। ঠিক গর্জন নয়, চাপা একটা ঘড়ঘড় শব্দ। সে শব্দটা গড়াতে গড়াতে সে-দিকে আসছে! কিছুটা তফাতেই একটা বিরাট কাঁটাঝোঁপ। এমি বলল, 'কপালে যা আছে হবে, ওই কাঁটা ঝোপের মধ্যেই আত্মগোপন করতে হবে।' তারা দুজন এরপর কোনোরকমে টোটার ছোট্ট শরীরটাকে নিয়ে ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কাঁটার আঘাতে তাদের দেহের উন্মুক্ত স্থানগুলো ছিঁড়ে রক্ত বেরোতে লাগল। তারা অবশ্য সে সব ভ্রুক্ষেপ করল না। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে কীভাবে নিজেদের রক্ষা করা যায় সেটাই তাদের আসল লক্ষ এখন। ঝোঁপের ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল দুজনে। বড়ো গাছ এ জঙ্গলে খুব বেশি না থাকায় চাঁদের আলোয় ঝোপঝাড়ের ওপর এসে পড়ছে। কিছুটা আলো-আঁধারি হলেও মোটামুটি দেখা যাচ্ছে বাইরেটা। এমি একবার আফশোশের সুরে বলল, টোটা যখন গুলি খেয়ে পড়ল তখন ওর অস্ত্রটাও কয়েক হাত তফাতে ছিটকে পড়েছিল। ওটা তখন বুদ্ধি করে কুড়িয়ে আনলে ভালো হত। আত্মরক্ষা করা যেত।'

দীপাঞ্জন বলল, 'সিংহটা যেদিক থেকে আসছে, সবাইতো সেদিকেই গেছে। ওরা সিংহর মুখোমুখি হল না কেন?'

এমি জবাব দিল, 'সিংহ অতি ধূর্ত প্রাণী। বনের মধ্যে এতজন লোককে একসাথে দেখে নিশ্চয়ই গা ঢাকা দিয়েছিল। এবার শিকারের খোঁজে এদিকে আসছে।'

সেই ঝোপের মধ্যে বসে রইল দীপাঞ্জনরা। সিংহটা দূরে চলে গেছে বুঝতে না পারলে বেরোবার আর কোনো উপায় নেই। তার ডাক না শোনা গেলেও হয়তো খুব কাছেই সে এসে পড়েছে। এমি এবার টোটার নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখল তার শ্বাস চলছে কিনা হ্যাঁ, চলছে গুলিটা কোথায় লেগেছে দীপাঞ্জনরা তা ঠিক বুঝতে পারছে না। সময় এগোতে থাকল। প্রতিটি মিনিট যেন এক! একটা ঘণ্টা মনে হতে লাগল তাদের কাছে। এভাবে প্রায় আধঘণ্টা সময় কেটে গেল। এমি একসময় বলল, 'তুমি বাচ্চাটাকে একটু ধরো, আমি বাইরে বেরিয়ে দেখি। সামনের ওই গাছে চড়লে অনেকদূর দেখা যাবে। হয়তো সিংহটা অন্য দিকে চলে গেছে?'

দীপাঞ্জন বলল, 'আচ্ছা!'

এরপর সে বাচ্চাটাকে কোলে নিতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই ঝোঁপের ফাঁক দিয়ে তাদের চোখে পড়ল একটা দৃশ্য। জঙ্গলে ঢুকছে একটা লোক! তার এক হাতে ধরা আছে

স্বয়ংক্রিয় একটা রাইফেল। অন্য হাতে যা ধরা আছে তা দেখে লোকটাকে চিনতে পারল দীপাঞ্জন। জাদুকর কুরি তাদের পিছু ধাওয়া করে এ-পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। গলায় তার ট্যামট্যাম ঝুলছে। আর এক হাতে ধরা শিকল বাঁধা হায়নার বাচ্চাটা!

দীপাঞ্জন বলল, 'ও সম্ভবত ঝোপের বাইরে থেকে আমাদের দেখতে পাবে না। আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাবে।'

কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। দূর থেকে তাদের দিকেই যেন আসতে লাগল কুরি। হায়নার বাচ্চাটা চেনে বাঁধা। কুকুরের মতো মাটি শুঁকতে শুঁকতে তার প্রভুকে নিয়ে ঝোপের দিকেই আসতে লাগল!

এমি বলল, 'মনে হচ্ছে আমরা ধরা পড়ে যাব। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। রক্তের গন্ধ পেয়েছে হায়নার বাচ্চাটা। টোটার গায়ের রক্ত। এ-গন্ধ বহু দূর থেকে টের পায় এ সব প্রাণী।'

ঝোপটার ফুট তিরিশেক তফাতে এসে থেমে গেল জাদুকর। ঝোপটাকে লক্ষ করে হায়নার বাচ্চাটা শেকল টান দিচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কুরি তাকাল ঝোপটার দিকে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। কী বীভৎস সেই মুখ! যেন জিঘাংসার প্রতিমূর্তি! আফ্রিকার যে-কোনো হিংস্র শ্বাপদের চেয়েও তা ভয়ঙ্কর।

কুরি তাকিয়ে আছে ঝোপের দিকে। নিজেদের হৃদ্‌স্পন্দন যেন শুনতে পাচ্ছে দীপাঞ্জনরা। কুরি তার হাতের রাইফেল একটু উঁচিয়ে ধরল। ঝোপ লক্ষ করে সে গুলি চালাবে নাকি? প্রমাদ গুনল দীপাঞ্জনরা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্য একটা শব্দে কেঁপে উঠল বনভূমি। সিংহর গর্জন! প্রাণীটা তাহলে কাছেই ওঁৎ পেতে ছিল! তার ডাক শুনেই কুরি শব্দটার উৎস সন্ধান করার জন্য চারপাশ তাকাল। তার মুখে যেন এবার আতঙ্ক ফুটে উঠল। হায়নার বাচ্চাটার শিকল হাত থেকে ফেলে দিল সে। সিংহের গর্জনে আতঙ্কিত প্রাণীটা ছুটল অন্যদিকে। আর এর পর কুরিও সম্ভবত গা ঢাকা দেবার জন্য দীপাঞ্জনদের ঝোপটার দিকেই আসতে লাগল!

হঠাৎ দীপাঞ্জনের মস্তিষ্কে একটা অদ্ভুত ভাবনা কাজ করল। কুরি তখন ঝোপটার হাত দশেকের মধ্যে চলে এসেছে, দীপাঞ্জন তার নিজের কোমর থেকে কুরির-ই সেই শিঙাটা বার করে তাতে ফুঁ দিয়ে দিল। অবিকল সিংহর গর্জন বেরোচ্ছে তার থেকে। আবারও কেঁপে উঠল বন।

ঝোপের ভিতরেই সিংহটা আছে! আর কুরি কিনা এগোচ্ছে সেদিকেই! এ-ব্যাপারটা ভেবে নিয়ে গুলি চালানো ভুলে গিয়ে আতঙ্কে ছুটল পিছনের দিকে। আর এরপরই ঝোপের ভিতর থেকে দেখল সেই ভয়ংকর দৃশ্য যেদিকে কুরি দৌড়চ্ছে সেদিক থেকেই চাঁদের আলোতে একটা ধূসর বিদ্যুৎ যেন উড়ে এসে পড়ল জাদুকর কুরির ওপর। সিংহের গর্জনের সাথে মিশে গেল কুরির আর্তনাদ। কয়েক মুহূর্ত মাত্র! কুরিকে মুখে তুলে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল আফ্রিকার রাজা। হায়না যতই ধূর্ত আর খল হোক বনের রাজার কাছে পরাস্ত হল সে।

দীপাঞ্জনরা কিন্তু এখনই বেরোল না। আরও কিছুটা সময় অতিক্রান্ত হবার পর দূর থেকে ভেসে এল সিংহের ডাক। এমি বলল, 'এবার বেরোনো যাবে। সিংহ তার শিকার নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।'

অচৈতন্য টোটাকে নিয়ে ঝোপের বাইরে বেরোল দুজন। অন্ধকারেও একটা জিনিস চোখে পড়ল এমির। কিছুটা তফাতে পড়ে আছে কুরির সেই ফুলানি ট্যামট্যামটা! সিংহ তাকে তুলে নেবার সময় তার গলা থেকে ছিঁড়ে পড়েছে বাজনাটা। টোটাকে দীপাঞ্জনের কাঁধে দিয়ে সে দৌড়ে গিয়ে কুড়িয়ে আনল বাজনাটা, আর তার সাথে কুরির রাইফেলটাও। কাছেই কোথাও ঝোপের আড়াল থেকে কেঁদে উঠল কুরির হায়নার বাচ্চাটা। তাকে দেখার সময় তখন দীপাঞ্জনদের ছিল না। চাদের পাড় ধরে জঙ্গল ঘেঁষে তারা টোটাকে নিয়ে ছুটতে শুরু করল।

ছুটতে ছুটতেই গুরুগুরু মেঘ ডাকার মতো শব্দ যেন কানে আসতে লাগল দীপাঞ্জনের। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চতুর্দিক দিয়েই যেন দূর থেকে ভেসে আসছে শব্দ। কখনও-বা খুব স্পষ্ট, কখনও-বা আবছা। কথা বলা ঢাকের শব্দ দীপাঞ্জন জিজ্ঞেস করল, 'এত ঢাক বাজছে কেন? কী কথা হচ্ছে?'

এমি বলল, ওরা বলছে, 'যুদ্ধ হবে যুদ্ধ। সেনা আসছে।' এ-খবরই এক গ্রাম অন্য গ্রামকে জানিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে।'

'কার সাথে কার যুদ্ধ?'

এমি জবাব দিল, 'সরকারি সেনার সাথে জেনারেল বরনুর দলের। আরও তাড়াতাড়ি পা চালাও। আমরা দু-দলের গোলাগুলির মাঝে পড়ে গেলে বাঁচব না।'

বাচ্চাটাকে নিয়ে আরও দ্রুত ছুটতে লাগল তারা। চাদের জলে তখন আলো ছড়াচ্ছে মাথার ওপরের চাঁদ। সেই আলোতে হ্রদের জলে খেলা করছে হিপোর দল। জলে ডুব দিচ্ছে, আবার ভুস করে ভেসে উঠছে। অ্যান্টিলোপের ঝাঁক সার বেঁধে হ্রদের দিকে এগোচ্ছে জলপানের জন্য, আর তাদের জন্য হ্রদের পাড়ে ওৎ পেতে আছে কুমিরের দল। এসব কোনো দৃশ্যই চোখে পড়ল না দীপাঞ্জনদের। তাদের শুধু কানে আসছে কথা বলা ঢাকের শব্দ। যুদ্ধ হবে, যুদ্ধ হবে . . .

হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই তাদের কানে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ এল—'হল্ট'।

থমকে দাঁড়াল তারা। হ্রদের পাড়ের জঙ্গল থেকে অন্ধকার বিদীর্ণ করে জ্বলে উঠল এক ঝাঁক টর্চের জোরালো আলো! তাহলে কী তারা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল জেনারেল বরনুর হাতে? এখনই নিশ্চয় ছুটে আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি! আত্মসমর্পণের জন্য মাথার ওপর হাত তুলতে যাচ্ছিল দীপাঞ্জন। ঠিক সেই সময় প্রফেসর জুয়ানের কণ্ঠস্বর কানে এল—'ভয় নেই দীপাঞ্জন। এরা সরকারি আর্মি।'

ছুটে এলেন জুয়ান। তারপর তিনি কোলে তুলে নিলেন লেফটানেন্ট টোটার ছোট্ট দেহটা।

পরিশিষ্ট : তিনদিন পর সকালবেলা ইউনিসেফের অতিথিশালার একটা ঘরে বসেছিল সকলে। দীপাঞ্জন, প্রফেসর জুয়ামশিয়ে, শ্যাঁপোলিও আর এমি। ইউনিসেফ হল সেই

আন্তর্জাতিক সংস্থা যারা ইউনেস্কোর সহযোগীরূপে সারা পৃথিবীর শিশুদের জন্য কাজ করে। তাদের হাতেই সমর্পণ করা হয়েছে 'চাইল্ড আর্মি'র বাচ্চাগুলোকে। তারাই দেখভাল করবে তাদের। শিক্ষার ব্যবস্থা করবে, ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে যাতে বাচ্চাগুলো ভবিষ্যতে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

টেবিলের ওপর পড়েছিল এদিনের একটা ইংরেজি সংবাদপত্র। এখানকার অন্য সব সংবাদপত্রর মতোই এ কাগজটাতেও বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছ জেনারেল বরনুর অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবার খবর। তাকে যদিও শেষ পর্যন্ত ধরা যায়নি, কিন্তু তার বেশ কিছু ঘাঁটি ধ্বংস করেছে সরকারি সেনাদল। অনুমান করা হচ্ছে, জেনারেল বরনু সুদানের দিকে পালিয়েছেন। কাগজটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে প্রফেসর জুয়ান বললেন, 'সব চেয়ে খুশির খবর যে আমাদের লেফট্যানেন্ট টোটা বিপদমুক্ত। ডাক্তাররা তার পাঁজর থেকে গুলিটা বার করতে পেরেছেন। সপ্তাহখানেকের মধ্যে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। খুব চিন্তায় ছিলাম ওর জন্য। এই যাবার বেলায় ছেলেটার সাথে দেখা হলে আরও ভালো লাগত। ওর জন্যই তো আমরা মুক্তি পেলাম। আর এমি, তোমার কথাও আমরা জীবন ভুলব না। হয়তো আবার কোনোদিন দেখা হবে তোমার সঙ্গে। গোছগাছ সব হয়ে গেছে। দীপাঞ্জনরা কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হবে এয়ারপোর্টে ঘরে ফেরার জন্য। বিদায়বেলায় তাদের সাথে দেখা করতে এসেছে এমি। তার সঙ্গে একটা পিচবোর্ডের বাক্স।

জুয়ানের কথা শেষ হবার পর এমি প্রথমে তার উদ্দেশে বলল, 'হ্যাঁ, আমিও সেই আশাতেই রইলাম। আপনারা আবার আসবেন আমাদের চাদের দেশে'। তারপর সে শ্যাঁপেলিওর দিকে তার বাক্সটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন আপনার জিনিস। যার জন্য এত কষ্ট সহ্য করতে হল আপনাদের। এই বাক্সর মধ্যে রাখা আছে সেই ফুলানি ট্যামট্যাম। এটা আমার উপহার।'

বাক্সটা হাতে পেয়ে শ্যাঁপেলিওর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'আমার সংগ্রহশালাতে এ জিনিসের দাতা হিসাবে তোমার নাম লিখে রাখব আমি। বহু লোক সেটা জানবে।'

দীপাঞ্জন এবার এমির উদ্দেশে বলল, 'এই যাবার বেলা তোমার থেকে একটা জিনিস জানতে চাই। ফুলানি ট্যাম ট্যামের বাজনা শুনলেই তুমি বারবার অমন অদ্ভুত আচরণ করেছিলে কেন?'

প্রশ্ন শুনে মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে এমি বলল, 'ফুলানি ট্যামট্যাম কেন এত দুষ্প্রাপ্য, কেন সরকার তা নিষিদ্ধ করেছে জানো'—এই বলে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তার শার্টটা উঠিয়ে ফেলল। এমির পিঠটা উন্মুক্ত হয়ে গেল। দীপাঞ্জনরা বিস্মিতভাবে দেখলে এমির গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হলেও তার শ্বেতী রোগীদের মতো সব ফ্যাকাশে! আর তাতে আঁকা হয়ে আছে অনেক কাটাকুটির দাগ!

জামাটা এরপর আবার নামিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে এমি বলল, 'ফুলানি ট্যামট্যাম তৈরি করা হয় মানুষের চামড়া দিয়ে। আর এই ট্যামট্যামটা বানানো হয়েছিল আমার

চামড়া দিয়ে।'

তার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সবাই। দীপাঞ্জন বলে উঠল, 'কী বলছ তুমি!'

এমি বিষণ্ণ হেসে বলল, 'আমি ঠিকই বলছি। সেটা আমার ছেলেবেলার এক ভয়ংকর স্মৃতি! জাতিদাঙ্গায় পরাজিত হলো আমার গ্রাম। আমার বাপ-মা প্রাণ হারাল তাতে। আমাকে প্রাণে না মারলেও আমাকে নিয়ে যাওয়া হল ওই ফুলানি গ্রামে। সে গ্রামের মাথা এখন তুয়াতুনা নামের এক ভয়ংকর লোক। তিকাকা বলেছিল যার কথা। ওই ট্যামট্যাম বানানোর জন্য আমার পিঠের চামড়া ছাড়ানো হল। তারপর আমাকে ফেলে আসা হয়েছিল চাদ হ্রদের ধারে জঙ্গলে। ভাগ্যক্রমে এক মিশনারি আমাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। চিকিৎসা করে আমাকে সুস্থ করে তোলে। এই ট্যাম ট্যামির বাজনা শুনলেই আমার মনে পড়ে যায় সেই ছেলেবেলায় ভয়ংকর স্মৃতি। ছোট্ট একটা বাচ্চা ছেলের পিঠের চামড়া ছাড়ানো হচ্ছে! আমি সহ্য করতে পারি না।'—এই বলে আতঙ্কে চোখ বুজল এমি। মুহূর্তখানেক পর চোখ খুলে সে আবার হেসে শ্যাঁপেলিওকে বলল, 'জিনিসটা রাখুন আপনার কাছে, সংকোচ করবেন না। এ চাদের বাজনা এর পর যদি কেউ বাজায়ও সাগর পেরিয়ে সে শব্দ আর আমার কানে এসে পৌঁছবে না। নিন, এবার চলুন, নইলে আপনাদের ফ্লাইট ধরতে দেরি হয়ে যাবে।

অতিথিশালা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল সবাই। সামনে শানবাঁধানো বিরাট সুদৃশ্য চত্বর। ইউনিসেফের পতাকা উড়ছে সেখানে। সেদিকে তাকিয়ে দীপাঞ্জন বিস্মিতভাবে বলে উঠল, 'আরে, ওই যে লেফটানেন্ট টোটা!'

যেখানে ইউনিসেফের ফ্ল্যাগটা উড়ছে ঠিক তার নীচে দপ্তরের কয়েকজন কর্মীর সাথে দাঁড়িয়ে আছে চাইল্ড আর্মির বাচ্চাগুলো। না, এখন তাদের পরিচয় আর চাইল্ড আর্মি নয়। বাচ্চাগুলোর পরনে নতুন পোশাক। মুখে কোনো কাঠিন্য নেই, চোখে নেই কোনো হিংস্র। সকালের আলোতে ঝলমল করছে বাচ্চাগুলোর মুখ। ইউনিসেফের ব্যান্ড বাজছে।

দীপাঞ্জন হাত রাখল টোটার ছোটো হাতের ওপর। সে টোটাকে বলল, 'তোমার জন্য নতুন জীবন পেলাম আমরা।'

টোটা হেসে বলল, 'আর তোমাদের জন্য আমরাও।'

এরপর সে বলল, 'তোমাদের দেওয়া খেলনাগুলো খুব সুন্দর, তবে তার মধ্যে ক-টা জিনিস আমাদের আর লাগবে না।'

'সেগুলো কী?' দীপাঞ্জন হেসে জানতে চাইল।

পাশ থেকে একটা বাচ্চা এগিয়ে এসে দীপাঞ্জনের হাতে ধরিয়ে দিল সেগুলো। কয়েকটা খেলনা পিস্তল। যেগুলো রাখা ছিল খেলনার বাক্সর মধ্যে।

শেরউড বনের
শিঙা

'টাওয়ার অব লন্ডন।' গগনচুম্বি বিরাট স্থাপত্যের ভিতরে প্রবেশ করার প্রধান ফটকে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল প্রফেসর জুয়ান আর দীপাঞ্জনাকে। পাশেই টিকিট কাউন্টার। তার গায়ে বোর্ড ঝুলছে, তাতে লেখা—'নো অ্যাডমিশন' অর্থাৎ 'প্রবেশ নিষেধ'। কাউন্টারের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল একজন লোক। তার পরনে লাল রঙের লম্বা ঝুলের পোশাক, পিতলের গুলসাঁটা চওড়া কোমরবন্ধে সোনালি জরির কাজ করা লম্বা তলোয়ারের খাপ, পায়ে ঝকঝকে পালিশ করা হাই হিল বুট, মাথায় ওলটানো টবের মতো দেখতে টুপি। এ ধরনের পোশাক পরা লোকের ছবি এর আগে বইতে দেখেছে দীপাঞ্জন। এরা হল 'রয়াল গার্ড' অর্থাৎ 'রাজরক্ষী', চলতি কথায় এদের বলা যেতে পারে 'রাজার পুলিশ'। লন্ডনের রাজকীয় স্থাপত্যগুলো এরা রক্ষণাবেক্ষণ করে, রানি বা রাজপুরুষরা যখন বাকিংহাম প্যালেস থেকে বাইরে আসেন তখন এরাই তাঁদের 'গার্ড অব অনার' দেয়, দেহরক্ষীরও কাজ করে। 'রয়াল গার্ডের' কাজ খুব সম্মানীয় পেশা। একটা সময় ছিল যখন শুধু ইংল্যান্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজনই এ কাজ করার সুযোগ পেত।

নোটিশ বোর্ডটি দেখে জুয়ান সেই লোকটার দিকে তাকাতেই সে বেশ মার্জিতভাবে বলল, 'আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত আপনাদের ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে পারছি না বলে। ভিতরের মিউজিয়ম নতুনভাবে সাজানোর কাজ চলছে। তাই এক সপ্তাহ ভিতরে দর্শকদের প্রবেশ নিষেধ ঘোষণা করেছেন কর্তৃপক্ষ। তবে এই স্থাপত্যের চারপাশের বাগান আপনারা ঘুরে দেখতে পারেন, সেখানে বিশ্রাম নিতে পারেন।'

দীপাঞ্জনরা একটু হতাশ হল রয়াল গার্ডের কথা শুনে। আসলে মিউজিয়াম সংস্কারের ব্যাপারটা জানা ছিল না তাদের। এখানে আসার আগে কোনো ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে বা গাইডের সঙ্গে কথা বললে তারা নিশ্চয়ই মিউজিয়াম বন্ধের ব্যাপারটা তাদের জানিয়ে জিত। দীপাঞ্জনরা নিজেরাই সকালে হোটেল থেকে একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে লন্ডন দেখার জন্য। প্রথমেই তারা এসে উপস্থিত হয়েছে 'টাওয়ার অব লন্ডন' দেখতে। যে স্থাপত্য শুধু লন্ডনের নয়, ইউরোপের অন্যতম প্রসিদ্ধ দুর্গ প্রাসাদ। প্রায় হাজার বছর ধরে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে টেমস নদীর ধারে।

রয়াল গার্ডের কথা শুনে জুয়ান দীপাঞ্জনকে বললেন, 'কী আর করা যাবে। আমরা তো এখানে চার-পাঁচ দিন থাকব, সুযোগ পেলে আবার একদিন এসে মিউজিয়মটি দেখে যাব। আপাতত বরং এর বাইরের অংশটাই ঘুরে দেখি।'

দীপাঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ, চলুন। চারপাশটাই আপাতত ঘুরে দেখা যাক।'

সদর দরজার পাশ থেকেই পাথরবাঁধা রাস্তা চলে গেছে স্থাপত্যটাকে বেড় দিয়ে। সে

পথেই ধীর পায়ে চারপাশ দেখতে দেখতে হাঁটতে শুরু করল দুজন। বাইরে থেকে স্থাপত্যটাকে দেখতে দেখতে জুয়ান বললেন, 'অন্য দিন হলে নিশ্চয়ই এখানে গাইড পাওয়া যেত তার মুখে অনেক কথা জানা যেত। তবে 'টাওয়ার অব লন্ডন' সম্পর্কে যতটুকু আমি জানি তা তোমাকে বলি?'

'হ্যাঁ বলুন', বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলল দীপাঞ্জন। জুয়ান 'মেসো আমেরিকান ইতিহাস' নিয়ে চর্চা করলেও, অন্য ইতিহাসের ব্যাপারে বেশ জ্ঞান আছে তাঁর।

প্রফেসর জুয়ান বলতে শুরু করলেন, দুর্গ প্রাসাদ আমাদের এশিয়া মহাদেশেও আছে। বিশেষত তোমাদের ভারতের রাজস্থানে বহু জায়গাতে। তবে এশিয়ার দুর্গগুলোর সঙ্গে ইউরোপের দুর্গগুলোর স্থাপত্যগত পার্থক্য আছে। আমাদের দুর্গগুলো অনেক বেশি জায়গা নিয়ে ছড়ানো থাকে, আসলে সেগুলো একটা ছোটখাট নগরী, আর এদের দুর্গ প্রাসাদগুলো সাধারণত উচ্চতায় বেশি হয় দৈর্ঘ্যপ্রস্থ অপেক্ষা। দুর্গর স্তম্ভগুলো অনেকটা ত্রিভুজের বাহুর মতো ওপর দিকে উঠে যায়। যদিও টাওয়ার অব লন্ডন অনেকটাই প্রশস্ত। একুশটা টাওয়ার বা স্তম্ভ ধরে রেখেছে ইংল্যান্ডের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী এই প্রাসাদকে। দুর্গপ্রাসাদের ঠিক মাঝখানে যে 'হোয়াইট টাওয়ার' দেখতে পাচ্ছ ওটাই সবচেয়ে প্রাচীন। ১০৭৮ খ্রিস্টাব্দে নর্মান বিজেতা টাওয়ার ও এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে তিনি প্রসিদ্ধ 'ইলিয়াম দি কংক্যুয়েরর' নামে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে অন্য টাওয়ারগুলো, ইউরোপের প্রসিদ্ধ বন্দিশালা বা ঘাতকশালা হিসাবে, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় এটা কিন্তু সাধারণ দুর্গই ছিল। মূলত সামরিককার্য পরিচালিত হত এখান থেকে। পরবর্তীকালে এর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার কারণে, এ জায়গা থেকে বন্দিদের পালানো প্রায় অসম্ভব বলে একে বন্দিশালায় পরিণত করা হয়। কুখ্যাত জায়গা হয়ে ওঠে 'টাওয়ার অব লন্ডন।'

দীপাঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ, টাওয়ার অব লন্ডন' যে কুখ্যাত বন্দিশালা ছিল তা আমি বইতে পড়েছি।'

জুয়ান বললেন, 'ঠিক তাই। রাজদ্রোহী ডিউক, ব্যারন, আর্ল প্রভৃতি অভিজাত পরিবারের মানুষ থেকে সাধারণত জনতা, বহু মানুষকে বন্দি অথবা হত্যা করা হয় এখানে। সিংহাসন দখলকে কেন্দ্র করে রাজপরিবারের মধ্যে যে ষড়যন্ত্র চলত তার ফলশ্রুতি হিসাবে রাজপরিবারের সদস্য বা রাজারানিরাও বিভিন্ন সময়ে এখানে বন্দিজীবন কাটিয়েছেন। যেমন, রাজা অষ্টম হেনরির স্ত্রী অ্যানি বোলিয়েন, দুই রাজপুত্র প্রিন্স এডোয়ার্ড ও প্রিন্স রিচার্ড, যিনি পরে সিংহাসনে বসেন, রানি লেডি গ্রে প্রমুখ। এছাড়া এখানে কারাবাসকারী আরও একজন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে। যিনি আমাজন অববাহিকায় ইনকাদের স্বর্ণনগরী 'এল-ডো-রে-ডো' খুঁজতে গিয়েছিলেন। রানি অ্যানি বোলিয়নের শিরশ্ছেদ করা হয় গ্রিন টাওয়ার বলে এখানকার এক টাওয়ারে। তারপর রানির ছিন্ন মুণ্ডু বর্শায় গেথে টাওয়ারের জানলা দিয়ে বাইরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে নীচে চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা সেই মুণ্ডু দেখে বুঝতে পারে যে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করলে কী ঘটতে পারে।! 'টাওয়ারে পাঠানো হবে'-এ কথা শুনলেই লন্ডনে এমন কোনো মানুষ ছিল না যার বুক কাঁপত না। এখানে শেষ প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয় ১৯৪১ সালে। জার্মান গুপ্তচর জোসেফ

জ্যাকবকে গুলি করে মারা হয় এখানে।'

বাইরে থেকে দুর্গপ্রাসাদটা দেখতে দেখতে এগোতে থাকল তারা। পাথরের ব্লক বসানো রাস্তার এক পাশে সবুজ ঘাসে ছাওয়া লন। ইতি-উতি ঘুরে বেড়াচ্ছে পর্যটকের দল। কেউবা লনের মধ্যে বসে গল্প করছে। কারুকাজ করা ধাতব বেঞ্চ রয়েছে লনের মধ্যে। লাল পোশাকের রয়েল গার্ডরাও ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। একটার পর একটা টাওয়ার অতিক্রম করতে করতে দীপাঞ্জনরা স্থাপত্যটার পিছন দিকে এসে উপস্থিত হল। এদিকটায় টুরিস্ট বেশি নেই। ঘাসে ছাওয়া লনের শেষপ্রান্তে লোহার রেলিং এর ফাঁক দিয়ে টেমস নদী চোখে পড়ছে। তাতে ভাসমান প্রমোদ তরিগুলোকে দূর থেকে খেলনার মতো দেখাচ্ছে। চারপাশ খুব নিস্তব্ধ। লন্ডন শহরের যাবতীয় কোলাহল, ব্যস্ততা যেন এই 'টাওয়ার অব লন্ডনের' সামনে এসে থেমে যায়। চারপাশে আধুনিক স্থাপত্যের মাঝখানে হাজার বছর ধরে নিজের আভিজাত্য আর ইতিহাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'টাওয়ার অব লন্ডন।'

টাওয়ার সংলগ্ন সবুজ লনে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল জুয়ান আর দীপাঞ্জন। জুয়ান টাওয়ারের গল্প শোনাচ্ছিলেন দীপাঞ্জনকে, হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস প্রত্যক্ষ করল তারা। লনের মাঝখানে যে পাথর বিছানো রাস্তা আছে সেখানে এসে হাজির হল একজন রয়াল গার্ড। তার হাতে একটা কাঠের বালতি। লনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে একটা ব্যাটন দিয়ে ঠকঠক শব্দ করতে লাগল কাঠের বালতিটাকে। আর সে শব্দে কিছুক্ষণের মধ্যেই এদিক ওদিক থেকে লাফাতে লাফাতে ছুটে এল বেশ কয়েকটা 'র‍্যাভেন' বা দাঁড়কাক। কাকগুলো এসে কোনোটা লোকটার কাঁধে, কোনোটা মাথায়, কোনোটা বাহুতে উঠে বসল। আর লোকটা তাদের ডানায় হাত বুলিয়ে কাঠের বালতি থেকে খাবার তুলে দিতে লাগল দাঁড়কাকগুলোর ঠোঁটে। ঠিক যেমন পোষা পায়রাদের খাওয়ানো হয় ঠিক তেমনই। কাক যে এমন পোষ মানে এর আগে তা কোনোদিন দেখেনি দীপাঞ্জন। সে জুয়ানকে বলল, 'কী অদ্ভুত ব্যাপার! এখানে দাঁড়কাক পোষা হয়!'

জুয়ান বললেন, 'কাকগুলোকে দেখে মনে পড়ে গেল, এখানে 'র‍্যাভেন টাওয়ার' নামে একটা টাওয়ার আছে বলে বইতে পড়েছি। কাকগুলো তাহলে হয়তো ওখানেই থাকে। এ ব্যাপারে আর কিছু আমার জানা নেই।'

জুয়ানের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে উঠল, 'আপনাদের ডানদিকে যে টাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন ওটাই র‍্যাভেন টাওয়ার। ওখানেই যুগ যুগ ধরে বাস করে আসছে কাকগুলো।'

মৃদু চমকে উঠে পাশে তাকাতেই দীপাঞ্জনরা দেখতে পেল কখন যেন একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। মাঝবয়সি এক ইংরেজ। পায়ে জুতো, পরনে লংকোট, মাথায় হ্যাট।

দীপাঞ্জনরা তার দিকে তাকাতেই সে বলল, 'মার্জনা করবেন, পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনাদের কথা কানে এল তাই জবাবটা দিয়ে দিলাম।' দীপাঞ্জন এবার খেয়াল করল লোকটার হাতে একটা ফাঁকা খাঁচাও ধরা আছে।

তার কথা শুনে জুয়ান বললেন, 'মার্জনা নয়, আপনাকে বরং ধন্যবাদ জানাই ব্যাপারটা

জানাবার জন্য। তা এই দাঁড়কাকগুলো কি পোষা হয় এখানে?'

লোকটা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে এখানে নিয়মিতভাবে দাঁড়কাক পোষা হয়। এটা একটা সংস্কার এবং এটা বর্তমানে টাওয়ার অব লন্ডনের একটা ঐতিহ্য। ছটা দাঁড়কাক সব সময়ে ছেড়ে রাখা হয় টাওয়ার অব লন্ডনে। আর একটাকে খাঁচায় রাখা হয়। হঠাৎ যদি কোনো দাঁড়কাক মারা যায় বা নিখোঁজ হয়ে যায় সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য। ছ-টা দাঁড়কাকবিহীন এই স্থাপত্য থাকতে পারে না।'

লোকটার কথা শুনে জুয়ান বললেন, 'বেশ চমকপ্রদ ব্যাপারতো! কিন্তু এর পিছনে কী কারণ আছে? এ সংস্কার কেন?'

লোকটা মাথার থেকে টুপিটা খুলল। তারপর মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গিতে বলল, 'আমার নাম রিচমন্ড। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?' প্রশ্নটা করে দীপাঞ্জনের পাশে বেঞ্চের শূন্যস্থানটা দখল করে বসল সে।

দীপাঞ্জনরা নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পর লোকটা বলল, 'আপনাদের আগ্রহ দেখে ভালো লাগল। তাই বসলাম। গল্পটা আপনাদের বলি, দাঁড়কাক পোষার চল তিন-সাড়ে তিনশো বছর ধরে হলেও কাকেরা কিন্তু এই দুর্গপ্রাসাদের আদি বাসিন্দা। কেউ কেউ বলেন, টাওয়ার তৈরি হবার পর থেকেই কাকগুলো ওখানে আশ্রয় নেয়। আবার কারও মতে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন শহর ও তার উপকণ্ঠে যে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হয় তখন প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গল থেকে দাঁড়কাকগুলো এসে আশ্রয় নেয় এই টাওয়ারে। তবে এই টাওয়ারে কাকগুলো থাকার একটা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ পাওয়া যায়। এই টাওয়ারেই এক সময় শিরশ্ছেদ করা হত বন্দিদের। অথবা হাত-পা কেটে শাস্তি দেওয়া হত। আর ওই যে টাওয়ারের মাথায় যে গবাক্ষ দেখছেন, সেখান থেকে ছিন্নমুণ্ড, কর্তিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ছুড়ে ফেলা হত আমরা যেখানে বসে আছি ঠিক এখানে! মাংসর লোভেই এখানে এই টাওয়ারে আশ্রয় নিয়েছিল কাকগুলো। তবে সেই সময় কাকগুলোকে এখনকার মতো ঠিক পোষা বলা যাবে না। রানি অ্যানি ব্যোলিয়নের ছিন্ন মুণ্ড থেকে চোখ খুবলে খেয়েছিল কাকগুলো। যাইহোক সপ্তদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসনে বসলেন। কাকগুলো মাঝে মাঝে ঠোঁটে করে মানুষের মাংস, হাড়ের টুকরো প্রাসাদের এখানে সেখানে নিয়ে ফেলত। ব্যাপারটা পছন্দ না হওয়াতে তিনি ধুঁয়ো দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন কাকগুলোকে। বেচারা কাকগুলো গৃহহীন হয়ে উড়তে উড়তে অনেকদূর চলে গেল নতুন বাসস্থানের খোঁজে। কিন্তু যেদিন হঠাৎ প্রবল ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল এই প্রাসাদ। শুধু এই প্রাসাদেই ভূমিকম্প, অন্য জায়গাতে কিন্তু নয়। টাওয়ারগুলো দুলতে থাকল, খসে পড়তে লাগল পাথর। যেদিন কাকগুলোকে তাড়ানো হল আর আর ভূমিকম্প হল সেদিন রাতে প্রাসাদের অন্ধকার অলিন্দ থেকে এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন রাজা চার্লস। 'তুমি যদি অন্তত ছ-টা দাঁড়কাক প্রাসাদে রাখতে না পারো তবে এ প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যাবে...।'

একটানা কথাগুলো বলে একটু থামল রিচমন্ড নামের লোকটা। তারপর আবার বলতে শুরু করল, অদৃশ্যবাণী শুনে ভয় পেয়ে গেলেন রাজা। পরদিন সকালেই তিনি লোক পাঠালেন এক জায়গাতে অন্তত ছটা দাঁড়কাক জোগাড় করে আনতে। তিনদিন সময়

লেগেছিল ছ-টা কাক আনতে। আর এই তিনদিনই নিয়মিত ভূমিকম্প হয় প্রাসাদে। কাক যেদিন আনা হল সেদিন থেকে ভূমিকম্প বন্ধ হল। মাঝে একবার দুটো কাক উড়ে গেছিল, ঠিক সেদিনই আবার ভূমিকম্প হল। সেই থেকে সবার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয় যে অন্তত ছ-টা কাক সবসময় রাখতে হবে এখানে। নইলে প্রাসাদ ভেঙে পড়বে। সেই থেকে ছ-টা কাক সবসময় এখানে থাকে। ওদের ডানা সেলাই করা থাকে যাতে ওরা উড়ে পালাতে না পারে।'

রিচমন্ডের কথা শুনে জুয়ান বললেন, 'গল্পটা আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনতো হতে পারে যে ধোঁয়া বা অন্য কোনো কারণে নয়, ভূমিকম্প হবে বুঝতে পেরেই দূরে পালিয়ে গেছিল দাঁড়কাকগুলো। পশুপাখিদের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আঁচ করার ক্ষমতা থাকে।'

রিচমন্ড শুনে বলল, 'তা থাকে আমিও জানি। তবে ভূমিকম্প কিন্তু শুদু এই দুর্গপ্রাসাদেই হত। সারা লন্ডন শহরে নয়। এ ব্যাপারটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন। যুগ যুগ ধরে এখানকার মানুষ বিশ্বাস করে এ কথা—'র‌্যাভেন যেদিন থাকবে না, টাওয়ার অব লন্ডন'ও আর থাকবে না।' কথাটা কিন্তু প্রবাদে পরিণত হয়েছে।'

জুয়ান এরপর এ প্রসঙ্গে আর বিতর্কে না গিয়ে লোকটাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি এখানেই থাকেন?'

রিচমন্ড বলল, 'না, আমি এখানে থাকি না। আমি থাকি এখান থেকে একশো কুড়ি মাইল দূরে নটিংহ্যামে।' তবে জায়গাটা ঠিক নটিংহ্যাম বললে ভুল হবে। বর্তমান নটিংহ্যাম বলতে যা বোঝায় সেই শহর থেকে আরও কুড়ি মাইল দূরে এক পল্লিগ্রামে। ওখানে একটা পাঁচশো বছরের প্রাচীন জমিদারবাড়ি আছে। আসলে সেটাও একটা ছোটোখাটো দুর্গ প্রাসাদ 'আর্লের জমিদার বাড়ি'। আমি সেখানেই থাকি। এখানে এসেছিলাম একটা দাঁড়কাক দিতে।'

'দাঁড়কাক দিতে!', দীপাঞ্জন বলে উঠল।

রিচমন্ড বলল, 'হ্যাঁ দাঁড়কাক দিতে। রাজা দ্বিতীয় চার্লস যেখান থেকে দাঁড়কাক সংগ্রহ করে 'টাওয়ার অব লন্ডন'কে বাঁচিয়ে ছিলেন সেটা আমাদের অঞ্চল। বিভিন্ন সময় আর্লের জমিদারবাড়ি থেকে এখানে দাঁড়কাক পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য এই প্রাসাদেই একটা দাঁড়কাক প্রজননকেন্দ্র বানানো হয়েছে। সংবাদপত্রে কদিন আগে খবর বেরিয়েছিল যে একটা দাঁড়কাক নাকি অসুস্থ। তাই আমার মালিক আর্ল সেভার্ন একটা কাক দিয়ে আমাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মুশকিল হল যে কাকটা এরা কিছুতেই নিল না।'

'কেন, নিল না, কেন?' জানতে চাইল দীপাঞ্জন।

রিচমন্ড যেন একটু হতাশভাবে বলল, 'দিনকাল, আইনকানুন সব পালটেছে। বাইরে থেকে এখন আর ওরা কাক নেয় না। এখানেই কাকের ছানা ফোটায়। এতে পাখিদের মধ্যে রোগ সংক্রমণের ভয় কম থাকে। তবে টাওয়ারের কর্তৃপক্ষ কাক নেয়নি শুনলে দুঃখ পাবেন বৃদ্ধ আর্ল। তাঁর মর্যাদায় আঘাত লাগবে। তাই কাকটাকে এখানেই ছেড়ে দিলাম। রয়াল গার্ডরা অবশ্য ব্যাপারটাতে বিশেষ আপত্তি করল না। বাইরের কাকগুলো অনেক সময় এখানে তো উড়ে আসে।'—এই বলে রিচমন্ড তার হাতের শূন্য খাঁচাটা

একটু তুলে ধরে দীপাঞ্জনদের দেখাল।

জুয়ান বললেন, 'নটিংহ্যামের অনেক নাম শুনেছি। সে জায়গাটা কেমন? আসলে আমি এখানে একটা সেমিনারে যোগ দিতে এসেছিলাম। ফেরার আগে হাতে দু-তিনদিন সময় আছে। লন্ডনের আশেপাশের জায়গাগুলো একটু ঘুরে দেখতে চাই।'

রিচমন্ড বললেন, 'রবিনহুডের গল্পে নটিংহ্যামের কথা আছে। সেজন্য অনেকে ওখানে বেড়াতে যায়। তবে ন-শো বছর আগের সেই নটিংহ্যাম তো আর নেই। এখন সেটা আধুনিক শহর। শেরউড বনও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু আমরা যেখানে থাকি সেখানে কিছুটা অরণ্য আছে। আর শহর যেভাবে বাড়ছে তাতে বিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে সেটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তবে তার আগে একবার দেখে আসতে পারেন জায়গাটা।'

জুয়ান জানতে চাইলেন, 'ওখানে থাকার বন্দোবস্ত কী আছে?'

রিচমন্ড প্রথমে জবাব দিল 'নটিংহ্যামে অনেক বড়ো বড়ো হোটেল আছে।' আর তারপর বলল, 'আপনারা যদি ইতিহাস পছন্দ করেন আর নিরিবিলিতে থাকতে চান তবে শেরউডের ভিতর আর্ল জমিদারবাড়িতেও থাকতে পারেন। দুশো পাউন্ড দিলে আমি সেখানে কদিন থাকার সব ব্যবস্থা করে দেব। অনেক প্রাচীন জিনিস আছে সে বাড়িতে। তার মধ্যে কিছু জিনিস এই টাওয়ার বা ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও নেই। আরও একজন ভদ্রলোক লন্ডন থেকে কাল ভোরের ট্রেনে যাচ্ছেন। তাহলে আমি এক সঙ্গে তিনজনের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারি? ভদ্রলোকও শুনলাম কী একটা সেমিনারে যোগ দিতে এসেছিলেন এখানে। আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিলেন। আইরিশ ভদ্রলোক। প্রাচীন ইংল্যান্ড নিয়ে চর্চা করেন।'

জুয়ান বললেন, 'আপনারা কি হোটেলের মতো বাড়িটা ভাড়া দেন?'

রিচমন্ড বলল, 'না, ঠিক তা নয়। আসলে দুর্গবাড়ির মালিক জানেন না ব্যাপারটা। কিন্তু টাকার জোগান না পেলে আমি বৃদ্ধ আর্লের খাবার খরচ, চিকিৎসার খরচ চালাব কীভাবে? বংশপরম্পরায় আমরা আর্লদের ভৃত্যের কাজ করি। বুড়ো মানুষটাকে ফেলে চলেও যেতে পারছি না। তাই মাঝে মাঝে টুরিস্টদের নিয়ে গিয়ে ওঠাই ওখানে, যখন দেখি আর খরচ চলছে না। আর্ল বেশ গর্ব অনুভব করেন এই ভেবে যে এখনও তাদের বংশগরিমা দেখতে লোক আসে।'

জুয়ান বললেন, 'বুঝলাম। তা আইরিশ ভদ্রলোকের নাম কী?'

'লর্ড শ্যানন।'—জবাব দিল রিচমন্ড।

'লর্ড শ্যানন? নামটা যেন চেনা লাগছে!' এই বলে জুয়ান তার কোটের পকেট থেকে সেমিনারের ছোটো পুস্তিকা বার করলেন। কয়েকটা পাতা ওলটাবার পর একটা পাতায় চোখ রেখে বললেন, 'হ্যাঁ পেয়েছি। এই জন্যই নামটা চেনা লাগছিল। সেমিনারের প্রথমদিন উনি বক্তৃতা করেছিলেন মধ্যযুগের ইংল্যান্ডের ইতিহাস নিয়ে। সঙ্গী হিসাবে লোকটা মন্দ হবে না কারণ তিনিও দেশের ইতিহাস জানেন।'

এ কথা বলার পর তিনি রিচমন্ডকে বললেন, 'ঠিক আছে আমরা যাব। কী ভাবে যাব বলুন?'

রিচমন্ড বলল, 'কাল সকাল ন-টায় একটা ট্রেন আছে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে। ঘণ্টা দুই-এর মধ্যে আপনাকে পৌঁছে দেবে নটিংহ্যামে। প্ল্যাটফর্মের বাইরে আমি অপেক্ষা করব আপনাদের জন্য।'

আরও সামান্য কিছু কথাবার্তা বলে রিচমন্ড চলে যাবার পর দীপাঞ্জনরা টাওয়ার চত্বর থেকে বেরিয়ে বাকিংহ্যাম প্যালেস আর ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে দেখে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় কাটিয়েছিল। পরদিন সকালবেলা ভিক্টোরিয়া রেল স্টেশন থেকে তারা রওনা দিল নটিংহ্যামের উদ্দেশ্যে।

২

দু-ঘণ্টা মতো মনোরম যাত্রাপথ পেরিয়ে তারা নির্দিষ্ট সময়েই পৌঁছে গেল নটিংহ্যামে। আধুনিক শহর নটিংহ্যাম। স্টেশনের বাইরে পা রেখেই দীপাঞ্জনরা বুঝতে পারল আধুনিকতার পাশাপাশি একটা প্রাচীন ঐতিহ্যের মেলবন্ধন আছে লন্ডনের মতো এ শহরেও। ঐতিহ্যের ব্যাপারে ব্রিটিশরা অন্য জাতির তুলনায় বরাবরই বেশ রক্ষণশীল। প্রাচীনত্বকে তারা ভালোবাসে, মর্যাদা দেয়। আধুনিক ঘরবাড়ির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যের বাড়ি ঘর। এবং সেগুলোই যেন বেশি সম্ভ্রম আকর্ষণ করে লোকের মনে। ওইসব স্থাপত্যই জানিয়ে দেয় এ শহর ভুঁইফোড় কোনো শহর নয়, এ শহর ইতিহাসের অঙ্গ, এর একটা আলাদা গন্ধ আছে, যে গন্ধ গগনচুম্বি অট্টালিকা সমৃদ্ধ নিউইয়র্ক বা হংকং-এ পাওয়া যাবে না। সে সব শহর যত ঝলমলেই হোক না কেন।'

পার্কিং লটে পৌঁছে একটু অপেক্ষা করার পরই তারা রিচমন্ডকে দেখতে পেল। একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করে সে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের মধ্যেই হবে। পরনে ওয়েস্টকোট, চোখে চশমা, মাথায় হ্যাট, হাতে একটা ছড়ি। প্রফেসর জুয়ানের দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, 'আমি লর্ড শ্যানন। গলওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। দর্শক আসনে বসে গতকাল, 'মেসো আমেরিকান সভ্যতা' নিয়ে আপনার বক্তৃতা শুনলাম এবং অনেক কিছু জানলাম।' জুয়ান দীপাঞ্জনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'দুর্ভাগ্য আপনার বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি দ্বিতীয় দিন এসে পৌঁছেছি। তবে সে আক্ষেপ আশাকরি আপনার সাহচর্যে পুষিয়ে নিতে পারব। আপনিতো এ দেশের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন। এই ঐতিহাসিক জায়গাতে আপনার মতো লোকের দুর্লভ সাহচর্য পাব আমরা।'

শ্যানন হেসে বললেন, 'জানার যে কোনো শেষ নেই তা আমি আপনি দুজনেই জানি। তবে এ জায়গা সম্বন্ধে যতটুকু জানি তা নিশ্চই বলার চেষ্টা করব।'

জুয়ান এরপর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রিচমন্ড বলল, 'এবার আপনার গাড়িতে চলুন। অনেকটা পথ যেতে হবে, গাড়িতে যেতে যেতে কথা বলতে পারবেন। ঘণ্টা তিনেকের মতো সময় লাগবে যেতে।'

জুয়ান বললেন, 'হ্যাঁ বলুন। কিন্তু আপনিতো বলেছিলেন মাত্র কুড়ি মাইল পথ। অত

সময় লাগবে কেন? আপনার গাড়ি কোনটা?'

রিচমন্ড হেসে বলল, 'হ্যাঁ কুড়ি মাইলই পথ। গাড়ি এই চত্বরের বাইরে আছে। ও গাড়ি ঢুকলে এ চত্বরটা নোংরা হতে পারে বলে গাড়িটা বাইরে রাখতে হয়েছে।'

রিচমন্ডের কথার অর্থ কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারল দীপাঞ্জনরা। চত্বরের বাইরে বেরিয়ে রিচমন্ড তাদের এনে দাঁড় করাল একটা ঘোড়ার গাড়ির সামনে। দু-ঘোড়ায় টানা কালোরঙের একটা ফিটন গাড়ি। ঘোড়াগুলোও কালো। গাড়ির ছাদে মালপত্র ওঠাতে ওঠাতে রিচমন্ড বলল, 'আমার মালিক আর্ল সেভার্ন খুব প্রাচীনপন্থী। ভাবনা-চিন্তার দিক থেকে তিনি এখনও সেই আর্ল-ব্যারন-ডিউকের যুগেই পড়ে আছেন। ওখানে যন্ত্রচালিত গাড়ির প্রবেশ নিষেধ। আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বলতে শুধু খবরের কাগজ। আমি তাকে কোনোদিন দুর্গপ্রাসাদের বাইরে বেরোতে দেখিনি। বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি ঢুকতে দেননি তিনি। তাঁর সামনে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যায় না। এতে হয়তো আপনাদের কিছুটা কষ্ট হবে, কিন্তু আপনারা একটা অতি প্রাচীন গন্ধ অনুভব করতে পারবেন সেখানে। যারা এটা বোঝে না তারা টাকা দিলেও আমি তাদের সেখানে নেই না।'

শ্যানন শুনে বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমরা প্রাচীনগন্ধ খুঁজতেই ওখানে যাচ্ছি। তাই পরিবেশটা ওরকম হওয়াই দরকার।'

দীপাঞ্জনরা চড়ে বসল গাড়িতে। রিচমন্ড বসল কোচয়ানের আসনে। ঘোড়ার নলের খটাখট শব্দ তুলে চলতে শুরু করল গাড়ি। প্রথম শহরের মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি। পথের দু-পাশে বড়ো বড়ো আধুনিক বাড়ি-ঘর-দোকানপাট। আর তার মাঝে মাঝে আপন গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভিক্টোরিয়ান যুগের নানান স্থাপত্য। বড়ো বড়ো থামওয়ালা সব ঘর বাড়ি সুদৃশ্য কাঠের প্যানেলে ঘষা কাচ ঢাকা দরজা জানালা। বাড়িগুলোর কোনোটার মাথায় বসানো আছে নানা ধরনের মূর্তি, দেয়ালের গায়ে রয়েছে কারুকাজ। দীপাঞ্জন একটা জিনিস খেয়াল করল, কলকাতার রাস্তায় কেউ যেমন পুরোনো বেডফোর্ড গাড়ি দেখলে হাসাহাসি করে তেমন এই ঘোড়ার গাড়ি দেখে পথচারীরা কিন্তু কেউ হাসাহাসি করছে না। বরং আধুনিক গাড়িগুলোর পাশে তাদের গাড়িটাকে দেখে বেশ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তাদের দিকে। এক বৃদ্ধ পথচারী ভদ্রলোক তো গাড়িটা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে মাথার টুপি খুলে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন গাড়ির দিকে। অর্থাৎ এরা প্রাচীন ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করে।

চলতে চলতে শ্যানন বললেন, 'আমরা যে জায়গা দিয়ে যাচ্ছি এটা এক হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন জনপদ। তবে তখন অবশ্য এ জায়গাতে একটা দুর্গ ছিল শুধু, আর তাকে ঘিরে ছোটো ছোটো অ্যাংলো স্যাক্সনদের গ্রাম। ওরাই ছিল এখানকার আদিবাসিন্দা। নর্মানরা এদেশ দখল করার পর এখানে দুর্গ বানায়। তখন এ শহর ঘেরা ছিল গভীর বনে। শেরউড বন। রাজা সেখানে হরিণ শিকার করতে আসতেন। তার বাসস্থান ও নিরাপত্তার জন্যই দুর্গ বানানো হয় এখানে। যদিও মহাকাল সে দুর্গকে এখন গ্রাস করে নিয়েছে, তার অস্তিত্ব নেই এখন।'

দীপাঞ্জন জানতে চাইল, 'আচ্ছা, রবিনহুডের ব্যাপারটা কি ঐতিহাসিকভাবে সত্যি, নাকি

শুধুই লোককথা? 'শেরউড বন' নামটা শুনলেই মনে পড়ে যায় রবিন হুডের কাহিনি। 'অসহায়, নিপীড়িত মানুষের ত্রাতা' শেরউডবনের রবিন হুড!'

প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্যানন বললেন, 'রবিনহুডের গল্প যে সময়কার সেটা হল দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ নর্ম্যানরা তখন দখল নিয়েছে দেশটার। রাজা ছিলেন 'রিচার্ড দি লায়ন হার্ট'। কিন্তু তিনি সুদূর প্রাচ্যে জেরুসালেমকে মুক্ত করার জন্য ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডে যোগ দিতে চলে গেলেন এবং যাবার আগে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন ভাই জন প্ল্যান্টাজেনেটকে। স্যাক্সনদের ওপর জনের নর্ম্যান বাহিনী নানারকম অত্যাচার করত। কারণ স্যাক্সনরা ছিল আগের রাজার অনুরক্ত। যাকে বিতাড়িত করে সিংহাসন দখল করে নর্ম্যানরা। সংঘর্ষ লেগে থাকত নর্ম্যান স্যাক্সনদের মধ্যে। রাজার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে লড়াই করা সম্ভব নয় বলে স্যাক্স বিদ্রোহীরা জঙ্গলে আত্মগোপন করত এবং অতর্কিতভাবে হানা দিত নর্ম্যান শেরিফ শাসকদের ভিতর। স্যাক্সন বিদ্রোহীদের অন্যতম ঘাটি ছিল শেরউড বনাঞ্চল। এই গভীর বনাঞ্চলে তারা আত্মগোপন করত। অস্ত্রপ্রশিক্ষণ দিত। গেরিলা যুদ্ধ চালাত।—এ ঘটনাগুলো কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে সত্যি। নর্ম্যানরা কিন্তু তাদের ডাকাত বলত। শেরউড বনের পথে তারা সুযোগ পেলেই রাজার খাদ্যশস্য, ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠন করত। এমনকি একবার তারা লুঠ করেছিল রাজা জন যে জহরতের মালা গলায় দিতেন সেই জহরতের ছড়া। রাজা যে মণিকারকে তা নতুন করে বাঁধতে দিয়েছিলেন তার থেকেই লুঠ হয় সেটা। ঐতিহাসিক গবেষকদের মধ্যে ধারণা হল হতে পারে স্যাক্সন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কোনো নেতার নাম ছিল 'রবিন'। যার কথা পল্লবিত হয়ে প্রথমে ইংল্যান্ডে তারপর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তবে রবিনহুডের সুস্পষ্ট উপস্থিতির কোনো প্রমাণ ঐতিহাসিকরা সংগ্রহ করতে পারেনি। সম্প্রতি দ্বাদশ শতকের একটা চিঠি উদ্ধার করা হয়েছে একজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে। রেশমের কাগজের ওপর সেই চিঠিতে কাসকেট নামক সেনাধ্যক্ষ তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ন্যাটিংহ্যামের শেরিফকে জানাচ্ছে যে ন্যাটিংহ্যাম দুর্গে আরও রক্ষী প্রয়োজন। কারণ সে খবর পেয়েছে যে 'শিঙাধারী বিদ্রোহী দস্যু র‍্যাভেন' শেরউড অরণ্য ছেড়ে বেড়িয়ে এসে নর্ম্যানদের আক্রমণ করতে পারে। চিঠিটা দ্বাদশ শতকেই লেখা। বিজ্ঞানীরা সেটা পরীক্ষা করে দেখেছেন। 'রবিন' হল একটা ছোট্ট সুন্দর পাখি, আর 'র‍্যাভেন' হল 'কুৎসিত কাক'। হতে পারে স্যাক্সনদের কাছে যে 'রবিন' নর্ম্যানদের কাছে সে 'র‍্যাভেন' বা কুৎসিত কাক। নর্মানরা হয়তো ঘৃণায় রবিনকে র‍্যাভেন বলত। যাইহোক চিঠি কিন্তু এখন রবিন বা র‍্যাভেনের উপস্থিতির ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দিচ্ছে।'

গড়ি চালাতে চালতে দীপাঞ্জনদের কথোপকথন শুনছিল রিচমন্ড। সে এবার বলল, জহরত লুণ্ঠনের গল্প আমি শুনেছি। মণিকারের নাম ছিল মরিস। রাজা মণিকারকে ডিউক উপাধি দিয়েছিলেন। জহরতগুলো খোয়া যাবার অপরাধে রাজা তাকে প্রাণদণ্ড দেন। ন্যাটিংহ্যাম দুর্গে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় তাকে। তবে আমি এ ঘটনাকে এতদিন গল্পকথা ভাবতাম। এবার অন্য একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি। আর্লদুর্গে কিন্তু প্রচুর র‍্যাভেন আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কাকেদের আস্তানা বাড়িটা। একটা সময় ছিল যখন

কাকেদের পরিচর্যা করার জন্যই লোক থাকত বাড়িতে। বর্তমান আর্লের ঠাকুরদার আমলে একটা ছেলে গুলতি দিয়ে একটা কাক মেরেছিল বলে তার বাবাকে ধরে এনে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হয়। দাঁড়কাক আর্ল বংশের ঐতিহ্যের প্রতীক। দোহাই, আপনাদের ওখানে দিয়ে দাঁড়কাক সম্বন্ধে কুৎসিত শব্দ বা ও ধরনের কোনো শব্দ ব্যবহার করবেন না।'

জুয়ান জানতে চাইলেন, 'আর্ল জমিদার বাড়িতে কে কে থাকেন?'

রিচমন্ড বলল, 'এক সময় অনেকেই থাকত। তাদের কেউ কেউ বয়সজনিত কারণে মারা গেছে, কেউবা কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখন ওখানে থাকার মধ্যে আছেন আর্ল সেভার্ন, আমি আর একপাল দাঁড়কাক।'

কথা চলতে চলতেই শহর ছেড়ে একসময় বেরিয়ে পড়ল গাড়ি। পল্লিগ্রামের পথ ধরে দুলকি চালে চলতে শুরু করল ঘোড়ার গাড়ি। পথের দুপাশে কাঠের বাড়ি-ঘর, কোথাও গমের খেত কোথাও বা চিনি বিটের খেত। কোথাও আবার বীজ বপনের জন্য ঘোড়া দিয়ে লাঙল দিচ্ছে কৃষকরা। কিছু জায়গাতে আবার বিস্তীর্ণ ফুলের খেত। গল্প করতে করতে এগিয়ে চলল দীপাঞ্জনরা। বক্তা মূলত শ্যানন। দীপাঞ্জন আর জুয়ান শ্রোতা। শ্যানন কোনো সময় বলে যেতে লাগলেন টিউডর রাজবংশের ইতিহাস, কখনও বা ভিক্টোরিয়ান যুগের কথা, কখনও বা নর্ম্যান স্যাক্সনদের লড়াইয়ের গল্প। ঘণ্টা খানেক চলার পরে ঘোড়াদের জল খাওয়ানোর জন্য ছোট গঞ্জের মতো এক জায়গাতে গাড়ি থামানো হল। দীপাঞ্জনরা তিনজন সেখানেই দুপুরের খাবার খেয়ে নিল। তারপর আবার পথ চলা। এক সময় দূরে দিগন্ত রেখায় তরুবীথি দেখা দিল। রিচমন্ড বলল, 'হল শেরউড বন।'

সোজা রাস্তা চলে গেছে বনের মধ্যে দিয়ে। সে পথেই ঢুকল ঘোড়ার গাড়ি। পথের দু-পাশে ওক, পাইন, ওয়াল নাটের ঘন জঙ্গল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে আছে এই প্রাচীন বনভূমি। গাড়িটা বনপথে প্রবেশ করা মাত্রই একটা অন্যরকম শিহরণ জাগল দীপাঞ্জনের মনে। ন্যাটিংহ্যামশ্যায়ারের শেরউড বনের গল্প, রবিনহুডের গল্প। রবিনহুডের গল্পের অন্য চরিত্রগুলোর কথাও তার মনে আছে। ন্যাটিংহ্যামের শেরিফ পেটমোটা মাওব্রে, রবিনের সঙ্গী টেকো ফ্রায়ার টাক, ধনুর্ধর লিটল্ জন, কত সব চরিত্র আর শেরউড বন তখন ছবির বইয়ের পাতা থেকে জীবন্ত হয়ে উঠে আসত দীপাঞ্জনের কল্পনায়। আর আজ সে সেই যে গল্পকথার শেরউড বনে গভীর জঙ্গল, সেই আলোছায়ার খেলা, সেই নির্জনতা। মাঝে মাঝে পাখির শিস শোনা যাচ্ছে। যেমন সাংকেতিক শিক দিত রবিনহুড। দীপাঞ্জনের মনে হতে লাগল এই হয়তো অরণ্য ফুঁড়ে আবির্ভূত হবে রবিন ও তার অনুচররা। রবিনের সেই চেনা মুখ, ছুচালো ছাগল দাড়ি চিবুকে, মাথার পালক গোঁজা টুপি, হাতে সরলরেখার মতো লম্বা তলোয়ার, পরনে কাঁধে আর হাতে ঝালর লাগানো মধ্যযুগীয় পোশাক, কোমরে শিঙা গোঁজা। যে শিঙা বাজিয়ে সে ডাক দিত বা সতর্ক করত তার সঙ্গীদের। দীপাঞ্জনের মনে হল সে যেন টাইম মেশিনে করে পৌঁছে গেছে আটশো বছর আগে ইংল্যান্ডের এই বনে।

বনপথে যেতে যেতে শ্যানন বললেন, 'এই বনাঞ্চলগুলোই কিন্তু নর্ম্যান-স্যাক্সনদের বিরোধের অন্যতম কারণ ছিল। এখানকার আদি অধিবাসী স্যাক্সনদের প্রধান নির্ভরশীলতা

ছিল এই বনাঞ্চল। এখান থেকে তারা খাদ্য সংগ্রহ করত। নর্ম্যানরা ক্ষমতা দখলের পর শেরউড বন 'রাজার বন' বলে ঘোষিত হল। রাজার বনে স্যাক্সনদের যুগ যুগ ধরে চলে আসা হরিণ শিকার নিষিদ্ধ হল। কেউ হরিণ শিকার করলেই তাকে ফাঁসিতে লটকানো হত। রাজার বনে হরিণ শিকার করতে পারবে শুধু রাজা। তার অনুগত নর্ম্যান শেরিফরা। 'অরণ্যের অধিকার'ও নর্ম্যান স্যাক্সনদের দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ। সে সময়ের জনজীবন কাঠ আর খাদ্যদ্রব্যর জন্য অনেকাংশে বনাঞ্চলের ওপর নির্ভরশীল ছিল।' শ্যাননের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দীপাঞ্জনরা দেখতে পেল একটা বেশ বড়ো হরিণ সামনের রাস্তা পেরিয়ে একপাশের বন ছেড়ে অন্য দিকের বনে ঢুকে গেল। রিচমন্ড বলল, 'এখনও এই বনে বেশ কিছু হরিণ আছে।'

দীপাঞ্জন রবিনহুড গল্পে শেরিফ মণ্ডব্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলল, 'রাজার বনে হরিণ শিকার করা নিষিদ্ধ।'

রিচমন্ডসহ সবাই হাসল তার কথা শুনে। রিচমণ্ডসহ সবাই এই উদ্ধৃতি পড়েছে রবিনহুডের গল্পে।

বনপথ ধরে আরও ঘণ্টাখানেক চলার পর শেষ দুপুরে এক সময় জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দীপাঞ্জনদের চোখে পড়ল একটা প্রাচীন দুর্গ প্রসাদ।

জঙ্গলের মধ্যে আর্লদের জমিদার বাড়ি বা আর্লদের প্রাচীন প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল দীপাঞ্জনদের গাড়ি। নিছক প্রাসাদ বা বাড়ি না বলে এই স্থাপত্যকে মনে হয় দুর্গ বলাই ভালো। বহিঃগাত্রে কোনো দৃষ্টিনন্দন অলংকরণ নেই। নিষ্প্রাণ কঠিন পাথরের স্তম্ভ দেয়ালগুলো খাড়া হয়ে আকাশের দিকে উঠে গেছে। নীচ থেকে দেখলে মনে হয় দুর্গর স্তম্ভগুলো যেন অনেক উঁচুতে উঠে এক সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রাসাদের মতো দৃষ্টিনন্দন ঝুলবারান্দাও নেই বহিঃদেশে। তার পরিবর্তে আছে অসংখ্য ছোটখাটো অন্ধকার গোলাকার গবাক্ষ। সম্ভবত গবাক্ষগুলোর আড়াল থেকে শত্রুদের উদ্দেশ্যে তির নিক্ষেপ করা হতো। দুর্গ প্রাসাদে যে চারটে স্তম্ভ আছে তার গায়ের ছিদ্র আর মাথার ওপরের পাথরের জাফরি ঘেরা গম্বুজ দেখলেই বোঝা যায় সেগুলো আসলে ছিল 'নজর মিনার'। গাড়ির ভিতর থেকেই দীপাঞ্জনরা বুঝতে পারল এক সময় গভীর পরিখা কাটা ছিল দুর্গের চারধারে। প্রবেশ মুখে ছিল একটা 'ড্র-বিজ'। কপিকল ঘুরিয়ে লোহার সাঁকোটা তুলে নিলেই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত এই দুর্গ প্রাসাদের। এখন অবশ্য স্থায়ীভাবে মাটির সঙ্গে এঁটে আছে সাঁকোটা। শুধু সেই সাঁকোর গায়ে আটকানো লোহার মোটামোটা ছিন্ন শিকলগুলো জানান দিচ্ছে যে একসময় সাঁকোটা ওঠানো নামানো যেত। আর একটা জিনিস অবশ্যই চোখে পড়ল তাদের। দুর্গ প্রাসাদের গায়ে, তির ছোড়ার গর্তে, গবাক্ষে

অসংখ্য দাঁড়কাকের বাসা। কার্নিশগুলোতে বসে আছে সার সার দাঁড়কাক। যেন তারা এই দুর্গ স্থাপত্যেরই অংশ। কোনো কোলাহল বা চাঞ্চল্য নেই তাদের মধ্যে। ড্র-ব্রিজ পেরিয়ে দুর্গ প্রাসাদের তোরণের সামনে এসে দাঁড়াল গাড়ি। পাথরে তোরণের মাথার ওপর থেকে নেমে আসা চওড়া লোহার পাত দিয়ে তৈরি এক প্রাচীন খাঁচা গতিপথ রুদ্ধ করেছে গাড়িটার। সেই খাঁচার মাটি সংলগ্ন অংশগুলো বল্লমের ফলার মতো তীক্ষ্ণ। শতশত বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় লোহার পাতগুলো কালো হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও তার গায়ে কোথাও মরচে পড়েনি। মহাকালের প্রহরীর মতো সে আজও দাঁড়িয়ে দুর্গ-প্রাসাদের ভিতর শত্রু সেনা বা অবাঞ্ছিত লোকদের প্রবেশ রোধ করতে পারে। তার সামনে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রিচমন্ড। সেই তোরণের পাশে প্রাকারের ফাঁক গলে সে ভিতরে প্রবেশ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘড়ঘড় শব্দে মাথার ওপরে উঠে গেল খাঁচাটা। উন্মুক্ত হয়ে গেল প্রবেশপথ। সম্ভবত কপিকল ঘুরিয়ে ভিতর থেকে সেটা টেনে তুলল রিচমন্ড। তারপর আবার বাইরে বেরিয়ে কোচয়ানের আসনে উঠে বসে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করল ভিতরে। পাথরের শান বাঁধানো প্রাচীন দুর্গ চত্বরে এসে থামল ঘোড়ার গাড়িটা। তার ভিতর থেকে মাটিতে নামল তারা তিনজন। দীপাঞ্জনদের সামনেই দুর্গর মূল স্থাপত্যে প্রবেশ করার জন্য লোহার পাত বসানো ভারী কাঠের এক বিশাল দরজা। সেই দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করার আগে রিচমন্ড বলল, 'আপনাদের একটা কথা জানিয়ে রাখি। বয়সের ভারে আর প্রাচীন বইপত্র পড়ার কারণে অনেক সময় অসংলগ্ন কথা বলেন আর্ল সেভার্ন। এমন কথা বলেন তিনি যাতে মনে হয় তিনি মধ্যযুগেই রয়ে গেছেন। তিনি মনে মনে এমনটাই ভাবেন। তাঁর অসংলগ্ন কথাবার্তার প্রতিবাদ করতে যাবেন না। তাঁকে তাঁর ভাবনা নিয়েই থাকতে দিন। এতে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মনে আঘাত দিয়ে লাভ নেই। আমি প্রথমে আপনাদের তাঁর কাছেই নিয়ে যাব।'

সেই কাঠের দরজা ঠেলে দীপাঞ্জনরা ভিতরে প্রবেশ করতেই একটা প্রাচীন গন্ধ এসে লাগল দীপাঞ্জনদের নাকে। সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে এখানে। একের পর এক কক্ষ অলিন্দ সিঁড়ি পাড় হয়ে দীপাঞ্জনরা এগিয়ে চলল রিচমন্ডের পিছন পিছন। আলো ছায়া খেলা করছে দুর্গর ভিতর। কোথাও ঘরের কোনো জমাট বাঁধা অন্ধকার, কোথাও আবার প্রাচীন গবাক্ষ দিয়ে আলো চুঁইয়ে ঢুকছে ভিতরে। আর তারই মধ্যে কোথাও দেয়ালের গায়ে ঝুলছে বিরাট শাখা-প্রশাখার মতো শিংওলা হরিণের মাথা, সাবেক কালের অস্ত্রশস্ত্র। কোথাও আবার সিঁড়ির কোণে দাঁড় করানো আছে প্রাচীন যোদ্ধাদের বর্ম। হঠাৎ সেগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় আপাদমস্তক শিরস্ত্রাণ আর বর্ম পরে বর্শা হাতে কোনো প্রহরী যেন দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের কোণে। এ সব দেখতে দেখতে দীপাঞ্জনরা এক সময় দুর্গর দ্বিতলে উঠে এল। সাধারণ বাড়িঘরের উচ্চতার নিরিখে অবশ্য একে চারতলাও বলা যেতে পারে। একটা লম্বা অলিন্দ পেরিয়ে দীপাঞ্জনদের নিয়ে রিচমন্ড প্রবেশ করল বেশ বড়ো একটা ঘরে। ঘরের ভিতর একটা মোমদানিতে মোম জ্বলছে। তার আভা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। ঘরের ঠিক মাঝখানে অনেকটা সিংহাসনের মতো চেয়ারে বসে আছেন এক অতিবৃদ্ধ ভদ্রলোক। তার মাথার চুল আর বুক পর্যন্ত নেমে আসা দাঁড়ি ধবধবে

সাদা শনের মতো। এমনকি তাঁর ভ্রূ পর্যন্ত সাদা। দেহের চামড়াও সাদা মোমের মতো। তাঁর পরনে লাল রঙের পোশাক। তাতে জরির কোমরবন্ধ। যদিও বয়সের ভারে সেই জরি এবং লম্বা ঝুলের গাউনের মতো পোশাকটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। চেয়ারের হাতলে রাখা এক হাতের আঙুলে অনেক কটা রঙিন আংটি আছে। ধবধবে ফরসা আংটি পরা সেই শীর্ণ আঙুলগুলোর শেষ প্রান্তে অনেক দিনের না কাটা লম্বা নখ। তবে তা তার গাত্রবর্ণের মতোই সাদা। আর্লের অন্য হাতে ধরা আছে একটা ভেড়ার সিং এর শিঙা। শ্যাননকে ইশারায় টুপি খুলতে বলে, নিজের মাথার টুপি খুলে আর্ল সেভার্নের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রিচমন্ড। তারপর সে আর্লের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গিতে বলল, 'মহামান্য আর্ল হুজুর, অতিথিদের নিয়ে ফিরে এসেছি আমি। আর্ল মনে হয় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। রিচমন্ডের কণ্ঠস্বর শুনে ঘন নীল চোখ মেলে তার দিকে তাকালেন তিনি। তারপর বললেন, 'ও তুমি ফিরে এসেছ? তা মহামান্য রাজা চার্লস আসার জন্য কিছু সংবাদ পাঠিয়েছেন কি? কাল তো তুমি দাঁড়কাকটা নিয়ে গেছিলে তাকে উপহার দেবার জন্য।'

দীপাঞ্জনরা অনুমান করল যে বৃদ্ধ আর্ল সম্ভবত সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় চার্লসের কথাই বলছেন। তাঁর কথার জবাবে রিচমন্ড বলল, 'হ্যাঁ, তিনি আপনার উপহার গ্রহণ করেছেন, এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপনাকে।'

রিচমন্ডের কথা শুনে অশীতিপর আর্লের ঠোঁটের কোণে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'তুমি দেখো এই গ্রীষ্মে রাজা নিশ্চয়ই হরিণ শিকার করার জন্য শেরউড বনে আসবেন এবং আমার আতিথ্য গ্রহণ করবেন।'

রিচমন্ড তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, 'আমি আপনার পক্ষে থেকে তাঁকে সেই আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছি। আশা করি তিনি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করবেন।'

রিচমন্ডের কথা শুনে আবারও বাচ্চা ছেলেদের মতো হাসলেন অতিবৃদ্ধ আর্ল। তারপর রিচমণ্ডকে বললেন, 'রাজার বনে হরিণ শিকার কিছু নিষিদ্ধ। দুর্গের সৈনিকদের বোলো তারা যেন নিয়মিত জঙ্গলে যায় যাতে কেউ হরিণ শিকার না করে।'

রিচমন্ড বলল, 'আপনার রক্ষীরা নিয়মিতভাবে বন পাহারা দেয় হুজুর। আপনার কোনো চিন্তা নেই।'—এ কথা বলার পর রিচমন্ড তার কিছুটা তফাতে দাঁড়ানো দীপাঞ্জনদের দেখিয়ে আর্লকে বলল, 'অতিথিরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে হুজুর। এদের কেউ এসেছে সুদূর ভারতবর্ষ বা জাপান থেকে, কেউ আয়ারল্যান্ড থেকে। আপনার প্রাসাদের ঐতিহ্যের কথা শুনে এরা এসেছে। আপনি অনুমতি দিলে এরা এ প্রাসাদে রাত্রিবাস করবে।'

বৃদ্ধ এবার চোখ তুলে তাকালেন দীপাঞ্জনদের দিকে। তারা তিনজনেই মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল তাঁকে। দীপাঞ্জনদের নামগুলো এরপর রিচমন্ড একে একে জানিয়ে দিল। বৃদ্ধ আর্লের সঙ্গে সে পরিচয় করিয়ে দিল তাদের। বৃদ্ধ আর্ল ভাসা ভাসা চোখে কিছুক্ষণ দীপাঞ্জনদের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, 'ভারতবর্ষ, সে তো অনেক দূর। আয়ার্ল্যান্ডটা অবশ্য আমাদের দেশেই। তবে 'ডিউক শ্যানন' নামটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। রাজার হয়ে আমরা, আর্ল, ব্যারন, ডিউকরাই তো দেশটা শাসন করি। ওদের

আমার অতিথিশালায় নিয়ে যাও। রক্ষীদের বলো বন থেকে হরিণ মেরে আনতে। নরফাক্সের ব্যারন আমার জন্য যে পানীয়ের পিপেটা পাঠিয়েছেন, সেখান থেকে পানীয় নিয়ে আর হরিণের মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করো অতিথিদের। যেন আর্ল প্রাসাদের বদনাম না হয়। আর একটা কথা, আমি এই শিঙা বাজালেই যেন রক্ষীরা প্রস্তুত হয় অতিথিদের অভিবাদন জানানোর জন্য। রিচমন্ড বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন প্রভু। আমি সব ব্যবস্থা করছি। এখন আমি এদের অতিথিশালায় নিয়ে যাচ্ছি। পরে এরা আবার আসবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আর আপনার শিঙা ফোঁকা ও অভিবাদনের কথা রক্ষীদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। যাই তবে?

বৃদ্ধ ডিউক বলল, 'হ্যাঁ যাও। আর রিচার্ডকে এ ঘরে দিয়ে যাও। তাকে খাবার দিতে হবে।'

'এদের অতিথিশালায় পৌঁছে রিচার্ডকে আপনার কাছে দিয়ে যাচ্ছি।'—এই বলে আর্লকে আর একবার অভিবাদন জানিয়ে দীপাঞ্জনদের নিয়ে ঘরের বাইরে বেড়িয়ে এল রিচমন্ড। তারপর সে দীপাঞ্জনদের উদ্দেশ্যে বলল, 'দেখলেন তো ওর মাথাটা কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। উনি ভাবছেন উনি রয়েছেন সেই মধ্য যুগে। তেমনই কথাবার্তা বলেন উনি। মাঝে মাঝে কোনো সময় হয়তো তারও ঘোর কাটে।

জুয়ান বললেন, 'চার্লসের ব্যাপারটা তো বুঝলাম। তিনি টাওয়ার অব লন্ডনের রাজা দ্বিতীয় চার্লস। কিন্তু রিচার্ড কে? রাজা রিচার্ড?'

রিচমন্ড এবার হেসে ফেলে বলল, 'না, এ রিচার্ড রাজা রিচার্ড নয়। এ রিচার্ড হলো একটা বড়ো দাঁড়কাক। নীচের কবর ঘরে থাকে। জানেন তো দাড়কাকরা দীর্ঘজীবী হয়। কাকটা আর্ল সেভার্নের বাবার আমলের। আর্লের বয়স আশি বছর। আর রিচার্ডের বয়স তারও বেশি। আর্লের ধারণা, রিচার্ড যত দিন বেঁচে থাকবে তিনিও ততদিন বাঁচবেন।'

দীপাঞ্জন আর জুয়ান দুজনেই বেশ অবাক হলো এ কথা শুনে। দীপাঞ্জন এরপর জানতে চাইল, 'কবর ঘরটা কী? গুম ঘর নাকি?'

অলিন্দ দিয়ে দীপাঞ্জনদের নিয়ে সামনের দিকে এগোতে এগোতে রিচমন্ড বলল, 'প্রাচীন অভিজাত পরিবারের প্রথা ছিল পরিবারের সদস্যদের, বিশেষত পুরুষদের প্রাসাদ বা দুর্গের মধ্যে কোনো একটা ঘরে কবরস্থ করার। শত্রুপক্ষ যাতে মৃত্যুসংবাদ চট করে জানতে না পারে সে জন্যই প্রত্যেক প্রাসাদ বা দুর্গে একটা করে কবর ঘর থাকত। এখানেও মাটির তলায় তেমন একটা ঘর আছে। আপনাদের দেখাব সেটা। এখানকার প্রাচীন অস্ত্রাগারটাও দেখার মতো। নর্ম্যান-স্যাক্সন আমলের বিভিন্ন অস্ত্র, যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্র আছে সেখানে। আর আছে বেশ কিছু প্রাচীন অলংকার ও জহরত। সেগুলোর একটা বেচলেই হয়তো বাকি জীবনটা আর অর্থ কষ্টে কাটাতে হয় না আর্লকে। লন্ডনে তাঁকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসাও করানো যায়। কিন্তু আর্ল তার একটাও বেচবেও না।'

শ্যানন শুনে বললেন, 'তাই নাকি? কিন্তু এখানে তো মিউজিয়ামের মতো কোনো রক্ষী নেই। জিনিসগুলো চুরি করতে পারে কেউ।'

রিচমন্ড দীপাঞ্জনদের এনে থামল একটা জায়গাতে, সেখানে দেয়ালের গায়ে পাশাপাশি

দুটো দরজা। রিচমন্ড বলল, 'এ দুটো আপনাদের থাকার ঘর।' তারপর সে শ্যাননের কথার জবাবে বলল, 'প্রথমত বলি, এতবড়ো দুর্গে কোথায় সে জিনিসগুলো রাখা থাকে তা বাইরের লোকের পক্ষে জানা মুশকিল। দ্বিতীয়ত বলি এ প্রাসাদে চুরির চেষ্টা যে কখনও হয়নি তা নয়। তবে তা সফল হয়নি। এ প্রাসাদের অদৃশ্য রক্ষী আছে। তবে নিরাপত্তার কারণে তাদের সম্বন্ধে বলা যাবে না।' এক অদ্ভুত কথা বলে দীপাঞ্জনদের ঘর দেখিয়ে এরপর পরে আসবে বলে চলে গেল রিচমন্ড।

একটা ঘরে দীপাঞ্জন আর জুয়ান, আর অন্য ঘরে ঠাঁই হলো শ্যাননের। দীপাঞ্জনদের ঘরটা মাঝারি আকারের। একটা ভিক্টোরিয়ান আমলের পালঙ্ক আর দুটো কাঠের চেয়ার, একটা টেবিল আছে সে ঘরে। দেয়ালে ঝুলছে পোকায় কাটা একটা ভাল্লুকের মাথা, আর মরচে পড়া একটা তলোয়ার। ঘর সংলগ্ন একটা বারান্দা আছে। সেখানে দাঁড়ালে চোখে পড়ে শেরউডের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। ঘরে বাতাস আসছে সেদিক থেকে। দুর্গ প্রাকারের মাথা থেকে এক ঝাঁক দাঁড়কাক উড়ে গেল জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের মাথার আকাশে এক পাক খেয়ে তারা আবার ফিরে দুর্গ প্রাসাদে। ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসছে।

দীপাঞ্জন, জুয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 'রিচমন্ডের শেষ কথাগুলো কিন্তু বেশ অদ্ভুত। এ প্রাসাদে অদৃশ্যরক্ষী আছে। ও কি অদৃশ্যরক্ষী বলতে কোনো ভূত প্রেত অপদেবতার কথা বলছে? অনেক সময় এ সব প্রাচীন দুর্গ প্রাসাদ ইত্যাদি নিয়ে নানা অতিপ্রাকৃত কাহিনি শোনা যায়। প্রাচীন প্রেতাত্মারা নাকি তাঁর উত্তরপুরুষদের আর পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষা করে। নাকি আমাদের দেশের মতো যখের কাছে এরা সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে?'

জুয়ান বলল, 'কথাটা আমারও অদ্ভুত লাগল। কিন্তু দামি জিনিস রক্ষা করার জন্য প্রেতপ্রহরীদের ওপর কী কেউ নির্ভর করে?'

জুয়ান এরপর বললেন, 'এই দুর্গে প্রাসাদটা কিন্তু বেশ লাগছে আমার। পুরোটা ভালো করে ঘুরে দেখতে হবে।'

দীপাঞ্জন জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কদিন থাকব আমরা?'

জুয়ান জবাব দিলেন, 'কাল রাতটাও থাকব। পরশু ভোরে রওনা দেব।'

আধঘণ্টা পর ঘরে ঢুকল রিচমন্ড। এক হাতে একটা মোমদানিতে বড়ো মোমবাতি, অন্য হাতে ট্রেতে সাজানো ধূমায়িত চায়ের কাপ। সেগুলো সে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, 'চা-পান করে বাইরে আসুন। আজ আপনাদের আর্মারি আর পানিসমেন্ট রুমটা দেখাই। সারা দুর্গ এখন ঘুরিয়ে দেখানো যাবে না। এখানে আলোর ব্যবস্থা নেই। দুর্গের অন্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো আমি কাল আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাব।'

চা-পান করে কিছুক্ষণের মধ্যেই অলিন্দে এসে দাঁড়াল তারা দুজন। লর্ড শ্যাননও ঘর থেকে বেরিয়ে রিচমন্ডের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। রিচমন্ড সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলল অস্ত্রাগারের দিকে। নানা বাঁক, ছোটোছোটো পাথরের সিঁড়ি, নানা খুপরি খুপরি দরজার অসংখ্য গোলকধাঁধা পেরিয়ে তারা হাজির হলো বিশাল এক দরজার সামনে। লোহার চওড়া পাটি বসানো কাঠের দরজাতে বিরাট বড়ো একটা তালা ঝুলছে। রিচমন্ড পকেট থেকে একটা লম্বা চাবি বার করে তালাটা খুলে ফেলে দীপাঞ্জনদের নিয়ে প্রবেশ করল

অন্ধকার ঘরটাতে। তারপর একটা জানালা খুলতেই পশ্চিমের শেষ আলো এসে আলোকিত করে তুলল ঘরটা। বেশ বড়ো ঘর। তার চারপাশের দেয়ালের গায়ে টাঙানো আছে নানা ধরনের অস্ত্র। দেয়ালের কোণগুলোতে দাঁড় করানো আছে শিরস্ত্রাণসমেত বর্মগুলো। রিক যেন মানুষের মূর্তি। সিলিং থেকে ঝুলছে প্রায় পনেরো ফুট লম্বা কয়েকটা ধাতব শূল। সেগুলো দেখিয়ে রিচমন্ড বলল, 'দেয়ালের কোণে রাখা বর্ম আর শুলগুলো দিয়ে মধ্যযুগে নাইটরা লড়াই করতেন। ঘোড়ায় চেপে এই দানবীয় শূল নিয়ে দু-প্রান্ত থেকে নাইটরা ছুটে আসতেন পরস্পরকে বিদ্ধ করার জন্য। অসীম শক্তিধর ছিলেন তারা শূল আর বর্মর ওজনই ছিল চারশো পাউন্ড। এ দুর্গেও একবার নাইটদের লড়াই হয়েছিল। নাইট এডোয়ার্ড আর নাইট ব্রাইটন্থডের মধ্যে নীচের চত্বরে। নাইট এডোয়ার্ড নিহত হন তাতে।'

জুয়ান বললেন, 'নাইটদের যুগ মানে তো অনেককাল আগের ঘটনা?'

রিচমন্ড বললেন, 'হ্যাঁ, অনেককাল আগের ঘটনা। আসলে এ দুর্গ প্রথমে বানিয়ে ছিল নর্ম্যানরা। তখন অবশ্য এটা কলেবরে অনেক ছোটো ছিল। কিন্তু স্যাক্সনদের আক্রমণে নর্ম্যান সেনারা দুর্গ ছেড়ে পালাবার পর এটা স্যাক্সনদের অধিকারে আসে। কিন্তু স্যাক্সনরাও এক সময় দুর্গ ছেড়ে চলে যায়। পরিত্যক্ত দুর্গ হয়ে ওঠে কাকের বাসা। বর্তমান আর্লের প্রথম পূর্বপুরুষ যিনি এখানে প্রথম এসে থাকতে শুরু করেন তিনি ছিলেন শিকারি। দাবিহীন এই দুর্গে তারপর তাঁর বংশধররাও থাকতে শুরু করেন। শিকারজাত পশুপাখির মাংস-চামড়া ইত্যাদি রাখা হত এখানে। হয়তো সে জন্যই কাকেদের সমাগম এ দুর্গে বেশি হয়ে ওঠে। স্যাক্সন-নর্ম্যানদের লড়াই তখন স্তিমিত হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডে তখন নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজা দ্বিতীয় চার্লস একবার শেরউড বনে শিকার করতে এসে এ দুর্গের সন্ধান পান। কিন্তু কাক ভরতি ভাঙাচোরা ছোটো দুর্গ দেখে তিনি বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেননি। কিন্তু এ দুর্গের কথা তার মনে আসে টাওয়ার অব লন্ডনের ঘটনার সময়। যখন তিনি কাকের সন্ধান করছেন। আর্ল সেভার্নের পূর্বপুরুষ স্টুয়ার্ট তখন এখানে বাস করছেন। রাজার পাঠানো লোকদের তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে দুর্গ বুরুজের খাঁজের থেকে ছ'টা দাঁড়কাক ধরে দেন। রক্ষা পায় টাওয়ার অফ লন্ডন। দ্বিতীয় চার্লস খুশি হয়ে স্টুয়ার্টকে ডেকে পাঠান লন্ডনে। তিনি তাকে 'আর্ল' অর্থাৎ জমিদার উপাধিতে ভূষিত করেন ও দুর্গ সংলগ্ন কয়েক মাইল এলাকার ভূমিস্বত্ব প্রদান করেন ও অর্থ সাহায্য করেন দুর্গ পুর্ননির্মাণের। প্রথম আর্ল স্টুয়ার্টের হাত ধরে নতুন ভাবে গড়ে ওঠে এই দুর্গপ্রাসাদ। রাজার শর্ত ছিল একটাই। টাওয়ার অফ লন্ডনকে রক্ষা করার জন্য যখনই দাঁড়কাকের প্রয়োজন হবে তখনই সরবরাহ করতে হবে এখান থেকে। তাই কোনো অবস্থাতেই কাকেদের এখান থেকে তাড়ানো চলবে না। সেই থেকে কাকেদের পাকাপাকি বাসস্থান এ জায়গা। এক সময় রাজকোষ থেকে এখানে অর্থ আসত দাঁড় কাকেদের পরিচর্যার জন্য। একটু খেয়াল করে দেখবেন এই দাঁড়কাকগুলোর প্রজাতি সাধারণ দাঁড়কাকের থেকে বড়ো।'

আর্মারি বা অস্ত্রাগারের অন্য জিনিসগুলো এরপর দেখতে লাগল তারা। কত ধরনের তীরধনুক, তলোয়ার, বর্শা, ভল্ল, ঢাল, লোহার ঝালরের মতো বর্ম। একটা যুদ্ধ কুঠার

তোলার চেষ্টা করল দীপাঞ্জন। কিন্তু দুহাতে ধরেও জিনিসটা ফুট খানিকের বেশি ওপরে তুলতে পারল না। অথচ রিচমন্ড বলল যে যোদ্ধারা নাকি ঘোড়ার পিঠে চেপে এ কুঠার এক হাতে নিয়ে যুদ্ধ করত! কত অসীম শক্তিধর ছিল তারা!

আর্মারি দেখার পর আবার অলিন্দ সিঁড়ির গোলকধাঁধা পেরোতে শুরু করল তারা। এগোতে এগোতে শ্যানন বললেন যে ইচ্ছা করেই নাকি দুর্গ প্রাসাদের নকশা সে সময় জটিলভাবে বানানো হতো। যাতে শত্রুপক্ষ ভিতরে ঢুকলে ঠিক মতো পথ চিনতে না পারে। কিছুক্ষণের মতোই তারা এসে দাঁড়াল একটা সুড়ঙ্গ মতো জায়গাতে। সামনে একটা দরজা। তার তালা খোলার পর সে ঘরে ঢুকল দীপাঞ্জনরা। পকেট থেকে একটা মোমবাতি বার করে জ্বালাল রিচমন্ড। সে ঘরে একটাই মাত্র জানলা সেটা আবার লোহার পাত দিয়ে আটকানো। রিচমন্ড বলল, 'এটা দুর্গের পিছন দিকের একটা ঘর। বাইরে থেকে অস্তিত্ব বোঝা যায় না। এ ঘরের কোনো শব্দ বাইরে যায় না। তবে বাইরের শব্দ এ ঘরে বসে শোনা যায়। অবাধ্য প্রজাদের এ ঘরে এনে শাস্তি দেওয়া হতো। কেউ যন্ত্রণায় মারা গেলে তাকে জানলা দিয়ে নীচে ফেলে দেওয়া হতো। ঘন অরণ্য ছিল ওখানে। জানোয়ারের দল এসে খেয়ে যেত তার দেহ।'

আলো আঁধারি ঘরটার দেয়ালে অসংখ্য গজাল পোঁতা। তার থেকে শিকল ঝুলছে এখনও। ওখানেই বাঁধা হতো ধরে আনা লোকদের। বেশ কিছু অদ্ভুত জিনিস রাখা আছে ঘরের মধ্যে। ঘরের ঠিক মাঝখানেই রাখা অনেকটা ঢেঁকির মতো দেখতে ঢালু একটা পাটাতন। ওর ওপর শুইয়ে পিঠে চাবুর মারা হতো হতভাগ্য লোকদের। এক একটা করে যন্ত্রণা ঘরের জিনিসগুলো দেখাতে দেখাতে তার কর্ম পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে লাগল রিচমন্ড। লোহার তৈরি জুতো, পায়ে পরিয়ে তার নাটের প্যাঁচ ঘুরিয়ে ভেঙে দেওয়া হতো পায়ের পাতা। রয়েছে কাঠের ভারী মুগুর। যা দিয়ে মেরে মাথা বা হাত-পা ভেঙে দেওয়া হতো। একটা বড়ো লোহার সাঁড়াশি দেখিয়ে রিচমন্ড বলল, তা দিয়ে নাকি বন্দিদের জিভ টেনে ছেঁড়া। তার কথা শুনে শিউরে উঠতে লাগল দীপাঞ্জনরা। মধ্যযুগীয় বর্বরতার চূড়ান্ত নিদর্শন এই ঘরটা!

সেই ঘর ছেড়ে একসময় বেরিয়ে এল তারা। নিজেদের ঘরে ফেরার জন্য তারা অলিন্দ ধরে হাঁটছে হঠাৎ এক অদ্ভুত শব্দে চমকে উঠল তারা। সেই শব্দে সারা অলিন্দ দুর্গ প্রাসাদ যেন কেঁপে উঠতে লাগল। দাঁড়কাকের ডাক।

রিচমন্ড বলল, 'সারাদিন কাকগুলো চুপচাপ থাকে। কিন্তু সূর্যোদয়ের সময় আর সূর্য ডোবার সময় তারা একযোগে ডেকে ওঠে। সে ডাক দুর্গবুরুজে, প্রাকারে, প্রতিধ্বনিত হয়ে এমন অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি করে।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেই অদ্ভুত শব্দ অনুরণিত হতে থাকল দুর্গ-প্রাসাদের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে। তারপর ধীরে ধীরে সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল একসময়। শেরউড বনের মাথায় অন্ধকার নেমে এল।

মোম জ্বালিয়ে ঘরে বসে গল্প করছিল দীপাঞ্জন আর জুয়ান। দীপাঞ্জনদের ঘরে পৌঁছে দেবার এক ঘণ্টা পর আবার রিচমন্ড ফিরে এসে বলল, 'আপনাদের বিরক্ত করার জন্য মার্জনা চাচ্ছি। আর্ল সের্ভন আপনাদের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছেন। আসলে মাথাটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে তো। এক এক সময় এক এক খেয়াল চাপে ওর মাথায়। আপনাদের সঙ্গে উনি কী কথা বলবেন কে জানে? কিন্তু আবার না গেলে আমার ওপর রাগারাগি শুরু করবেন।'

জুয়ান বললেন, 'আমরা কোনো বিরক্তি বোধ করছি না। আমরা তো ঘরেই বসে আছি, তার চেয়ে আর্লের সঙ্গে কথা বলে আসাই ভালো।'

ঘর ছেড়ে বেরোল দীপাঞ্জনরা। শ্যাননকেও ডাকা হলো। তিনি বেশ উৎসাহিত হলেন আর্ল ডেকেছেন বলে।

রিচমন্ড একটা মোমবাতি জ্বেলে রেখেছিল দীপাঞ্জনদের দরজার বাইরে একটা কুলুঙ্গিতে। সেটা হাতে করে দীপাঞ্জনদের সঙ্গে নিয়ে সে এগোল অলিন্দ ধরে। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই এই নির্জন প্রাসাদটা যেন আরও নিঝুম হয়ে গেছে। অলিন্দের প্রতিটা কোণে জমাট বেঁধে আছে চাপচাপ অন্ধকার। অলিন্দ থেকে নীচের পাথর বাঁধানো প্রাচীন চত্বরটা দেখা যাচ্ছে। চাঁদ উঠতে শুরু করেছে আকাশে। তার আলো এসে পড়েছে জাফরিঘেরা অলিন্দে, নীচের সুপ্রাচীন চত্বরে। কেমন যেন আধিভৌতিক পরিবেশ বিরাজ করছে অলিন্দ, নীচের চত্বর সহ চারদিকে: গা ছমছমে পরিবেশ চারদিকে। এই পরিবেশ দেখে রিচমন্ডকে দীপাঞ্জন জিজ্ঞেস করল, 'এইসব প্রাচীন দুর্গ বা প্রাসাদে নানা অতৃপ্ত আত্মার দেখা মেলে বলে শুনেছি। যেমন 'টাওয়ার অফ লন্ডনে' নাকি রানি অ্যানি ব্যেলিয়নের প্রেতাত্মাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে কেউ কেউ! এখানে তেমন কিছু নেই?' টাওয়ার অফ লন্ডনে প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়াবার কথা অবশ্য দীপাঞ্জনের জুয়ানের মুখ থেকে শোনা। সেটাই বলল সে। চলতে চলতে দীপাঞ্জনের প্রশ্ন শুনে হঠাৎই যেন একটু থমকে দাঁড়িয়ে দীপাঞ্জনের মুখের দিকে তাকাল রিচমন্ড। তারপর আবার এগোতে এগোতে বলল, 'হ্যাঁ, তেমন একজন আছে এখানে। আমি একবার তাঁকে দেখেছি। আর্ল সেভার্ন আর এ দুর্গ প্রাসাদে যারা আগে কাজ করতেন, তারা অনেকেই তাঁকে দেখেছেন। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের পর সিংহাসনে বসেন রাজা দ্বিতীয় জেমস। তারপর স্টুয়ার্ট রাজবংশের বদলে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন অরেঞ্জ রাজবংশের রাজা তৃতীয় উইলিয়াম। তখন এখানকার দুর্গধীপ আর্ল রোলান্ড। তাঁর এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন তাঁর নাম জর্জ। রাজা উইলিয়ামের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। আর্ল রোনান্ডের ধারণা হয় তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই জর্জ তাঁর

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন এবং রাজা উইলিয়ামকে প্রভাবিত করে আর্ল জমিদারির দখল নেবেন। সে সময় কিছু দাঁড়কাক মারা যায় প্রাসাদে। যে কারণে রোনাল্ডের ওপর রুষ্ট হন রাজা। দাঁড়কাক মৃত্যুর খবরটা নাকি রাজার কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন জর্জই। যাই হোক প্রমাদ গুনলেন দুর্গধীপ রোনাল্ড। তিনি ঠিক করলেন জর্জকে সরিয়ে দিতে হবে পৃথিবী থেকে। জর্জকে কিছু বুঝতে দিলেন না তিনি। একদিন তিনি তাঁকে নিয়ে যাত্রা করলেন শেরউড বনে হরিণ শিকার করতে। সঙ্গে আর্লের একান্ত বিশ্বস্ত কিছু অনুচর। কিন্তু তিনদিন পর তিনি জর্জকে ছাড়াই ফিরলেন দুর্গ প্রাসাদে। সবাইকে তিনি বললেন হরিণের পিছু ধাওয়া করতে করতে নাকি জর্জ হারিয়ে গেছেন শেরউড বনের গভীরে। সে সময়ে শেরউড বন কয়েকশো মাইল বিস্তৃত ছিল। আসলে ঘটনা হলো, তিনি বনের মধ্যে হত্যা করেছিলেন তাঁর ভাইকে। জর্জের মৃতদেহ যাতে কেউ শনাক্ত না করতে পারে এরপর তিনি সে জন্য জর্জের মুণ্ডু কেটে এনে লুকিয়ে ফেলেন এ দুর্গের কোনো এক জায়গাতে। কেউ তার সন্ধান পায়নি। জর্জের প্রেতাত্মা সেই কাটা মুণ্ডুর খোঁজে ঘুরে বেড়ায় এ প্রাসাদে। আমি তাকে একবার দেখেছি অস্পষ্টভাবে। জ্যোৎস্না আলোতে কবর ঘরের নীচ থেকে বেরিয়ে আসছিল সে। তাঁর পরনে কালো গাউন। রক্তাক্ত কবন্ধ। আর্ল সেভার্ন সহ অনেকেই বিভিন্ন সময় দেখেছে তাঁকে।

দীপাঞ্জনরা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে না। এমনি দীপাঞ্জন কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল। কথা বলতে বলতেই তারা প্রবেশ করল আর্ল সেভার্নের কক্ষে বর্তমানে রয়েছেন সে ঘরে। এ ঘরটা সে ঘর নয়, যে ঘরে দীপাঞ্জনদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল বৃদ্ধ আর্লের। ঘরে একটা মশলা জ্বলছে। দেয়ালের চারপাশে কাঠের র‍্যাকে সাজানো আছে চামড়ায় মোড়া মোটা মোটা বই। দেখেই বোঝা যায় এটা লাইব্রেরি। টেবিলের ওপর আর্লের সেই শিঙাটা, কিছু বই আর সংবাদপত্র রাখা আছে। সংবাদপত্রগুলো টাটকা। এক হাত দিয়ে একটা আতসকাঁচ ধরে কী একটা মোটা বই দেখছিলেন আর্ল সেভার্ন। বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন তিনি। দীপাঞ্জনদের সঙ্গে নিয়ে টেবিলের সামনে উপস্থিত হয়ে আর্লকে রিচমণ্ড বলল, 'অতিথিরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন হুজুর।'

'কেন দেখা করতে এসেছে?' মৃদু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন আর্ল।

রিচমন্ড বলল, 'আপনিই তো ওনাদের সাক্ষাৎ করার জন্য ডাক পাঠিয়েছেন।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আর্ল জুয়ানের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কী রাজার বনে হরিণ শিকার করতে এসেছ?'

জুয়ান জবাব দিলেন, 'না, মহামান্য আর্ল। আমরা আপনার দুর্গ দেখতে এসেছি।'

'দুর্গ দেখতে এসেছ? নাকি জর্জের কাটা মুণ্ডু খুঁজতে?'

জুয়ান বললেন, 'তা নয়। দুর্গ দেখতেই এসেছি।'

আর্লের এবারও কথাটা বিশ্বাস হলো না। তিনি প্রথমে বললেন, 'এ বার বুঝেছি তোমরা কারা। রবিন তোমাদের পাঠিয়েছে।' তারপর চারপাশে তাকিয়ে তার কথা যেন কেউ শুনতে না পায় এমন ভাবে গলাটা খাদে নামিয়ে বললেন, 'রবিনকে বোলো, তার জিনিসটা যত্ন করে রেখেছি আমি।'

শ্যানন এবার প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ জিনিসটা?'

আর্ল বললেন, 'যে জিনিসটা সে রেখে গেছিল এখানে। পরে নিয়ে যাবে বলেছিল...

রিচমন্ড চাপা স্বরে বলল, 'ওনার মাথাটা এখন একদম গেছে। কালতো পূর্ণিমা, আসলে অমাবস্যা-পূর্ণিমা এলে ওর মাথার গণ্ডগোলটা একটু বাড়ে।'

শ্যানন কথাটা শুনে মৃদু হেসে আর্লকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, 'ঠিক আছে রবিনকে আমরা খবরটা দিয়ে দেব।' আর্ল সেভার্নও যেন আশ্বস্ত হলেন তাঁর কথা শুনে। তিনি শ্যাননকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কী স্যাক্সন? তোমার নাম যেন কী?'

'লর্ড শ্যানন।' জবাব দিলেন শ্যানন।

'লর্ড শ্যানন, লর্ড শ্যানন...নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেন শুনেছি মনে হয়!' বিড়বিড় করে কথাগুলো বললেন আর্ল। এ কথাটা তিনি প্রথম সাক্ষাতেও বলেছিলেন। হয়তো শ্যাননের নামের আগে 'লর্ড' শব্দটা আছে বলেই তাঁর নামটা চেনা লাগছে এমনও হতে পারে।'

সেভার্ন এরপর আর্লের উদ্দেশ্যে বললেন, 'অতিথিরা এখন তাহলে ফিরে যাক হুজুর। আপনারও ডিনারের সময় হয়ে গেছে।'

আর্ল বললেন, 'হ্যাঁ যাক তবে। ডিনারে আমি শূকরের রোস্ট, আর হরিণের মাংসের পুর দেওয়া রুটি খাব।'

রিচমন্ড বলল, 'আচ্ছা হুজুর। তাই খাবেন।' কথাগুলো বলে দীপাঞ্জনদের নিয়ে ঘরের বাইরে যাবার সময় শ্যানন বললেন, 'ওঁর টেবিলে একটা টাটকা সংবাদপত্র দেখলাম সেটা পাওয়া যাবে কি? আসলে এখন ঘরে ফিরে তো কোনো কাজ নেই, সংবাদপত্রর পাতা উলটে একটু সময় কাটানো যেত।'

দীপাঞ্জনরা সে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল আর রিচমন্ড আর্লের টেবিল থেকে সংবাদপত্রটা এনে দিল শ্যাননের হাতে। দীপাঞ্জন দেখল সেটা লন্ড টাইমস্-এর একটা ট্যাবলয়েড সংস্করণ। কাগজটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'এখানে খবরের কাগজ দেখে খুব অবাক হলাম। কাছে পিঠে তো আর কোনো ঘরবাড়ি নেই। কাগজঅলাদের খরচ পোষায়?'

রিচমন্ড বলল, 'হকার আসে না, ডাকে আসে। সকালবেলা একটা ডাকগাড়ি যায় এখান দিয়ে। সেই ফেলে দিয়ে যায়। আপনার কাগজটা গতকালের সংস্করণ। ডাকে আসে বলে একদিন পরে আসে কাগজটা। আর্লের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগসূত্র বলতে এই কাগজটাই বাকি সময় তিনি আর্ল-ব্যারন-ডিউকদের কাহিনি পড়েন। পারিবারিক ইতিহাস পড়েন।'

জুয়ান জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ওঁনার পূর্বপুরুষরা নর্ম্যান না স্যাক্সন ছিলেন?'

রিচমন্ড বললেন, 'এটা কিন্তু একটা মজার ব্যাপার। আর্লের প্রথম যে শিকারি পূর্বপুরুষ এখানে এসে থাকতে শুরু করেন, তিনি ছিলেন একজন দলছুট নর্ম্যান। সে অর্থে আর্ল হলেন নর্ম্যান। যে যুগে এখানে দুর্গ গড়ে উঠেছিল সে যুগে নর্ম্যান-স্যাক্সনদের মধ্যে সাপে-নেউলে সম্পর্ক হলেও আর্ল সেভার্নের আদি পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কোনো অজানা

কারণে স্যাক্সনদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তারা কোনোদিন হামলা চালায়নি এ দুর্গে। কথা বলতে বলতে আলো-আঁধারি অলিন্দ দিয়ে এগোচ্ছিল দীপাঞ্জনরা। হঠাৎই একটা বাঁকের অন্ধকার থেকে বিশাল একটা ছায়া যেন উড়ে এল দীপাঞ্জনদের দিকে। রিচমন্ডের হাতে ধরা মোমবাতিটা দপদপ করে কেঁপে উঠল। বাতাসের একটা ঝাপটা লাগল দীপাঞ্জনদের গায়ে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েল দীপাঞ্জনরা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছায়াটা দীপাঞ্জনদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে হারিয়ে গেল পিছনের অন্ধকারে।

দীপাঞ্জনের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে দেখে রিচমন্ড হেসে বলল, 'ও হলো সেই রিচার্ড। এ দুর্গের সবচেয়ে প্রাচীন বাসিন্দা। নীচের কবর ঘরে থাকে। রোজ রাতে একবার উড়ে এসে আর্লের ঘরে ঢোকে। আর্লের হাত থেকে খাবার খায়। আর্ল গল্প করেন ওর সঙ্গে। এমনি দাঁড়কাকের থেকেও ও আকারে বড়ো। আলো ছায়ার খেলায় ওকে আরও বড়ো দেখাল এখন। আর্ল সেভার্নের মতো ওকেও কিন্তু 'হুজুর' বলে সম্বোধন করতে হয় আমাকে।'

দীপাঞ্জনদের ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল রিচমন্ড। তারপর সে আবার ঘন্টাখানেক পর ফিরে এসে খাবার দিয়ে গেল। হরিণের মাংসের রোস্ট আর নরফক্সের ব্যারানের পাঠানো পানীয় নয়। সাধারণ মাংসের স্যুপ আর পাউরুটি। মহামান্য আর্লের জন্যও নাকি এই খাবারই বরাদ্দ। তবে আর্লকে খাবার দেবার সময় নাকি বলতে হবে যে রুটিটা নাকি বাকিংহাম প্যালেসের উপহার। আর সুরুয়া বানাবার জন্য তাঁর সেরা ভেড়াটা নজরানা দিয়েছে আর্লের এক অনুগত প্রজা।—এ কথা যাবার আগে নিজেই জানিয়ে গেল রিচমন্ড। খাওয়া সেরে বেশ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল দীপাঞ্জনরা।

বেশ রাতে হঠাৎই কেন জানি ঘুম ভেঙে গেল দীপাঞ্জনের। বাতি নেভালেও দরজা খুলে শুয়েছিল তারা। চোর ডাকাতের ভয় নেই বলে। তাদের মাথার পিছনে খোলা দরজা দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। হঠাৎ তার কানে এল একটা খটখট শব্দ, যেন কাঠের জুতো পায়ে ঘরের সামনের অলিন্দে কেউ হাঁটছে! আর এরপরই সে খেয়াল করল মাঝে মাঝে ঘরটা কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ খোলা দরজার পাল্লার যে ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে ঢুকছে যে জায়গাটা মাঝে মাঝে আড়াল হয়ে যাচ্ছে। কেউ কি পায়চারি করছে ঘরের সামনে? হ্যাঁ, খটখট শব্দটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কখনও সেটা কাছে আসছে, কখনও বা একটু দূরে চলে যাচ্ছে! এই শব্দটাই সম্ভবত ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে দীপাঞ্জনের। সে শব্দটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলো। কিন্তু এত রাতে কে হাঁটে? শ্যানন কি ঘুম আসছে না বলে পাশের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পায়চারি করছেন? নাকি রিচমন্ড? শব্দটা হয়েই চলেছে খট খট। খট খট। মাঝে মাঝে একটু থামছে, তারপর আবার হচ্ছে।

ব্যাপারটা দেখার জন্য নিঃশব্দে খাট ছেড়ে নেমে দীপাঞ্জন ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। বাইরে তাকাতেই সে দেখতে পেল তাকে, এবং চিনেও ফেলল তাকে। অলিন্দের গায়ে রেলিং এর ওপর গম্ভীরভাবে পায়চারি করছে সে। বিশাল একটা কাক। সাধারণ দাঁড়কাকের চেয়ে সে দ্বিগুণ বড়ো, পাতি কাকের চারগুণ হবে। রিচার্ড!

মাঝে মাঝে সে তার বিরাট ঠোঁটটা ঠুকছে রেলিং-এ, আর সে জন্যই খটখট শব্দটা হচ্ছে, প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা ঠোঁট তার। তবে তাকে দেখে হেসে ফেলল দীপাঞ্জন। মনে মনে ভাবল, এ ভাবেই মানুষ ভয় পায়, ভূত দেখে! দীপাঞ্জন অলিন্দে বেরিয়ে রেলিং-এর কাছে যেতেই কাকটা তার বিশাল ডানা মেলে চাঁদের দিকে উড়ে গিয়ে দুর্গের অন্য প্রান্তে এক বুরুজের মাথায় গিয়ে বসল। তারপর ওপর থেকে ঘাড় নীচু করে নীচের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ করতে লাগল। দীপাঞ্জন গিয়ে দাঁড়াল রেলিং এর ধারে। নিঝুম দুর্গ প্রাসাদ। কোথাও কোনো শব্দ নেই। মাথার ওপর থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে দুর্গ প্রকারে। অলিন্দে, বুরুজে, নীচে শান বাঁধানো পাথুরে চত্বরে। চাঁদের আলোতে যেন আরও রহস্যময় মনে হচ্ছে এই দুর্গ প্রাসাদ। হাজার বছর ধরে কত ইতিহাস জমা হয়ে আছে এই দুর্গ প্রাসাদে, কত হাসি-কান্না চাপা পড়ে আছে এই পাথরগুলোর আড়ালে! শুধু হাজার কেন? একশো বছরই বা কম কীসে? তার মধ্যেই তো ঘটে যায় কত ঘটনা? ওই যে চাঁদের আলোতে বুরুজের মাথায় বুড়ো কাকটা বসে আছে একমাত্র সেই হয়তো দেখেছে সব কিছু,—এসব কথা ভাবতে ভাবতে নীচের চত্বরের দিকে তাকাল দীপাঞ্জন। চারপাশ স্তব্ধ আর দেয়াল দিয়ে ঘেরা চত্বরটা চাঁদের আলোতে খাঁ খাঁ করছে। বড় বড় স্তম্ভগুলোর ছায়া এসে পেড়ছে চত্বরে। এক সময় হয়তো নর্ম্যানরা, স্যাক্সনদের ওই চত্বরে বেঁধে আনত তাদের যন্ত্রণা ঘরে নিয়ে যাবার জন্য। ওখানেই হয়তো লড়াই হত নাইটদের, ঘোড়ার খুরের শব্দ আর অস্ত্রর ঝনঝনানিতে কেঁপে উঠত চত্বর, উৎসবের সময় বিউগল আর ড্রাম বাজত, ওই চত্বরের মাঝেই হয়তো শিকার করতে এসে দুর্গে ঢুকে ঘোড়ার পিঠে বলদর্পী ভঙ্গিতে একদিন দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজা দ্বিতীয় চার্লস। কিন্তু সময় সব কিছু কেড়ে নেয়। সেদিনের সেই কোলাহল মুখর চত্বর আজ নিঝুম, ম্লান।

চত্বরটার দু-পাশে দাঁড়িয়ে থাকা থামগুলোর আড়ালে ছোটো-বড়ো অনেক ঘর রয়েছে। ওপরে ওঠার বেশ কিছু সিঁড়িও রয়েছে সেখানে। চত্বরের দিকে রেলিং ধরে তাকিয়ে ছিল দীপাঞ্জন। হঠাৎই তার মনে হলো একটা থামের ছায়া যেন নড়ছে। আর তারপরই সে এক অদ্ভুত, অকল্পনীয় দৃশ্য দেখতে পেল। থামের আড়ালের অন্ধকার থেকে চাঁদের আলোতে বেড়িয়ে এল এক অদ্ভুত মূর্তি। পরনে তার মধ্যযুগীয় লম্বা ঝুলের কালো আলখাল্লার মতো পোশাক, কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে লম্বা তলোয়ার। দেখে মনে হয় সেই পুরুষ যথেষ্ট দীর্ঘকায়। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো দীপাঞ্জন ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছে সেই মূর্তির কোনো মাথা নেই! কবন্ধ মূর্তি সেটা! নিজের চোখকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু সেটা কবন্ধই। চাঁদের আলোতে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মুণ্ডুর পরিবর্তে যে জায়গাতে মাথা থাকে সেখানে ঘাড়ের ওপর দগদগে একটা ক্ষত। যেন এক কোপে তার মুণ্ডুটা কেটে ফেলা হয়েছে এখন। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, আর তার পরই মূর্তিটা লম্বা লম্বা পা ফেলে চত্বর পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্যদিকের আড়ালে। আর এরপরই বুরুজের মাথার ওপর থেকে কাকটা শোঁ করে চত্বরের দিকে নেমে গেল। নীচে নেমে সে বাঁক নিয়ে সে সেই কবন্ধ মূর্তি যেদিকে অদৃশ্য হলো সেদিকেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। দীপাঞ্জনের মাথার ভিতর কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। ওই মুণ্ডুহীন

মূর্তি কী জর্জের প্রেতাত্মা? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে সে ভাবতে লাগল দৃশ্যটার কথা। সময় কাটতে লাগল। আর তার পরই একসময় হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে সেই অদ্ভুত শব্দে যেন কাঁপতে লাগল সেই দুর্গপ্রসাদ। যে শব্দ তারা শুনেছিল সন্ধ্যার আগে। অসংখ্য দাঁড়কাকের চিৎকার আর তার প্রতিধ্বনি। অন্ধকারের মধ্যে যেন আরও বীভৎস মনে হচ্ছে সেই শব্দ। থরথর করে দেয়ালগুলো কাঁপছে। সেই শব্দ শুনে জুয়ান ধড়ফড় করে উঠে বসে বললেন, 'আলো ফুটল নাকি! কাক ডাকছে?"

দীপাঞ্জন আর জুয়ান এসে দাঁড়িয়েছিল ঘরের পিছনে এক চিলতে বারান্দায়। কাকের ডাকের আরও ঘণ্টা দুই পর ধীরে ধীরে আলো ফুটতে শুরু করল শেরউড বনের মাথায়। কাকের ঝাঁক ঘুরপাক খাচ্ছে তার ওপর। দুর্গের প্রধান বুরুজের মাথাটা ক্রমেই আলোকিত হয়ে উঠছে। জুয়ান বললেন, 'তোমার কথা শুনলাম। কিন্তু প্রেতাত্মা বলে তো কিছু হতে পারে না, ওটা মানুষের দুর্বলতা। যেমন অলিন্দের রেলিং-এ রিচার্ডের হাঁটার ব্যাপারটাই ধরো। তোমার বদলে অন্য কেউ হলে সে ভাবতেই পারত যে প্রাচীন দুর্গ অলিন্দে কোনো প্রেতাত্মার পদধ্বনি ওটা। জর্জের গল্পটা তুমি শুনেছ। অনেক সময় পরিবেশের প্রভাবে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে মানুষের। জর্জের গল্প শোনার পর ঘুম চোখে তেমনই কিছু হয়ে থাকতে পারে তোমার। তবে মাঝ রাতে হঠাৎ কাক ডেকে ওঠার ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। সেটা আমিও শুনেছি, দীপাঞ্জন বলল, 'না, ঘুমের ঘোরে নয়, আমি নিশ্চিত দেখেছি সেই কবন্ধ মূর্তিকে। আমার কোনো দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি।'

জুয়ান বললেন, 'তুমি যখন এত জোর দিয়ে বলছ যে তুমি তাকে দেখেছে তবে দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথার আসা যাক। তাহলে হয়তো কেউ কবন্ধ মূর্তি সাজছে।'

'কিন্তু কেন?' জানতে চাইল দীপাঞ্জন।

জুয়ান বললেন, 'এ প্রাসাদে তো কোনো রক্ষী নেই। এমন হতে পারে যে কেউ কবন্ধ মূর্তি সেজে ঘুরে বেড়ায় এ প্রাসাদে, যাতে কেউ এ প্রাসাদে না ঢোকে। প্রাচীন প্রাসাদের সঙ্গে এসব ভৌতিক ঘটনা মিশিয়ে দেওয়া সহজ। আমার ধারণা ওই লোকটা রিচমন্ড নিজেই। সেই কিন্তু আমাদের জর্জের গল্পটা বলল। সে হয়তো এই ভাবেই পাহারা দেয় এই দুর্গ। সেই গল্পটা বলেছে আমাদের। এমনও হতে পারে সে দেখাতে চেয়েছে আমাদেরকে এই অলৌকিক ব্যাপার। যাতে আমরা ব্যাপারটা প্রচার করি বাইরে। আবার এমনও হতে পারে যে সে যেখানে অদৃশ্য হলো সেদিকেই কোথাও লুকানো আছে আর্লদের ধন সম্পদ। বাইরে থেকে দেখে কে কী মতলব নিয়ে চলছে তা তো চট করে বোঝা যায় না। আমাদের সে অবিশ্বাস করতেই পারে। হয়তো ওই জায়গা থেকে আমাদের দূরে রাখার জন্য কবন্ধ সেজেছে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস জাগাবার জন্য সে

নিজেও ওই কবন্ধ মূর্তি দেখেছে বলে আমাদের জানিয়েছে, যাই হোক এ ব্যাপার নিয়ে রিচমন্ডের সঙ্গে কোনো আলোচনার দরকার নেই, এমনকি ডিউক শ্যাননের সঙ্গেও নয়। তিনি নিশ্চয়ই হাসাহাসি করবেন ব্যাপারটা শুনে। আর এমনিতেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ-আইরিশদের এক অদ্ভুত ধারণা আছে। ভারতবর্ষ মানেই সাধু আর যোগীদের দড়ির খেলা। আর ভারতবাসী মানেই তুকতাক, ভূতপ্রেত এসব বিশ্বাসী। অথচ মধ্যযুগের ইউরোপ বা তিনশো বছর আগের ইংল্যান্ড কুসংস্কারের ব্যাপারে ভারতীয় বা এশীয়দের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল।'

দীপাঞ্জন বলল, 'না, কবন্ধ মূর্তির ব্যাপারে আমি কাউকে কিছু বলছি না। তবে সত্যটা জানা দরকার।'

জুয়ান বললেন, 'হ্যাঁ, সেটা জানতে আমিও আগ্রহী। তেমন হলে আজ রাতে দুর্গ প্রাসাদটা দুজনে মিলে ঘুরে দেখতে পারি। দেখা যাক কোনো কবন্ধ মূর্তি বা জর্জের প্রেতাত্মার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় কিনা?'

আলো ভালো করে ফোটার আরও কিছুক্ষণ পর বেলা ছ'টা নাগাদ দীপাঞ্জনরা পিছনের ঝুল বারান্দা ছেড়ে সামনের অলিন্দে এসে দাঁড়াল। গতরাতে ঘুম ভেঙে উঠে দীপাঞ্জন ঠিক যে জায়গাতে এসে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সে জায়গাতে এসে নীচের দিকে তাকাল। নতুন সূর্যর আলোতে চত্বরের অন্ধকার কেটে গেছে। পাথরের চৌখুপ্পিগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চত্বর সংলগ্ন নীচে দুটো জায়গা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দীপাঞ্জন জুয়ানকে বলল, ওই যে ওই স্তম্ভর আড়াল থেকে বেরিয়ে সেই অদ্ভুত মূর্তি শানবাঁধানো জায়গাটা পেরিয়ে এদিকের এই পলেস্তরা খসা স্তম্ভর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছিল!'

জুয়ান বললেন, 'ওই মূর্তি যে স্তম্ভর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিল বলছ, দোতলার সিঁড়ি কিন্তু ওর কাছাকাছি দিয়েই নীচে নেমেছে। রিচমন্ডের কাছ থেকে কায়দা করে জানতে হবে সে দোতলায় থাকে কিনা? আর ওই স্তম্ভর ওদিক দিয়ে বাইরে বেরোবার রাস্তা আছে কিনা? তাহলেই একটা অনুমান করা যাবে সেই স্কন্ধ কাটা এই দুর্গ প্রাসাদেই থাকে নাকি বাইরের লোক?'

জুয়ান এরপর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাদের কানে এল একটা সম্ভাষণ—'গুড মর্নিং।' অলিন্দের উলটো দিক থেকে হেঁটে আসছে ডিউক শ্যানন। দীপাঞ্জনদের কাছে এসে থামলেন তিনি।

দীপাঞ্জনরাও তাঁকে প্রথমে সুপ্রভাত জানাবার পর জুয়ান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই সাত সকালে কোথায় গেছিলেন?'

জুয়ানের কথার জবাবে শ্যানন বললেন, 'সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভেঙেছে আমার। প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাস আমার। দিনের আলোতে দুর্গর কিছু অংশ ঘুরে এলাম। দুর্গটা সত্যিই প্রাচীন। রিচমন্ড মিথ্যা বলেনি। এ ব্যাপারে কিছু পড়াশোনা আর বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার আছে। দুর্গটা নর্ম্যান-স্যাক্সন আমলেই তৈরি হয়। ওই যে ওই বুরুজটা দেখছেন ওটা তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।'—এই বলে তিনি হাতের তর্জনী তুলে সেই বুরুজটার দিকে দেখালেন যেখানে চাঁদের আলোতে উড়ে গিয়ে বসেছিল রিচার্ড।

দীপাঞ্জন ওই ব্যাপারটাও বলেছে জুয়ানকে। বুরুজের ব্যাপারটা শ্যানন বলতেই জুয়ান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল মাঝ রাতে কাকের ডাক শুনেছেন? ওই ডাক শুনেই তো ঘুম ভেঙে গেল আমার।'

তার কথা শুনে শ্যানন প্রথমে বললেন, 'কই, না তো!'

তারপর হেসে বললেন, 'অবশ্য সে ডাক না শোনার পিছনে একটা কারণ আছে। আমি অনিদ্রার রোগী। তাই ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুতে হয়। কাল রাত ন'টায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছি। জানেন, ঘুমের মধ্যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি আমি। দেখলাম জর্জের সেই মুণ্ডুকাটা ছায়ামূর্তি আর আর্ল সেভার্ন দাবা খেলছেন বুরুজের মাথায় বসে। কী অদ্ভুত স্বপ্ন!'

শ্যাননের কথা শুনে মুহূর্তর জন্য দৃষ্টি বিনিময় হলো জুয়ান আর দীপাঞ্জনের মধ্যে। দীপাঞ্জনের চোখে ভেসে উঠল সেই অদ্ভুত মূর্তি।

শ্যানন এরপর বললেন, 'রিচমন্ড নিশ্চয়ই এসে পড়বে। যাই আমি ঘরে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়েনি। আপনারাও তৈরি হয়ে নিন। দুর্গর আনাচ-কানাচ ঘুরে দেখতে হবে। সম্ভব হলে শেরউড বনের ভিতরেও যাব?'

এ কথা বলে লর্ড শ্যানন নিজের ঘরে ঢুকে যাবার পর দীপাঞ্জনরাও নিজেদের ঘরে ঢুকল। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ট্রেতে ধুমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল রিচমন্ড। টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রেখে সে জানতে চাইল ঘুম কেমন হল?'

জুয়ান হেসে বললেন, 'ভালোই, তবে তিনটে নাগাদ কাকের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। ওই সময়টাতে ঠিক ভোর বলা যায় না। আপনি তো বলেছিলেন যে শুধু সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ওরা ডাকে?'

রিচমন্ড বলল, 'হ্যাঁ, তাই ডাকে। ঋতু অনুসারে ভোর সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে। অত আগে অন্ধকারে সাধারণত ওরা ডাকে না।'

'তবে কেন ডাকল কেন?' জানতে চাইল দীপাঞ্জন।

একটু চুপ করে থেকে রিচমন্ড বলল, 'হ্যাঁ, ডাকটা আমিও শুনেছি। আর একটা চাঞ্চল্যও লক্ষ করছি ওদের মধ্যে। ভোর হলে সাধারণত ওরা বুরুজ, কার্নিশ ছেড়ে নীচে নেমে চত্বরে বসে হাঁকডাক শুরু করে। রোজ ওদের সেখানে খাবার দেওয়া হয়। আজ দেখছি ওরা আকাশে ওড়াউড়ি করছে এখনও। খাবার খেতে নীচে নামেনি। আমার ধারণা, জঙ্গল থেকে ভাম বা বনবিড়াল জাতীয় কোনো প্রাণী এসে হানা দিয়েছিল ওদের ডেরায়। সাপও হতে পারে। কাকগুলো তাই ভয় পেয়ে ডেকে উঠেছিল একসঙ্গে। কাকেদের মধ্যে সামাজিক বোধ প্রবল। একজন আক্রান্ত বা বিপদগ্রস্ত হলে সবাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে।'

একথা বলার পর রিচমন্ড বলল, 'আপনারা চা-ব্রেকফাস্ট করে তৈরি হয়ে থাকুন। আমি একটু পরে আসছি। আপনাদের দুর্গ আর কিছু জিনিস দেখাব।'

রিচমন্ড কিন্তু আবার ফিরে আসতে বেশ দেরি করল। ব্রেকফাস্ট সেরে তৈরি হয়ে বাইরে বেরিয়ে তার জন্য বেশ কিছুটা সময় দীপাঞ্জনদের অপেক্ষা করতে হলো তার জন্য। প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ সে এল। দীপাঞ্জনদের উদ্দেশ্যে সে বলল, 'মার্জনা করবেন

আসতে দেরি হলো বলে। আসলে আর্লের মাথা গরম হয়ে গেছে। তাকে একটু ঠান্ডা করে আসতে হলো।'

শ্যানন জানতে চাইলেন, 'সাত সকালে তার মাথা গরম হল কেন?'

রিচমন্ড বলল, 'রোজ ভোরবেলা তার খবরের কাগজ চাই। সকাল সাতটার মধ্যে ডাক বিভাগের গাড়িটা কাগজ গুঁজে দিয়ে চলে যায় দুর্গের ঢোকার মুখে লোহার ফটকে। কিন্তু ইদানীং তারা মাঝে মাঝে ভুলে যাচ্ছে কাগজ দিতে। নতুন লোক এসে দায়িত্ব নিয়েছে গাড়িটার। তারপর থেকে ঘটনাটা ঘটছে। আজও তারা কাগজ দিয়ে যায়নি। অথচ লর্ড ভোরবেলা জানলা দিয়ে দেখেছেন তাদের গাড়িটাকে চলে যেতে। তাই খাপ্পা হয়ে গেছেন তিনি। তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে কিছুটা ঠান্ডা করলাম। যদিও এখন তিনি ডাক বিভাগের সম্বন্ধে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি লিখতে বসেছেন খোদ রানি এলিজাবেথকে।'

রিচমন্ড এরপর বলল, 'চলুন এবার। যা যা দেখানোর আছে আপনাদের দেখিয়ে আনি। দিনের আলোতে কিছুটা হলেও প্রাণ ফিরে পেয়েছে দুর্গ। আসলে গত দিন দীপাঞ্জনরা যখন দুর্গে এসে পৌঁছেছিল তখন সূর্য পশ্চিমে হাঁটতে শুরু করেছে। অলিন্দ, গবাক্ষ দিয়ে সকালে বেশ কিছুক্ষণ আলোকিত হয় দুর্গর। ঘর, অলিন্দ, সিঁড়ির ধুলোমাখা ধাপগুলো। তারপর তারা ধীরে ধীরে ডুবে যায় বিস্মৃতির অন্ধকারে। অলিন্দর গা ঘেঁসেই সার সার ঘর তার কোথাও রাখা আছে লোহার বেড় দেওয়া আদ্যিকালের কাঠের পিঠে, কোথাও গোড়ার রেকাব, জিন, সাজসজ্জা, এছাড়াও নানা প্রাণীর স্টাফ করা মাথা, ধাতুর মূর্তি ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ ঘরই খালি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরু ধুলোর আস্তরণ জমা হয়েছে সেখানে। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে জুয়ান, রিচমন্ডকে বললেন, 'এত ঘর এ দুর্গে! আপনি থাকেন কোথায়?' রিচমন্ড বলল, 'দোতলাতেই। কাল আপনারা রাতে যে ঘরে আর্লের সঙ্গে দেখা করলেন তার কাছেই একটা ঘরে। আর্লের শয়নকক্ষও ওই লাইব্রেরির পাশেই।'

রিচমন্ড দীপাঞ্জনদের নিয়ে দুর্গর গোলকধাঁধায় কিছুক্ষণ হাঁটার পর এসে থামল একটা ঘরের সামনে। কাঠের শক্ত দরজার ওপর মোটা লোহার গরাদওয়ালা আর-একটা দরজা আছে সেখানে। দুটো দরজাতেই বড়ো বড়ো লোহার তালা ঝুলছে। দুর্গর তালাগুলো যেমন বিশাল, তেমন চাবিগুলোও বড়ো বড়ো। রিচমন্ড তার পোশাকের ভিতর থেকে প্রায় ছ ইঞ্চি লম্বা দুটো চাবি বার করে করে পরপর দরজা দুটো খুলে ফেলল। আলোকিত হয় উঠল ঘর। ঘরটাতে কোনো জানলা নেই। ঘরে পা রেখেই দীপাঞ্জনদের যেটা প্রথমেই চোখে পড়ল তা হলো, দেয়ালের গায়ে চেনে বাঁধা প্রাচীন এক কঙ্কাল। তার দেহের কিছু খসে খসে পড়েছে বয়সের ভারে। ঘরের মধ্যে রয়েছে লোহার পটি দেওয়া বেশ কিছু সিন্দুক আর বড়ো বালতির আকারের অসংখ্য জালা। রিচমন্ড বলল, এটা ছিল দুর্গের তোষাখানা। ছোটো ছোটো জালাগুলোর মধ্যে সোনার মোহরে ভরা থাকত আর সিন্দুকগুলোর মধ্যে অলংকার।'

কথা বলতে বলতে সে এগিয়ে গেল একটা সিন্দুকের কাছে, চাবি দিয়ে তালা খুলে সিন্দুকের থেকে একটা মাঝারি বাক্স এনে টেবিলের ওপর রাখল। দীপাঞ্জন জিজ্ঞেস করল,

'ওই কঙ্কালটা কে? রত্নাগারের পাহারাদার?'

বাক্সটা খুলতে খুলতে রিচমন্ড হেসে ফেলে বলল, 'ওর বয়স তিনশো বছর। পাহারাদার নয় চোর ছিল। আগে এ ঘরে একটা জানলা ছিল। কীভাবে যেন সে তিনশো ফুট উঁচু এই ঘরে রক্ষীদের চোখ এড়িয়ে দেয়ালের খাঁজ বেয়ে উঠে জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সোনার মোহরটোহর বস্তায় পুরে ছিল ঠিকই, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। পালাবার সময় সে ধরা পড়ে গেল রক্ষীদের হাতে। তাকে এ ঘরে এনে শিকলে বাঁধা হলো দেয়ালের সঙ্গে। খাবার চাইলেই তার মুখে সোনার মোহর গুঁজে দেওয়া হত। ও ভাবেই মারা গেল লোকটা। তারপর থেকেই সে ওখানেই আছে।'

কথা বলতে বলতেই বাক্সটা খুলে তার ভিতরের নীল মখমলের আস্তরণটা সরিয়ে ফেলল রিচমন্ড। সঙ্গে সঙ্গে যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল বাক্সর ভিতরটা। তার ভিতর রাখা আছে বেশ কিছু প্রাচীন গহনা, জহরত। একটা মুক্তোর ছড়া দীপাঞ্জনের দিকে এগিয়ে দিয়ে রিচমন্ড বললে, 'ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তো কোনো কিছু ছুঁয়ে দেখার সৌভাগ্য হবে না, এটা হাতে নিয়ে দেখুন, এটা হলো রাজা জেমসের উপহার। আর এই যে পান্না বসানো সোনার ব্রোচ, এটা আর্ল সেভার্নকে দিয়েছিল রানি ভিক্টোরিয়া।' মুক্তোর মালাটা হাতে নিতেই দীপাঞ্জনের শরীর শিরশির করে উঠল। তার মনে হলো সে যেন ইতিহাসকে স্পর্শ করছে! এরপর আরও কিছু মূল্যবান জিনিস, হিরে বসানো আংটি, সোনার লকেট ইত্যাদি বাক্স থেকে বার করে দীপাঞ্জনদের দেখাল সে। বিস্মিত জুয়ান জিনিসগুলো দেখতে দেখতে বললেন, 'এ সবের মূল্যতো বেশ কয়েক লাখ ডলার হবে। তোষাখানা তবে এখনও সম্পদে ভরতি!'

তার কথা শুনে রিচমন্ড একটু সতর্ক ভাবে বলল, 'না, জিনিসগুলো এখানে থাকে না। অন্য জায়গাতে থাকে। আপনাদের দেখাবার জন্য জিনিসগুলো বার করে এনেছি। যেখানের জিনিস সেখানে আবার রেখে আসতে হবে।'

রত্ন দেখাবার পর রিচমন্ড ঘরের বাইরে এসে তালা দিয়ে বলল, 'আপনাদের নীচে সমাধিক্ষেত্র দেখাতে নিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে ছাদটা দেখিয়ে আনি, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় সেখান থেকে। ওখানে একটা দেখার জিনিসও আছে।' রিচমন্ডের পিছু পিছু আবার এগোতে শুরু করল তারা, একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে তারা পৌঁছোল দুর্গপ্রাকারে। প্রাকারের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ফুটপাঁচেক চওড়া পথ এগিয়েছে ওপর দিকে প্রাকারটা যেভাবে ওপরের দিকে উঠে গেছে সেভাবে। পথের এক পাশে খাঁজকাটা অনুচ্চ প্রাচীর, অন্য পাশে অনেক নীচে দুর্গর ভিতরের শানবাঁধানো জমি। বেখেয়ালে নীচে পড়লে মৃত্যু অবধারিত। দীপাঞ্জনদের নিয়ে সে পথ ধরে সাবধানে ছাদের দিকে এগোতে এগোতে রিচমন্ড বলল, 'এক সময় এ পথ ধরে টহল দিত রক্ষীরা। প্রাচীরের গায়ে যে ফুটোগুলো দেখছেন সেগুলো বানানো হয়েছিল তির চালাবার জন্য। আর কিছু নালি আছে সেগুলো দিয়ে ওপর থেকে গরম তেল ঢালা হতো শত্রুর দুর্গ আক্রমণ করলে।'

গল্প শুনতে শুনতে ছাদে উঠে এল তারা। ছাদতো নয় যেন একটা ফুটবল মাঠ। শেরউড বনভূমির মাথার ওপর বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে। দীপাঞ্জনরা ছাদে উঠতেই

মাথার ওপর পাক খেতে থাকা কাকগুলো একবার কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে রিমচন্ড বলল, 'কাকগুলো এখনও উত্তেজিত হয়ে আছে কেন কে জানে? আপনাদের দুর্গ দেখানো শেষ হলে দেখি ওদের খাবার দিয়ে নীচে নামানো যায় কিনা?'

ছাদের মাঝখানে রাখা আছে কাঠ আর লোহার তৈরি একটা অদ্ভুত যন্ত্র। তারা গিয়ে দাঁড়াল সেটার সামনে। ফুট আটেক একটা খাড়া স্তম্ভর ওপর একটা কুড়ি ফুট লম্বা ঢেঁকি যেন বসানো আছে। ঢেঁকির এক দিকের মাথায় বসানো আছে বিরাট লোহার ঝুড়ি। রিচমন্ড বলল, 'এটা হলো দানব গুলতি। সে যুগে এ জিনিসের খুব চল ছিল। ঝুড়িতে হাজার পাউন্ড ওজনের পাথর খণ্ড বসিয়ে বেশ দূর পর্যন্ত ছোড়া যেত। এ হলো কামানের পূর্বপুরুষ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দীপাঞ্জনরা ঘুরে বেড়াল ছাদে। দাঁড় কাকগুলো ডেকেই চলেছে তাদের মাথার ওপর। এরপর নীচে নামার পথ ধরল তারা। দুর্গ প্রাকারের গা ধরে ঠিকই তবে অন্য দিক দিয়ে। সে পথে এগোবার সময় রিচমন্ড একটু সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'একটু সাবধান। প্রাকারের এ অংশে অনেক কাকের বাসা আছে। আচমকা ঠোকর খেয়ে নীচে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। দু-একজন এভাবে মারাও গেছে। তবে আমি আছি সঙ্গে। তেমন কিছু হবে না। ওরা চেনে আমাকে' কয়েকপা এগোতেই দীপাঞ্জনরা দেখল সত্যিই প্রাচীরের খাঁজে খাঁজে রয়েছে বিরাট বিরাট অসংখ্য দাঁড়কাকের বাসা। তার কয়েকটাতে ছানাপোনাও আছে। বাসা তৈরির কাঠখড়কুটো আর কাকের বিষ্ঠায় ভরে আছে সে জায়গা। বড়ো বড়ো ঠোঁটের দাঁড়কাকগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে দীপাঞ্জনদের মাথার ওপর। ঠোকোর খাবার ভয়ে সবাই বেশ সাবধানে পার হলো সে জায়গা। বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল দীপাঞ্জনদের মতো উঁচু ছাদ থেকে একদম নীচে চত্বরটাতে নামতে।

নীচে নেমে চত্বরের মাঝখানে দাঁড়াল তারা। রিচমন্ড বলল, 'এবার আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি আর্লদের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র দেখাতে।' রিচমন্ড দীপাঞ্জনের ঠিক সেই জায়গাতেই নিয়ে ঢুকল যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছিল সেই গতরাতের ছায়ামূর্তি। স্তম্ভের আড়ালে লম্বা একটা বারান্দা, তার লাগোয়া সার সার ঘর। দীর্ঘদিন দরজাগুলো খোলা হয় না। পুরু ধুলো জমে আছে চৌকাঠে। সে অলিন্দ পেরোবার পর প্রায় একশো ফুট লম্বা একটা জায়গা। তার দু-পাশে উঁচু প্রাচীর, তবে মাথার ওপর ছাদ নেই। শান বাঁধানো পাথুরে মেঝে পেরিয়ে তার শেষ প্রান্তের দিকে এগোতে এগোতে রিচমন্ড বলল, 'এ জায়গার নাম হলো 'ডুয়েল কোর্ট।' অভিজাত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সে যুগে অনেক বিবাদের শেষ নিষ্পত্তি হতো ডুয়েল বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমে। বিশেষত সম্পত্তি বা বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ের বিরোধের নিষ্পত্তির জন্যই ডুয়েল লড়াই হতো। দেয়ালের গায়ে অনেক জায়গাতে যে আঁচড়ের মতো দাগ দেখছেন তা হলো তলোয়ারের আঘাত। তলোয়ারের ডুয়েল হতো

এখানে। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ শেষে পরিবারের মৃত সদস্যকে নিয়ে যাওয়া হত ভূগর্ভস্থ কবরখানায় সমাধি দেবার জন্য। বাইরের কেউ ব্যাপারটা জানতে পারত না। বেশ কয়েকবার লড়াই হয়েছে এ জায়গাতে।'

ডুয়েল কোর্ট পেরিয়ে তারা প্রবেশ করল ছাদ ঢাকা এক অলিন্দে। কিছুটা এগিয়েই একটা দরজা। তবে তার পাল্লা নেই। হতে পারে এককালে পাল্লা ছিল এখন সেটা খসে পড়েছে। দরজা থেকে সার সার সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের অন্ধকারে। দরজার পাশেই কুলুঙ্গিতে একটা মশাল রাখা ছিল। সেটা জ্বালিয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্রে নামতে শুরু করল রিচমন্ড। বেশ অনেকটা নামার পর তারা এসে প্রবেশ করল সমাধিক্ষেত্রে। লম্বাটে বেশ বড়ো সমাধিক্ষেত্র। অন্তত সেটা দেড়শো ফুট লম্বা আর তিরিশ ফুট চওড়া। দরজা থেকে একটা সরু পথ চলে গেছে সমাধিক্ষেত্রের শেষ প্রান্তে। একপাশে দেয়ালের মাথায় বেশ বড়ো একটা গবাক্ষ আছে। তার ফাঁক গলে কিছুটা আলো ঢুকছে ভূগর্ভস্থ ঘরটাতে। সেই আলোতে আর রিচমন্ডের মশালের আলোতে সমাধিক্ষেত্রের শেষ প্রান্তে চলে যাওয়া সরু পথটার দু-পাশ জেগে আছে সার সার পাথরের তৈরি শবাধার। মাটি খুঁড়ে নয়, শবাধারেই শায়িত করে রাখা হত মৃতদেহ। সমাধিক্ষেত্রের দু-পাশে দেয়ালের মাথার দিকে বেশ কিছু তাক আছে। সেখানেও রাখা আছে পাথরের তৈরিবেশ কিছু ছোটো বাক্স। দীপাঞ্জন জানতে চাইল 'ওগুলি কী?'

রিচমন্ড বলল, ওগুলি হলো পরিবারের শিশু সদস্যদের শবাধার। ওগুলো খুব প্রাচীন। কয়েকটার বয়স আট নশো বছর হবে? রিচমণ্ডের পিছন পিছন শুঁড়িপথ ধরে ধীর পায়ে সামনের দিকে এগোল তারা। দু-পাশে রয়েছে শবাধারগুলো। প্রাচীন সব শবাধার। বিবর্ণ হয়ে গেছে তাদের গায়ে থাকা ফুল লতাপাতার অলংকরণ, কোনোটার মাথার ক্রুশ হেলে পড়েছে, কোনোটার ঢাকনা খসে পড়েছে। দীপাঞ্জন দু-একটা ভাঙা শবাধারের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল। না, হাড়গোড়ের কোনো চিহ্ন নেই ভিতরে। সব ধুলো হয়ে মিশে গেছে কফিনের ভিতর। এক সময় তারা ঘরটার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছোল। সেখানকার কফিনগুলো একটু ভালো অবস্থার। অর্থাৎ তাদের বয়স এক-দুশো বছর। অন্যদের তুলনায় তাদের নবীনই বলা যায়। সেখানে একটা প্রায় নতুন পাথরের কফিন রাখা আছে। সেটার ঢাকনা সরিয়ে রিচমন্ড বলল, 'এটা বছর খানেক আগে লন্ডন থেকে আনিয়েছি। এর ভিতর কে শোবেন জানেন? আর্ল সেভার্ন। তাঁর নির্দেশেই আগাম প্রস্তুতি সেরে রেখেছি।'

কিছুক্ষণ সে জায়গাতে দাঁড়িয়ে থেকে তারা আবার সবাই ফিরতে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার সেই কবরখানায় চোখ আটকে গেল মাথার ওপরের দেয়ালের এক জায়গাতে। সেখান থেকে কেউ যেন তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। আধো অন্ধকারে সেখানে জেগে আছে এক জোড়া লাল চোখ। আরে সেই বিশাল কাকটা। রিচার্ড। দেয়ালের মাথার ওপরের দিকে তাকে রাখা একটা ছোটো কফিন বাক্সে বাসা বানিয়ে তার মধ্যে বসে আছে সে। খড়কুটো ঝুলছে বাক্সর গর্তর মধ্যে থেকে তার গা বেয়ে। বাক্সর মধ্যে বসে কাকটা তাকিয়ে আছে দীপাঞ্জনদের দিকে। দীপাঞ্জন ব্যাপারটা সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করল অন্যদের। তারাও তাকাল বাক্সটার দিকে। রিচমন্ড হেসে বলল, 'হ্যাঁ, উনি ওখানেই থাকেন। রাত হলে

ওই গবাক্ষ দিয়ে বা বাইরে বেরিয়ে দুর্গ টহল দেন। আমি ছোটবেলা থেকে ওকে ওখানেই দেখছি। যে বাক্সটায় উনি বসবাস করেন ওটা হল হেনরির শবাধার। প্রথম আর্লের মৃত শিশুপুত্র ছিলেন তিনি।'

লর্ড শ্যানন এবার বললেন, 'মাফ করবেন। এবার ওপরে উঠলে ভালো হয়। আমার শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে। এখানে বাতাস বড়ো কম।'

সমাধিক্ষেত্রটা মোটামুটি সবার দেখা হয়ে গেছিল। তাই তারা এবার ওপরে উঠে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ডুয়েল কোর্ট অতিক্রম করে ফিরে এল সেই চত্বরে।

সেখানে ফিরে এসে রিচমন্ড বলল, 'আমি এবার কাকেদের খাবারের ব্যবস্থা করি। দুর্গে যা যা দ্রষ্টব্য আছে তা আপনাদের দেখালাম। আপনারা এবার নিজেরা ঘুরে দেখতে পারেন অন্য অংশগুলো। তবে একটু সাবধানে। প্রাচীন জায়গাতো। সাপখোপ থাকতে পারে কোথাও।'

শ্যানন বলল, 'আমি বরং একটু জঙ্গলের ভিতর ঘুরে আসি। যাবেন নাকি আপনারা?'

জুয়ান বলল, 'আপনি ঘুরে আসুন। এখন বেশ রোদ। আমরা বিকালে যাব ওদিকটাতে। এখন এই দুর্গ প্রাসাদেই ঘুরে বেড়াই।'

রিচমন্ড শ্যাননকে বললেন, 'দুর্গের মূল ফটক খুলতে হবে না। ওর পাশে বেশ বড়ো একটা ফোকরা আছে। সেখান দিয়েই আপনি যাওয়া আসা করতে পারবেন।'

তার কথা শুনে শ্যানন চলে গেলেন সেদিকে। রিচমন্ডও বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর সেই চত্বর ছেড়ে অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবেই জুয়ান আর দীপাঞ্জন প্রবেশ করল দুর্গস্থাপত্যের ভিতরে। কত কক্ষ, কত অলিন্দ, প্রাকার, বুরুজ। তারা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল কেল্লাটা।

ঘুরতে ঘুরতে জুয়ান এক সময় বললেন, 'তোমার দেখা কবন্ধ মূর্তিটা কী তবে? ভূগর্ভস্থ কবর খানাতেই গেছিল? ওদিকের রাস্তাটা তো কবরখানাতেই গিয়ে শেষ হয়েছে।'

দীপাঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ, ওদিক দিয়ে তো আর বেরোবার পথ নেই। কিন্তু সে কবরখানায় গেল কেন? তার কাটামুণ্ডুর সন্ধানে নাকি?' কথা শেষ করে মৃদু হাসল দীপাঞ্জন।

জুয়ান বললেন, 'এমন হতে পারে যে রিচমন্ড যে অলংকার রত্নগুলো আমাদের দেখাল সেগুলো? সমাধিক্ষেত্রের কোথাও লুকোনো থাকে। আমাদের দেখানোর জন্য সে? ছদ্মবেশে আনতে যাচ্ছিল সেগুলো। অথবা সে জায়গা থেকে লোকজন কে দূরে রাখার জন্য সে ছদ্মবেশ ব্যবহার করে। সাধারণত কবরস্থানের মতো জায়গা এড়িয়ে চলে সাধারণ মানুষ, এমনকি চোরেরাও। তার ওপর সেখানে যদি স্কন্ধকাটা দেখা যায় তাহলে তো কথাই নেই। ধন-সম্পদের চেয়ে প্রাণের মায়া বড়ো। কেউ ঘেঁষবে না সেখানে। কোনো কিছু লুকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তাই সমাধিক্ষেত্রের পাথরের কফিনগুলো কিন্তু আদর্শ জায়গা। কেউ সাহস করে হাত দেবে না ওর ভিতরে।'

একটা সিঁড়ি পড়ল দীপাঞ্জনদের সামনে। সেটা দিয়ে তারা ওপরে উঠতে শুরু করল। ওপরে উঠতে উঠতে জুয়ান বললেন, তুমি একটা জিনিস খেয়াল করছে কিনা জানি না, আমি করেছি। রিচার্ড যে বাক্সটায় থাকে, মানে সেই ছোটো পাথরের শবাধারটা মনে

হয় কেউ হাত দিয়ে টেনেছিল। তার ভিতরে ঘাঁটাঘাঁটিও করে থাকতে পারে। কারণ অন্য বাক্সগুলো যেমন তাকের দেয়ালের সঙ্গে লেপ্টে আছে সেটা তেমন নেই। বাক্সর একটা কোণা তেরছাভাবে বেরিয়ে এসেছে তাক থেকে। কিছু টাটকা খড়কুটো আর ধুলোবালিও পড়েছিল মাটিতে। তার ওপর আমি জুতো পরা মানুষের পায়ের ছাপ দেখেছি। সেটাও টাটকা।'

কথা বলতে বলতেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল তারা। এ জায়গাটা চিনতে পারল দুজনেই। আরে ওইতো আর্লের লাইব্রেরি রুম। এখানেই কোনো ঘরে থাকেন বৃদ্ধ আর্ল এবং রিচমন্ড।

দীপাঞ্জন, জুয়ানের কথা শুনে বললেন, 'তাহলে কী? রিচার্ডের বাক্সে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখা আছে বা হয়েছিল?'

জুয়ান বললেন, 'অসম্ভব কিছু নয়। কালতো আমরা চলে যাব। আজ চলো সমাধিক্ষেত্রে আমরা রাত কাটাই। এই সিঁড়িটা যখন খুঁজে পেলাম তখন এটা দিয়েই দোতলা থেকে নেমে যাব। কেউ কিছু টের পাবে না। কবন্ধ মূর্তির ব্যাপারটা আমাদের জানা দরকার। নইলে সারাজীবন মনের মধ্যে অতিপ্রাকৃত বিষয় সম্বন্ধে একটা খটকা থেকে যাবে। রিচমণ্ড যদি অলংকারগুলো ওখান থেকেই এনে থাকে তবে নিশ্চয়ই ওখানেই আবার রাখতে যাবে। আর রাতটাকেই সে বেছে নেবে এ কাজের জন্য। আসল সত্যটা উদ্‌ঘাটন হওয়া দরকার। আমরা শুধু লুকিয়ে থেকে দেখব সে আসল ব্যাপারটা কী?'

দীপাঞ্জন প্রশ্ন করল, 'কী ভাবে লুকোব আমরা?'

জুয়ান উত্তর দিলেন, 'কেন? ওখানে যে ভাঙা শবাধারগুলো আছে তার মধ্যেই লুকোব। ওটাই সেরা জায়গা...'

জুয়ান হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কাছেই একটা ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং আর্ল সেভার্ন। তাঁর এক হাতে উঁচিয়ে ধরা আছে সেই শিঙটা। আর অন্য হাতে ধরা একটা হাসের পালকের কলম। সম্ভবত লিখতে লিখতে বেরিয়ে এসেছেন তিনি তাঁকে দেখে দুজনের কথাবার্তা থেমে গেল। আর্ল বেশ কিছুক্ষণ ঘোলাটে চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমরা কি ডাক বিভাগের লোক? নিশ্চয় আমার লেখা চিঠি পেয়ে রাজা তোমাদের আমার কাছে পাঠিয়েছেন? সংবাদপত্র দাওনি কেন? একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর পড়া আমার বাকি রয়ে গেল।'

জুয়ান মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে অভিবাদন করে বললেন, 'না আমরা ডাক বিভাগের লোক নই। আমরা আপনার প্রাসাদের অতিথি। লন্ডন থেকে এসেছি। আপনি কী খবর সংবাদপত্রে পড়তে চাইছেন বলুন? আমাদের জানা থাকলে আপনাকে জানাচ্ছি।'

আর্ল বললেন, 'ওই যে ওই খবরটা। সেটা বেরোচ্ছে সংবাদপত্রে। নরফক্সের ডিউক নাকি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইছে! শুনেছ খবরটা?'

আর্লের কথা শুনে একটু চুপ করে থাকলেন জুয়ান। অসংলগ্ন কথা বলছেন আর্ল। এর কী বা জবাব দেবেন তিনি? একটু আমতা আমতা করে জুয়ান বললেন, 'না, এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।'

আর্ল এ কথা শুনে বেশ রুষ্ট ভাবে বললেন, 'শোনোনি এ কথা? যত সব অপদার্থের দল! নরফক্কের ডিউক রাজার সম্পদ লুঠ করার চেষ্টা করছে শেরউড বনে। তোমরা যখন ব্যাপারটা কিছুই শোনোনি তখন আমি একাই লড়াই করব তার বিরুদ্ধে। আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আজ রাতেই যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ যুদ্ধ'—একথা বলতে বলতে শিঙায় ফুঁ দেবার ভঙ্গিতে সেটা মুখের কাছে উঁচিয়ে ধরে আবার ঘরে ঢুকে গেলেন আর্ল। দীপাঞ্জনরা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আবার এগোতে শুরু করল সামনের দিকে। কিন্তু মিনিট দশেক সময়ের পরই হঠাৎ নীচের চত্বরে ভারী কিছু পড়ার শব্দ আর মানুষের আর্ত চিৎকার চমকে উঠল তারা। কাকের দল মনে হয় নীচে নেমেছিল। তারা চিৎকার করতে করতে নীচ থেকে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ওপরে উঠতে লাগল। যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে দাঁড়কাকগুলো। দীপাঞ্জনরা যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে সেখানে অলিন্দের রেলিং এত উঁচু যে নীচে ঝুঁকে দেখা যাবে না। কাকের কোলাহলের মধ্যে থেকে নীচ থেকে ভেসে আসছে আর্তনাদ।

নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। দীপাঞ্জনরা পিছু ফিরে সিঁড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল নীচের চত্বরে পৌঁছোবার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল সেখানে।

চত্বরের ঠিক মাঝখানে দু-পা ছড়িয়ে বসে আছে রিচমন্ড। রক্ত চুঁয়াচ্ছে তার দেহ থেকে। কিছু দূরে উলটে পড়ে আছে গমের ঝুড়ি। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে প্রচুর গম। আর্তনাদ করছে রিচমন্ড।

দীপাঞ্জনরা ছুটে গেল তার দিকে। তার সামনে নীচু হয়ে বসে জুয়ান জানতে চাইলেন, 'আপনার আঘাত লাগল কী ভাবে?'

রিচমন্ড বলল, 'দাঁড়কাকগুলোকে গম খাওয়াচ্ছিলাম। ওরাও নীচে নেমে গম খাচ্ছিল, হঠাৎ ওই পাথরটা ওপর থেকে কাঁধে খসে পড়ল! এই বলে সে বাঁ হাতের আঙুল নির্দেশ করল কিছুটা তফাতে পড়ে থাকা একটা বেশ বড় পাথর খণ্ডর দিকে। তার নীচে চেপ্টে গেছে একটা কাক। পাথরের চাপে পাখিটার প্রাণ বেরিয়ে গেছে। পালক ছিটিয়ে আছে চারপাশে। জুয়ান আর দীপাঞ্জন পরীক্ষা করল রিচমন্ডের কাঁধের ক্ষতচিহ্নটা। কেটে গেলেও আঘাত তেমন কিছু মারাত্মক নয়। ঘটনার আকস্মিকতায় আর যন্ত্রণায় বিহ্বল হয়ে গেছে রিচমন্ড। তবে পাথরটা মাথায় পড়লে তার মৃত্যু অনিবার্য ছিল। খুব বাঁচা বেঁচেছে সে! ধরাধরি করে প্রথমে তাকে দাঁড় করানো হলো। দীপাঞ্জন বলল, "কিন্তু পাথরটা খসে পড়ল কোথা থেকে?'

যন্ত্রণাকাতর গলায় দীপাঞ্জন আর জুয়ানের কাঁধে ভর দিয়ে রিচমন্ড বলল, 'মনে হয় ওই টাওয়ারের মাথা থেকে। দীপাঞ্জন মাথা তুলে তাকাল ওপর দিকে। টাওয়ারের বা বুরুজের মাথায় একটা ছোটো ঘর আছে। সে দিকে তাকাতেই দীপাঞ্জনের মনে হলো একটা মূর্তি যেন দাঁড়িয়েছিল সেখানে! সে তাকাতেই মূর্তিটা সরে গেল! ব্যাপারটা অবশ্য তার মনের ভুলও হতে পারে। দোতলায় উঠে জুয়ান নিজেদের ঘরে ছুটলেন সঙ্গে আনা ফার্স্ট এইড বক্সটা আনতে। আর দীপাঞ্জন, রিচমন্ডকে নিয়ে পৌঁছোল তার ঘরে। জুয়ান খুব দ্রুতই ফিরে এলেন। রিচমন্ডের ঘরের দরজার বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করছিল

দীপাঞ্জন। ঘরে ঢুকে দুজনে মিলে রিচমন্ডের কাঁধে ব্যান্ডেজ বেঁধে ব্যথার ওষুধও খাওয়ানো হলো তাকে। জুয়ান বললেন, 'আপাতত আপনি বিশ্রাম নিন। আশা করি কাল সকালে আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

দীপাঞ্জন তাকে বলল, 'আমাদের নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে। দুর্গ তো মোটামুটি দেখা হয়ে গেছে। বড়ো টাওয়ারটা আর জঙ্গল নিজেরাই দেখে নিতে পারব। আচ্ছা ওই টাওয়ারে ওঠার রাস্তা কোন্‌টা বলুন তো?'

রিচমন্ড শুশ্রূষার জন্য তাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'এই ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে একটু এগোলে বাঁ হাতে দেয়ালের গায়ে একটা সরু পথ আছে। সেটা আপনাদের টাওয়ারের সিঁড়ির দরজাতে পৌঁছে দেবে। দরজা খোলাই থাকে।'

এরপর দীপাঞ্জনরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে দীপাঞ্জন বলল, 'চলুন ওই টাওয়ারে একবার উঠব। ওখান থেকেই পাথর খসে পড়েছে। ওপর দিকে তাকিয়ে আমি কাকে যেন দেখলাম মনে হয়! ব্যাপারটা মনের ভুলও হতে পারে। তবু দেখে আসি।'

জুয়ান কথাটা শুনেই বললেন, 'তবে চলো ওদিকে।'

রিচমন্ডের নির্দেশ মতোই এগোল তারা। কিছুটা এগিয়ে গলিপথটা দেখতে পেল তারা। কিন্তু সেখানে ঢোকার মুখেই এমন একজন সেখান থেকে বেরিয়ে এল যে আর একটু হলে তার সঙ্গে ধাক্কা লাগল জুয়ানের। তিনি আর্ল সেভার্ন। তাঁর হাতে তখনও ধরা আছে সেই শিঙাটা। দীপাঞ্জনদের দেখে তিনি বললেন, 'যুদ্ধ যুদ্ধ! সব তৈরি হও। আজ রাতেই আমি আমার সেনা নিয়ে আক্রমণ করব ডিউককে।' কথাগুলো বলতে বলতে তিনি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। জুয়ান বললেন, 'কোথা থেকে এলেন আর্ল। উনিই ওই বুরুজে উঠে রিচমন্ডকে শত্রুপক্ষের সেনা ভেবে পাথর ছুড়ে মারেননি তো? এ সব মানুষ কিন্তু কল্পনায় অনেক কিছু দেখেন। এ ব্যাপারটাও কিন্তু বেশ সম্ভাবনা আছে।'

দীপাঞ্জন বলল, 'চলুন আগে এগিয়ে দেখা যাক।'

সেই গলিতে ঢুকে কিছুটা এগিয়েই তারা একটা খোলা জায়গাতে এসে পড়ল। তার এক পাশ থেকে দুর্গ প্রাকারের গা বেয়ে খাড়া সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে দুর্গর বাইরে জঙ্গলের দিকে। তবে তার অস্তিত্ব সম্ভবত দুর্গর বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আর সেই সিঁড়ির উলটোদিকেই বুরুজের মাথায় ওঠার দরজা। বুরুজ বা টাওয়ারটা নীচ থেকে উঠে এসে ছাদ ছাড়িয়ে উঠে গেছে সোজা ওপর দিকে। দরজাটা বুরুজের গায়েই এবং সেটা খোলা। তারা দুজন তার ভিতরে প্রবেশ করে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। খুব স্বল্প পরিসর। একজনের পিছনে অন্যজন এভাবে তারা উঠে এল বুরুজের মাথার ঘরটাতে। না, সেখানে কেউ নেই। ঘরের চারদিকেই অলিন্দ। সেখান থেকে পাখির চোখে দেখা যাচ্ছে দুর্গর ভিতরের চত্বর, পুরো দুর্গ, আর শেরউড অরণ্য। বেশ কিছু বড়ো পাথরের টুকরো পড়ে আছে ঘরটার মধ্যে। ঠিক যেমন পাথরের টুকরো রিচমন্ডের ঘাড়ে পড়েছিল। জুয়ান বললেন, 'ও পাথরটা সম্ভবত এখান থেকেই ফেলা হয়েছিল। এত উঁচু থেকে ফেলা বলে ঠিক মতো লক্ষ ভেদ হয়নি। আর্লই কি ফেললেন পাথরটা?' কিছুক্ষণ সেখানে থাকার পর আবার নীচে নেমে এল তারা। বুরুজ থেকে বাইরে বেড়িয়ে

নীচে নামার সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে জুয়ান বললেন, 'এ পথে দুর্গের বাইরে থেকেও কিন্তু দুর্গে ঢোকা যায়, বুরুজেও আসা যায়। এমনও হতে পারে তোমার দেখা ওই প্রেতাত্মা হয়তো রিচমন্ড নয়, সে বাইরে থেকে কিছু খুঁজতে আসে দুর্গে বা কবর ঘরে।'

দীপাঞ্জন বলল, 'আজ রাতেই হয়তো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে আমাদের কাছে।'

ঘরে ফিরে এল জুয়ান আর দীপাঞ্জন। তার বেশ কিছুক্ষণ পর তারা শ্যাননকে ফিরতে দেখলেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দীপাঞ্জন তাকে বলল, 'একটা ঘটনা ঘটেছে। নীচের চত্বরে রিচমন্ডের ঘাড়ের ওপর পাথর খসে পড়েছে। অল্পর জন্য সে রক্ষা পেয়েছে। কাঁধে আঘাত লেগেছে। যদিও চোট তেমন গুরুতর নয়। বুরুজের ওপর থেকে পাথরটা পড়ছে।' দীপাঞ্জনের কথা শুনে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল শ্যাননের চোখেমুখে। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'একটা কথা বলি আপনাদের। এ জায়গাটা মোটেই সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না। অনেক দুর্গ দেখেছি আমি, কিন্তু এমন গা ছমছমে জায়গা দেখিনি। রিচমন্ড যে স্কন্ধকাটার গল্প বলল হয়তো সেই ফেলেছে পাথরটা? রাতটা কাটিয়ে সকাল হলে চলে যেতে পারলে ভালো। আর বনটাও কেমন যেন গা ছমছমে! মনে হচ্ছিল গাছের আড়াল থেকে কারা যেন কথা বলছে! তার কথা শুনে দীপাঞ্জনের পিছন থেকে গলা বাড়িয়ে জুয়ান বিস্মিতভাবে বললেন, 'আপনি ভূত-প্রেত বিশ্বাস করেন?' শ্যানন গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ করি। অনেক নামকরা বৈজ্ঞানিকরাও ভূত-ভগবানে বিশ্বাস করতেন। আপনারা হাসবেন বলে আগে বলিনি, ওই সমাধিক্ষেত্রে অন্ধকারের মধ্যে আমি একটা ছায়া সরে যেতে দেখেছি। তারপর রিচার্ড নামের দাঁড়কাকটাও কী বিরাট বড়ো আর অদ্ভুত দেখতে! কাক কখনও মাটির নীচে অন্ধকার ঘরে থাকে শুনেছেন? আমরা ধারণা ও একটা কাকরূপী প্রেতাত্মা। এমনকি ও নিজেই সেই স্কন্ধকাটা হতে পারে।'

শ্যানন তার কথাগুলো এমনভাবে বললেন যে দীপাঞ্জনরা হাসতে পারল না। আঘাত পেতে পারেন ভদ্রলোক। 'কাল সকালে এ জায়গা ছাড়তে পারলে বাঁচি।' এই বলে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন ভদ্রলোক।

দুপুরটা ঘরেই কাটিয়ে দিল দীপাঞ্জনরা। বিকালে আলো একটু পড়লে ঘর ছেড়ে বেরোল তারা। শ্যাননের ঘরের দরজা বন্ধ। জুয়ান বললেন, 'বাইরে বেরোবার আগে চলো একবার রিচমন্ডের অবস্থাটা দেখে আসি। তার ঘরে পৌঁছে গেল তারা। দরজা খোলাই ছিল। বই পড়ছিল সে। দীপাঞ্জনদের দেখে সে বলল, 'এখন অনেকটাই সুস্থ, আশা করছি কাল আপনাদের ন্যাটিংহ্যাম স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারব। জুয়ান বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি বিশ্রাম নিন। জঙ্গলটা দেখা হয়নি। আমরা বরং সেখানে বেড়িয়ে আসি।'

রিচমন্ডের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নীচে নেমে প্রধান ফটকের লাগোয়া ফাটল গলে বাইরে বেরিয়ে এল। দুর্গটাকে বেড় দিয়ে তারা পৌঁছে গেল পিছন দিকে। জঙ্গলটা প্রায় দুর্গর পিছনদিক থেকেই জঙ্গল শুরু হয়েছে। শেরউড বনে ঢুকল তারা। এ যেন এক অন্য পৃথিবী। পাইন, বার্চ, রোজউড আরও চেনা-অচেনা নানা গাছ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। শ্যানন ঠিকই

বলেছিলেন, বাতাসের শব্দ শুনে মাঝে মাঝে মনে হয় কেউ বা কারা যেন গাছের গুড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে, ছোটোবেলায় ছবির বইতে পড়া রবিনহুডের সেই শেরউড বন! ভাবতেই কেমন যেন রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছিল দীপাঞ্জনের। সময় এগিয়ে চলল। শেরউড বনের মাথার ওপর সূর্য পশ্চিমে ঢলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে ছায়া ঘনাতে শুরু করল। দুর্গাপ্রাকারে হঠাৎ শোনা গেল দাঁড়কাকদের সেই অদ্ভুত কলরব। বেশ কিছুক্ষণ ধরে জঙ্গলের মধ্যেই অনুরণিত হলো সেই ডাক। অন্ধকার নামার সংকেতধ্বনি। জঙ্গল ছেড়ে দীপাঞ্জনরা ফেরার পথ ধরল।

যে দিক থেকে দুর্গটাকে বেড় দিয়ে পিছনে গেছিল তারা। ফেরার সময় তারা ঠিক উলটো দিক থেকে বেড় দিয়ে এগোতে থাকল। উদ্দেশ্য ছিল বাইরের চারপাশ থেকে দুর্গটা একবার দেখে নেওয়া। দুর্গপ্রাকারের গা ঘেঁষেই হাঁটছিল তারা। হঠাৎ জুয়ান বললেন, 'আরে ওটা কী?'

ঝোঁপটার কাছে গিয়ে জিনিসটা কুড়িয়ে নিল তারা। রোল করা খবরের কাগজ। লন্ডন টাইমস এর ট্যাবলয়েড সংস্করণ, তার তারিখ দেখে জুয়ান বললেন, 'তারিখটা দেখছি গতকালের। অর্থাৎ যে কাগজটা আজকে দেবার কথা ছিল। এটাইতো আর্ল খুঁজছিলেন, তাহলে কী দায় এড়াতে ডাক বিভাগের লোক এটা এখানে ফেলে গেছে?'

দীপাঞ্জন বলল, 'আরও একটা ব্যাপারও হতে পারে। ওই দেখুন মাথাতেই তো বেশ কয়েকটা কাকের বাসা, আমি ওদের বাসাতেও কাগজ পিজবোর্ডের অনেক বড়ো বড়ো টুকরো দেখেছি। ছোটো রোল করা কাগজ। এমনও হতে পারে ডাকবিভাগের লোক ঠিক জায়গাতে কাগজটা রেখে গেছে আর কাগজটা ঠোঁটে করে এখানে এনে ফেলেছে।'

জুয়ান বললেন, 'হ্যাঁ, তা হতে পারে!' কাগজটা তিনি পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন।

তারা দুর্গে ফিরে আসতেই ঝুপ করে সন্ধ্যা নামল।

নিজেদের ঘরে ফিরে এল দীপাঞ্জনরা। জুয়ান বললেন, 'শ্যাননের ঘরের দরজা বন্ধ দেখলাম। সম্ভবত উনি আর বাইরে বেরোননি। রাত আটটা নাগাদ রিচমন্ড খাবারের ট্রে নিয়ে হাজির হল ঘরে। দীপাঞ্জনরা তাকে দেখে বেশ অবাকই হলো। খাবারের ট্রে নামিয়ে রেখে সে বলল, 'এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি তাই খাবার নিয়ে এলাম। জঙ্গল কেমন দেখলেন?'

জুয়ান বললেন, 'খুব ভালো। অনেক পুরোনো গাছ আছে। তবে হরিণ দেখিনি।'

এ কথা বলার পর তিনি পকেটে হাত দিলেন কুড়িয়ে পাওয়া কাগজটা ফেরত দেবার জন্য। ঠিক সেই সময় শ্যানন দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। সম্ভবত রিচমন্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি উঠে এসেছেন। রিচমন্ডকে দেখে তিনি বললেন, 'শুনলাম আপনার আঘাত লেগেছিল! যাক এখন সুস্থ দেখে ভালো লাগছে। সত্যি আপনার সাহস আছে! এত বড়ো ভূতুড়ে দুর্গ প্রাসাদে একা থাকেন কী করে কে জানে!'

রিচমন্ড হেসে বলল, 'একা কেন? আর্ল আছেন, তারপর আছে ওই জর্জের প্রেতাত্মা।'

শ্যানন বললেন, 'আর্লকে তো ঠিক সুস্থ মানুষ বলে ধরা যায় না। আর ওই...

দীপাঞ্জনের মনে হলো ওই প্রেতাত্মার প্রসঙ্গটা ওঠায় যেন কেমন মুষড়ে পড়লেন

ভদ্রলোক। তাই আর বেশি কথা না বলে রিচমন্ডকে বললেন, 'আমার ঘরে তাড়াতাড়ি খাবারটা দিয়ে যান। খাবার খেয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ব আমি। কাল কিন্তু তাড়াতাড়ি বেরোব। গাড়িটা তৈরি করে রাখবেন।'

এ কথা বলে, দীপাঞ্জনদের শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ঘরে শ্যানন ফিরে গেলেন।

তিনি চলে যাবার পর জুয়ান জানতে চাইলেন, 'মহামান্য আর্লের খবর কী?'

রিচমন্ড বলল, 'তিনি খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। তবে শোবার আগে আমাকে জানিয়েছেন যে লন্ডন থেকে ঘোড়সওয়ার রাজার কোনো পত্র নিয়ে আসতে পারে। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে যেন ডেকে তোলা হয়।'

এ কথা বলার পর রিচমন্ড বলল, 'আমি এবার আসি। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। কাল আপনাদের ন্যাটিংহ্যামে পৌঁছোতে হবে।'

রিচমন্ড ঘর ছেড়ে বেরোবার পর জুয়ান বললেন, 'ওহো, কথায় কথায় কাগজটাই দিতে ভুলে গেলাম রিচমন্ডকে। ডিনার করে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নাও। তারপর নৈশ অভিযানে বেরোব।'

বেশ বড়ো সোনার থালার মতো গোল চাঁদ উঠেছে শেরউড বনের মাথায়। তার আলো এসে পড়েছে দুর্গ প্রাসাদে চাঁদের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকা নশো বছরের প্রাচীন বুরুজে, দুর্গপ্রাকারে, অলিন্দে, নীচের চত্বরে। তবে প্রাকারের খাঁজ, অলিন্দের বাঁক বা স্তম্ভর আড়ালে যেখানে চাঁদের আলো প্রবেশ করছে না, সেখানকার অন্ধকার যেন আরও গাঢ় মনে হচ্ছে আজ। স্তম্ভ মিনারের ছায়াগুলোতে লাগছে আরও বেশি দীর্ঘ। দুর্গ প্রাকারের খাঁজে, ছাদের কার্নিসে বসে ঘুমোচ্ছে সার সার দাঁড়কাক। তারা কেউ নড়ছে না। যেন তারা এই প্রাচীন স্থাপত্যরাই নিশ্চল অংশ।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল দীপাঞ্জনরা। শ্যাননের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার পাল্লায় কান রেখে শ্যাননের নাক ডাকার শব্দ শুনল দীপাঞ্জন। মার্জারের মতো নিঃশব্দে অলিন্দ পেরিয়ে তারা সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল, মাঝে মাঝে মাথার ওপরের গবাক্ষ দিয়ে এক চিলতে আলো এসে পড়ছে পাথুরে ধাপগুলোতে সিঁড়ির বাঁকে। আলো ছায়ার খেলায় সিঁড়ির কোণে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন যোদ্ধা নাইটদের বর্মগুলোতে অনেক সময় জীবন্ত মনে হচ্ছে। যেন তারা নড়ে উঠছে! এই বুঝি তারা হাতে ধরা বর্শা উঁচিয়ে থামতে বলবে।

সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল দীপাঞ্জনরা। থামের আড়াল থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তারা দেখল চত্বরটা। চাঁদের আলোতে নিষ্প্রাণ চত্বরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। না, কেউ কোথাও নেই। মূক, নিঃসঙ্গ চত্বরটা চাঁদের দিকে তাকিয়ে হয়তো তার ফেলে আসা যৌবনের

কথা ভাবছে। যোদ্ধাদের লোহার জুতোয়, রাজা, আর্ল, ডিউকদের ঘোড়ার খুরে, বন্দিদের নগ্ন ক্ষতবিক্ষত পায়ে তার বুকের ওপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লেখা হয়েছে কত কাহিনি, কত ইতিহাস!

চারপাশে কেউ নেই এ ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত হবার পর দীপাঞ্জনরা চত্বরে নেমে নিঃশব্দে দ্রুত জায়গাটা পেরিয়ে গিয়ে উঠল উলটো দিকের থামের আড়ালে। তারপর অলিন্দ পার হয়ে উপস্থিত হল ডুয়েল কোর্টে। মাথার ওপর থেকে সরাসরি চাঁদের আলো এসে পড়েছে সেই মৃত্যু উঠানে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দেয়ালের গায়ে আঁকা প্রাচীন যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন, তলোয়ারের দাগ। আর সেই জায়গার শেষপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্র নামার দরজাটা।

ডুয়েল কোর্টও পেরিয়ে তারা পৌঁছে গেল দরজার সামনে। দরজার ভিতরে যেন গহ্বর হাঁ করে আছে। জুয়ান একটা পেনসিল টর্চ জ্বালালেন। নীচে নামা শুরু হলো। তারা পৌঁছে গেল ভূগর্ভস্থ সেই কক্ষে। গবাক্ষ দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকছে। সেই আলোতে আবছাভাবে জেগে আছে সাদা পাথরের বড়ো বড়ো কফিন বাক্স বা শবাধারগুলো। জায়গাটাতেও কেউ নিশ্চিত হবার পর সিঁড়ির বাঁকের আড়াল থেকে নেমে পড়ল কবরখানায়। দুপাশে সারসার শবাধার। ডালা ভাঙা শবাধারগুলোর মধ্যে খেলা করছে জমাট বাঁধা অন্ধকার। তারা তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে প্রায় ঘরটার শেষ প্রান্তে পৌঁছোল। কাছেই দেয়ালের শাখায় খাঁজের মধ্যে রাখা সেই বাক্সটা। রিচার্ডের বাসস্থান। তবে সে সেখানে নেই। সম্ভবত নৈশ ভ্রমণে বেরিয়েছে। কাছেই একটা ডালা ভাঙা শবাধার পছন্দ হলো তাদের। দৈর্ঘ্যে অন্তত সেটা ছ'ফুট আর গভীরতায় চার ফুট হবে। অনায়াসে তার মধ্যে দু-জন ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারবে। যার শবাধার তিনি নিশ্চয়ই বেশ দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিলেন। জুয়ান দীপাঞ্জনকে ইশারা করলেন শবাধারে প্রবেশ করার জন্য। হাজার হোক মৃত মানুষের শবাধার। মুহূর্তের জন্য একটু অস্বস্তিবোধ হওয়ায় থমকে দাঁড়াল দীপাঞ্জন। আর ঠিক সেই সময় একটা খস খস শব্দ শুরু হলো ভিতরে। শবাধারে শুয়ে কেউ যেন হাত পা নাড়ছে। দুজনেই চমকে উঠল শব্দটা শুনে। পর মুহূর্তেই একটা বেশ বড়ো ইঁদুর শবাধারের ভিতর থেকে লাফিয়ে নেমে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। এত উত্তেজনার মধ্যেও হেসে ফেলল দুজন। মুহূর্তের জন্য হলেও তাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল প্রাণীটা। এরপর আর সময় নষ্ট না করে তারা আত্মগোপন করল শবাধারের ভিতর। তাদের চারপাশেও শুধু প্রাচীন শবাধার। এদের মধ্যে অনেকেরই নাকি মৃত্যু হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা ডুয়েল কোর্টে। অপঘাতে মৃত মানুষদের আত্মার নাকি মুক্তি ঘটে না! দীপাঞ্জন যেন কোনো একটা বইতে পড়েছিল একথা। প্রাচীন দুর্গপ্রাসাদের ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্রের অন্ধকারে সময় এগিয়ে চলল।

মিনিট কুড়ি সময় কেটে যাবার পর হঠাৎই একটা ছায়ামূর্তি নেমে এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মুখে। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হয়ে গেল দীপাঞ্জনরা। কে ও? সেই স্কন্ধকাটা?'

ছায়ামূর্তিটা একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখল, তারপর যেন বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই সমাধিবাক্সগুলোর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল দীপাঞ্জনরা যেখানে লুকিয়ে আছে

সেদিকে। কাছাকাছি আসতেই চেনা গেল লোকটাকে। সে রিচমন্ড। তার হাতে ধরা আছে ছোট একটা বাক্স। সেই গয়নার বাক্সটা। দীপাঞ্জনদের কয়েক হাত তফাতে গিয়ে সে থামল। দেয়ালের গায়ে লাগানো একটা কফিন বাক্সর ওপর উঠে দাঁড়াল সে। একটা শব্দ করল 'উঃ' করে। হয়তো বা তার কাঁধের ব্যথার জন্যই। বাক্স সমেত হাত উঁচু করল সে। হাত পৌঁছে গেল দেয়ালের গায়ে রিচার্ডের বাসায়। বাক্সটা সে ফেলল সেই ছোট শবাধারে। এরপর লাফিয়ে নীচে নেমে কিছুক্ষণের মধ্যেই সমাধিক্ষেত্র ছেড়ে ওপরে উঠে গেল।

জুয়ান বললেন, 'আমার অনুমানই তবে ঠিক। দাঁড়কাকের বাসাতেই দামি জিনিসগুলো রাখা হয়। আমাদের দেখাবার জন্যই সম্ভবত ওই স্কন্ধকাটা সেজে কাকের বাসা থেকে জিনিসগুলো নিতে এসেছিল সে। কিন্তু তার দুর্ঘটনার পর হয়তো তার আমাদের সৎ লোক বলে মনে হয়েছে। সে জন্য সে আজ আর ও পোশাকের ধার ধারেনি।'

দীপাঞ্জন বলল, 'তাহলে এবার ফেরা যাক? সে বাইরে বেরোতে যাচ্ছিল জায়গাটা ছেড়ে। কিন্তু জুয়ান বলল, 'না, আরও মিনিট দশেক থাকি এখানে। কোনো কারণে সে যদি আবার এখনই ফিরে আসে তবে আমাদের এখানে দেখলে তার মনে ভুল ধারণা হতে পারে। তাছাড়া সে ঘরে ফিরে গেলেও তার জন্য তাকে সময় দেওয়া দরকার। আর একটু অপেক্ষা করে বেরোনোই ভালো।'

মিনিট দশেক সময় কবরের বাক্সর মধ্যেই কেটে গেল। এক সময় জুয়ান বললেন এখানে রাত কাটাতে বেশ ভালোই লাগল। মানুষ মিথ্যা ভয় পায় এসব জায়গা নিয়ে। এটা এত প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র। এখানে কোনো প্রেতাত্মা থাকলে সে কি দেখা দিত না? এই শবাধারগুলোতে যাঁরা ছিলেন বা আছেন তাদের অনেকেরই তো অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। আসলে এসবই মানুষের মনের ভুল। চলো এবার ফেরা যাক।' এই বলে তিনি কফিন ছেড়ে নামতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় দীপাঞ্জনের চোখে পড়ল সিঁড়ির মুখটাতে। নিজের অজান্তেই তার একটা হাত যেন টেনে ধরল জুয়ানকে। তিনিও সেদিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেলেন। সিঁড়ি থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে আরও একজন। গবাক্ষের অস্পষ্ট আলো এসে পড়েছে তার গায়ে। সেই আলোতে বোঝা যাচ্ছে সে রিচমন্ড নয়, দীর্ঘকায় অন্য এক ছায়া মূর্তি। তার পরনে লম্বা ঝুলের পোশাক, কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ার ঝুলছে। ভালো করে তাকে দেখার পর চমকে উঠল তারা। লোকটার কোনো মুণ্ডু নেই, সে এক কবন্ধ মূর্তি, ঘাড়ের ওপর শুধু জেগে আছে তার গলাটা! দীপাঞ্জনতো ওপর থেকে নীচের চত্বরে একেই দেখেছিল। জর্জের মুণ্ডুহীন প্রেতাত্মা!

সে কখন এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক খেয়াল করেনি দীপাঞ্জনরা। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে যেন কোনো কিছুর প্রতীক্ষা করছে পাথরের মূর্তির মতো। কোনো দিকে সে ঘুরছে না। তার দিকে বিস্মিতভাবে চেয়ে রইল তারা। এক একটা মুহূর্ত যেন মনে হচ্ছে এক এক ঘণ্টা। কিছুক্ষণ পরই মুহূর্তের জন্য যেন ঢেকে গেল গবাক্ষটা। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে গেল সব। তারপরই অবশ্য আবার অস্পষ্ট আলোকিত হয়ে উঠল জায়গাটা। গবাক্ষ দিয়ে রিচার্ড প্রবেশ করেছে ঘরে। সারা ঘরে একবার পাক খেয়ে সে গিয়ে বসল নিজের জায়গাতে। তার নিরাপদ আশ্রয়ে সেই দেয়ালের তাকের শবাধারটার মধ্যে। সেখানে

বসে বড়ো কাকটা ঠোঁটগুঁজে ঘাড়ের মধ্যে। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

এবার নড়ে উঠল কবন্ধ ছায়ামূর্তিটা। সে এগোতে শুরু করল দীপাঞ্জনরা যেদিকে আছে সেদিকে। একটা রক্তস্রোত যেন প্রবাহিত হতে লাগল দীপাঞ্জনের ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত। একটা শিরশির অনুভূতি।

রিচমন্ডের মতোই সে এসে দাঁড়াল একই জায়গাতে দীপাঞ্জনদের কাছাকাছি। এবার তারা স্পষ্ট দেখতে পেল তাকে। তার পোশাকই বলে দিচ্ছে সে রাজকীয় ব্যক্তি। তার পরনে মধ্যযুগের সম্ভ্রান্ত লোকেদের মতো সার্টিনের পোশাক, ঝলমলে কোমরবন্ধ। তলোয়ারের খাপটাও ঝিলিক দিচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে। তার ছিন্ন গলাতে ঝুলছে বেশ কিছু মালা। তবে তার বুক যে রক্তে ভেজা তা অস্পষ্ট আলোতেও বোঝা যাচ্ছে। বীভৎস দেখাচ্ছে তার ধড়ের ওপর মুণ্ডুহীন গলাটা!

মূর্তিটা এরপর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রিচমন্ড যে শবাধারে উঠে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। মাথার ওপর দিকে দেওয়ালের গায়ে রিচার্ডের বাক্সর দিকে সে হাত বাড়াল। সে কী লুঠ করতে চায় আর্লদের সম্পদ? নাকি ওখানে তারও কাটা মুণ্ডু রাখা আছে? কাকটা মাথা তুলল এবার। তাকাল কবন্ধ মূর্তির দিকে। কিন্তু তার মধ্যে তেমন কোনো উত্তেজনা দেখা গেল না। বহু যুগ ধরে এটা তার নিরাপদ বাসস্থান। কিন্তু এর পর মুহূর্তেই একটা কাণ্ড ঘটল। সাপ যেমন তার শিকার ধরে তেমনই সেই মূর্তির ডান হাতটা সাপের ছোবলের মতো উঠে গিয়ে চেপে ধরল দাঁড়কাকের গলা। এমন কোনো ঘটনা ঘটতে পারে হয়তো ভাবতেই পারেনি কাকটা। দীর্ঘ দিন ধরে এ প্রাসাদে সবাই তাকে আদর যত্নই করে এসেছে, কেউ আক্রমণ করেনি। কবন্ধ মূর্তির বজ্রকঠিন মুঠির মধ্যে আটকা পড়ে গেল সে। এমনভাবে আটকা পড়ল যে তার ডাক দেবার ক্ষমতা রইল না। দু-একবার পাখা ঝাপটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে থেমে গেল। আঙুলগুলো এঁটে বসেছে তার গলায়। কাকটাকে নিয়ে কবন্ধ মূর্তি লাফিয়ে নীচে নামল, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে যেদিক থেকে সে এসেছিল সেদিকে এগোল।

জর্জের প্রেতাত্মা সিঁড়ির মুখে অদৃশ্য হতেই জুয়ানের ধাক্কায় সংবিৎ ফিরল দীপাঞ্জনের। জুয়ান বললেন, 'চলো ওকে অনুসরণ করতে হবে। ও যদি কোনো রক্তমাংসের মানুষ হয় তবে এত নির্লোভ চোর আমি দেখিনি। ধনরত্নর বদলে দাঁড়কাক চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে! ওই কাক নিয়ে ও কী করবে?'

কবরের বাক্স থেকে বেরিয়ে দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগোল তারা। দীপাঞ্জনরা যখন বাইরে এল তখন কাক হাতে সেই কবন্ধ মূর্তি সেই ডুয়েল কোর্ট পার হয়ে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দীপাঞ্জনরাও নিঃশব্দে এগোল তার পিছনে। কবন্ধ মূর্তির আবার দেখা মিলল ভিতরের চত্বরটাতে। স্তম্ভগুলোর আড়াল থেকে সে নীচে নেমেছে চত্বর পেরিয়ে অন্য দিকে যাবার জন্য। যেখানে দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা আছে। স্তম্ভের আড়াল থেকে তারা দেখতে লাগল তাকে।

জর্জের প্রেতাত্মা এখন চত্বরের মাঝখানে পৌঁছেছে, ঠিক তখনই ওপাশের স্তম্ভের আড়াল থেকে চত্বরে নামল একজন। তার পরনে যুদ্ধের পোশাক। হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার

ফিতে বাঁধা জুতো। কোমরবন্ধে ঝুলছে লম্বা তলোয়ার। দেহের উর্ধ্বাংশ ঢাকা আছে লোহার ঝালর দেওয়া বর্মে, মাথায় শিরস্ত্রাণ।

লোকটাকে দেখেই চত্বরের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জর্জের প্রেতাত্মা। সেই বর্মধারী যোদ্ধা এগিয়ে এল তার দিকে। এবার তাকে চিনতে পারল দীপাঞ্জনরা। নতুন আগন্তুকের হাতে একটা শিঙা ধরা আছে। তিনি আর্ল সেভার্ন।

আর্ল ও সেই কবন্ধ মূর্তি কিছুটা তফাতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অদ্ভুত মূর্তি দুটো পরস্পর পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল।

আর্ল তারপর প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে? রিচমন্ড নাকি?'

কবন্ধ জবাব দিল, 'আমি রিচমন্ড নই। আমি জর্জের প্রেতাত্মা।'

আর্ল বললেন, 'তা হতে পারে না। তাহলে তুমি নিশ্চই নরাফাক্সের রাজদ্রোহী ডিউক?'

তার কথা শুনে কবন্ধমূর্তি যেন একটু হাসল বলে মনে হলো। তারপর সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সে কথা অবশ্য তুমি বলতে পারো।'

আর্ল বললেন, 'আমি তাহলে ঠিকই ধরেছি। রাজদ্রোহী তুমি দুর্গে প্রবেশ করেছ কেন? আমি রাজার অনুগত সেবক আর্ল সেভার্ন তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছি। চলো, ডুয়েল কোর্টে চলো।' এই বলে তলোয়ারের হাতলে হাত রাখলেন বৃদ্ধ আর্ল।

স্তম্ভের আড়ালে অন্ধকারে আত্মগোপন করে দীপাঞ্জন আর জুয়ান শুনতে লাগলেন তাদের কথোপকথন।

কবন্ধ মূর্তি স্পষ্টই হাসল দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা শুনে। সে বলল, 'সে না হয় যাওয়া যাবে ডুয়েল কোর্টে। কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলাম। তুমি নীচে নেমে আসায় আমার কাজে সুবিধা হলো। ডুয়েল কোর্টে যাবার আগে এটা দেখো—' এই বলে সে চাঁদের আলোতে উঁচু করে তুলে ধরল গলা চেপা দাঁড় কাকটাকে।

বৃদ্ধ আর্ল সম্ভবত এতক্ষণ ব্যাপারটা খেয়াল করেননি। প্রেতাত্মা সেটা ওপরে তুলে ধরতেই আর্ল আর্তনাদ করে উঠলেন—'রিচার্ড' বলে।

তারপর তিনি বলে উঠলেন, 'ওকে নিয়ে তুমি কী করবে? ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও বলছি।'

ছায়ামূর্তি বলল, 'হ্যাঁ ওকে ছেড়ে দেব ঠিকই, কিন্তু তার আগে একটা একটা করে ডানা ছিঁড়ব, তারপর গলাটা মুচড়ে ভাঙব।' এই বলে সে কাকটার ডানা থেকে কটা পালক ছিঁড়ে অন্ধকারে উড়িয়ে দিল।

ব্যাপারটা দেখেই আর্তনাদ করে উঠলেন আর্ল। তিনি কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'দোহাই তোমার, অমন কোরো না। নরফাক্সের ডিউক তুমি কী চাও বলো? আমি আত্মসমর্পণ করছি। এ প্রাসাদ তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, শুধু ওকে তুমি ছেড়ে দাও।'

জর্জের প্রেতাত্মা বলে উঠল, 'এ ভাঙা প্রাসাদ নিয়ে কী করব? আমি অন্য জিনিস চাই। তার আগে তলোয়ারটা নামিয়ে রাখো।' ইতস্তত করতে লাগলেন আর্ল। তাই দেখে স্কন্ধকাটা আরও দুটো পালক ছিঁড়ে বাতাসে ওড়ালেন। আবার আর্তনাদ করে উঠলেন আর্ল। তারপর তলোয়ারটা কোষমুক্ত করে ছুঁড়ে ফেললেন দূরে। ধাতব শব্দ করে সেটা

আছড়ে পড়ল দীপাঞ্জনরা যে থামের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তার কাছেই। আর্ল এরপর কাতরকণ্ঠে বলল, 'আর কী করতে হবে বলো? কি নিতে এসেছ তুমি ধন সম্পদ? ও সব রিচার্ডের বাক্সে আছে। সব নিয়ে যাও, শুধু ওকে ছেড়ে দাও...

এ পর্যন্ত শোনার পর জুয়ান বললেন, 'লোকটা লুটেরা ওকে থামাতে হবে।' এই বলে থামের আড়াল থেকে লাফিয়ে নেমে আর্লের তলোয়ারটা নিয়ে জুয়ান ছুটলেন কবন্ধ মূর্তির দিকে। তাঁকে অনুসরণ করল দীপাঞ্জন। সেই স্কন্ধকাটা শব্দ পেয়ে পিছনে ফিরল। জুয়ানকে ছুটে যেতে দেখে সেও কোষমুক্ত করে ফেলল তলোয়ার।

প্রথম আঘাত হানলেন জুয়ানই। তলোয়ার উঁচিয়ে সেটা প্রতিহত করল ছায়া মূর্তি। দুই তলোয়ারের সংঘর্ষে প্রচণ্ড ধাতব শব্দ আর আগুনের ফুলকি উঠল। শুরু হলো এক অদ্ভুত লড়াই। চত্বর জুড়ে তখন এগিয়ে কখনও পিছিয়ে লড়াই চালাতে থাকল দুই যোদ্ধা। ঠিক যেমন ডুয়েল লড়াই হত একসময়। দুই তলোয়ারের ধাতব সংঘর্ষের শব্দ অনুরণিত হতে লাগল চত্বর জুড়ে। সে লড়াইয়ের হতবাক দর্শক দীপাঞ্জন আর আর্ল।

এক হাতে কাকটা ধরে অন্য হাতে তলোয়ার ধরে লড়াই চালাচ্ছে কবন্ধ মূর্তি। তবে জুয়ানও যে এত ভালো তলোয়ার চালাতে পারেন তা জানা ছিল না দীপাঞ্জনের। সেই কবন্ধমূর্তি যেন পিছু হটতে শুরু করেছে আত্মরক্ষা করতে করতে। জুয়ানের তলোয়ার একবার ছুঁয়ে গেল ছায়ামূর্তির বাহু। মুহূর্তের মধ্যেই একটা লাল দাগ সৃষ্টি হলো সেখানে। ছায়ামূর্তি সঙ্গে সঙ্গে হাতে ধরা দাঁড়কাকটাকে উঁচিয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, 'এই বুড়ো কাকটা আর বাঁচবে না। এখনই এর প্রাণ বার করে দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটল। আর্ল সেভার্ন হঠাৎ ছুটে এসে জুয়ানকে জাপ্টে ধরে বলতে থাকলেন, লড়াই থামাও, লড়াই থামাও, নইলে ও রিচার্ডকে মেরে ফেলবে।'

এ ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না জুয়ান হতচকিত হয়ে পড়লেন তিনি। কবন্ধ মূর্তি মনে হয় এই রকম কোনো সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। তলোয়ারের উলটো দিক দিয়ে সে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল জুয়ানের মাথায়। হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ল জুয়ানের, আর্লের বাহুবন্ধন থেকে তিনি ঢলে পড়লেন মাটিতে। দীপাঞ্জন ছুটে আসতে যাচ্ছিল। কিন্তু কবন্ধ মূর্তি চিৎকার করে উঠল—'কাছে এলেই এখনই এর মুণ্ডু কেটে দেব।' সেই বীভৎস মূর্তির উদ্যত তলোয়ারের নীচে পড়ে যাচ্ছেন অচৈতন্য জুয়ান। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপাঞ্জন।

আর্লও কিছুটা পিছু হটে দাঁড়িয়েছেন। তাকিয়ে আছেন কবন্ধমূর্তির পায়ের নীচে পড়ে থাকা জুয়ানের দিকে। হয়তো তিনি ভাবতে পারেননি তার জন্য এমন একটা ঘটনা ঘটবে। তিনি অস্পষ্ট ভাবে ছায়ামূর্তির উদ্দেশ্যে বললেন, 'ওকে তুমি মারলে?'

সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ মারলাম। এবার কাকটার মুণ্ডু কাটাব। কবর ঘরের বাক্সে যা আছে তা আমি নিতে আসিনি। নিতে এসেছি তোমার কাছে যে জিনিসটা রাখা আছে সেটা।'

কথাটা শুনে যেন থমকে গেলেন আর্ল। তাঁর মুখ স্পষ্ট বিস্ময় ফুটে উঠল। কবন্ধ মূর্তি আবার ধমকে উঠল, 'দিয়ে দাও বলছি, দিয়ে দাও।'

আর্ল হতভম্বর মতো আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর শিঙার মাথার দিকটা অন্য হাতের চেটোয় ওপর উপুড় করে কয়েকবার ঝাঁকি দিলেন। একটা ছোট্ট কাপড়ের পুঁটলি শিঙার ভিতর থেকে খসে পড়ল তাঁর হাতে। সেটা নিয়ে তিনি ছুড়ে দিলেন কবন্ধ মূর্তির দিকে। কবন্ধর এক হাতে ধরা তলোয়ার, অন্য হাতে দাঁড়কাকটা। আর্ল যে জিনিসটা ওভাবে তার দিকে দেবেন তা মনে হয় ধারণা করতে পারেনি সে। ছোট্ট বলের মতো আকারের কাপড়ের পুঁটলিটা কবন্ধর গায়ে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে ফেটে গেল। তার থেকে বিন্দ বিন্দু আলোক বিন্দু যেন ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। জহরত!

কবন্ধ মূর্তি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে তলোয়ারটা পাশে নামিয়ে আর্ল আর দীপাঞ্জনদের দিকে তাকাতে তাকাতে তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা জহরতগুলো আর পুঁটুলিটা তার পোশাকের মধ্যে পুরে ফেলল। কিন্তু সে তলোয়ারটা তুলে নিয়ে যখন উঠতে যাচ্ছে তখনই সে কীসে যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল একবার। আর তখনই যেন কীভাবে তার হাত ফসকে মুক্ত হয়ে গেল রিচার্ড। একটা কর্কশ ডাক ছেড়ে আতঙ্কিত পাখিটা উড়ে গেল আকাশের দিকে। আর তারপরই এক খসখস অদ্ভুত শব্দ হতে লাগল দুর্গ প্রাকারের খাঁজ আর মাথার ওপরের তাকগুলো থেকে। এক অদ্ভুত খসখস শব্দ!

কবন্ধ মূর্তিটা মাটিতে পড়ে গেলেও দাঁড়কাকটা হাত ছাড়া হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিং-এর মতো লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। তারপর তলোয়ারটা দিয়ে অচৈতন্য জুয়ানকে দেখিয়ে বলল, 'কাকটা গেল যাক। এ লোকটা তো আছে, এর জীবন তোমার ওপরই নির্ভর করছে আল। দাঁড়কাক নয়, একটা মানুষের জীবন।'

আর্ল বলে উঠলেন, 'যা ছিল তোমাকে দিয়েছি। এবার তুমি দুর্গ ছেড়ে চলে যাও।'

কবন্ধমূর্তি বলে উঠল, 'যাব, তার আগে তোমার হাতের শিঙাটাও চাই আমার চাই। ওটা নিতেই তো এসেছি আমি।'

বৃদ্ধ আর্ল সেভার্ন কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। শিঙাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। যেন বৃদ্ধ আর্ল কী করবেন সেটা বুঝে উঠতে পারছেন না।

তাকের গায়ে খসখস শব্দ ক্রমশ বাড়ছে। মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা পড়ছে চাঁদ। মুহূর্তের জন্য অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে চত্বরটা। মাটিতে পড়ে আছেন জুয়ান। মাথার কাছে মাটি রক্তে ভেজা। কবন্ধ মূর্তির তলোয়ারের নীচে তার দেহ। বেশ কিছুটা তফাতে দীপাঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে অসহায়ভাবে। সে বুঝতে পারছে না সামান্য শিঙাটা দিতে তিনি এত দেরি করছেন কেন? ওই জহরতগুলোর থেকেও কী শিঙার মূল্য বেশি? নাকি শিঙার চেয়ে জুয়ানের জীবনের মূল্য কম আর্লের কাছে? আর্লের সিদ্ধান্তের ওপর হয়তো সত্যিই নির্ভর করছে জুয়ানের জীবন।

দীপাঞ্জন তাঁকে বলতে যাচ্ছিল শিঙাটা কবন্ধমূর্তিকে দিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু তার আগেই সেই মূর্তি বলল, 'দাও শিঙাটা দিয়ে দাও।'

আর্লের মুখে যেন একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। হয়তো বা সেটা পাগলের পাগলামো। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, দিচ্ছি, তবে দেবার আগে জিনিসটা একবার বাজিয়ে নেই।'

ছায়ামূর্তি শুনে অট্টহাস্য করে বলে উঠল, 'ওটা বাজিয়ে আর্ল তোমার সৈন্যসামন্ত

ডাকবে নাকি? ছিল তো শুধু রিচমন্ড। সে এখন তলোয়ারের ঘায়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বন্ধ ঘরে। আর কে আসবে শিঙার ডাকে? ঠিক আছে কয়েকবার বাজিয়ে নাও তোমার শিঙা।'

কয়েক মুহূর্ত সেই কবন্ধ মূর্তির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বৃদ্ধ আর্ল। তারপর শিঙাটা আকাশের দিকে তুলে ধরে ফুঁ দিলেন তাতে। অদ্ভুত এক পোঁ পোঁ শব্দ হলো। আর তার পরই যেন দাঁড়কাকগুলোর সম্মিলিত বীভৎস চিৎকারে কেঁপে উঠল দুর্গপ্রাসাদ। কয়েক মুহূর্তর জন্য অন্ধকার নেমে এল চত্বরে। মেঘ সরে যেতেই দীপাঞ্জন দেখতে পেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। ঝাঁকে ঝাঁকে দাঁড়কাক ঘিরে ধরেছে কবন্ধ মূর্তিকে। তারা ঠোকোর দিচ্ছে তাকে। সেই মূর্তি পাগলের মতো তলোয়ার চালাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু একটা দাঁড়কাক কাটা পড়লেই তার জায়গা দখল করে নিচ্ছে পাঁচটা দাঁড়কাক। তাদের লম্বা ধারালো ঠোঁটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে প্রেতাত্মার পোশাক। আর্ল সেভার্ন বাজিয়ে চলেছেন তাঁর শিঙা। আর সেই শব্দে কবন্ধ মূর্তির দিকে মাথারা ওপরের বুরুজ থেকে দুর্গর প্রাচীন খাঁজ থেকে মাথার ওপরের তাক থেকে ধেয়ে আসছে শয়ে শয়ে দাঁড়কাকের দল। বৃদ্ধ আর্লের অদৃশ্য প্রহরীরা। এতদিন আর্ল তাদের রক্ষা করেছেন এবার তারা তাঁর জন্য আত্মাহুতি দিতে তৈরি। তাদের বীভৎস চিৎকার আর আর্লের শিঙা ফোকার শব্দে কাঁপছে দুর্গ প্রাসাদ। কবন্ধ মূর্তির গলাটা খসে পড়ল তার ঘাড় থেকে। সেটা গড়াতে গড়াতে এসে পড়ল দীপাঞ্জনের পায়ে কাছে। লাল রঙ করা একটা ফাঁপা টিনের কৌটো। কিন্তু সেটা খুলে যেতেই উন্মোচিত হলো তার ভিতরে থাকা লোকটার মাথা। কিন্তু কাকগুলো মৌমাছির মতো লোকটাকে ঘিরে ধরে লোকটার মাথায় মুখে ঠেকোর দেবার চেষ্টা করছে যে তার মুখটা ঠিক বুঝতে পারছে না দীপাঞ্জন। কাকের পালকও উড়ছে চারপাশে।

একসময় লোকটা আর লড়াই চালাতে পারল না। কাকেদের চক্রব্যূহে আটকা পড়ে গেছে সে। প্রতি মুহূর্তে ধারালো ঠোঁটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে তার শরীর। ছিন্নভিন্ন পোশাক থেকে উন্মুক্ত হয়ে গেছে তার দেহ। প্রতি মুহূর্তে কাকগুলো ঠোকোর বসাচ্ছে সে সব জায়গাতে। তলোয়ারও এক সময় পড়ে গেল হাত থেকে। দু-হাত দিয়ে কাকের ঠোঁট থেকে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে লোকটা বাঁচার জন্য ছুটল চত্বর ছেড়ে দুর্গর ভিতর অন্ধকার অংশে। কিন্তু কাকগুলোও তার পিছু ছাড়ল না। লোকটার পিছন পিছন কাকের ঝাঁকও হারিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। দুর্গের ভিতর থেকে ভেসে আসতে লাগল লোকটার আর্ত চিৎকার আর কাকেদের ডাক। অন্ধকারের মধ্যে সে শব্দ পাক খাচ্ছে দুর্গর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। অর্থাৎ কাকের দল লোকটার পিছু ছাড়েনি। দীপাঞ্জন দেখল জুয়ান উঠে বসেছেন। সে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। যদিও তার কপাল ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে তবু তিনি বললেন, আমার তেমন কিছু হয়নি। প্রাথমিক অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম ঠিকই, কিন্তু উঠতে পারছিলাম না চোখের সামনে লোকটার তলোয়ার নাচছিল বলে। তাই অজ্ঞানের ভান করে পড়ে ছিলাম। শেষের দিকের সব কথোপকথন আমি শুনেছি।'

ও কথা বলার পর দীপাঞ্জনের হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে জুয়ান বললেন, 'চলো রিচমন্ডকে

খুঁজে বার করতে হবে। সে কী অবস্থায় আছে কে জানে। আর রুমাল দিয়ে আমার কপালে একটা ফেট্টি বেঁধে দাও।'

দীপাঞ্জন দ্রুত করে ফেলল সে কাজটা। তারপর মাটি থেকে তলোয়ার দুটো কুড়িয়ে নিয়ে তারা এগোল দুর্গর ভিতর কোন্ ঘরে রিচমন্ড আছে তাকে খোঁজার জন্য। আর্ল পাগলের মতো বিভিন্ন খাদে শিঙা বাজিয়েই চলেছেন। তাঁর কোনো দিকে হুঁশ নেই। কিন্তু যখন দীপাঞ্জনরা এগিয়ে গিয়ে প্রাসাদের ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে তখন তারা আবার দেখতে পেল সেই লোকটাকে। কাকের তাড়া খেয়ে কী ভাবে যেন সে পৌঁছে গেছে দুর্গপ্রাকারে। প্রাকারের গায়ে সৈন্য চলাচলের যে পথ আছে চাঁদের আলোতে সে পথ ধরে ছুটছে লোকটা, যার তার পিছু ধাওয়া করছে কাকের দল! সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপাঞ্জনরা।

চিৎকার করতে করতে দুর্গ প্রাকারে সংকীর্ণ পথ দিয়ে ক্রমশ ওপরে উঠছে লোকটা। এক সময় যে পৌঁছে গেল সবচেয়ে উঁচু জায়গাতে। ঠিক সেই সময় হঠাৎই শিঙা ফোঁকা থামিয়ে দিলেন আর্ল। আর শব্দ বন্ধ হওয়াতে কাকের দল হঠাৎ লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে উড়তে শুরু করল আকাশে। তাদের চিৎকারও থেমে গেল। আক্রমণ মুক্ত হয়ে লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। মাথা উঁচু করে সে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল কাকগুলো আর ধেয়ে আসছে কিনা? কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর সে যেন নিশ্চিত হলো যে কাকগুলো আর আসছে না। সে এরপর দুর্গ প্রাকারে গায়ের তাক থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে সম্ভবত দুর্গ থেকে পালাবার অন্য কোনো পথ আছে কিনা তা দেখতে লাগল।

আর তারপরই ঘটল সেই ভয়ংকর ঘটনাটা। চাঁদটাকে ডানার আড়ালে ঢেকে দিয়ে আকাশ থেকে নেমে এল একটা বিশাল কাক। লোকটার পিছনে ঠোকোর দিল সে। রিচার্ড! হঠাৎ ঠোকোর আর ডানার ঝাপটায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল লোকটা। প্রাকারের ওপর থেকে একটা বীভৎস আর্তনাদ করে লোকটা সশব্দে এখানে ওখানে ধাক্কা খেতে খেতে আছড়ে পড়ল চত্বরের এক কোণে। দীপাঞ্জন আর জুয়ান ছুটে গেলেন তার কাছে। তার নিষ্প্রাণ রক্তাক্ত মুখমণ্ডল দেখে চমকে উঠল তারা। চাঁদের আলোতে তাদের সামনের পড়ে আছে ডিউক শ্যাননের দেহ!

পরিশিষ্ট : সকালবেলা রিচমন্ডের ঘরে বসে কথা বলছিল দীপাঞ্জন আর জুয়ান। রিচমন্ডকে তারা উদ্ধার করেছিল একতলারই একটা ঘর থেকে তার গোঙানি শুনে। আলো ফোটার পরই রিচমন্ড পুলিশ ডাকে। তারা এসে তুলে নিয়ে গেছে লর্ড ওরফে রবার্টের দেহ। পুলিশ তাকে শনাক্ত করতে পেরেছে। তার নাম রবার্ট। প্রত্নসামগ্রীর চোরা কারবারি। এর আগে সে একবার পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যায়।

দীপাঞ্জন বলল, 'লোকটা আচ্ছা ধোঁকাবাজ। সেমিনারে আসা ডিউক শ্যাননকে কিডন্যাপড করে নিজে শ্যানন সেজে এখানে এসেছিল! ভাবুন কী বুদ্ধি! তবে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বেশ খোঁজখবর রাখতো লোকটা। কী সুন্দর আমাদের ইতিহাসের গল্প শোনাচ্ছিল!'

জুয়ান বললেন, 'যারা এ সব প্রাচীন প্রত্নসামগ্রীর চোরাকারবারি তাদের ও সব খোঁজ রাখতে হয়, ইতিহাসও জানতে হয়। কুড়িয়ে পাওয়া খবরের কাগজটা যদি আগে খুলে দেখতাম তবে সব স্পষ্ট হয়ে যেত। প্রথম কাগজটায় ইতিহাসবিদ শ্যাননের ছবিসহ তার নিখোঁজ হবার সংবাদ ছাপা হয়েছিল, যার দ্বিতীয় দিনের কাগজে লন্ডনের পল্লি অঞ্চল থেকে পুলিশ কর্তৃক তাঁর উদ্ধার হওয়ার কাহিনি। তাই কাগজদুটো হাতিয়ে নিয়ে সেগুলো ফেলে দিয়েছিল রবার্ট।

রিচমন্ড বলল, 'পরশু রাতে আমি যখন কবন্ধর পোশাক পরে পরদিন আপনাদের দেখাবার জন্য প্রাচীন গহনাগুলো আনতে যাই তখন সম্ভবত সেও দেখে ফেলে আমাকে। তারপর কাল রাতে পোশাক ঘর থেকে হাতিয়ে নেয় আমার পোশাকটা। আমি কাল রাতে অবাক হয়ে গেছিলাম পোশাকটা না পেয়ে। আর্ল মাঝে মাঝে ঢোকেন সেই পোশাক ঘরে। আমি ভাবলাম মনের খেয়ালে পোশাকটা তিনি কোথাও সরিয়ে ফেলেছেন!

জুয়ান আবার বললেন, 'আমার এবার মনে হচ্ছে বারবার 'নরফক্সের লর্ড, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে' ইত্যাদি বলে আর্ল সেভার্ন মনে হয় ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমাদের কোনো ইঙ্গিত দিতে চাচ্ছিলেন। প্রথমদিনের কাগজে লর্ডের নিখোঁজ হবার খবর তিনি পড়েছিলেন। হয়তো তিনি ধরতে পেরেছিলেন ধাপ্পাবাজির ব্যাপারটা। আমরা তাঁর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝে কথাগুলোকে পাগলের প্রলাপ ভেবেছিলাম।

রিচমন্ড বলল, হ্যাঁ। তা হতে পারে। এবার বেরোতে হবে। আশা করছি নটিংহ্যাম থেকে লন্ডনে ফেরার দুপুরের ট্রেনটা আপনাদের ধরিয়ে দিতে পারব। আমার জন্য আপনাদের বিপদের মুখে পড়তে হলো সে জন্য দুঃখিত।'

জুয়ান বললেন, 'আমরা দুঃখিত নই,...আপনার মতো নির্লোভ মানুষের দেখা পেয়ে। এভাবে আপনি কোটি কোটি পাউন্ডের সম্পত্তি আগলে রাখছেন! অসুস্থ, মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষের সেবা করছেন। এমন মানুষের চট করে দেখে মেলে না। তবে আপনাদের কাছে একটা শেষ প্রশ্ন যাচ্ছে। চত্বরে যা ঘটেছিল তা আমরা আপনাকে আগেই বলেছি। রবার্ট নামের জালিয়াত জহরতগুলো হস্তগত করার পর শিঙাটা চাইছিল কেন? ওটাইতো তার বিপদ ডেকে আনে!'

রিচমন্ড মুহূর্ত খানেক চুপ করে থেকে বলল, 'তাহলে ব্যাপারটা আপনাদের বলি। এর পিছনে ঐতিহাসিক সত্যতা কতটা আমার জানা নেই। এই আর্ল বংশধরদের মধ্যে বংশানুক্রমে এক গোপন কাহিনি প্রচলিত আছে। রবার্ট নামের লোকটা কীভাবে যে গল্প জানল তা আমি বলতে পারব না। আপনাদের সম্ভবত আগে বলেছিলাম যে নর্ম্যান হলেও স্যাক্সনদের সঙ্গে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল আর্লদের। তারা কখনও আক্রমণ করেনি এই দুর্গ। এর পিছনে গোপন কাহিনি হলো, শেরউড বনে রবিনহুড মণিকারের কাছ থেকে রাজা জনের জহরতের মালা ডাকাতি করার কিছুদিনের মধ্যেই রাজার সেনারা এসে ঘিরে ফেলল বন। রবিন পালিয়ে এসে আশ্রয় নিল এই নর্ম্যান দুর্গে। আর্ল সেভার্নের শিকারি পূর্বপুরুষ কী কারণে তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তা গল্পে বলা নেই। যাই হোক রবিন এ দুর্গ ছেড়ে বেরোবার সময় কৃষকের ছদ্মবেশে বেরোল। তার আগে গচ্ছিত রেখে গেল

দুটো জিনিস। ওই জহরতের মালা, যারা . . .রিচমন্ড কথা শেষ করার আগেই দীপাঞ্জন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলল, 'তার মানে ওটা রবিনহুডের শিঙা!'

রিচমন্ড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, গল্পটা তেমনই বলে। যুগ যুগ ধরে শিঙা আর তার ভিতর রাখা জহরত রক্ষা করে আসছে এই আর্ল পরিবার। ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, তবে? জহরতের থেকে অনেক বেশি দাম হবে শিঙার। কোটি পাউন্ডে বিক্রি হবে রবিনহুডের শিঙা। সে জন্যই ওটা নিতে চাচ্ছিল রবার্ট।

রিচমন্ডের ঘর ছেড়ে তার সঙ্গে অলিন্দে বেরিয়ে এল দীপাঞ্জন আর জুয়ান। মালপত্র নিয়ে রিচমণ্ডের সঙ্গে চত্বরে নেমে এল দীপাঞ্জন। চত্বর পেরিয়ে তারা প্রধান তোরণের দিকে এগোতে যাচ্ছে, ঠিক এমন সময় থামের আড়াল ছেড়ে কবর ঘরের দিক থেকে বেরিয়ে এলেন আর্ল সেভার্ন। তার পরনে ঝলমলে পোশাক। কোমরবন্ধে তলোয়ার ঝুলছে। যেন ছবির বই থেকে উঠে আসা ডিউক তিনি। তার বাঁহাতের ওপর বসে আছে রিচার্ড, আর ডান হাতে ধরা আছে সেই শিঙাটা। তিনি তাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই দীপাঞ্জনরা মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল তাঁকে।

খুশি হলেন বৃদ্ধ আর্ল। তিনি দীপাঞ্জনদের বললেন, 'তোমরা কি শেরউড বনে ফিরে যাচ্ছ? রবিনকে বলো তার জিনিস নিরাপদেই আছে। তোমরা যখন ফিরে যাচ্ছ তখনতো তোমাদের অভিবাদন জানাতে হয়।' এই বলে তিনি শিঙাটা উচিয়ে ধরে ফুঁ দিলেন তাতে। অন্য রকম এক গম্ভীর শব্দ হলো শিঙা থেকে। সে শব্দ শুনে কাকগুলো কিন্তু ধেয়ে এল না। শুধু রিচার্ড একটা মৃদু শব্দ করল 'ক-ক' করে। যেন সে বলল—'গুড বাই!'
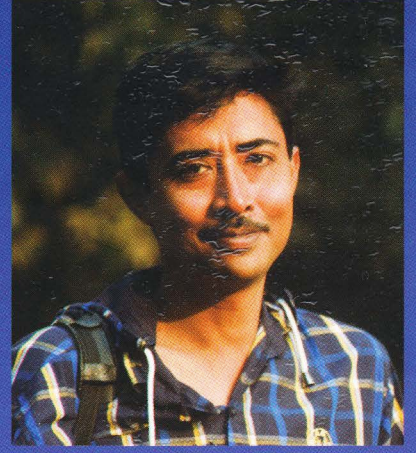
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত। জন্ম ১৯৭৩ কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ। বর্তমান বাসস্থান কাঁচরাপাড়া। কিশোর সাহিত্যের নিয়মিত লেখক। সন্দেশ, শুকতারা, আনন্দমেলা, কিশোর ভারতী, প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত শিশু-কিশোর পত্রিকায় নিয়মিত লিখে চলেছেন। বড়দের জন্যও লেখেন। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৫টি। দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র (প্রথম খণ্ড)।' তাঁর সুদীপ্ত-হেরম্যানের উপন্যাস ইংরাজিতেও অনূদিত হয়েছে। জনপ্রিয় এফ.এম. চ্যানেলগুলোতে পরিবেশিত হয়েছে একাধিক গল্পের নাট্যরূপ। শখ-আড্ডা, ভ্রমণ।

২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী' শিশু কিশোর অ্যাকাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন।
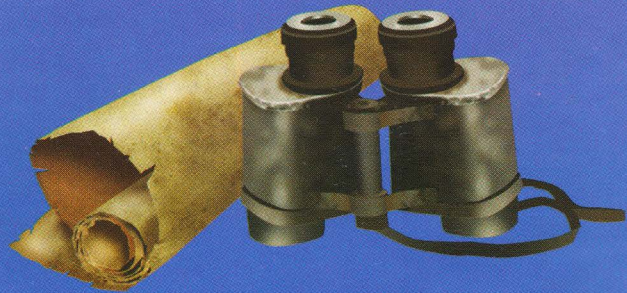
তুষারশুভ্র কিরীটশোভিত হিমালয়ের রহস্যময় পর্বত কন্দর, কোস্টারিকার ক্লাউড ফরেস্ট বা মেঘ-অরণ্য রাব-আল-খালি-র কুখ্যাত মরুভূমির হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন নগরী, আফ্রিকার বনভূমির 'চাইল্ড আর্মি', অথবা ইতিহাসের গন্ধমাখা রবিনহুডের সেই শেরউড বন!

কখনও অদেখা পৃথিবী, কখনও ইতিহাসের গন্ধমাখা পটভূমিতে পাঁচটি রহস্যময় রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস এক মলাটে সংকলিত।

9 788129 529176